অনুবাদ: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

А. С. Макаренко

# ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Книга первая

*На языке бенгали*

# সূচি



## জীবনজয়ের পথে

### প্রথম খণ্ড

# মুখবন্ধের পরিবর্তে*

## মাক্সিম গোর্কির 'সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক-দিগন্তরে' বইটি থেকে

১৮৯১ সালের গ্রীষ্মে আমি একবার কুরিয়াজ মঠে যাই ও তৎকাল-খ্যাত ক্রোন্‌স্টাড্‌ট্‌-এর জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলি। কিন্তু পরের বার সে-মঠে থাকার সময়ে আমি যে সেখানে তার আগে আরও একবার এসেছি তা তৃতীয় দিনের আগে আমার মনেই পড়ে নি। এবারে আমি ছিলুম ওখানকার চার শো বাসিন্দা — পূর্বতন 'রাস্তার বাউণ্ডুলে' আর 'সামাজিক দিক থেকে বিপজ্জনক' সব ছেলেমেয়ের মধ্যে তাদের অতিথি হয়ে। ওরা এখন আমার চিঠি-চালাচালির বন্ধু...

গত চার বছর ধরে এই উপনিবেশের বাচ্চাদের সঙ্গে আমার চিঠি-লেখালেখি চলছে। আমি লক্ষ্য করে চলেছি ওদের ব্যাকরণ আর বানান-জ্ঞানের নিয়ত-পরিবর্তন, সমাজ-চেতনার শ্রীবৃদ্ধি, চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে

---

* মাকারেঙ্কোকে যাঁরা ভালোভাবে চিনতেন এমন ব্যক্তিদের লেখা তিনটি প্রবন্ধ 'জীবনজয়ের পথ' উপন্যাসটির ভূমিকা হিসেবে বইয়ের এই প্রথম খণ্ডে 'প্রগতি প্রকাশন' সংযোজন করছে। এই প্রবন্ধ-লেখকরা হলেন, যথাক্রমে, বইটি যাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে সেই মাক্সিম গোর্কি স্বয়ং; মাকারেঙ্কোর উপনিবেশে লালিত ও এ-উপন্যাসে সেমিওন কারাবানভ নামে চিত্রিত পরবর্তী কালে রুশ ফেডারেশনের সম্মানিত শিক্ষক

ওদের সচেতনা। আমি দেখছি ওই সব খুদে নৈরাজ্যবাদী, চালচুলোহীন ভবঘুরে, চোর আর ছুকরি বেশ্যারা কীভাবে ভদ্র, শ্রমজীবী মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছে।

কলোনিটার বয়স হল সাত বছর, তার মধ্যে চার বছর ওটা ছিল পল্‌তাভা জেলায়। এই সাত বছরে শ্রমিক ফ্যাকাল্টি (বা, 'রাব্‌ফাক') আর কৃষি ও সামরিক বিদ্যালয়গুলিতে এই কলোনি যুগিয়েছে বেশ কয়েক কুড়ি মানুষ। আর অন্যান্য উপনিবেশে 'শিক্ষক-শিক্ষিকা'র পদে আরও কিছু লোক। কিন্তু সরকারি অপরাধ-তদন্ত দপ্তর মারফত পাঠানো আর মিলিত্‌শিয়া রাস্তা থেকে যাদের কুড়িয়ে পেয়েছে এমন সব ছেলেপিলে দিয়ে এই শূন্যতা পূরণ হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। তাছাড়া বেশ কিছু বাচ্চা-বাউণ্ডুলেও মাঝে-মাঝেই এসে স্বেচ্ছায় জুটে যায় ওখানে। ফলে উপনিবেশটার বাসিন্দার সংখ্যা কখনই চার শো-র নিচে নামে না। গত অক্টোবর মাসে ন. দেনিসেঙ্কো নামে উপনিবেশের এক বাসিন্দা ওখানকার 'দলপতিদের' পক্ষ থেকে আমায় লিখে জানিয়েছে :

'আপনি এখান থেকে যাওয়ার পর সবকিছু কত-যে পালটে গেছে তা যদি দেখতেন! আমাদের উপনিবেশের বহু পুরনো বাসিন্দা নিজে থেকেই গিয়ে যোগ দিয়েছে কল-কারখানায়, শ্রমিক ফ্যাকাল্টিতে আর শিল্প-বিদ্যালয়ে। পুরনো বাসিন্দা এখন আর বড় একটা নেই, বেশির ভাগই এখন নবাগত। অবিশ্যি, যারা এখানকার যৌথ শ্রম-জীবনের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত তাদের চেয়ে নতুনদের নিয়ে জীবনযাত্রা সংগঠিত করা বেশি কঠিন, সন্দেহ নেই। পুরনো বাসিন্দারা চলে যাওয়ায় কলোনির নিয়মশৃঙ্খলা শিথিল হতে শুরু করেছে। তবে পুরনো বাসিন্দাদের মধ্যে আমরা যারা এখনও আছি, এমনটা হতে দেয়া তাদের উচিত নয়, আমরা তা হতে দেবও না। কলোনির ইশ্‌কুলটাকে পুরোপুরি ঢেলে সাজা হয়েছে। নতুন একটা সপ্তম বর্ষ-পাঠক্রমের ইশ্‌কুল বসিয়েছি আমরা, আর যারা এই ইশ্‌কুলে ভরতি হতে পারে নি তাদের জন্যে বসিয়েছি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের আরও একটা ইশ্‌কুল। জ্ঞানতৃষ্ণা-যে এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে খুব প্রবল তা নয়, তবে কিনা চার শো বাসিন্দার একজনও ইশ্‌কুল পালাচ্ছে না।'

---

স. কালাবালিন; এবং সুপরিচিত সোভিয়েত লেখক ও মাকারেঙ্কোর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের একজন, ভ. ফিঙ্ক্‌। তিনটি রচনাই সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে সন্নিবিষ্ট হল।

বর্তমানে এই কলোনিতে কম্‌সমোল-সদস্যের সংখ্যা হল বাষট্টি। এদের মধ্যে কিছু-সংখ্যক পড়াশুনো করে খার্‌কভ শহরে, একজন তো ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর মেডিক্যাল ছাত্র। কিন্তু এরা সবাই শহর থেকে মাইল পাঁচেক (আট ভের্স্তা) দূরের এই কলোনিতেই থাকে। সকলেই ওরা কলোনির সঙ্গীদের প্রাত্যহিক কাজকর্মের অংশীদার।

কলোনির চার শো বাসিন্দা চব্বিশটি শ্রম-বাহিনীতে সংগঠিত। কাঠ-মিস্ত্রি, ফিটার-মিস্ত্রি, খেত ও সব্জি-বাগানের জনমজুর, গোরুর রাখাল, শূকরপালক, ট্র্যাক্টর-চালক, স্বাস্থ্যকর্মী, চৌকিদার, জুতো-বানানো মজুর, ইত্যাদি নিয়ে ওই সব বাহিনী তৈরি। যতদূর জানি, ৪৩ হেক্টর আবাদযোগ্য ও সব্জি-বাগান জমি আর ২৭ হেক্টর বন-জমি নিয়ে উপনিবেশটার খামার গড়ে উঠেছে। খামারে আছে বেশ কিছু গোরু, ঘোড়া আর ৭০টা ভালোজাতের শুয়োর। আশপাশের চাষীরা তো ওগুলো কিনতে পেলেই লুফে নেয়। খামারের আছে নিজস্ব কৃষি-যন্ত্রপাতি, দুটো ট্র্যাক্টর আর নিজস্ব বিজলি সরবরাহ কেন্দ্র। একটা বারুদের কারখানার কাছ থেকে অর্ডার পেয়ে কলোনির কাঠ-মিস্ত্রিরা এখন বারো হাজার প্যাকিং বাক্স বানানোয় ব্যস্ত।

উপরোক্ত শ্রম-বাহিনীগুলোর চব্বিশ জন নির্বাচিত কর্মকর্তা মিলেই কার্যত কলোনির যাবতীয় কাজকর্ম ও জীবনযাত্রার রুটিন পরিচালনা করে থাকে। ওদের হাতে থাকে সব ক'টা ভাঁড়ারের চাবি, কী কী কাজ করতে হবে তার ছক তৈরি করে ওরাই, কাজকর্মের তদারকি করে আর বাহিনীর অন্যান্যদের সঙ্গে সম-মর্যাদার ভিত্তিতে নিজেরাও কাজে হাত লাগায় সমান তালে। আপনা থেকে যারা এসে জুটেছে সেই নবাগতদের কলোনিতে নেয়া হবে কি হবে না, এ-ধরনের সমস্যার মীমাংসা করে দলপতিদের এই পরিষদ; কলোনির অপর বাসিন্দারা গুছিয়ে কাজ না-করলে কিংবা নিয়মশৃঙ্খলা ও 'ঐতিহ্য' ভঙ্গ করলে সেই অন্যায়ের বিচারও পরিষদ করে থাকে। এক্ষেত্রে দলপতি-পরিষদের সিদ্ধান্ত — যেমন, ভর্ৎসনা বা অতিরিক্ত কায়িক শ্রমের শাস্তি বরাদ্দ কবা হলে কলোনির ডিরেক্টর আ. স. মাকারেঙ্কো জমায়েত বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে দোষীকে তা জানিয়ে দেন। এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ কিংবা বারে বারে অপরাধ করলে, যেমন কুঁড়েমি করলে, কঠিন পরিশ্রমের কাজে ফাঁকি দিয়ে চললে, কোনো সঙ্গীকে অপমান কিংবা

কলোনির সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর কোনো কাজ করলে, তার শাস্তি হল কলোনি থেকে বহিষ্কার। এ-রকম ঘটনা অবশ্য খুবই কম ঘটে থাকে। দলপতি-পরিষদের প্রতিটি সদস্য যেমন মনে রাখে 'বাইরে' তার নিজের জীবন একসময়ে কেমন কেটেছে, তেমনই তা মনে রাখে দোষী ব্যক্তিটিও। কেননা, তখন তার জীবনের ভবিতব্য হয়ে দাঁড়ায় কোনো শিশু-সদনে আশ্রয় নেয়া। আর ওই সদনগুলোকে 'নিরাশ্রয়, অনাথ-সমাজ' একেবারে বিষ-নজরে দেখে থাকে।

কলোনির নানা ঐতিহ্যের একটি হল 'তাদের নিজেদের মধ্যেকার কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম না-করা'। এই ঐতিহ্য নিয়মনিষ্ঠভাবে মেনে চলা হয়। কলোনির ইতিহাসে মাত্র একবারই এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল। আর নবজাত শিশুটিকে খুন করার মধ্যে দিয়ে তার পরিণতিও হয়েছিল বিয়োগান্ত। বাচ্চার তরুণী মা নবজাতককে লুকিয়ে ফেলেছিল বিছানার নিচে। ফলে দম বন্ধ হয়ে বাচ্চাটি সেখানেই মারা যায়। আদালতে মেয়েটির 'চার বছর সঙ্গীহীন অবস্থা'-য় থাকার সাজা হয়েছিল, তবে তাকে কলোনিরই হেফাজতে ও প্রহরাধীনে থাকতে দেয়া হয়েছিল। আমি যতদূর জানি, পরে মেয়েটি বিয়ে করেছিল তার বাচ্চার জন্মদাতাকেই। কলোনির অপর একটি ঐতিহ্য হল এই রকম: যখন কোনো ছেলে বা মেয়েকে সরকারি অপরাধ-তদন্ত দপ্তর কলোনিতে আনে, তখন তার পরিচয়, কীভাবে সে আগে জীবন কাটিয়েছে, কিংবা কী করেই-বা তদন্ত দপ্তরের খপ্পরে পড়ল, এ-সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা একদম নিষিদ্ধ। আর যদি কোনো 'আনাড়ি' আপনা থেকেই নিজের সম্বন্ধে বকবকানি শুরু করে তাহলে তার কথায় কান না-দেয়াই রেওয়াজ। যদি সে নিজের পূর্ব-কীর্তিকলাপ সাতখানা করে বলতে শুরু করে, তবে তার কথা কেউ তো বিশ্বাস করেই না, উপরন্তু তা-ই নিয়ে তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়। এর ফল কিন্তু সব সময়েই ভালো হয়। আগন্তুক ছেলেটিকে সবাই মিলে সমঝে দেয়, 'বুঝেচ, বাপু, এটা কিন্তু জেলখানা নয়। এখানে আমরাই কত্তা। তুমিও তাই। চুপটি মেরে থাক এখানে, শেখো আর আমাদের সাথে মিলেমিশে কাজ কর দেখি। আর যদি এ-সব পছন্দ না-হয়, তাহলে তুমি, বাপু, পথ দেখতে পার।'

নবাগত শিগ্‌গিরই বুঝতে পারে, এ-সব কথা কত খাঁটি। দেখা যায়, সহজেই সে কলোনির সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। যতদূর

মনে পড়ছে, কলোনির সাত বছরের জীবনে মোটমাট দশ বারের বেশি বাচ্চাদের কলোনি 'ছেড়ে যাওয়া'-র মতো ব্যাপার ঘটে নি।

দ. নামে 'কর্মকর্তা'দের একজন কলোনিতে ঢুকেছিল তেরো বছর বয়সে। এখন তার বয়স সতেরো। পনেরো বছর বয়স থেকেই সে পঞ্চাশ জন কলোনি-বাসিন্দার একটা বাহিনী পরিচালনা করে আসছে। এই বাহিনীর বেশির ভাগই আবার দ.-র চেয়ে বয়সে বড়। শুনেছি, ছেলেটি নাকি ভালো একজন কমরেড, আর খুবই কড়া আর সু-বিচারক দলপতি। সরকারি আত্মজীবনীতে ও লিখেছে: 'কম্‌সমোল-এর সদস্য থাকা অবস্থায় হৈ-হল্লার দিকে বেশি ঝোঁকায় আমাকে বহিষ্কার করা হয়।' 'বাঁচতে আমার ভারি ভালো লাগে, আর সবচেয়ে ভালো লাগে গান-বাজনা আর বই।' 'গান-বাজনার আমি দারুণ ভক্ত।'

বিশেষ করে দ.-র উদ্যোগে কলোনির ছেলেমেয়েরা আমায় এক চমৎকার উপহার দিয়েছে। দু-শো চুরাশি জন সদস্য তাদের আত্মজীবনী লিখে উপহার দিয়েছে আমায়। দ. নিজে একজন কবি। ইউক্রেনীয় ভাষায় গীতি-কবিতা লেখে সে। কলোনিতে আরও বেশ কয়েক জন কবি আছে। কলোনি থেকে 'প্রমিন' (ঝলক) নামে একখানা সচিত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে। তিন জন বাসিন্দা মিলে কাগজটির সম্পাদনা করে, ছবি এঁকে অলঙ্করণ করে চ. নামে অপর একজন 'দলপতি' ছেলে। চ. নিশ্চিতভাবে প্রতিভাবান ও একনিষ্ঠ ছেলে। তবে নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে ও সন্দিহান, আর সে-প্রতিভা কাজেও লাগায় খুব সাবধানে।

পোল্যান্ড-থেকে-আসা বাস্তুহারা ছেলে চ.। আট বছর বয়স থেকে রাস্তার অনাথ ছেলে হিসেবে ওর জীবন শুরু। ইয়ারস্লাভ্‌ল-এ এক শিশু-উপনিবেশে কিছুদিন ছিল, কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে ট্রামগাড়িতে পকেটমারের পেশা নেয়। এর পরে ও কিছুদিন এক দাঁতের ডাক্তারের কাছে থাকে। ডাক্তারের কাছ থেকেই ও পায় 'বই-পড়া আর ছবি-আঁকার নেশা'। কিন্তু 'রাস্তার ডাকে' ডাক্তারকে ছেড়ে আবার পালায় ও, সঙ্গে নেয় 'জারের আমলের কয়েকটা সোনার টাকা'। এই পয়সা ও খরচা করে বই, কাগজ আর রঙ কেনায়। শ্বেত সাগরে জাহাজের বয়লারে কয়লা-ঠেলা খালাসির সহকারী হিসেবে ও সাগর পাড়ি দেয়, কিন্তু 'চোখ খারাপ থাকায় সে-কাজে ইস্তফা দিতে বাধ্য' হয়। অতঃপর পেচোরা নদীর ধারে জিরিয়ানদের মধ্যে 'ফসলে

খাজনা আদায়ের পেয়াদা'-র কাজ করে কিছুদিন। এই সময়ে জিরিয়ান ভাষাটাও শিখে নেয়। তারপর কিছুদিন থাকে সাময়েদদের মধ্যে। কুকুরে-টানা গাড়িতে চেপে চ. এরপর উরাল পর্বতমালা পেরিয়ে এসে হাজির হয় অব্দোর্স্কে, তারপর পাড়ি দেয় আর্খাঙ্গেল্স্কে। চুরিচামারি করে আর রাতে সরাইখানায় ঘুমিয়ে ওর দিন কাটতে লাগল সেখানে। এরপর ওখানে থাকতেই ও শুরু করল দোকানের সাইবোর্ড আর নিসর্গদৃশ্য আঁকার কাজ। একটা চারু ও কারুশিল্প কারখানায় ও কাজ নিল। এদিকে একই সঙ্গে তৈরি হতে লাগল সপ্তম-বর্ষ পাঠক্রমের ইশ্কুলে ঢোকার জন্যে। সার্টিফিকেট জাল করে এরপর চ. ঢুকে পড়ল ভিয়াত্কা চারু ও কারুশিল্প ইশ্কুলে। 'প্রথমেই যারা পরীক্ষায় পাশ করল আমি ছিলাম তাদের একজন। ছবি আঁকায় আর ড্রইং-এ আমার নাকি ওস্তাদের হাত আছে, সবাই বললেন। কিন্তু ও-কথা আমার বিশ্বাস হয় নি।' এরপর চ. নির্বাচিত হল ছাত্র-সমিতিতে, সাংস্কৃতিক কাজকর্মও চালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু শীতকালে, ছুটির মধ্যে, ও গ্রেপ্তার হল — 'জাল দলিলপত্রের জন্যেই ঝামেলায় পড়ে গেলাম আর-কি। এরপর বসন্তকাল পর্যন্ত একটা স্বভাব-সংশোধনী জেলে কাটালাম'। জেলে বসেও ও প্রচুর পড়াশুনো আর সাংস্কৃতিক কাজকর্ম করল। এরপর ও 'সেভের্নায়া প্রাভ্দা' কাগজের রিপোর্টার হল।

এত সব কথা ও লিখেছে এতটুকু বড়াই না-করে, আর, বলা বাহুল্য, অন্যের সহানুভূতি আকর্ষণের বিন্দুমাত্র বাসনা মনে স্থান না-দিয়েই। এ এক সরল, অকপট বিবরণমাত্র, যেন কেউ লিখছে: আমি একটা জলার মধ্যে দিয়ে গেলুম, তারপর ঢুকলুম বনে, পথ হারিয়ে এসে উঠলুম একটা ধুলোভরা রাস্তায়, পথচলা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল...

নিঃসন্দেহে চ. অত্যন্ত প্রতিভাবান তরুণ। আর, আমার ধারণা, এরপর ও আর খারাপ পথে যাবে না। ওর জীবনকথা একান্তভাবে ওরই কাহিনী নয়। আরও যে-সব জীবনকথা আমি পড়েছি বা শুনেছি তার প্রায় সবই ওর জীবনের প্রতিরূপ।

কিন্তু এই সব 'রাস্তার বাউণ্ডুলের দল' এল কোথা থেকে? — যুদ্ধের ঘূর্ণিবাত্যা সারা দেশে যাদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছিল পশ্চিমের জেলাগুলোর বাসিন্দা সেই সব বাস্তুহারার ছেলেপিলে এরা, গৃহ-বিসংবাদ,

মহামারী আর দুর্ভিক্ষের বছরগুলোয় যারা দলে-দলে মারা পড়েছিল সেই সব লোকের অনাথ কাচ্চাবাচ্চা এরা সব। কলঙ্কিত উত্তরাধিকারের অভিশাপ নিয়ে জন্মেছে এই শিশুরা — এদের মধ্যে রাস্তার প্রলোভনে মজেছে যারা তারাই ডুবেছে, আর যারা অস্তিত্বের লড়াইয়ে নিজেদের সামলিয়ে চলতে সক্ষম হয়েছে তারা গেছে বেঁচে। স্বেচ্ছায় তারা যে-কোনো চাকরিবাকরিতে ঢুকে পড়েছে, মানবার মতো হলে কাজের নিয়মশৃঙ্খলা মেনে নিয়েছে সহজে, আত্মসম্মানও ক্ষুণ্ণ করে নি। এরা সবকিছু শিখতে চায়, লেখাপড়া করেও মন দিয়ে। সম্মিলিতভাবে কাজ করার গুরুত্ব এরা উপলব্ধি করে, এরা বোঝে এই ধরনের কাজ কত সুবিধাজনক। আমি বরং বলব, চমৎকার অথচ কঠোর শিক্ষক আমাদের এই জীবন ওই সব ছেলেমেয়ের মধ্যে থেকে 'আত্মিক দিক থেকে' যৌথশ্রমের কর্মী গড়েপিটে তৈরি করে নিয়েছে। অথচ, একই সঙ্গে, ওই ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকে কমবেশি স্পষ্টভাবে নির্ণীত একেকটি বিশিষ্ট সত্তা, প্রত্যেকেই 'মুখের নিজস্ব আদল'-সহ একেকটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। কুরিয়াজ শ্রম-উপনিবেশের সদস্যদের দেখলে কেমন যেন একটা অদ্ভুত ধারণা জন্মায় যে তারা বুঝি 'ভদ্র পরিবারে লালিত'। যারা সবেমাত্র কলোনিতে এসে পেঁছেছে কিংবা যাদের ওখানে পাঠানো হয়েছে এমন সব 'বাচ্চা ছেলেমেয়ে' আর 'আনাড়ি'দের সঙ্গে কলোনির উপরোক্ত ছেলেমেয়েরা যে-রকম আচরণ করে বিশেষ করে তা দেখেই এমন ধারণা জন্মায়। নবাগত বাচ্চারা একেবারে আচমকা কিশোর-কিশোরীদের আদরযত্নের এক অকল্পনীয় পরিবেশে এসে পড়ে। অথচ কলোনিতে আসার আগে রাস্তার জগতে ওই বয়সের কিশোর-কিশোরীরা বাচ্চাদের কাছে বিভীষিকার বস্তু হিসেবে গণ্য। সেখানে বাচ্চাদের ওরা মারধর করে, নানাভাবে উৎপীড়ন করে, চুরি করতে, ভোদ্‌কা খেতে আর নানারকম অপকর্ম করতে শেখায়। কলোনিতে আসার পর মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে এই রকম একটি নবাগত 'বাচ্চা ছেলে' চমৎকার বাঁশি বাজাতে শিখে গেছে। কলোনির ব্যান্ড-পার্টিতে সে এখন এক ওস্তাদ বাঁশি-বাজিয়ে। এছাড়া তার কাজ হল গোরুর রাখালি। রোদে-পোড়া বাদামি একটা খালি-পা নেড়ে-নেড়ে বাজনার সঙ্গে যখন সে তাল দিতে থাকে তখন ভারি মজা লাগে দেখতে। ছেলেটি আমায় একদিন বলেছিল: 'প্রথম যখন এখেনে আসি, ভারি ভয় নেগেছিল: মাইরি, ভাবলাম, ই বাবা, কতগুলো ধেড়ে আছে এখেনে! ওরা সবাই একজোট হয়্যে যদি মারধর শুরু করে তবে

পালাব কোন্ চুলায়! কিন্তু, কী আশ্চয্যি, কেউ আমার গায়ে এট্টা আঙ্বল ছোঁয়ায় নি পেয্যন্ত।'

কলোনির বাসিন্দাদের মধ্যে আমি খ্বই স্বচ্ছন্দ বোধ করেছি, অথচ বাচ্চাদের সঙ্গে ভাব জমানোর মান্ষ আমি নই। ওদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ভয় হয়, পাছে যা বলার নয় তাই বলে ফেলি, আর এই ভয়েই ম্খ ব্জিয়ে থাকি। কিন্তু কুরিয়াজ উপনিবেশের বাচ্চাদের মধ্যে গিয়ে এই ভয় আমাকে পেয়ে বসে নি। তাছাড়া ওদের সঙ্গে কথা বলার দরকারও ছিল না। নিজেরাই ওরা খ্ব ভালো বলিয়ে-কইয়ে, আর প্রত্যেকের কিছ্-না-কিছ্ বক্তব্যও ছিল...

কিন্তু জীবন যাদের প্রতি অমন নির্মম ও হীন আচরণ করেছে সেই রকম কয়েক শো শিশ্কে নতুনভাবে শিক্ষিত করে তুলে তাদের মধ্যে এমন অলৌকিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল কে? — লোকটি আর কেউ নন, কলোনির সংগঠক ও ডিরেক্টর আ. স. মাকারেঙ্কো স্বয়ং। মাকারেঙ্কো নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান শিক্ষাদাতা। কলোনির খ্দে বাসিন্দারা সত্যিই ওঁকে ভালোবাসে। ওঁর সম্পর্কে এমন একটা গর্বের ভাব নিয়ে ওরা কথা বলে যেন মনে হয় ওরাই ব্ঝি ওঁকে তৈরি করেছে। লম্বা নাক, তীক্ষ্ণ বিচক্ষণ দ্টো চোখ, র্ক্ষ-চেহারার স্বল্পবাক, চল্লিশোর্ধ্ব মান্ষ মাকারেঙ্কো — যাঁকে দেখলে একই সঙ্গে সেনাবাহিনীর লোক ও 'উন্নত আদর্শ'-মানা গ্রাম্য ইশ্কুল-মাস্টার বলে মনে হবে। যেন গলা ভেঙে গেছে এমনি ধরাগলায় কথা বলেন উনি, হাঁটেন ধীরেস্স্থে, অথচ সময়ের সদ্ব্যবহারে পাকাপোক্ত, সবদিকে নজর আর কলোনির প্রতিটি বাসিন্দা ওঁর নখদর্পণে। বাসিন্দাদের কারো সম্পর্কে কিছ্ বলতে হলে উনি মাত্র গ্টি পাঁচেক শব্দে যেন তার চরিত্রের একটা ফোটোগ্রাফ চোখের সামনে তুলে ধরেন। স্পষ্টতই, বেশি বাড়াবাড়ি না-করেও বাচ্চাদের প্রতি এক-আধটুকু স্নেহ বর্ষণ করা ওঁর পক্ষে দরকার হয়ে পড়ে, আর উনি তা করেও থাকেন — কাউকে দ্টো মিষ্টি কথা বলে, কারো দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে, আবার কাউকে-বা মাথায় আস্তে একটু থাবড়া দিয়ে।

মাঝে-মাঝে সভায় মিলিত হয়ে দলপতিরা কলোনির কাজকর্ম, খাবার সরবরাহের সমস্যা, ইত্যাদি নিয়ে নিজেদের মধ্যে চুটিয়ে আলোচনা করে থাকে, কিংবা কর্মী-বাহিনীগ্লোর কাজকর্মে ত্র্টিবিচ্যুতি, অবহেলা ও

ভুলভ্রান্তির নানা নমুনা পরস্পরের সামনে তুলে ধরে। ওই সব সভায় আন্তন মাকারেঙ্কো কিন্তু চুপচাপ একপাশে বসে থাকেন, কখনো-সখনো এক-আধটা কথা বলেন মাত্র। ওই দু-একটা কথা মানে প্রায়ই ওঁর ধমক আর-কি; তবে কথাগুলো বলেন উনি বয়স্ক বন্ধুর উপদেশের ঢঙে। দলপতিরা ওঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে, তর্ক করতেও কুণ্ঠিত হয় না। ভাবখানা এমন যেন এই পঁচিশতম কমরেডকে বাকি চব্বিশ জন তাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান আর অভিজ্ঞ বলে ধরে নিয়েই আলোচনা করছে।

কলোনির জীবনযাত্রায় সামরিক বিদ্যালয়ের দৈনিক রুটিনের খানিক-খানিক চালু করে দিয়েছেন মাকারেঙ্কো। ইউক্রেনীয় জনশিক্ষা-দপ্তরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এটাই তাঁর মতদ্বৈধের কারণ। মাকারেঙ্কোর প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন ভোর ছ-টায় কলোনি-প্রাঙ্গণে বিউগ্‌ল বাজিয়ে জাগরণী সংকেত জানানো হয় এবং কলোনির বাসিন্দারা প্রাঙ্গণের মাঝখানে একটা সম-চতুর্ভুজের আকারে দাঁড়িয়ে পড়ে। কলোনির প্রতীক পতাকা থাকে ওই সম-চতুর্ভুজের মাঝখানে। আর পতাকা-বাহকের দু-পাশে দাঁড়ায় রাইফেল-হাতে কলোনির দুই কমরেড। মাকারেঙ্কো তখন সে-দিনের কাজ কী কী করতে হবে তা তাদের উদ্দেশ করে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেন, আর যদি সেদিন অপরাধী কেউ থাকে তো দলপতি-পরিষদে গৃহীত তার শাস্তির সিদ্ধান্তও সকলের সামনে ঘোষণা করেন। এরপর দলপতিরা তাদের নিজ-নিজ বাহিনীর কাজকর্ম বাহিনীকে সবিস্তারে বুঝিয়ে দেয়। এই 'সাড়ম্বর অনুষ্ঠান' কিন্তু বাচ্চাদের খুব পছন্দ।

তবে এর চেয়েও বেশি সাড়ম্বর, এমন কি বলতে পারি গুরুগম্ভীর, অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়েছিল সেদিন, যেদিন কলোনি থেকে পাঁচ-গাড়িবোঝাই প্যাকিং বাক্স ফ্যাক্টরির খরিদ্দারকে যোগান দেয়া হল। কলোনির ব্যান্ড-পার্টি সেদিন ব্যান্ড বাজিয়েছিল, আর তারপর দেয়া হল পর-পর অনেকগুলো বক্তৃতা — সংস্কৃতির স্রষ্টা শ্রমের অসামান্য তাৎপর্য সম্পর্কে; স্বাধীন যৌথশ্রমই-যে একমাত্র বস্তু যা মানুষকে দেবে ন্যায়নির্ভর জীবন, সে-সম্পর্কে; এবং ব্যক্তি মালিকানা বিলোপসাধনই-যে একমাত্র মানুষে-মানুষে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলবে আর জীবনের যত কিছু অমঙ্গল ও দুঃসহ ভবিতব্যের অবসান ঘটাবে, সে-বিষয়েও। সেদিন সেই সারি-সারি গম্ভীর, মিষ্টি, কচি মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে গভীর আবেগে উদ্বেল না-

হওয়া ছিল অসম্ভব। কলোনির নিজস্ব ছুতোরশালে বানানো কাঠের বাক্সে বোঝাই গাড়িগুলোর দিকে গর্বোজ্জ্বল, হাসি-ফুটফুট চোখে তাকিয়ে ছিল যে নীল-কটা-বাদামি নানারঙা চার শো জোড়া চোখ তাদের দিকে তাকিয়ে আমিও হয়ে পড়েছিলুম বিচলিত। চার শো গলায় উঠল সেদিন প্রাণভরা, উচ্ছল জয়োল্লাস-ধ্বনি। বাচ্চাদের কাছে আ. স. মাকারেঙ্কো শ্রম সম্পর্কে এমন একটা শান্ত, নিগূঢ় প্রাণশক্তি নিয়ে কথা বলতে পারেন যা অনেক সুন্দর, সাজানো কথার চেয়ে অনেক বেশি বোধগম্য ও স্পষ্ট হয়। আমার তো মনে হয়, তাঁর হাতে-গড়া কলোনি-বাসিন্দাদের জীবনকথার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা-প্রসঙ্গে তিনি নিজে যা লিখেছেন মাকারেঙ্কো নামের মানুষটিকে তার চেয়ে আর ভালোভাবে বর্ণনা করা যায় না। ওই ভূমিকার এক জায়গায় তিনি লিখছেন:

'শততম জীবনকথাটি টাইপরাইটারে টাইপ করতে-করতে হঠাৎ আমার খেয়াল হল, জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর বইটি পড়ছি আমি। কত সহজ, কী নির্মম সব শব্দ গেঁথে-গেঁথে একটি শিশুর দুঃখদুর্ভাগ্যের সংহত রূপ নিয়েছে গল্পটা। এর প্রতিটি শব্দে আমি অনুভব করছি, এ-গল্প কারো অনুকম্পা জাগানোর উদ্দেশ্যে বানানো নয়, কারো মনে প্রভাববিস্তার উদ্দেশ্য নয় এর। এটা হল গিয়ে একদম একা, নিঃস্ব, রিক্ত এক মানবকের সরল, আন্তরিক একটি কাহিনী, কারো দয়ার উপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত নয় যে-মানবশিশু, যে কেবল প্রতিকূল দুনিয়ার মুখোমুখি দাঁড়াতে, নির্ভয়ে নিজের অবস্থাকে মেনে নিতেই অভ্যস্ত। এটা অবশ্য আমাদের এই যুগকালের ট্র্যাজেডি। তবে এ-ট্র্যাজেডি কেবল আমাদেরই নজরে পড়ে; কলোনির খুদে বাসিন্দাদের কাছে এটা কোনো ট্র্যাজেডিই নয়, ওদের ও দুনিয়ার মধ্যে এটা একটা প্রথাসিদ্ধ সম্পর্ক হিসেবে ওদের কাছে গণ্য।

'সম্ভবত আর কারো চেয়ে আমার কাছে এ-ট্র্যাজেডি অনেক বেশি দুঃখবহ। গত আট বছর ধরে আঁস্তাকুড়ে-ফেলে-দেয়া শিশুদের ভয়াবহ দুঃখযন্ত্রণাই শুধু নয়, তাদের আতঙ্কজনক নৈতিক বিকৃতিও চোখ মেলে দেখতে বাধ্য হয়েছি। তাই ওদের প্রতি শুধুমাত্র সহানুভূতি ও করুণা প্রদর্শনেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার কোনো অধিকার নেই আমার। বহুদিন থেকে এ-উপলব্ধি আমার জন্মেছে যে এই মানব-সন্তানদের বাঁচাতে হলে আমাকে নির্মমভাবে ওদের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হবে, কঠিন ও

অনমনীয় হতে হবে। নিজেদের সম্পর্কে ওরা যেমন ভ্রূক্ষেপহীন, আমাকেও ওদের সম্পর্কে তেমনই উদাসীন দার্শনিক হতে হবে।

'আমার জীবনের ট্র্যাজেডি হল এই। আর এই টুকরো লেখাগুলো পড়তে-পড়তে সে-ট্র্যাজেডি আরও তীক্ষ্ন হয়ে আমাকে বাজল। আমাদের সকলের জীবনেরই ট্র্যাজেডি এটা, একে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো অধিকার নেই আমাদের। যারা কেবলমাত্র মিষ্টি-মিষ্টি অনুকম্পা অনুভবের ও এই সব শিশুকে খুশি করার মোলায়েম ইচ্ছা জাহিরের কষ্টস্বীকারটুকু করতে চায়, তারা এই শিশুদের সুপ্রচুর ও তাদের কাছে যা সুলভ সেই দুঃখকষ্টের আড়ালে নিজেদের ভণ্ডামিকেই ঢাকতে চায় মাত্র।'

কুরিয়াজের উপনিবেশ ছাড়াও খার্কভের কাছে দ্জের্জিন্স্কি কমিউনটি দেখেছি আমি। এই কমিউনে আছে বড়জোর একশো কি একশো কুড়ি জনের মতো ছেলেমেয়ে। 'শিশু অপরাধী' ও 'সামাজিক দিক থেকে বিপজ্জনক'-দের জন্যে আদর্শ শিশু শ্রম-উপনিবেশ কী রকমটা হওয়া উচিত স্পষ্টত সেটা প্রমাণ করার জন্যেই এর প্রতিষ্ঠা। সামনে সদরের দিকে উনিশটি জানলাওয়ালা বিশেষভাবে-তৈরি একটা বাড়ির দুটো তলা জুড়ে কমিউনটির অধিষ্ঠান। এখানে কাঠের কাজ, জুতো তৈরি ও যন্ত্রপাতি বানানোর উপযোগী তিনটে কারখানা-ঘর সাজানো হয়েছে একেবারে আধুনিকতম যন্ত্র আর বহুতর বাছাই হাতিয়ার দিয়ে। বাড়িটায় আছে হাওয়া-চলাচলের চমৎকার ব্যবস্থা, বড়-বড় জানলা আর প্রচুর আলো। বাচ্চাদের পরনে পোশাকের উপর আরামদায়ক আঙরাখা, তাদের শোবার ঘরগুলো বড়-বড়, ভালো বিছানাপত্র, আর আছে স্নানের ঘর, ধারাস্নানের উপযোগী ঝাঁঝরি-কল, পড়াশুনোর জন্যে পরিচ্ছন্ন আলোহাওয়াযুক্ত ঘর, একটা অ্যাসেম্ব্লি হল, প্রচুর বইসহ লাইব্রেরি ও লেখাপড়ার সরঞ্জাম অঢেল। আর এ-সবকিছুই ফিটফাট, ঝকঝকে। এক কথায়, লোককে 'দেখানোর মতো' একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান এটি। এমন কি, শিশুদেরও যেন ওখানে 'প্রদর্শনীর জন্যে' বেছে নেয়া হয়েছে — বাচ্চারা সবাই এমন স্বাস্থ্যে ভরপুর। এ-ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংগঠকদের এখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে...

## সেমিওন কালাবালিন

### কীভাবে আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন মাকারেঙ্কো

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে আন্তন সেমিওনভিচ মাকারেঙ্কোর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় আমার — কিছুটা অস্বাভাবিক পরিবেশে, অর্থাৎ জেলখানায়। তিক্ত শৈশবের ভুলভ্রান্তির ফলস্বরূপ আমি তখন ওখানে কয়েদ খাটছি। সেদিনের পর চৌত্রিশ বছর কেটে গেছে, তবু সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের প্রতিটি খুঁটিনাটি এখনও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল এইভাবে। জেলখানার কর্তা একদিন ডেকে পাঠালেন আমায়। তাঁর অফিসে ঢুকতে কর্তা ছাড়াও একজন অপরিচিত লোককে দেখলাম। টেবিলের পাশে একটা আর্মচেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে, মাথায় হুডওয়ালা টুপি ও নোংরা ধুকড়ি একটা গ্রেটকোট গায়ে বসে ছিলেন মানুষটি। দেখলাম, লোকটির করোটি বেশ বড় আর প্রশস্ত, প্রসন্ন কপাল। কিন্তু প্রথমেই যে-জিনিসটি আমার নজর কাড়ল তা হল, পাঁশনে-চড়ানো ওঁর মস্ত নাক, আর চশমার কাচের আড়ালে এক-জোড়া সদয় দৃষ্টি, যে-দৃষ্টি বিচক্ষণতা আর কৌতুকে মেশামেশি, মানুষকে বশীভূত হতে বাধ্য করে যে-দৃষ্টি। মানুষটি ছিলেন আন্তন সেমিওনভিচ মাকারেঙ্কো।

‘ও, তুমিই তাহলে সেমিওন কালাবালিন?’ উনি আমায় বললেন।

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

‘তা, তুমি আমার সঙ্গে যেতে রাজি তো?’

আমি একবার ওঁর দিকে তাকালাম, তারপর প্রশ্নভরা-চোখে তাকালাম জেলখানার কর্তার দিকে — কারণ, এই দ্বিতীয় ব্যক্তির কথার ওপরই আমার 'সম্মতি' নির্ভর করছিল। এদিকে তখন আন্তন সেমিওনভিচ বলে চলেছেন:

'বুঝেছি, বুঝেছি। যাওয়ার ব্যাপারটা আমি নিজেই কর্তার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নেব। আচ্ছা তাহলে, সেমিওন, যদি কিছু মনে না কর তো এক মিনিট ঘর ছেড়ে একটু বাইরে যাও দেখি। ও কি যেতে পারে, কমরেড জেলর?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। যাও, বাইরে যাও,' কর্তা বললেন।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

ওয়ার্ডারের সঙ্গে বাইরের করিডরে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নিজের মনেই ভেঙ্‌চি কেটে ওঁর কথাগুলো আওড়ালাম, 'কিছু মনে কোরো না। ঘর ছেড়ে একটু বাইরে যাও দেখি, সেমিওন'। ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছিলাম না। বুঝছিলাম না কথাগুলোও — বলা যেতে পারে, এ-ধরনের কথা আমার জীবনে প্রায় প্রথম শুনলাম সেদিন। লোকটা আচ্ছা মজার তো!

কিছুক্ষণ পর আবার আমাকে অফিস-ঘরে ডাকা হল। আন্তন সেমিওনভিচ তখন দাঁড়িয়ে উঠেছেন।

'আচ্ছা, সেমিওন, তোমার কিছু জিনিসপত্র আছে?'

'না। কিস্যু নাই।'

'ঠিক আছে,' বলে মাকারেঙ্কো কর্তার দিকে ফিরলেন, 'তাহলে এখান থেকেই আমরা সোজা রওনা দিতে পারি?'

কর্তা বললেন, 'হ্যাঁ, যেতে পারেন। আচ্ছা, কালাবালিন, শোনো...'

'আহা, থাক থাক। ওসব ঠিক হয়ে যাবে'খন', বাধা দিলেন মাকারেঙ্কো। 'আচ্ছা, চলি তাহলে... এস, সেমিওন!'

একের-পর-এক জেলের দরজাগুলো সটান খুলে গেল। আন্তন সেমিওনভিচের সঙ্গে আমি পা বাড়ালাম আমার জীবনপথের সবচেয়ে সুখকর অংশ পাড়ি দিতে।

এরও প্রায় বছর দশেক পরে আমি যখন মাকারেঙ্কোর অন্যতম সহকারী তখন একদিন তিনি আমায় বলেছিলেন:

'জেলখানার কর্তার অফিস-ঘর থেকে সেদিন তোমায় আমি বাইরে

পাঠিয়ে দিল্ম কেন, জানো তো? কারণ, তোমাকে আমার হেফাজতে দেয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রে আমি-যে সই করছি তা যাতে তুমি দেখতে না-পাও। এতে তোমার মানব-মর্যাদাবোধে ঘা লাগত, তাই।'

মাকারেঙ্কো তখনই আমার মধ্যে এমন সব মানবিক গ্নণের সন্ধান পেয়েছিলেন যাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমি নিজেও ঘ্নণাক্ষরে সচেতন ছিলাম না। এটাই ছিল আমার জীবনে ওঁর প্রথম উষ্ণ, মানবিক স্পর্শ।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে জেলা জনশিক্ষা-দপ্তরে যাওয়ার পথে আমি মাকারেঙ্কোকে ছাড়িয়ে অল্প আগে-আগে হাঁটতে চেষ্টা করলাম। এটা করলাম এইজন্যে যাতে উনি আমার ওপর নজর রাখতে পারেন, আর আমি-যে ওঁকে ছেড়ে পালাতে চাইছি না সেটা দেখানোর জন্যেও বটে। কিন্তু উনি আমাকে আগাগোড়া ওঁর পাশে-পাশে রাখলেন, একটার-পর-একটা শ্ননিয়ে গেলেন কলোনির গল্প, কলোনি-সংগঠন যে কত কঠিন কাজ তাও জানালেন। এক কথায়, দ্ননিয়ার যাবতীয় বিষয় নিয়ে কথা বললেন, কেবল জেলখানা, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আর আমার অতীত সম্বন্ধে টঁ্ন-শব্দটি করলেন না।

জেলা জনশিক্ষা-দপ্তরের বাড়ির উঠোনে পেঁছে কলোনির গাড়ি আর ঘোড়াটাকে আমার জিম্মা করে দিলেন মাকারেঙ্কো। তারপর আমাকে এমন একটা কাজে পাঠালেন যাতে আমি মনে-মনে চমকে উঠলাম।

'তুমি লিখতে-পড়তে জানো তো, সেমিওন?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে।'

পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে উনি আমার হাতে দিলেন। বললেন:

'এই জিনিসগ্নলো আমার হয়ে কিনে ফ্যালো দেখি — এই র্নটি, চর্বি খানাকটা, আর চিনি। আমার কেনিকাটার সময় নেই এখন, সারাটা দিন আজ সরকারি আপিসে-আপিসে দৌড়োদৌড়ি করে কাটবে। সত্যি বলতে কি, দোকানী, ওজনদার, এই সব পাঁচমিশেলি লোকের সঙ্গে কারবার করতে ভারি বিশ্রী লাগে আমার। ওরা যাচ্ছেতাইভাবে আমায় ঠকাবেই ঠকাবে — হয় ওজনে মারবে, আর নয়তো ভাঙানির খ্নচরোয় কম দেবে। আমার ধারণা, তুমি কাজটা আমার চেয়ে ভালো পারবে।'

হতভম্ব ভাবটা কাটানোর, এমন কি ভদ্রতাস্নচক আপত্তি জানানোর

সময়টুকুও না-দিয়ে দ্রুত চলে গেলেন উনি। ভ্যালা ঝামেলায় পড়লাম তো! আপাতত ভালোই তো ঠেকছে, কিন্তু এর শেষটা দাঁড়াবে কী রকম? যে-মামুলি জায়গাটা থেকে জীবনের যত কিছু ধাঁধার উত্তর মেলে সেই মাথার পেছনটা চুলকে নিলাম একবার। তারপর শুরু হল ভাবনার জাবর কাটা: কে জানে! জেল থেকে সোজা বেরুতে-না-বেরুতেই একেবারে রুটি আর চিনি কেনার ভার! এটা আমায় পরীক্ষা করার জন্যে নাকি? কিংবা এ এক রকম ফাঁদ পাতার ব্যবস্থা নয়তো? দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে মনে-মনে নাড়াচাড়া করলাম। শেষপর্যন্ত ধারণা হল, মাকারেঙ্কো নিশ্চয়ই ছিটগ্রস্ত। তা না-হলে আমার মতো লোককে কেউ বিশ্বাস করে এ-কাজের ভার দেয়!

দোকানে ঢুকতেই দোকানী তেলতেলা মিহি গলায় শুধোল:

'তুমিই মালগুলো গস্ত করবে নাকি? তা তুমি কে বট, বাপু?'

'সে-সব পরে জেনে্য নিয়ো' খন।' কথাটা বলে ওর দিকে মাল-সরবরাহের হুকুমনামাটা এগিয়ে দিলাম।

যা-যা দরকার ছিল সব মালপত্র নিয়ে সেই ছাদখোলা ঘোড়ার গাড়িটায় এনে রাখলাম। গাড়ি মানে আর কিছুই নয়, রেলগাড়ির কামরার নিচে যে-স্প্রিং ব্যবহার করা হয় তারই ওপর বসানো অদ্ভুতদর্শন একটা জরাজীর্ণ কলবিশেষ। মাকারেঙ্কোও এসে পড়লেন তখনই। তাঁর দেয়া কাজ সমাধা হয়েছে দেখে আমায় ঘোড়া জুতে গাড়ি ছাড়তে বললেন।

কখনও রাশ আলগা দিয়ে কখনও টেনে, চাবুক হাঁকড়িয়ে, চ্যাঁচামেচি করে আর জিভ দিয়ে নানারকম আওয়াজ তুলে ৩৬-বছর ধরে কুঁড়েমি করায় অভ্যস্ত সেই ঘোড়াসদৃশ প্রাণীটিকে তো কোনোরকমে নড়ানো গেল। কিন্তু জেলা জনশিক্ষা-দপ্তরের বাড়িটা ছেড়ে সবে শ-দুই মিটার মাত্র এগিয়েছি এমন সময় মাকারেঙ্কো আবার আমায় থামতে বললেন। তারপর আমার দিকে ফিরে যা বললেন তার মর্মার্থ এই:

'ওহো, আমি তোমায় বলতে ভুলেছি। এই মালগুলো গস্ত করার ব্যাপারে একটু ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে। ওরা আমাদের দুটো আস্ত পাঁউরুটি বেশি দিয়ে ফেলেছে। লক্ষ্মী ছেলে, ও-দুটো একটু ফেরত দাও গিয়ে, কেমন? নইলে দোকানীরা পরে মহা হুলুস্থুল বাধিয়ে দেবে। আমি তোমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করি, কেমন?'

লজ্জায় আমার কানদুটো উঠল ঝাঁ-ঝাঁ করে, মুখটা লাল হয়ে উঠল। কিন্তু এমনটা কেন হল আমার? এর আগে তো কখনও এমন হয় নি। যাই হোক, গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে খড়ের তলা থেকে দুটো পাঁউরুটি টেনে বের করলাম, তারপর হাঁটা শুরু করলাম দোকানের দিকে। মনে-মনে ভাবছি তখন: এ কেমনধারা লোক? নিজেই তখন বললেন, দোকানীরা ওঁকে ঠকায়। তাই ভাবলাম, এর ভালোরকম শোধ তোলা যায় কীভাবে, তা-ই করতে হবে। দু-খানা তো পাঁউরুটি মাত্তর, তা উনি এখন বলছেন কিনা, 'লক্ষ্মী ছেলে, ওগুলো ফেরত দিয়ে এস দিকি'। বাঃ!

পাঁউরুটিদুটো ফেরত দিতে দোকানীরা মহা খুশি। একজন বললে, 'অনেক, অনেক ধন্যবাদ, ছেলে। আমরা ঠিকই ধর্‌য়েছিলাম, ওটা কিছু না, এট্টা ভুল হয়্যে গেছে মাত্তর, পরে শুধরে নেবে' খন। যাই হোক, শুভদিন জানাচ্ছি তোমারে। অনেক ধন্যবাদ।'

কড়া চোখে ওর দিকে তাকিয়ে দ্রুত দোকান ছেড়ে চলে এলাম।

গাড়িতে উঠে বসার পর মাকারেঙ্কো আমার দিকে হাতের মুঠো বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ভাজা সূর্যমুখী বীজ আর বাদাম চলবে নাকি? আমার তো দারুণ লাগে।'

রুটির কথা আর ঘুণাক্ষরেও তুললেন না উনি। মাকারেঙ্কো কিন্তু এইভাবে আমায় বোঝাতে পারতেন: আমি কিন্তু তোমায় বিশ্বাস করেছিলাম। নিজের সুনাম বিপন্ন করে জেল থেকে খালাস করে এনেছিলাম তোমাকে। আর তুমি কিনা দুটো পাঁউরুটি বেশি সরাতে গিয়ে আমায় লজ্জায় ফেললে। ছি-ছি...

কিন্তু উনি এ-সব কিছুই করলেন না। পাছে আমি মনে কষ্ট পাই, ভুলভাবে যাকে আমি ন্যায্য প্রতিশোধগ্রহণ বলে মনে করেছিলাম আমার সেই কাজের নিজস্ব পুনর্মূল্যায়নে পাছে ব্যাঘাত ঘটে, স্পষ্টত এই সব কারণেই উনি উপরোক্ত আনাড়ির মতো ব্যবহার থেকে বিরত থাকলেন। আমাকেও দূরে ঠেলে দিলেন না। সেদিন উনি যদি আমায় ধমকাতে শুরু করতেন, তাহলে আমরা দু-জনে মিলে শেষপর্যন্ত কলোনিতে পৌঁছতাম কিনা সন্দেহ।

অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই রকমই ছিল আন্তন সেমিওনভিচের আচরণ-পদ্ধতি — সর্বদাই অত্যন্ত সতর্ক, পরের মন [illegible] মমতাচিহ্নিত,

অথচ একেবারে স্বাভাবিক। তাঁর অননুকরণীয় হাসি-তামাশার মধ্যে দিয়ে কখনও কোনো 'বীর'-এর হামবড়াইয়ের বেলুন ফাঁসিয়ে দিয়ে, কখনও কড়া প্রতিবাদ ও তীব্র নিন্দা প্রকাশ করে, আবার কখনও-বা ক্রোধে জ্বলে উঠে কিশোর-কিশোরীদের মনে ভয় ঢুকিয়ে, হয়তো-বা নাড়া দিয়ে তাদের চেতনা জাগিয়ে। আর প্রতিবারই তাঁর আচরণ হোত পৃথক, প্রতিবারই নতুন, কখনও দু-বার একই রকম ব্যবহার করতেন না। সে-আচরণ ছিল সর্বদাই বিশ্বাসযোগ্য, আন্তরিক আর নির্দ্বিধ।

আমার এখনও মনে পড়ে কলোনির বাসিন্দাদের মধ্যে তাদেরই নিয়ে চোলাই মদ্যপান নিবারণী বাহিনী গড়ে উঠেছিল যারা নিজেরা এক-আধটুকু মদ গেলা পছন্দ করত আর তা করতে গিয়ে ধরা পড়ত প্রায়ই। আর রাস্তাঘাটে রাহাজানি ঠেকানোর জন্যে যে-বিশেষ নৈশ রক্ষীবাহিনী তৈরি হয়েছিল তার সদস্যরা নিজেরাই ডাকাতির অপরাধে কলোনিতে প্রেরিত হয়েছিল। এই সব ব্যবস্থা আমাদের তখন হতবুদ্ধি করে দিত। এর বহুবছর পর আমরা বুঝেছিলাম, একজন বুদ্ধিমান ও মানুষের মন বুঝে চলতে ওস্তাদ লোকের পক্ষে এটা কতখানি আস্থা স্থাপনের নিদর্শন ছিল। আর আমাদের প্রতি অতখানি আস্থা রাখার ফলে আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে যে-শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণগুলি সুপ্ত অবস্থায় ছিল তাদের জাগিয়ে তুলেছিলেন মাকারেঙ্কো।

মাকারেঙ্কোর নিজস্ব অফিস-ঘরটি সর্বদাই ভিড়াক্রান্ত থাকত। কলোনির বাসিন্দারা কেবল-যে প্রতিষ্ঠানের যৌথ-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্যেই সেখানে যেত তা নয়, নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারেও আলাপ করতে যেত তারা। আর এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই কথা বলার মতো সময় খুঁজে পেতেন মাকারেঙ্কো। কখনও-কখনও কথা বলতেন তিনি গম্ভীরভাবে. সাগ্রহ আন্তরিকতার সঙ্গে, আবার কখনও-বা তাঁর কৌতুকভরা একটিমাত্র মন্তব্য আলাপরত দ্বিতীয় ব্যক্তিটির মত-পরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট হোত। আমার নিজেরও এ-রকম অভিজ্ঞতা আছে। ১৯২২ সালে আমি গভীরভাবে ওল্‌গা নামে একটি মেয়ের প্রেমে পড়ি। নিজের বাবা থাকলে যেমন বলতাম তেমনই প্রথম যে-ব্যক্তিটির কাছে আমি আমার মনের কথা খুলে বলি, তিনি হলেন আন্তন সেমিওনভিচ। উনি আমার সব কথা শুনলেন, তারপর টেবিলের ওধারে

উঠে দাঁড়িয়ে আমার দুই কাঁধে ওঁর দুটি হাত রেখে খুব আস্তে, আবেগভরে বললেন, 'ধন্যবাদ, সেমিওন। তুমি আমায় কী-যে আনন্দ দিলে, কী বলি। ধন্যবাদ!'

'আনন্দ কেন, আন্তন সেমিওনভিচ?'

'প্রথম কথা, তুমি আমায় বিশ্বাস করেছ বলে। এ তোমার একান্ত নিজস্ব জিনিস। এই ভালোবাসা। কত রকমেরই তো লোক আছে। তুমি হয়তো কারো কাছে মন খুলে কথা বলতে, আর সে হয়তো ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিত কিংবা খবরটা সর্বত্র রটিয়ে বেড়াত। কিন্তু আমি তেমন নই। এটা যেন আমার নিজের ব্যাপার এইভাবে কথাটা গোপন রাখব।' কথাটা শুনে আমি একবার সকৃতজ্ঞ চোখে ওঁর দিকে তাকালাম। উনি বলে চললেন, 'দ্বিতীয়ত, তুমি-যে কোনো অস্বাভাবিক জীব নও বরং সাধারণ মানুষেরই মতো, এটা বুঝতে আমায় সাহায্য করেছ বলে। প্রেম-ভালোবাসা সব বয়সের সকল মানুষেরই বৈশিষ্ট্য, আমি যাদের ভারপ্রাপ্ত সেই ছেলেমেয়েরাও এ থেকে বাদ নয়। কাজেই, তুমি সব বিচারেই পরিণত মানুষ। আচ্ছা, এবার তোমার প্রেম সম্বন্ধে বলি। এর অপচয় ঘটিয়ো না, প্রতারণা আর কামুকতার মধ্যে দিয়ে একে নষ্ট কোরো না। ভালোবাসো সুন্দর করে, শোভনভাবে, মিতব্যয়ীর মতো — এক কথায়, বীরের মতো... এটা এমনই একটা ঘটনা যে আজ আর আমার কাজ করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এস, আজ তুমি আমার সঙ্গে খাবে।'

মাকারেঙ্কো আমায় ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিলেন না, নিজের মধ্যে গুটিয়ে যেতেও দিলেন না আমায়। লম্বা-চওড়া লেকচার দিয়ে বা ধমক দিয়ে প্রেমকে আমার তুচ্ছ করলেন না তিনি, ঔদাসীন্য বা মেকি সহানুভূতি দেখিয়ে তার অবমাননাও ঘটালেন না।

অবশ্য এর পরে, ১৯২৪ সালে, ছুটি কাটাতে আমি যখন কলোনিতে এলাম আন্তন সলভিওভ নামে একটি ছেলে আমায় তখন জানাল যে ওল্‌গা আমায় ছেড়ে গেছে ও অপর একজনকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। যে-গ্রামে ওল্‌গা থাকত তিন কিলোমিটার পথ ভেঙে সেই গ্রামে দৌড়লাম। গিয়ে দেখলাম, কথাটা সত্যি।

বেশ রাত করে সেদিন কলোনিতে ফিরে আন্তন সেমিওনভিচের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমার শরীর-মনের তখন যা অবস্থা!

'কী ব্যাপার, সেমিওন? অসুস্থ নাকি?'

'জানি না। বোধহয় অসুস্থই।'

'যাও, শোবার ঘরে যাও। তোমায় দেখার জন্যে এলিজাভেতা ফিওদরভ্‌নাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'কোনো দরকার নেই। কোনো এলিজাভেতা ফিওদরভ্‌নার সাধ্যি নেই আমায় সাহায্য করেন। ওল্‌গা আমায় ছেড়ে গেছে। ও বিয়ে করছে। সামনের রবিবার বিয়ে... ওই সব মেয়ে আমাদের, কলোনির বাসিন্দাদের, বিশ্বাস করে না।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, সব শেষ। আমি ভেবেছিলাম এ বুঝি সারা জীবন টিকবে। কিন্তু...'

এই পর্যন্ত বলেই কাঁদতে শুরু করলাম।

'কিছু মনে কোরো না, সেমিওন, কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এই তো মাত্র তিন মাস আগে ওল্‌গার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, কথাও বলেছি ওর সঙ্গে। ও তো তোমাকেই ভালোবাসে। না-না, কোথাও একটা কিছু গোলমাল ঘটেছে।'

'কিছ্ছু গোলমাল নেই, বিয়ে একদম পাকা। আমার ওপর রাগ করবেন না, আন্তন সেমিওনভিচ, ভাববেন না আমি এমনি কথার কথা বলছি... আমি গলায় দড়ি দেবই!'

'উহ্‌, তোমার কি মাথা খারাপ হল, সেমিওন?'

'না, মাথা খারাপ হয় নি। কিন্তু আর বাঁচব কী জন্যে বলতে পারেন?'

'যাও, তাহলে গলায় দড়ি দাও গিয়ে! নিকুচি করেছে, নাকে-কাঁদা কন্যে-মাছি কোথাকার! তবে আমার একটা উপকার কর — গলায় দড়িটা কলোনি থেকে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে দাও দেখি, যেন তোমার ওই বিরহরোগে-ভোগা দেহের দুর্গন্ধ আমাদের নাকে না-পেঁছয়। বুঝলে?'

ক্রুদ্ধভাবে টেবিলের ওপর কী-একটা জিনিস যেন সরালেন মাকারেঙ্কো। তাঁর কথার তাৎক্ষণিক ফল হল এই যে গলায় দড়ি দেবার ইচ্ছেটা আমার উবে গেল। অতঃপর উনি এসে আমার পাশে সোফায় বসলেন, আর আমার হৃদয়ে, আমার জ্বরতপ্ত মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হল সহৃদয় সাহচর্যের স্নিগ্ধ স্রোত। এরও পরে ওঁর পরামর্শে একসময়ে আমরা বাইরে

গিয়ে তারাভরা আকাশের নিচে বসলাম, আর এক উন্নততর ভবিষ্যতের কল্পনায়, অপেক্ষাকৃত ভালো, একনিষ্ঠ মানুষের সমাজ কেমন হবে সেই স্বপ্নে মশগুল হয়ে গেলাম...

আন্তন সেমিওনভিচের ছিল মহৎ মানবিক গুণাবলী। মস্ত বড় মনের অধিকারী ছিলেন তিনি, অনেক কিছু শেখার ছিল তাঁর কাছ থেকে। তাঁর বই 'জীবনজয়ের পথে' এমন সব সত্যিকার মানুষজনকে নিয়ে লেখা যারা বাস্তবে গোর্কি উপনিবেশে বাস করত। গ্রন্থকার কেবল কয়েকটি নাম বদলে দিয়েছেন মাত্র। বইয়ের শেষে মাকারেঙ্কো তাঁর রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সম্পর্কে লিখেছেন। আগে যারা ছিল রাস্তার বাউণ্ডুলে ও শিশু-অপরাধী সেই ছেলেমেয়েরা সবাই সৎপথে গিয়েছিল। ওরা গড়ে উঠেছিল শ্রমিক, এঞ্জিনিয়র, কৃষিবিৎ, ডাক্তার, বৈমানিক আর শিক্ষক হিসেবে। ওদের মধ্যে অনেকে, যারা কমিউনিস্ট হয়েছিল, সাবালক হবার পরে তারা দেশপ্রেমমূলক মহাযুদ্ধে বীরের মতো লড়েছিল। আজও তারা স্বদেশের হিতার্থে নিজ-নিজ কাজে লিপ্ত। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, ইভান কোলস ('জীবনজয়ের পথে' যার নামকরণ করা হয়েছে ইভান গোলস) পরবর্তী জীবনে হয়েছে এঞ্জিনিয়র। ও এখন কাজ করছে মন্‌চেগোর্‌স্কে। নিকলাই শের্‌শ্‌নেভ (বা, ভের্‌শ্‌নেভ) এখন আমুর নদীর তীরবর্তী কম্‌সমোল্‌স্কে ডাক্তারি পেশায় নিযুক্ত। পাভেল আর্খাঙ্গেল্‌স্কি (বা, জাদোরভ) সামরিক এঞ্জিনিয়রদের মধ্যে এখন একজন লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল। ভাসিলি ক্লুশ্‌নিক (বা, ক্লুশ্‌নেভ) সোভিয়েত সেনাবাহিনীর একজন অফিসার। এছাড়া অনেকে মৃত্যুবরণ করেছে যুদ্ধে। মারাত্মক ক্ষতস্থানে জটিলতা দেখা দেয়ার ফলে লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল গ্রিগোরি সুপ্রুন (বা, বুরুন) মারা যায় ১৯৫৪ সালে।

আন্তন মাকারেঙ্কো প্রায়ই বলতেন, 'মানুষের একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার — সে হবে এমন একজন মানুষ যার 'ম'-অক্ষরটা লেখা হবে বড়-বড় করে, তাকে হতে হবে সত্যিকার মানুষ।' নিজেই মাকারেঙ্কো ছিলেন এই বৈশিষ্ট্যের স্ফুটতম রূপের অধিকারী, আর এই বৈশিষ্ট্য তাঁর দায়িত্বাধীন ছেলেমেয়েরা যাতে আয়ত্ত করতে পারে তার জন্যেও যথাসাধ্য করতেন।

## ভিক্তর ফিঙক্

# অস্থিরতার সুখ

'জীবনজয়ের পথে' বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতি জুটে গেল তাঁর কপালে। কিন্তু এ সাধারণ সাহিত্যিক খ্যাতি ছিল না। মাকারেঙ্কোর সঙ্গে যখন আমার পরিচয় ঘটল আর আমি তাঁর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার বাঁধা নিয়মের সাক্ষী হয়ে দাঁড়ালুম, তখন দেখলুম তাঁর এই খ্যাতি কত কঠিন, কত বড় গুরুভার বোঝাস্বরূপ।

নানা কারণে মন বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল হলে অসংখ্য মানুষ পরামর্শ ও সান্ত্বনালাভের আশায় তাঁর মুখাপেক্ষী হতেন। মাকারেঙ্কোর সঙ্গে পত্রালাপ করতেন তাঁরা, মনের ভার হালকা করার উদ্দেশ্যে দূর-দূর থেকে, বা কাছ থেকে এসে দেখা করতেন। পাঠকরা শুধু-যে তাঁর চমৎকার বইখানির পাতার পর পাতা পড়ে মোহিত হতেন তা-ই নয়, তাঁরা উদ্বুদ্ধ হতেন গ্রন্থকারের ব্যক্তিত্বে, অভিভূত হতেন তাঁর নিজ জীবনের মহৎ কৃতিত্ব দেখে, তাঁর কঠিন বহিরাবরণের নিচে স্পন্দিত প্রাজ্ঞ হৃদয়ের স্পর্শ অনুভব করে।

আন্তন মাকারেঙ্কোর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় মস্কোয়, ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, লাভ্রুশিন্স্কি গলিতে লেখকদের ভবনে বসবাসের সূচনার দিন। সেদিন ওঁর পরনে ছিল সৈনিকের গ্রেটকোট আর মাথায় চামড়ার ক্যাপ। দেখে মনে হচ্ছিল বয়স বছর পঞ্চাশেক হবে। ওঁর মুখভাবে ছিল প্রাণচঞ্চলতার লক্ষণ, আর ছিল চোখে-পড়ার-মতো লম্বা নাক, চশমার আড়ালে গম্ভীর দুটি চোখ আর ছোট-করে-ছাঁটা একমাথা চুল।

লেখক-ভবনে আমার পাশের ঘরে থাকতেন উনি। প্রথম পরিচয়েই ওঁকে হৃদয় দান করে ফেললুম। দেখলুম, উনি আশ্চর্য স্বচ্ছ বিচারশক্তির আর নতুন কোনো কিছুকে অনুভবে বুঝতে পারার উপযোগী অতি-বিকশিত বোধশক্তির অধিকারী। তাঁর এই বোধ ছিল সঙ্গীত-শিল্পীর সাধা কর্ণেন্দ্রিয়ের মতোই।

১৯৩৭ সালের হেমন্তে মাকারেঙ্কো 'সুখ' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটির আলোচ্য বিষয় ছিল সাহিত্য। ওই প্রবন্ধে লেখক সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'মানুষের দুঃখবেদনার জমা-খরচের হিসাব' বলে। সাহিত্যে তিনি এমন একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যা তাঁর আগে আর কেউ লক্ষ্য করেছেন বলে মনে হয় না। বিষয়টা হল এই, বিশ্বের মহৎ লেখকদের কেউ কখনও সুখের বর্ণনা দেন নি। এর কারণ এই নয় যে আমাদের এই পাপে-ভরা পৃথিবীতে সুখের চেয়ে শোক-দুঃখের পরিমাণ বেশি। এর আসল কারণ, আলোচ্য বস্তুর সাহিত্য-প্রযুক্তিগত গুণ। মাকারেঙ্কো বললেন, মানুষের সুখ যে সাহিত্যে আলোচনার পক্ষে কখনও বিশেষ কাজের হয় নি তার কারণ ওই সুখ ছিল তুচ্ছ বস্তু। সাধারণত তা ছিল নিছক ব্যক্তিগত সুখ, আর তাসখেলায় বাজি জেতার মতো প্রায়শই ছিল তা দৈবাৎ-লভ্য। সাহিত্যে একে বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না এই জন্যে যে এ-সুখ এ-পর্যন্ত কাউকে স্পর্শ করে নি, কেউ এ-নিয়ে মাথা ঘামায় নি। দুঃখ-শোকই একমাত্র নায়ককে সাহিত্যে প্রবেশাধিকার দিয়েছে — কারণ, শোক হল সার্বিক ব্যাপার। পরিশেষে মাকারেঙ্কো এই মত প্রকাশ করলেন যে ব্যক্তিগত সুখ একমাত্র তখনই সাহিত্যের মঞ্চ অধিকার করবে যখন তা আর দৈবক্রমে-প্রাপ্য বস্তু হয়ে থাকবে না এবং সামাজিক অন্যায়-অবিচার যখন সে-সুখের প্রতিবন্ধক হবে না। আর এ-অবস্থা একমাত্র মুক্ত, শ্রেণীহীন সমাজেই সম্ভব হয়ে উঠবে।

প্রবন্ধটি আমি প্রথম পড়ি পারিতে থাকতে। মুখে-মুখে তর্জমা করে তখনই সেটি পারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক পুরনো সতীর্থ, এক ফরাসি ভদ্রলোককে শোনাই।

শুনে তিনি বললেন, 'ধুত্তোর, তোমরা এমন অস্থির মানুষ যে কী বলি! আচ্ছা, আমাদের এই বুড়ি পৃথিবীটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই

থাকতে চাইলে তাতে তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন বল তো? তোমাদের কি সবকিছুরই ভিত নাড়িয়ে দিতে হবে, এমন কি সাহিত্যের খাম্বাগুলো পর্যন্ত?'

মাকারেঙ্কোর বক্তব্যের সমর্থনে বলতে শুরু করলে তিনি আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন:

'থাক, হয়েছে। তোমাকে আর প্রমাণ করতে হবে না। উনি ঠিক কথাই বলেছেন। একেবারে খাঁটি কথা। আমি নিজেই তা ধরতে পারছি। তবু... ব্যাপারখানা ভাবো একবার। আমরা এতকাল বিশ্বাস করে এসেছি যে আমাদের দেবদেবীরা সব মার্বেল-পাথরে তৈরি, তাঁরা শাশ্বত। আর উনি কিনা এসেই দিলেন এক ঘা — ব্যস, শাশ্বত দেবদেবীরা দড়াম করে আছড়ে পড়ে মাটির ঢেলার মতোই ভেঙে হয়ে গেলেন টুকরো-টুকরো।'

'না-না, তুমি ভুল করছ,' ওঁকে সান্ত্বনা দেবার ছলে বললুম, 'দেবদেবীরা একদিন ছিলেন আর তাঁরা ছিলেন সত্যিই মার্বেল-পাথরে গড়া। কিন্তু কাল, কালের গ্রাস যাবে কোথায়, বুঝলে হে বন্ধু! কালক্রমে মার্বেল-পাথর ভেঙে পড়তে শুরু করেছে আর-কি...'

কিন্তু উনি এ-কথা মানতে চাইলেন না।

গলা চড়িয়ে বললেন, 'ওঁরা আরও শ-খানেক বছর অনায়াসে খাড়া থাকতেন। একমাত্র তোমাদের জন্যে এই হাল! তোমাদের জাতটার কোনো ডেলাইল্যা নেই-যে এই মুশকিল! তা না-হলে ইতিমধ্যেই সে-ডেলাইল্যা কুচকুচ করে তোমাদের কেশর ছেঁটে ছোট করে দিত!'

মস্কোয় ফিরে এসে মাকারেঙ্কোর কাছে তাঁর এই প্রবন্ধ সম্পর্কে আমি উচ্ছ্বাসবর্ষণ শুরু করলুম। আর, আমার উচ্ছ্বাস যথারীতি তাঁর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তবে যখন কথা বলা শুরু করলেন তখন তাঁর চোখে একটা চাপা ঝলক লক্ষ্য করলুম।

তিনি বললেন, 'না, সত্যিই, আমার কথাটা ঠিক। আচ্ছা, আপনি বিশ্ব-সাহিত্যের এমন একখানা বইয়েরও নাম করতে পারেন যেখানে ব্যক্তিগত সুখের বর্ণনা আছে? ভালোই জানেন, আপনি নাম করতে পারবেন না! এমন কোনো বই-ই নেই আসলে। আপনি কি মনে করেন লেন্‌স্কি দ্বন্দ্বযুদ্ধে মারা গিয়েছিল আর অনেগিন নিজের বুদ্ধির দোষে তাতিয়ানাকে হারিয়েছিল বলেই পুশ্‌কিন সুখী প্রেমের বর্ণনা দেন নি?.. আপনি কি

বলতে চান পুশ্‌কিন তাঁর জীবনে একটিও সুখময় বিয়ে ঘটতে দ্যাখেন নি? একদম বাজে কথা!.. আসলে, এই জাতীয় সীমিত সুখে শিল্পীর সুখ নেই-যে... যেমন, ধরুন, তলস্তোয়। সুন্দরী হেলেনকে বিয়ে করার পর পিয়ের বেজুখভ যতক্ষণ অসুখী হয়ে ছিল ততক্ষণ তলস্তোয় তাকে উলটেপালটে এদিক-সেদিক থেকে কেবলই দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু নাতাশা রস্তোভাকে বিয়ে করার পর যেই পিয়ের সুখের মুখ দেখল অমনি তলস্তোয় তাকে পরিত্যাগ করলেন — এ-ধরনের সুখ নিয়ে তাঁর আর কিছু করার ছিল না, তাই। কেননা, সবকিছু সত্ত্বেও এ ক্রীতদাস-প্রভুদের লজ্জাকর সুখ বৈ তো নয়...'

অল্পক্ষণের জন্যে কথায় ছেদ পড়ল। মনে হল, মাকারেঙ্কোর মুখের উপর দিয়ে এক টুকরো মেঘ যেন ছায়া ফেলে গেল। স্পষ্টতই, হৃদয়দৌর্বল্য তাঁকে আবার কাবু করে ফেলছিল। তাই তাঁকে অন্যমনস্ক করার জন্যে আমার পারির সেই বন্ধু, যিনি আমাদের ডেলাইল্যার ভয় দেখিয়েছিলেন. তাঁর কথা বলতে শুরু করলুম।

গল্প শুনে প্রাণ খুলে হাসলেন মাকারেঙ্কো।

'ডেলাইল্যাই বটে! বন্ধুকে আপনার বলা উচিত ছিল যে বহুদিন ধরে ডেলাইল্যা আমাদের এখানে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যা। পিয়াত্‌নিত্‌স্কায়া স্ট্রিটে নাপতিনীর কাজ করে সে, আর সারা দিন ধরে পুরুষদের দাড়ি কামায় আর চুল ছাঁটে। এখানে কে তার কড়ি ধারে!'

মাকারেঙ্কো এ-ব্যাপারে ছিলেন সিদ্ধহস্ত — অর্থাৎ, আচমকা হাসি-মস্করা জুড়ে দিয়ে যে-কোনো গুরুগম্ভীর আলাপ-আলোচনায় ইতি টানতে।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার তিনি একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'মানুষের দোষত্রুটি কি থাকতেই হবে?'

লেখাটির বক্তব্য ছিল এই রকম: মানুষের চরিত্রে বহুতর ছোটখাট অথচ বিরক্তিকর খুঁত থাকে। কিন্তু, হায়রে, তার জন্যে কেউ শাস্তি পায় না। অতি-সম্মানিত ব্যক্তিও মিথ্যাবাদী, অসার দাম্ভিক, অর্থলিপ্সু, অমার্জিত বা রূঢ়ভাষী হতে পারে কিংবা তার অধীনস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার করতে পারে। অথচ এ হেন ব্যক্তি সম্পর্কে সর্বদাই বলতে শোনা যায়: 'লোকটি ভারি কাজের! আর দোষত্রুটি যদি বলো তো সে কারই-বা নেই? প্রত্যেক মানুষেরই দোষত্রুটি আছে।'

এই পর্যন্ত এসেই মাকারেঙ্কো আচমকা প্রশ্ন তোলেন, 'ঠিক-ঠিক বলতে গেলে, মানুষের কি দোষত্রুটি থাকতেই হবে? যদি সে মিথ্যাবাদী কিংবা অভব্য বর্বর না-হয় তাহলে কি সে তার কাজ ভালোভাবে করতে পারবে না?'

বক্তৃতাটি নিয়ে অতঃপর আমাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হল।

'আন্তন সেমিওনভিচ, আপনি দেখছি সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন বিষয়ীপনার ঘোর শত্রু। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, এই দোষ আমাদের নিজেদের মধ্যেই, লেখকদের মধ্যেই, বৃদ্ধি পাচ্ছে?'

এ-ব্যাপারে কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে শেষে বললুম:

'জানেন তো, সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন এই বিষয়ীপনার দুর্গন্ধ এমন একটা ব্যাপার যা এমন কি সেকালের বুর্জোয়াশ্রেণীও সহ্য করতে পারত না...'

শুনে মাকারেঙ্কো যেন ফেটে পড়লেন:

'সেকালের বুর্জোয়াদের কথা আর বলবেন না। তাদের পক্ষে সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন বিষয়ীপনার দুর্গন্ধ এড়ানো সম্ভব ছিল না, কারণ ওটা ছিল তাদের নিজস্ব, স্বাভাবিক, শারীরিক দুর্গন্ধ। কিন্তু আমাদের একালের মানুষ তা সহজেই শরীর থেকে ধুয়ে ফেলতে পারে। সে এখনও সাতবাসি পুরনো পোশাক গায়ে চড়িয়ে আছে, তা থেকেই এই দুর্গন্ধ। তফাতটা ভুলবেন না, ওস্তাদ!..'

আব একসময়ে এক প্রাক্তন ছাত্রের কাছ থেকে একখানা চিঠি পাওয়ার পর তিনি মন্তব্য করলেন, 'এই নিকলাইটা দেখছি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে!' নিকলাই ছিল একদার রাস্তায় পরিত্যক্ত শিশু। পরে সে ডাক্তার হয়ে কাজকর্ম করছিল। মাস্টারমশাইকে সে চিঠিতে অভিযোগ জানিয়ে লিখেছিল যে চারিদিকে বড্ড বেশি মূর্খের ছড়াছড়ি।

'কেমন লাগছে শুনতে -- চারিদিকে বড্ড বেশি মূর্খের ছড়াছড়ি?' মাকারেঙ্কো রাগে গাঁক-গাঁক করে উঠলেন, 'আচ্ছা, বলুন তো, বিপ্লব যদি না-হোত তাহলে আমার এই সোনার চাঁদ নিকলাইয়ের অবস্থাটা কী দাঁড়াত?'

'কী করে জানব, বলুন!'

'শুনুন, তাহলে আমিই বলছি। ও পচে মরত কোনো একটা নগণ্য

জেলা-শহরের নরকে। নিজেই বাঁচত মূর্খ হয়ে, অথচ তা বোঝার ক্ষমতাও থাকত না ওর। এটা অনুভব করার মতো, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো বুদ্ধিই থাকত না ওর। আর, বলা যায় না, নিজের মতো করে হয়তো ও সুখেই থাকত... কিন্তু, আমি ভাবছি, এখন কি ও ওই ধরনের সুখ মেনে নিতে রাজি হবে?'

'তাহলে, আপনার মতে, সুখ হল গিয়ে নানা ধরনের?' বিচক্ষণের মতো বললুম আমি।

মাকারেঙ্কো হাসলেন:

'নিশ্চয়ই! বহু রকম সুখ আছে। যার যা কাজ তা-ই করার সুখ প্রকৃতির বিরুদ্ধে, খারাপ সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, বদমায়েসদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কঠিন, ঝামেলায়-ভরা, অশান্ত সুখ। এ-সুখ পেতে হলে শরীরে কালশিরা পড়ে, দেহ ছিঁড়েকুটে যায়। কিন্তু, মনে রাখবেন, এই সুখই দুনিয়াটাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে... অবশ্য এছাড়া আরত এক রকমের শান্তির সুখ আছে মানুষের যাতে মানুষ স্বল্পে সুখী হয় আর চায়ও না কিছুই।'

'আমার তো মনে হয় প্রত্যেকেই যে-যার নিজের মতো করে সুখী হতে পারে,' বললুম আমি।

উনি আমার দিকে তেরছা চোখে তাকালেন। স্পষ্টতই, ওঁর মনে হল যে-মানুষ কিছুই চায় না আমি বুঝি তার সেই শান্ত সুখের সমর্থনে কথা বলছি। আর কথাটা মনে হতেই উনি কেমন যেন মিইয়ে গেলেন। আমার দিকে না-তাকিয়ে টেনে-টেনে শুরু করলেন:

'হ্যাঁ-াঁ, তা বটে!'

তারপর, বিরক্ত হলে যে-ঢঙে কথা বলতেন সেই কাট-ইউক্রেনীয় উচ্চারণে বললেন:

'তবে ওয়া তো শুয়ারের সুখ। ও সুখ শুয়ারে খাউক!..'

মাকারেঙ্কো ছিলেন এমন একজন লোক, কোনো পরিশ্রমেই তৃপ্ত হতেন না যিনি। প্রথম-প্রথম আমি ভাবতুম, এটা বুঝি তাঁর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্যমাত্র। কিন্তু পরে আমার ভাবনায় নতুন আলোকপাত ঘটল। আসলে ব্যাপারটা ছিল এই যে মানুষটির অনেক কাজ করার ছিল, কিন্তু তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্যে আর বেশিদিন কুলোবে না বুঝে তিনি মৃত্যুর উপর একহাত নিতে, তাকে হারিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

মৃত্যুকে ভয় করেন নি তিনি। তাকে নিছক একটা জ্বালাতনের ব্যাপার বলে মনে করতেন, কারণ তা মানুষের কাজে ব্যাঘাত ঘটায়। তাই মৃত্যুকে তিনি ঘৃণা করতেন।

ওই সময়ে লেখা আসন্ন মৃত্যুর পূর্বাভাসে পূর্ণ এক চিঠিতে তিনি এমন কথাও বলেছেন:

'প্রকৃতি আবিষ্কার করেছে মৃত্যুকে, কিন্তু মানুষ শিখেছে তাকে প্রতিরোধ করতে...'

মনে-মনে ছবিটা স্পষ্ট কল্পনা করতে পারি।

রাত্রি। উনি বসে আছেন নিজের টেবিলে। কাজ করছেন আর বুকের মধ্যে একটা কিছু একবার সংকুচিত একবার প্রসারিত হচ্ছে — মৃত্যু ভেঙ্চি কাটছে ওঁকে। কিন্তু মানুষটির চোখে ঝিকমিক করছে কাউকে জব্দ করার দুষ্টুহাসি — সোজাসুজি, চ্যালেঞ্জ জানানোর ভঙ্গিতে উনি তাকিয়ে আছেন মৃত্যুর কুৎসিত মুখের দিকে। আর ওইখানে বসেই, মৃত্যুর একান্ত উপস্থিতিতেই, কালি-কলম দিয়ে লিখে যাচ্ছেন যে উনি তার পরোয়া করেন না, আর কাজ করে চলছেন অনবরত।

মাকারেঙ্কো ছিলেন ঠিক এই ধরনের মানুষ।

# জীবনজয়ের পথে

আমাদের সুহৃদ ও শিক্ষক
মাক্সিম গোর্কির উদ্দেশ্যে
একান্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধায় নিবেদিত

## ১

## জেলা জনশিক্ষা-দপ্তর-প্রধানের সঙ্গে কথাবার্তা

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকারি জেলা জনশিক্ষা-দপ্তরের প্রধান একদিন আমায় ডেকে পাঠালেন।

হাজিরা দিলে উনি বললেন, 'আমি শুনছি, ভাই, তুমি নাকি তুলকালাম কাণ্ড শুরু করেছ... দেখো, তোমার ইশ্‌কুলের জন্যে এই... এখানে... কী বলে... গুব্‌সোভ্‌নার্‌খোজ*...'

'তুলকালাম কাণ্ড করার মতোই ব্যাপারটা-যে,' আমি জবাব দিলুম। 'তুলকালাম কাণ্ড বলছেন? আমার তো ভাবতেই কান্না পাচ্ছে! ওটাকে কি কারুশিল্প শিক্ষার ইশ্‌কুল বলা চলে? ওই দুর্গন্ধে-ভরা নোংরা নরকটাকে? ইশ্‌কুল সম্বন্ধে ওই রকম আপনার ধারণা বুঝি?'

'বুঝেছি, বুঝেছি! আমি জানি তুমি কী চাও! চাও, আমরা একটা নতুন দালান তুলে দিই, নতুন চেয়ার-ডেক্‌সো দিয়ে সাজিয়ে দিই, আর তোমরা শুধু তার ভেতরে সেঁধিয়ে বিদ্যেদান করতে থাক! কিন্তু, দোস্ত, দালান-কোঠা আসল ব্যাপার নয় — আসল ব্যাপার হল গিয়ে, নতুন মানুষ গড়া। তা না, তোমরা, শিক্ষেদাতারা, খালি খুঁতখুঁত করতেই জানো, 'এ-দালানে কাজ চলবে না, টেবিলগুলো ঠিক না, এই সব!' আসলে তোমাদের ওই... যাকে বলে... মনোবৃত্তি, বিপ্লবী মনোবৃত্তি আর-কি,

* গুব্‌সোভ্‌নার্‌খোজ — জেলা অর্থনৈতিক পরিষদ। — অনুঃ

তারই অভাব, বোঝলে? তুমি হলে গিয়ে ওই বাবু-কর্মীদের একজনা, ঠিক তা-ই!'

'হুম, কিন্তু আমি তো বাবুদের শাদা কলার পরি না।'

'ঠিক আছে, পরো না তো পরো না!.. তাতে কী! মশাই, তোমরা সব একেকটি অপদাথ্ বুদ্ধিজীবী!.. আরে, আমি বলে কিনা সর্ব্বত্র একজনা মানুষের মতন মানুষ ঢুঁড়তে লেগেচি — কত-যে পর্ব্বতপ্রমাণ কাজ করবার আছে, কী বলি! এই সব বাস্তুহারা কাচ্চাবাচ্চা খালি আসচে তো আসচেই, পিলপিল করে ওরা বাড়তে লেগেচে, ওদের জন্যে রাস্তায় চলাফেরা করাই মুশকিল হয়ে পড়েচে, বলব কি হুড়মুড় করে ঘরেদোরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে ওরা। তা, যারেই এর দায়িত্ব নিতে বলি সে জবাব দেয়: 'এ তোমার কাজ', 'এ জনশিক্ষা-দপ্তরের দায়িত্ব...' ঠিক আছে, তাহলে, কী করা?'

'কোন্ বিষয়ে কী করা?'

'কোন্ বিষয়, ভালোই জানো তুমি! কেউই নিতে চায় না এ-কাজের দায়িত্ব! যারেই কই, সে-ই সাফ জবাব দেয় — 'না, আজ্ঞে — আমাদের গলা কাটা যাক তা আমরা চাই নে!' তোমরা মশাই সবাই চাও আরামের পড়ার ঘর আর মিঠে-মিঠে বই... ধুত্তোর, নিকুচি করেছে তোমাদের আর তোমাদের ভ্যালা চশমাগুলার!..'

হাসলুম।

'শেষপর্যন্ত আমার চশমা নিয়ে পড়লেন!'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই বলতে চাই আমি — তোমরা চাও খালি বইয়ে মুখ গুঁজে থাকতে, আর যখনই একটা আস্ত, জ্যান্ত মানুষের মুখোমুখি পড়ো অমনি শুরু করে দ্যাও গলা ছেড়ে চ্যাঁচানি: ওরে বাবারে, গলায় কোপ দিলে রে — তোমাদের ওই আস্ত, জ্যান্ত মানুষটা রে! হুঃ, যত সব বুদ্ধিজীবী!'

জেলা জনশিক্ষা-দপ্তরের প্রধান তাঁর খুদে-খুদে কালো চোখ পাকিয়ে ক্রুদ্ধভাবে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন আর তাঁর সিন্ধুঘোটক-সদৃশ গোঁফের ফাঁকে এইভাবে গোটা শিক্ষক-সম্প্রদায়ের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে চললেন। কিন্তু জেলা জনশিক্ষা-দপ্তরের প্রধানটি ভুল বুঝেছিলেন।

'এবার তাহলে শুনুন...' আমি শুরু করলুম।

'কী হবে মাথামুণ্ডু শুনে? কী তোমার বলার থাকতে পারে, অ্যাঁ? আমি জানি তুমি কী বলতে যাচ্ছ। তুমি বলবে: ওরা ওইখেনে... কী বলে... ওই আমেরিকায় যা করেচে আমরা যদি তেমনটা করতে পারতাম!.. এ-সম্বন্ধে একখান বইও পড়ে ফেলেচি — কে যেন আমারে গছিয়ে দিইছিল। সংশোধ... ওরে কী কয় যেন? ও, হ্যাঁ, মনে পড়েচে, সংশোধনাগার! তা, আমাদের তো অমনটা এখনও গড়ে ওঠে নাই!'

'তা, আমাকে কিছু বলতে দেবেন তো।'

'বল-না, বল, আমি শুনচি।'

'বিপ্লবের আগেও অনাথ নিরাশ্রয়দের জন্যে একটা-না-একটা ব্যবস্থা ছিল, তাই না? কিশোর-অপরাধীদের জন্যে সংশোধনী ইশ্‌কুল ছিল তখন...'

'ওতে আমাদের কাজ চলবে না... না-না, বিপ্লবের আগে যা ছিল তাতে আমাদের চলবে না।'

'ঠিক কথা। তাহলে, নতুন মানুষ গড়তে গেলে আমাদের নতুন পদ্ধতি খুঁজে বের করতে হবে।'

'নতুন পদ্ধতি। ঠিক, ঠিক।'

'অথচ কোথা থেকে শুরু করতে হবে তা কেউ জানে না।'

'তুমিও না?'

'আমিও না।'

'কিন্তু... জেলা জনশিক্ষা-দপ্তরেই... এমন কিছু লোক আছে যারা এর হদিশ জানে...'

'কিন্তু তারা এ নিয়ে কোনো কাজ করতে নারাজ।'

'ঠিক কথা, তারা নারাজ — চুলোয় যাক সব! ঠিক বলেছ!'

'আর আমি যদি কাজটার ভার নিই, ওরা আমার কাজ করা অসম্ভব করে তুলবে। যা-ই আমি করতে যাব, ওরা ফেঁকড়া তুলবে, বলবে: না-না, ওভাবে নয়!'

'তা ফেঁকড়া বাধাবেই, শোরের বাচ্চারা! তুমি ঠিক বলেছ।'

'আর আপনি তখন ওদের কথাই বিশ্বাস করবেন, আমার কথা নয়।'

'না। আলবত না! আমি বলব: কাজটা তোমরা নিজেরাই করে দেখাও না কেন, বাপু!'

'কিন্তু, ধরুন, আমি সত্যিই যদি ভুল করে তালগোল পাকিয়ে বসি?'

জেলা জনশিক্ষা-দপ্তরের প্রধান এবার দুম করে টেবিলে এক ঘুষি কশিয়ে দিলেন:

'চুলোয় যাক তুমি আর তোমার 'তালগোল-পাকানো'! কী বলতে চাও খোলসা করে বল দেখি? তুমি কি ভাবো আমি কিছু বুঝি না, না? তালগোল পাকাক আর না-পাকাক, কাজটা করতেই হবে। ফল দিয়ে আমরা বিচার করব। বাচ্চা অপরাধীদের জন্যে কলোনি গড়াটাই আসল কথা না, আসল হল, বোঝলে কিনা! — ওই, যারে কয়... সামাজিক পুনঃশিক্ষাদান। নতুন মানুষ আমাদের গড়তেই লাগবে, বোঝলে কিনা — আমাদের ধাঁচের মানুষ আর-কি। তোমার কাজ হল এইটাই! যাক গিয়ে, আমাদের সবাইরে শিখতে হবে, তুমিও শিখবে। তুমি যেভাবে আমার মুখের ওপর বললে: আমি জানি না, তা আমার ভালো লেগেচে। ভালো কথা, তারপর।'

'একটা জায়গা দিতে পারেন? যতই যাই হোক, দালান-কোঠা ছাড়া তো আমাদের চলবে না, জানেনই।'

'তা, জায়গা একটা আছে! সোন্দর জায়গা, ইয়ার! ওইখেনেই আগে বাচ্চা অপরাধীদের জন্যে একটা সংশোধনী বিদ্যালয় বসত। জায়গাটা খুবই কাছে — এখেন থেকে ছয় কিলোমিটার-খানেক হবে। ভারি চমৎকার জায়গাটা -- বন আছে, খেতখামার আছে... গোরু পর্যন্ত পালতে পারবে...'

'আর লোকজনের কী হবে?'

'তুমি কি ভাবো লোকজন আমি পকেটে পুরে রাখি নাকি! এরপর দেখছি মোটরগাড়িরও বায়না ধরবে!'

'আর টাকা-পয়সা?..'

'পয়সা আমাদের আছে। নাও, ধর।'

টেবিলের ড্রয়ার খুলে একতাড়া নোট বের করলেন উনি।

'পনেরো কোটি রুবল। সাংগঠনিক যাবতীয় খরচাপাতি আর আসবাবপত্তর যা-যা দরকার তার জন্যে...'

'গোরু কেনার দাম সমেত?'

'গোরু পরে কিনলেও চলবে। জানলার কাচ কিন্তু একখানাও নাই। তুমি আসচে বছরের জন্যি খরচার একটা হিসেব তৈরি করে আমাদের দ্যাও দেখি।'

'কেমন যেন গ্‌লিয়ে যাচ্ছে সব। আমার কি আগে গিয়ে জায়গাটা একবার দেখে এলে ভালো হোত না?'

'সে-কাজ আমি সেরে ফেলেচি... তুমি কি ভাবো আমি যা দেখি নাই তা তোমার চোখে পড়বে? কিচ্ছ্‌ দরকার নাই, কেবল ওখেনে গিয়ে ঢুকে পড়লেই হয়।'

'ঠিক আছে।' স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলে বললুম। কারণ, তখন আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে অর্থনৈতিক পরিষদের বাড়ির ঘরগ্‌লোর চেয়ে খারাপ জায়গা দ্‌নিয়ায় আর কোথাও থাকতে পারে না।

অবশেষে জেলা জনশিক্ষা-দপ্তরের প্রধান রায় দিলেন, 'তুমি, দোস্ত, খাসা লোক! কাজে লেগে যাও দেখি! এ অতি মহৎ কাজ, বোঝলে না!'

## ২

## গোর্কি কলোনির লজ্জাকর স্‌চনা

পল্‌তাভা থেকে ছ-কিলোমিটার দ্‌রে বাল্‌ময় পাহাড়ি টিলার ব্‌ক ফ্‌ড়ে উঠেছিল ২০০ হেক্টর জমি জ্‌ড়ে একটা পাইন-বন। বনের ধার ঘেঁষে ছিল খার্‌কভ যাওয়ার পাথরে-বাঁধানো বড় শড়ক — যতদ্‌র চোখ যায় ঝকঝকে, মস্‌ণ।

ওই বনের মধ্যে ৪০ হেক্টর জায়গা জ্‌ড়ে পরিষ্কার করা একটা ফাঁকা জমির এক কোণে একটা সম্প্‌র্ণ সম-চতুর্ভুজের আকারে গড়ে উঠেছিল কঠোররকমে স্‌সমঞ্জস বেশ কয়েকটা ইটের দালান। ওইখানেই ছিল শিশ্‌ ও কিশোর অপরাধীদের নিয়ে নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলার কথা।

বাড়িগ্‌লোর মধ্যেকার বাল্‌ময় ঢাল্‌ উঠোনটা গড়িয়ে নেমে মিশে গিয়েছিল চওড়া একটা ফাঁকা জায়গায়। ফাঁকা জমিটা আবার ছড়িয়ে ছিল শরবনের পাড়-বসানো একটা হ্রদের কিনার পর্যন্ত। হ্রদের অপর পারে নজরে পড়ত এক ধনী কুলাক-চাষীর খামারবাড়ির ঘর আর বাবলা-জাতীয় ঘন গাছের বেড়ার সারি। খামার ছাড়িয়ে আরও দ্‌রে, যেন আকাশের গায়ে খোদাই-করা ছিল একসারি প্রাচীন বার্চগাছের সরলরেখা আর পরস্পর জড়াজড়ি-করে-থাকা কয়েকটা ক্‌ড়েঘরের চালা।

বিপ্লবের আগে জায়গাটা ছিল শিশ্ব ও কিশোর অপরাধীদের একটা কলোনির আস্তানা। কিন্তু ১৯১৭ সালে কলোনির বাসিন্দারা সরে পড়েছিল সবাই, পেছনে পড়ে ছিল কেবল একটা শিক্ষায়তনের অদৃশ্যপ্রায় কয়েকটা সাক্ষ্য। ছেঁড়াখোঁড়া রেজিস্ট্রি খাতাগ্বলো হাঁটকে বোঝা গেল, সরকারি সনদ পায় নি এমন নিম্নপদস্থ, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসরদের মধ্যে থেকেই প্রধানত ইশ্‌কুলের শিক্ষক নিয্বক্ত করা হোত। আর এই শিক্ষকদের প্রধান কাজ ছিল — কাজ বা বিশ্রাম যে-কোনো সময়েই তাঁদের রক্ষণাধীন ছেলেদের উপর কড়া নজর রাখায় ত্র্বটি না-করা। এমন কি রাত্রেও ছেলেরা যে-ঘরে ঘ্বমোত তার সংলগ্ন পাশের ঘরে ঘ্বমোতে হোত তাঁদের। স্থানীয় কৃষকদের মতে, এই শিক্ষকদের শিক্ষাদান-পদ্ধতি যে খ্বব স্ক্ষ্ম ছিল তা নয়, কার্যত তা সীমাবদ্ধ ছিল শিক্ষাদানের সেই চিরকেলে সহজতম হাতিয়ার — অর্থাৎ, বেত-ব্যবহারের মধ্যে।

আগের কলোনির বিষয়-আশয়ের চিহ্ন খ্বঁজে পাওয়া ছিল আরও দ্বর্ঘট। কারণ প্রতিবেশীরা আসবাবপত্র, ভাঁড়ারের মালমশলা আর কারখানার যন্ত্রপাতি যা-কিছ্ব হাতের কাছে পেয়েছিল সবই তুলে নিয়ে বা গাড়িতে চাপিয়ে গিয়ে প্বরেছিল নিজের-নিজের বারবাড়িতে বা গোলায়। অন্যান্য ম্বল্যবান সম্পত্তির মধ্যে তারা এমন কি একটা গোটা ফলের বাগানই সরিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু এ-সবকিছ্বর মধ্যে ল্বটতরাজের মনোভাবের বিন্দ্বমাত্র প্রকাশ ছিল না। যেমন, ফলের গাছ কুপিয়ে না-কেটে শিকড়স্বদ্ধ তুলে নিয়ে অন্যত্র পোঁতা হয়েছিল, জানলার শার্সি না-ভেঙে ফ্রেম থেকে সাবধানে খ্বলে নেয়া হয়েছিল, কুড়্বলের নির্মম ঘায়ে দরজাগ্বলো না-কেটে আস্তে তুলে নেয়া হয়েছিল কব্জা থেকে, আর একখানা-একখানা করে ইট খ্বলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল চুল্লীগ্বলোকে। আসবাব বলতে একটিমাত্র বস্তু যা বাড়িগ্বলোয় পড়ে ছিল তা হল প্রাক্তন ডিরেক্টরের ফ্ল্যাটে একটা সাইডবোর্ড মাত্র।

আমাদের এক প্রতিবেশী ল্বকা সেমিওনভিচ ভের্‌খোলা খামারবাড়িটা থেকে এসেছিলেন কলোনির কর্তাব্যক্তিদের এক-নজর দেখতে। তাঁকে জিজ্ঞেস করল্বম, ‘সাইডবোর্ডটা রয়ে গেল কীভাবে?’

‘ব্যাপার কী জানেন, আমাদের নোকজনেরা এই কাবার্ডটারে লিয়ে করবেই-বা কী। ইটা এত উঁচা আর এত চওড়া — উয়াদের দরজা দিয়ে তো

ইটা ঢুকবেই না। আবার ক্যেটে-কুট্যে সাতখান করলেও ইটারে দিয়ি তো কোনো কাম হবার লয়...'

কলোনির গুদামঘরগুলো ছিল এটা-ওটা নানা জিনিসে বোঝাই, কিন্তু তার কোনোটাই কাজে লাগার মতো ছিল না। সন্ধান পেয়ে সদ্য-চুরি-যাওয়া কিছু জিনিসও আমি পুনরুদ্ধার করলুম। এইভাবে পাওয়া গেল একটা পুরনো বীজ-বোনার যন্ত্র, আটখানা নড়বড়ে কাঠ-মিস্ত্রির টেবিল, একটা পিতলের ঘণ্টি এবং তিরিশ-বছুরে একটা বুড়ো ঘোড়া — এককালে যা কিনা তেজিয়ান কির্‌গিজ জাতের ঘোড়া ছিল।

জায়গাটায় প্রথম যেদিন গিয়ে পেঁছিলুম তখন ওখানে হাজির ছিল কালোনির সরবরাহ-তদারকির ম্যানেজার কালিনা ইভানভিচ। আমি পেঁছতেই তার প্রথম প্রশ্ন হল:

'আপনে কি শিক্ষায়তনের ডিরেক্টর?'

পরে, অল্প সময়ের মধ্যেই, জেনেছিলুম যে কালিনা ইভানভিচ ইউক্রেনীয় টানে কথা বলে থাকে, যদিও নীতিগতভাবে সে ইউক্রেনীয় ভাষাকে ভাষা বলে স্বীকার করে না।

'আপনে কি শিক্ষায়তনের ডিরেক্টর?'

'কে, আমি? আমি এই কলোনির ডিরেক্টর...'

'না, আপনে কলোনির ডিরেক্টর নন!' মুখ থেকে তামাকের পাইপ সরিয়ে ও বলল। 'আপনে শিক্ষায়তনের ডিরেক্টর, আর আমি সরবরাহ-তদারকির ম্যানেজার।'

মনে-মনে একবার শিল্পী ভ্রুবেল-এর আঁকা বনভূমির গ্রীক অধিদেবতা 'প্যান'-এর ছবিটা কল্পনা করুন। তবে প্যানের যদি মাথাজোড়া টাক হয় আর দু-কানের ওপর খালি ঝুলতে থাকে দু-গুচ্ছ চুল, প্যানের ছাগুলে-দাড়ি কামিয়ে দেয়া হয়, বিশপদের কায়দায় ছেঁটে দেয়া হয় গোঁফ আর দু-পাটি দাঁতের ফাঁকে গুঁজে দেয়া হয় পাইপের বাঁট — তাহলেই প্যান হয়ে যাবে কালিনা ইভানভিচ সের্‌দিউক। শিশু-উপনিবেশের সরবরাহ-তদারকির ম্যানেজারের পদের মতো সামান্য কাজের পক্ষে কালিনা ইভানভিচ ছিল একটু বেশিরকমই যোগ্য। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বহুবিচিত্র কাজকর্মে কেটেছিল তার জীবন। এর মধ্যে জীবনের মাত্র দুটি সময়ের কথা স্মরণ করে সে গর্ব অনুভব করত — একটা হল তার যৌবনের একটা পর্যায়,

যখন জারিনার রক্ষী-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কেক্সখোল্‌ম অশ্বারোহী বাহিনীতে সে ছিল একজন সৈনিক, অপরটি হল ১৯১৮ সালে জার্মান আক্রমণের মুখে মির্‌গরদ শহরের লোকাপসারণের কাজে তার তদারকির দায়িত্ব।

শিক্ষাদানের ব্যাপারে আমার প্রবল আগ্রহের প্রথম বলি হল কালিনা ইভানভিচ। কিন্তু ওর মতামতের প্রাচুর্য ও রকমারি বৈচিত্র্যই আমার পক্ষে সবচেয়ে বড় অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়াল। বুর্জোয়া আর বলশেভিক, রুশী আর ইহুদি, রুশী ঢিলেঢালা ভাব আর জার্মানদের কায়দাদুরস্ত শিষ্টাচার — এ-সবকিছুরই সে নিন্দা করত একই রকম পক্ষপাতশূন্য উৎসাহ নিয়ে। কিন্তু ওর নীল-নীল চোখদুটো থেকে বাঁচার উদ্দীপনা এমনভাবে বিকীরিত হোত, এত সংবেদনশীল আর এত প্রাণবন্ত ঠেকত ওকে যে আমার শিক্ষকসুলভ কর্মশক্তি ওর জন্যে কিছুটা ব্যয় করতে কুণ্ঠা ছিল না মনে। প্রথম দিনেই, আমাদের সেই প্রথম পরিচয়ের ক্ষণটি থেকেই, আমি ওর শিক্ষার ভার নিজের হাতে তুলে নিলুম।

'কমরেড সের্‌দিউক, আপনি নিশ্চয়ই মনে করেন না যে ডিরেক্টর ছাড়া একটা কলোনি চলতে পারে! একজন-না-একজনকে তো সবকিছুর দায়িত্ব নিতেই হয়, তাই না?'

কালিনা ইভানভিচ মুখ থেকে আবার পাইপ সরাল, তারপর আমার দিকে ভদ্রতাসূচক অল্প একটু মাথা ঝুঁকিয়ে বললে:

'অর্থাৎ আপনে ডিরেক্টর হইতে চান, এই তো? আর আপনে চান আমি আপনের, যারে কয়, অধীনস্থ কর্মচারি হই, তাই না?'

'ঠিক তা নয়! আপনি যদি চান আমিও আপনার অধীনস্থ হতে পারি।'

'দ্যাখেন, শিক্ষে যারে কয় আমি তো জীবনে কখনও তা পাই নাই। নিজের যোগ্যতায় যা আমি অর্জন করি নাই তা আমি চাই না। তবু দ্যাখেন, আপনের বয়স অল্প, আর আপনে কিনা আমার মতন বুড়ারে কইতেছেন আপনের হুকুম তামিল করনের ল্যেগে। এডা কি ঠিক, আপনেই কন। কী করুম, ডিরেক্টর হইবার মতন তো বইপত্তর পড়ি নাই — তাছাড়া, মনও চায় না ডিরেক্টর হইবার ল্যেগে!..'

অভিমানভরে আমার কাছ থেকে সরে গেল কলিনা ইভানভিচ। মুখ গোমড়া করে সারাটা দিন কেমন যেন মনমরা হয়ে রইল ও। তারপর

সন্ধেবেলায় ও যখন আমার ঘরে ঢুকল তখন মনে হল একেবারে যেন ভেঙে পড়েছে।

বলল, 'একখান তক্তপোষ আর এউগ্যা টেবিল ঘরে দিয়া দিছি। সব থেইকা ভালো যা পাইছি, দিছি।'

'ধন্যবাদ।'

'সকাল থেইকা ভাবতেছি আর ভাবতেছি, এখানে এই কলোনিটারে কেমনে দাঁড়া করান যায়। তা ভাইব্যা ঠিক করলাম যে আপনেই বরং ডিরেক্টর হন, আর আমি হইবনে, ওরে কী কয়, আপনের অধীনস্থ কর্মচারি।'

'আমরা দু-জনে দিব্যি মানিয়ে চলতে পারব, কালিনা ইভানভিচ!'

'আমারও তাই মনে লয়। যতই যাই হোক, বুটজুতায় সুকতলা লাগাইতে বেশি কেরামতির দরকার হয় না। আমরা দুইজনায় চালাইয়া দিতে পারুম। আর আপনে একজন শিক্ষিত লোক, আপনেই — ওরে কী কয় — ডিরেক্টর হইবেন।'

অতএব, কাজ শুরু করা গেল। তিরিশ-বছুরে বুড়ো ঘোড়াটাকে দরকারমতো এক-আধটুকু খুঁটির ঠেকো দিয়ে দাঁড় করানো গেল পায়ের ওপর। আমাদের এক প্রতিবেশীর দয়ার দান একখানা ফিটন-জাতীয় গাড়ির ওপর অনেক কষ্টে কালিনা ইভানভিচ চড়ে বসল আর তারপর সেই গোটা অদ্ভুতদর্শন বস্তুটি ঘণ্টায় দুই কিলোমিটার বেগে শহরের দিকে রওনা দিল। এইভাবে শুরু হল সাংগঠনিক পর্যায়।

সাংগঠনিক পর্যায়ের জন্যে যে-কর্তব্যকর্ম ঠিক হয়েছিল তা ছিল খুবই উপযুক্ত — অর্থাৎ, নতুন মানুষ গড়ার উদ্দেশ্যে তার উপযোগী বৈষয়িক উপাদান সঞ্চয় করা। কালিনা ইভানভিচ আর আমি প্রথম দু-মাস দিনের পর দিন কাটাতে লাগলুম শহরে। ও যেত শহরে গাড়িতে চেপে, আর আমি পায়ে হেঁটে। পায়ে হেঁটে যাওয়াটা ওর কাছে মনে হোত মানহানিকর, আর আমি আমাদের কির্‌গিজ ঘোড়ার ঢিমে-তেতালা চলন কিছুতে সহ্য করতে পারতুম না।

ওই দুই মাসে গ্রাম্য কারিগরদের সাহায্যে জানলায় শার্সি বসিয়ে, চুল্লীগুলো মেরামত করে, দরজায়-দরজায় নতুন পাল্লা লটকিয়ে পুরনো কলোনির একটা ব্যারাকবাড়িকে আমরা কোনোরকমে বাসোপযোগী করে তুললুম। 'বাইরের রণাঙ্গনে' কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রে আমাদের জয় হল, তবে

এই জয়টা বেশ লক্ষণীয় ছিল। প্রথম সংরক্ষিত সেনাবাহিনীর খাদ্য-সরবরাহ দপ্তর থেকে ১৫০ পুদ ওজনের বাজরার ময়দা বের করে নিতে সক্ষম হলুম আমরা। বৈষয়িক উপাদানের 'সঞ্চয়' বলতে আমাদের সম্বল দাঁড়াল মাত্র ওইটুকু।

কিন্তু বৈষয়িক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমার আদর্শ লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে তার যতটুকু বাস্তবে আমাদের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয়েছিল তার তুলনা করলুম যখন, তখন বুঝলুম আমি যদি ওর এক শো গুণ বেশি সাফল্যও অর্জন করতুম তাহলেও আমার স্বনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা থেকে ঠিক অতখানিই পিছিয়ে থাকতুম। অতএব যা অবশ্যম্ভাবী তাকে মেনে নিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলুম, আমাদের সাংগঠনিক পর্যায় শেষ হল। কালিনা ইভানভিচের চিন্তাধারাও অবশ্য আমারই মতো ছিল।

ও বলল, 'এখানে কীই-বা পাওয়ার আশা করতে পারি, কও দেখি? ওই পরগাছারা তো সিগ্রেট-লাইটার বাদে কিছুই তৈয়ার করে না! প্রথমে তো অরা জমি-টমি সব পতিত কইরা ফেলাল, আর তারপর আমাদেরে কয় কিনা 'সংগঠন' গড়তে। ওই ইলিয়া মুরমেত্স যেমন করছিল-না, আমাদেরও অমনধারা করন লাগবে...'

'ইলিয়া মুরমেত্স?'

'হ-হ, ওই ইলিয়া মুরমেত্স... শোনো নাই বুঝি তার কথা? তারে — পালোয়ানডারে — অরা সবাই মিলি বীর বানায়েছিল, যত্তো সব পরগাছার দঙ্গল। কিন্তু আমি জানি বেটা ছিল এক্কেবারে ভবঘুরে — নিষ্কম্মার ধাড়ি। গরমকালে বেটা শ্লেজগাড়ি চড়ি ঘুইরা বেড়াইত।'

'ঠিক আছে, তাহলে, আমরাও মুরমেত্সের মতো হব। বলা যায় না, আমরা আরও খারাপ কাজ করতে পারি। কিন্তু তাহলে রাহাজান সলভিইটা হবে কে?'

'ভাবনার কিছু নাই, অমন লোকেরও অভাব ঘইটব না...'

অতঃপর কলোনিতে এসে হাজির হলেন জনা দুই শিক্ষিকা — একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না এবং লিদিয়া পেত্রোভ্না। শিক্ষক-শিক্ষিকা পাওয়ার ব্যাপারে ওই সময়ে আমি প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলুম। কারণ, মনে হচ্ছিল, আমাদের ওই জঙ্গলে এসে নতুন মানুষ গড়ার দায়িত্ব নিতে কেউই বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন না। আমাদের 'ভবঘুরেদের' সম্পর্কে আতঙ্ক তো

ছিলই, তাছাড়া আমাদের পরিকল্পনা-যে সফল হবে সে-ব্যাপারেও কারো আস্থা ছিল না। অতঃপর হঠাৎ একদিন পল্লী-অঞ্চলের স্কুল-শিক্ষকদের এক সম্মেলনে আমার বাকপটুতা ফলিয়ে মানুষেকে আকর্ষণের অক্লান্ত চেষ্টার ফল ফলল অবশেষে। দু-জন সত্যিকার জীবন্ত মানুষ সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। সেই দু-জনই ছিলেন মহিলা, আর এতে আমি খুশিই হলুম। কারণ, আমার মনে হচ্ছিল, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ করে তুলতে ঠিক ওই 'মনের উন্নতিসূচক মেয়েলি হাতের ছোঁয়া' টুকুরই তখন দরকার ছিল।

লিদিয়া প্রেত্রোভ্‌না ছিল অত্যন্ত অল্পবয়সী, প্রায় ইশ্‌কুলের ছাত্রী বললেই চলে। হাই স্কুল থেকে তখন সবেমাত্র পাশ করে বেরিয়েছিল সে, সবেমাত্র মায়ের আঁচল ছেড়ে বাইরে এসেছিল। জেলা জনশিক্ষা-দপ্তর-প্রধান মেয়েটির চাকরির নিয়োগপত্রে সই দিতে গিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন:

'এ-মেয়েরে লিয়ে কী করবে তুমি? এ তো এক্কেবারে অর্বাচীন।'

'এমন মেয়েই খুঁজছিলুম। জানেন, সময়-সময় আমার মনে হয়, আজকের দিনে পুঁথিগত বিদ্যেটা মোটেই বড় কথা নয়। আমাদের এই লিদচ্‌কা মেয়েটি এক্কেবারে নির্মল একটি বাচ্চা-বিশেষ। একধরনের রোগপ্রতিষেধক টিকে বলেই মনে করি ওকে।'

'এটু বেশি কষ্টকল্পনা হয়ে যাচ্চে নাকি? ঠিক আছে, বেশ...'

অপরপক্ষে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না ছিলেন একেবারে পাকাপোক্ত শিক্ষিকা। লিদচ্‌কার চেয়ে তিনি-যে বয়সে খুব বেশি বড় ছিলেন তা নয়, তবু শিশু যেমন মা-কে জড়িয়ে থাকে লিদচ্‌কাও ছিল তেমনি তাঁর আঁচল-ধরা। একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার গাম্ভীর্য-মাখানো সুন্দর মুখখানায় ছিল প্রায়-পুরুষালি, সরলরেখার মতো একজোড়া কালো ভ্রূ। সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন তিনি, কী এক অলৌকিক কৌশলে যেন পোশাক-আশাক পরিচ্ছন্ন রাখতেন। ও'র সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর কালিনা ইভানভিচ সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছিল:

'এমনে মাইয়ার সাথে বুঝ্যাশুন্যা চলবার লাগে দ্যাখতাছি...'

অতঃপর আসল কাজ শুরু করার মতো অবস্থায় এলুম আমরা।

চৌঠা ডিসেম্বর তারিখে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণে থাকার জন্যে প্রথম ছ-টি ছেলে এসে উপস্থিত হল কলোনিতে। সঙ্গে এল পাঁচটা প্রকাণ্ড

সিলমোহর-লাগানো আজগবি রকমের ঢাউস একটা প্যাকেট। এই প্যাকেটে ছিল ওই সব ছেলের পূর্ব-জীবনের কাহিনী-সংবলিত 'নথিপত্র'। দেখা গেল, ওদের চার জনকে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সিঁদেল চুরির অপরাধে। ওই চার জন ছিল প্রায় আঠারো বছর বয়সের। অপর দু-জন ছিল এদের চেয়ে অল্প একটু ছোট। তারা ধরা পড়েছিল চুরির দায়ে। এই নতুন আগন্তুকদের পরনে ছিল অতি চমৎকার সব পোশাক-পরিচ্ছদ, সবচেয়ে কেতাদুরস্ত ঘোড়সওয়ারের আঁটো পাত্‌লুন আর ঘোড়সওয়ার সৈনিকরা যে-ধরনের জুতো পায়ে দেয় সেই ধরনের বুটজুতো। চুলও আঁচড়েছিল ওরা সবচেয়ে ফ্যাশনদুরস্ত কায়দায়। ছেলেগুলো নিছক রাস্তার বাউণ্ডুলে-মার্কা ছিল না। ওদের নাম ছিল, জাদোরভ, বুরুন, ভোলখভ, বেন্‌দিউক, গুত্‌ আর তারানেত্‌স।

যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে ওদের আমরা অভ্যর্থনা জানালুম। সেদিন সারা সকালটা কাটল এই আনন্দোৎসবের ভোজের আয়োজনে। রাঁধুনি-মেয়ে চুল বেঁধে নিল ঝলমলে শাদা ফিতে দিয়ে। বড় এজমালি শোবার ঘরে খাটগুলোর মাঝখানে যে-জায়গাটা ফাঁকা ছিল সেখানে ভোজের টেবিল পাতা হল। আমাদের টেব্‌লক্লথ ছিল না, তবে আনকোরা নতুন একাধিক বিছানার চাদর দিয়ে সে-অভাব ভালোভাবেই পূরণ করা গেল। আমাদের জায়মান উপনিবেশের সব ক-জন সদস্য সেদিন জড় হলুম ভোজের টেবিলে। এই বিশেষ উপলক্ষের মর্যাদা রাখতে কালিনা ইভানভিচও তার রীতিমাফিক ছোপধরা পাঁশুটে-রঙের কোট না-পরে এসে উপস্থিত হল সবুজ মখমলের জ্যাকেট গায়ে চড়িয়ে।

ভোজের আসরে নতুন শ্রমনির্ভর জীবন, অতীতকে ভুলে-যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আর সর্বদা সামনে এগিয়ে চলার ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললুম। নতুন আগন্তুকরা অবশ্য আমার কথায় মনোযোগ দিল যৎসামান্য। তারা কেবল নিজেদের মধ্যে কানাকানি করতে লাগল আর ছেঁড়া-গদিওয়ালা ক্যাম্প-খাটের সারি আর রঙ না-করা দরজা-জানলার দিকে অবজ্ঞা ও বিদ্রূপের দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে লাগল। আমার বক্তৃতার মাঝখানেই জাদোরভ এক সময়ে হঠাৎ গলা চড়িয়ে অপর একটি ছেলেকে বলল:

'তোরই জন্যে আমাদের এই ঝামেলায় পড়তে হয়েছে!'

ওই দিনটার বাকি সময় আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের রূপরেখার ছক

তৈরি করতে কাটিয়ে দিলুম। নবাগতরা অবশ্য আমার সবকিছু প্রস্তাব নীরব ঔদাসীন্যে গলাধঃকরণ করল। মনে হল, ব্যাপারটা কখন চুকবে তারই জন্যে তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

আর তারপর, পরদিন সকালবেলাতেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে লিদিয়া পেত্রোভ্‌না এসে আমার কাছে নালিশ জানালে:

'সত্যি, ওদের সামলাতে পারছি না! হ্রদ থেকে জল আনতে বললুম, তা ওদের একজন — ওই-যে, খুব কেয়ারি-করে চুল-আঁচড়ানো যে-ছেলেটির — সে বুটজুতো ধরে সজোরে টানাটানি করতে-করতে একেবারে আমার মুখের কাছে লাথি ছুড়ল। আবার বলে কিনা: 'দেখছেন, মুচি-ব্যাটা জুতোজোড়া কীরকম আঁটো করে তৈরি করেছে!''

প্রথম কয়েক দিন ওরা এমন কি রূঢ় ব্যবহার পর্যন্ত করলে না, কেবল আমাদের উপেক্ষা করে চলতে লাগল। সন্ধে লাগলেই ওরা এদিক-ওদিক রোঁদে বেরিয়ে পড়ত, ফিরত সকালবেলা। আর বিচক্ষণের মতো অল্প হেসে আমার যত করুণ উপরোধ-অনুযোগ সব এড়িয়ে যেত। আর তারপর, মাত্র এক সপ্তাহ পরে, জেলা অপরাধ-তদন্ত দপ্তরের এক গোয়েন্দার হাতে বেন্‌দিউক গ্রেপ্তার হল তার আগের রাত্রে একটা জায়গায় খুন ও ডাকাতি করার অভিযোগে। এ-ঘটনায় আতঙ্কে লিদচ্‌কার তো বুদ্ধিসাধ্যি লোপ পাওয়ার উপক্রম হল। প্রাণভরে কাঁদবে বলে সে তার ঘরের মধ্যে সেঁধল। আর মাঝে-মাঝে বাইরে বেরিয়ে হাতের কাছে যাকে পেল তাকেই শুধোতে লাগল:

'আচ্ছা, এর মানে কী? আমি তো কিছুই বুঝছি না! ও এমনিই বাইরে বেরুল আর একজনকে খুন করে বসল? ..'

অপরদিকে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না গম্ভীর স্মিত হেসে ভ্রু কুঁচকিয়ে বললেন:

'আমি জানি না, আন্তন সেমিওনভিচ, আমি সত্যিই জানি না... আমাদের বোধহয় এ-সব ছেড়েছুড়ে চলে যাওয়াই ভালো... এ-ব্যাপারে কীভাবে এগনো উচিত তা বুঝতে পারছি বলে মনে হচ্ছে না...'

সত্যি বলতে কি, কলোনির চারপাশ ঘিরে সেই নির্জন অরণ্য, আমাদের কোঠাবাড়িগুলোর হা-হা শূন্যতা, আমাদের গোটা বারো ক্যাম্প-খাট, হাতিয়ার বলতে যা ছিল আমাদের প্রায়-একমাত্র সম্বল সেই একখানা কুড়ুল

আর একটা কোদাল, আর সেই আধ-ডজনখানেক ছেলে — শুধু আমাদের শিক্ষাদান-পদ্ধতিরই নয়, মানবিক সংস্কৃতির নীতিগুলিরই ছিল যারা ঘোর বিরোধী, তারা — এই সবকিছু ছিল আমাদের প্রত্যেকের ইশ্‌কুল-সংক্রান্ত সব রকম পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে যতদূর পৃথক হতে হয় তা-ই।

কলোনিতে শীতের দীর্ঘ সন্ধ্যাগুলো হয়ে দাঁড়াল গা-ছমছমে, ভুতুড়ে। আলোর রোশনাই যোগাত একমাত্র দুটো তেলের বাতি — তার একটা জ্বলত ছেলেদের এজমালি শোবার ঘরে, আরেকটা আমার ঘরে। শিক্ষিকাদের আর কালিনা ইভানভিচের কপালে জুটল আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই চিরকেলে ব্যবস্থা — চায়ের পিরিচে তেলে-ভাসানো একটা করে পল্‌তে। আমার ঘরের বাতিটার কাচের ওপরটা ছিল ভাঙা আর নিচের অংশটা সব সময়ে ঝুলকালিতে মাখামাখি হয়ে থাকত। এটা ঘটত কালিনা ইভানভিচের জন্যে, কারণ তামাকের পাইপ ধরাতে লম্ফর চিমনির মধ্যে প্রায় আধখানা খবরের কাগজ গুঁজে আগুন নেয়া ছিল তার অভ্যেস।

সে-বছর তুষার-ঝড় কিছুটা আগেই শুরু হল। কলোনি-বাড়িগুলোর মধ্যেকার উঠোনটা শিগ্‌গিরই ভরে গেল হাওয়ায়-ওড়া তুষারে। দেখা গেল, সেই তুষার সরিয়ে চলাচলের পথ পরিষ্কার করা কেউ আর কাজ বলে গণ্য করছে না। ছেলেদের ডেকে আমি কাজটা করতে বললুম, কিন্তু জাদোরভ বললে:

'কাজটা সহজ অবিশ্যি, কিন্তু শীতটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, কারণ রাস্তা পরিষ্কার করব আমরা আর আবার তো বরফ জমবে, বুঝলেন-না?'

স্বর্গীয় সৌন্দর্যে-ভরা একটুখানি হাসি বিলিয়ে সে এক বন্ধুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, ভাবখানা এমন করলে যেন আমি-যে ওখানে আছি তা সে জানেই না। যে-কেউ এক-নজর ঠাহর করলেই বুঝতে পারত, জাদোরভ ছিল শিক্ষিত বাপ-মায়ের সন্তান। ও কথা বলতে জানত সঠিকভাবে। আর ওর মুখে এমন একটা প্রাণবন্ত মার্জিত ভাব দেখা যেত যা একমাত্র যারা সযত্নলালিত শৈশব কাটিয়ে এসেছে তাদের মুখেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ভোলখভ ছিল সম্পূর্ণ অন্য স্তর থেকে উদ্ভূত। ওর মস্ত বড় হাঁ-মুখ, চ্যাটালো নাক, দূর-সন্নিবিষ্ট দুটো চোখ ও ফোলাফোলা, অস্থির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ — সব মিলিয়ে চেহারাটা ছিল অবিকল রাস্তার গুণ্ডার মতো।

সব সময়ে ও যেমন ভঙ্গিতে চলত তেমনই ঘোড়সওয়ারের আঁটো পাত্‌লুনের দুই পকেটে হাতদুটো অনেকখানি ডুবিয়ে ভোলখভ পায়ে-পায়ে আমার কাছে এগিয়ে এল, তারপর টেনে-টেনে চিবিয়ে-চিবিয়ে বললে:

'কেমন, মুখের মতো জবাব মিলল তো...'

ওদের এজমালি শোবার ঘরটা থেকে আমি বেরিয়ে এলুম। রাগে বুকের ভেতরটায় তখন শক্ত দলা পাকিয়ে উঠেছে। কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও রাস্তা পরিষ্কার করা দরকার ছিল, আর আবশ্যিক ছিল কাজের মধ্যে দিয়ে আমার অবদমিত ক্রোধের মুক্তিদান। কালিনা ইভানভিচকে খুঁজে বের করে বললুম:

'চলুন, আপনি আর আমি বরফ পরিষ্কার করি গিয়ে।'

'কী? মাটিকাটা মজুরের কাম করনের ল্যেগে আসছি নাকি এখানে? আর ওই ছ্যামরারা?' লম্বা শোবার ঘরটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ও বলল, 'ওই ডাকাইতগুলান?'

'ওরা করতে রাজি নয়!'

'যত্তো সব পরগাছার দল! চল, যাই তাইলে!'

কালিনা ইভানভিচ আর আমি প্রথম রাস্তাটা প্রায় পরিষ্কার করে ফেলেছি এমন সময় দেখা গেল ভোলখভ আর তারানেত্‌স ওই রাস্তা ধরে বেগে তাদের দৈনন্দিন কৃত্য রাত্তিরের রোঁদে শহরমুখো বেরোচ্ছে।

'সাবাস!' তারানেত্‌স খুশিভরা গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

'কাজটা করার সময়ও হইছিল বটে,' ফোড়ন কাটল ভোলখভ।

কালিনা ইভানভিচ হঠাৎ ওদের রাস্তা আটকে দাঁড়াল।

''সাবাস' মানে? মানে কী ইয়ার? তরা বজ্জাতের ধাড়িরা কাম করবার চাস না, আর ভাবছস আমি তদের হয়্যা কাম কইরা দিমু, অ্যাঁ! এই রাস্তা পায়ে পাড়া দিবি না কইয়া দিলাম! পরগাছার দল যত সব! যা-যা, বরফের মধ্যি দিয়া যা, নাইলে কোদালের এক বাড়ি দিয়া মাথা ভাইঙা থুমু...'

কোদালটা সজোরে ঘোরাতে থাকল কালিনা ইভানভিচ। কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখা গেল কোদাল উড়ে দূরের একটা তুষারস্তূপে গিয়ে পড়েছে আর ওর তামাকের পাইপটা উলটেপালটে গিয়ে পড়েছে আরেক দিকে। আর হতভম্ব কালিনা ইভানভিচ নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে চোখ পিটপিট করতে করতে তাকিয়ে আছে ছেলে দুটোর গমনপথের দিকে।

হো-হো করে হাসতে-হাসতে চলে যাওয়ার সময় ছেলে দুটো চেঁচিয়ে বলে গেল, 'যান, নিজি গিয়্যে কোদাল বয়্যে আনেন!'

'আমি চললাম, যদি না যাই তো কী কইলাম! এইখানে আর কিছুতে কাম করুম না আমি!' বলে, কোদালটা সেই তুষারস্তূপের ওপর ফেলে রেখেই, নিজের ঘরে চলে গেল কালিনা ইভানভিচ।

কলোনির জীবন ক্রমশ হতাশাচ্ছন্ন ও ভয়ংকর হয়ে উঠল। রাতের পর রাত খার্কভ রোড থেকে 'বাঁচাও!' বাঁচাও!' চিৎকার শোনা যেতে লাগল। সর্বস্বান্ত গ্রামবাসীরা সব সময়ে এসে দীন, করুণ সুরে সাহায্য ভিক্ষা করতে লাগলেন।

আমাদের নিজেদের রাহাজানদের হাত থেকে পথচারীকে রক্ষার জন্যে আমি নিজেই জেলা জনশিক্ষা-দপ্তর-প্রধানের কাছ থেকে একটা রিভলবার যোগাড় করলুম, অবশ্য কলোনির তৎকালীন অবস্থা তাঁর কাছ থেকে গোপন রেখেই। তখনও কিন্তু আমার রক্ষণাধীন ছেলেদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার ভরসা ত্যাগ করি নি।

কলোনির অস্তিত্বের এই প্রথম ক'টা মাস যেমন আমার ও আমার সহকর্মীদের পক্ষে ছিল হতাশা ও পণ্ডশ্রমের কাল, তেমনই আবার এটা ছিল সোৎসাহ গবেষণারও সময়। ১৯২০ সালের সেই শীতকালে শিক্ষাদান বিষয়ে আমি যত বই পড়ে ফেলেছিলুম তার আগের সারা জীবনে অত বই কখনও পড়ি নি।

সময়টা ছিল তখন ভ্রাঙ্গেল ও পোলিশ যুদ্ধের কাল। ভ্রাঙ্গেল এসে গিয়েছিল খুব কাছে, নভমির্গরদের ঠিক বাইরে সে থানা দিয়ে ছিল; আর আমাদের খুবই কাছে চেরকাস্সিতে পেঁছে গিয়েছিল পোলিশ-বাহিনী। এদিকে সারা ইউক্রেন জুড়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল 'আতামান' বা কশাক-সেনানীরা, আর আমাদের আশেপাশেই অনেকে তখনও পেত্লিউরার নীল-হলদে যাদুতে মোহিত হচ্ছিল। তবু সেই জনহীন প্রান্তরে হাতে থুতনি ঠেকিয়ে, বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে আমরা চেষ্টা করছিলুম এই সব সাংঘাতিক ঘটনার হট্টগোলকে আড়াল করে রাখতে আর শিক্ষাদান-সংক্রান্ত বিজ্ঞানের পাঠে ডুবে থাকতে।

এই সব পুঁথিপাঠের প্রধান ফল যা দাঁড়াল তা হল আমার এই স্পষ্ট, দৃঢ়মূল ধারণাটা গড়ে ওঠা যে বিজ্ঞান বা তত্ত্বকথার দিক থেকে পুঁথিপত্র

থেকে খুব সামান্যই সাহায্য পেয়েছি আমি, বরং দৈনন্দিন জীবনে যা ঘটে চলেছে সেই সব বাস্তব ঘটনার মোট যোগফলের ওপর ভিত্তি করেই আমাকে নিজস্ব তত্ত্ব নিঙড়ে বের করতে হবে। প্রথমেই আমি অনুভব করলুম — বোঝার চেয়ে অনুভবই করলুম বলা উচিত -- যে আমার দরকার কতগুলো বিমূর্ত সূত্র নয় (কারণ, বলা বাহুল্য, ওই সব সূত্র বাস্তবে প্রয়োগ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না), দরকার আসল পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ ও সেই বিশ্লেষণ অনুযায়ী সঙ্গে-সঙ্গে কাজ করা।

আমি ভালোই জানতুম আমাকে দ্রুত কাজ করতে হবে, একটা দিনও নষ্ট করার মতো সময় নেই হাতে। কলোনিটা দিনকে-দিন ক্রমেই চোর আর খুনেদের আস্তানার মতো হয়ে উঠছিল। শিক্ষিকাদের প্রতি ছেলেদের মনোভাব দ্রুত অভ্যস্ত ঔদ্ধত্য ও খোলাখুলি গুণ্ডামির রূপ নিচ্ছিল। ইতিমধ্যেই শিক্ষিকা মহিলাদের সামনে তারা নোংরা গল্প বলাবলি করছিল, খাওয়ার সময় খাবার চাইছিল রূঢ় ভাষায়, খাবার ঘরে কথায়-কথায় প্লেট ছুড়ে ফেলছিল, ছুরি নিয়ে চাকু-চালানো খেলা খেলছিল আর ইয়ার্কি করে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের খোঁজখবর নিচ্ছিল আর ব্যঙ্গ করে বলছিল:

'বলা তো যায় না... কখন কোন্‌টা কার কাজে লেগ্যে যেতি পারে।'

আগুন জ্বালানোর জন্যে কাঠ চেলা করতে সরাসরি অস্বীকার করে বসল ওরা। উলটে একদিন কালিনা ইভানভিচের নাকের সামনেই একটা গুদামঘরেব কাঠের ছাদ খোশ-মেজাজে. নিছক ঠাট্টার ছলে ভেঙে চেলা করে ফেলল। তারপর খুশিভরা গলায় চেঁচিয়ে বলল:

'আমাদের জীবন'ভর এতে চলি যাবে!'

তামাকের পাইপ থেকে চারিদিকে আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে কালিনা ইভানভিচ হতাশার ভঙ্গিতে হাতদুটো ওপর দিকে ছুড়ে দিল। চেঁচিয়ে বলল:

'এয়াদের সাথে কথা কইয়া লাভ কী, পরগাছার দল যত সব! অপরে যা গড়তেছে তারে ভাঙ্গার বুদ্ধি দিল কে এয়াদের? এই পরগাছাগুলার বাপ-মায়েদের ফাটকে পোরা উচিত...'

আর তারপর একদিন ঝড় উঠল। শিক্ষাদান প্রয়োগ-পদ্ধতির আঁটো-করে-বাঁধা দড়ির ওপর দিয়ে সন্তর্পণে হাঁটতে-হাঁটতে আচমকা একদিন পা ফসকাল আমার।

এক শীতের সকালে আমি জাদোরভকে বললুম রান্নাঘরের উনোনের জন্যে কিছু কাঠ চেলা করে আনতে। যথারীতি খোশ-মেজাজী উদ্ধত জবাবও মিলল:

'তুমি নিজেই আনো-না! তোমরা তো গাদাখানেক লোক রয়েছ এখানে!'

এই প্রথম ছেলেদের একজন এতখানি অসম্মান দেখিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলল।

একেই গত কয়েক মাসের নানা অভিজ্ঞতায় চরম তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছিলুম তার ওপর এই কথায় রাগে, ঘৃণায় জ্ঞানহারা হয়ে হাত তুলে জাদোরভের মুখে সরাসরি একটা ঘুসি বসিয়ে দিলুম। এত জোরে মারলুম ওকে যে পা টলে গিয়ে ও উলটে পড়ল চুল্লীর গায়ে। কলার চেপে ধরে মাটি থেকে প্রায় তুলে ফেলে আবার মারলুম ওকে। তারপর তৃতীয়বার ফের মারলুম।

অবাক হয়ে দেখলুম, ছেলেটা একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। মড়ার মতো শাদা হয়ে গিয়ে কাঁপা-কাঁপা হাতে টুপিটা মাথা থেকে বারবার খুলছে আর পরছে। আমি হয়তো ওকে আরও মেরে চলতুম যদি-না ও 'আন্তন সেমিওনভিচ, মাপ চাইছি' বলে গোঙাতে শুরু করত।

উন্মত্তের মতো এমন লাগাছেঁড়া রাগ আমাকে পেয়ে বসেছিল তখন যে কেউ বাধা দিয়ে বা আপত্তি করে একটি কথা বললেও আমি পুরো দলটাকেই মারতে, একেবারে খুন করে ফেলতে, ডাকাতের দলটাকে দুনিয়া থেকে মুছে দিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতুম। চুল্লী-খোঁচানোর একটা লোহার ডাণ্ডা কী করে যেন আমার হাতে এসে গিয়েছিল। দলের অপর পাঁচ জন হতবাক হয়ে বিছানাগুলোর পাশে জড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বুরুনকে নার্ভাস হয়ে পরনের জামাকাপড় ঠিক করতে দেখা গেল।

ওদের দিকে ফিরে চুল্লী-খোঁচানোর ডাণ্ডাটা দিয়ে একটা খাটের পায়ায় সজোরে ঘা দিলুম।

'হয় এই মুহূর্তে সকলে বনে কাঠ কাটতে যাও, আর নয়তো কলোনি ছেড়ে চলে যাও, জাহান্নমে যাও সবাই!'

কথাটা বলে ঘর ছেড়ে চলে এলুম আমি।

যে-গুদামঘরে আমাদের যন্ত্রপাতি থাকত সেখানে গিয়ে একটা কুড়ুল তুলে নিলুম। তারপর কড়া চোখে দেখতে লাগলুম, ছেলের দল আমার কিছু

পিছু এসে নিজেদের পছন্দমতো কুড়ুল আর করাত বেছে নিল। একবার মনে হল, ওই দিন কাঠ কাটতে ছেলেদের হাতে কুড়ুল না-দিলেই বোধহয় ভালো হোত। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গিয়েছিল: ছেলেরা তাদের দরকারমতো সবকিছু নিয়ে ফেলেছিল। তার আর কোনো চারা ছিল না। তবে আমি তখন সহ্যের শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছি, সবকিছুর জন্যে তখন আমি প্রস্তুত। কেবল মনে-মনে ঠিক করেছি যে নিজের জীবনটা সহজে বিকিয়ে দেব না। তাছাড়া আমার পকেটে সেই রিভলবারটাও ছিল।

জঙ্গলের দিকে রওনা দিলুম। পেছন থেকে এসে কালিনা ইভানভিচ অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে আমার কানে-কানে বললে:

'ব্যাপারখানা কী, কও দেখি? ভগমান জানে, এয়ারা হঠাৎ এমনধারা বশ হয়্যা পড়ল যে?'

বনদেবতা প্যানের নীল চোখের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে জবাব দিলুম:

'ব্যাপার মন্দ, বুড়ো দাদা... জীবনে এই প্রথম আমি মানুষের গায়ে হাত তুলেছি।'

'ভগমানের দোহাই,' কালিনা ইভানভিচ বলে উঠল, 'উয়ারা যদি এখন নালিশ করে, তাইলে?'

'সেটাই কি সব...'

কিন্তু অবাক হয়ে দেখলুম সবকিছুই সহজে, বিনা বাধায় হয়ে গেল। দুপুরের খাওয়ার সময় পর্যন্ত ছেলেদের সঙ্গে আমি কাজ করে চললুম। যে-পাইনগাছগুলো বেশি বেঁটে সেগুলো কাটলুম। গোড়ার দিকে ছেলেরা একটু মুখ গোমড়া করে ছিল, কিন্তু বরফের মতো কনকনে চন্‌মনে হাওয়া, তুষারের ঝলমলে মুকুট-মাথায় পাইনগাছ আর মিলিত শ্রমের ফলে মঞ্জাত সাথীত্ব কুড়ুল আর করাতের ছন্দের সঙ্গে তালে-তালে মিশে মন্ত্রের মতো কাজ করল।

যখন বিরতির সময় হল তখন সবাই আমাব যত্নে-জমানো তামাকের এগিয়ে-দেয়া থলির মধ্যে লাজুক-লাজুক ভাব করে হাত পুরে দিল। পাইনগাছগুলোর মাথার দিকে মুখ করে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জাদোরভ হঠাৎ হেসে উঠল:

'জিনিসটা ভালোই হয়েছে! হোঃ-হোঃ-হোঃ!..'

ওর গোলাপি, হাসিমাখা মুখের দিকে তাকিয়ে ভারি ভালো লাগল। আমিও না-হেসে পারলুম না।

বললুম, 'কী? কাঠ-কাটার কাজ?'

'কাঠ-কাটার কাজ ভালোই। আমি বলছিলাম, আপনি যেভাবে আমায় মারলেন সেই কথা!'

ও ছিল শক্তসমর্থ, লম্বা-চওড়া টগবগে ছেলে। অমন মার খেয়ে ওর পক্ষেই হাসা সম্ভব ছিল। অমন একজন হারকিউলিস-সদৃশ ছেলের গায়ে হাত তুলতে সাহস করেছি ভেবে আমার নিজেরই অবাক লাগল।

আবার খুব একচোট হেসে নিয়ে কুড়ুলটা কুড়িয়ে জাদোরভ একটা গাছের কাছে গেল:

'কী রসিকতা! হোঃ-হোঃ-হোঃ!..'

সবাই মিলে একত্রে বসে দুপুরের খাওয়া সারলুম। পেয়েও ছিল চন্‌মনে খিদে। পরস্পর হাসি-তামাশা করতে-করতে খাওয়া গেল। ভুলেও কেউ সকালের ঘটনার কথা উল্লেখ করল না। আমি তখনও কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করছিলুম। তবু ঠিক করলুম, কর্তৃত্বের রাশ আলগা দিলে চলবে না। খাওয়াদাওয়ার পর আমি দৃঢ়ভাবে হুকুম জারি করতে লাগলুম। শুনে ভোলখভ দাঁত বের করে হাসতে লাগল। কিন্তু জাদোরভ আমার কাছে এগিয়ে এসে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে:

'আমরা সত্যিই এত খারাপ ছেলে নই, আন্তন সেমিওনভিচ! এবার সব ঠিক হয়ে যাবে! আমরা বুঝতে পেরেছি...'

## ৩

## আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির বর্ণনা

এর পরদিন আমি ছেলেদের বললুম:

'তোমাদের এজমালি শোবার ঘরটা পরিষ্কার রাখতেই হবে! ওই ঘরের জন্যে তোমাদের মধ্যে থেকে একজনকে সর্দার বা মনিটর ঠিক কর। আর একমাত্র আমার অনুমতি নিয়েই তোমরা শহরে যেতে পার। অনুমতি না-

নিয়ে যদি কেউ যায় তাহলে তার আর ফিরে না-আসলেও চলবে, কারণ আমি তাকে আর এখানে ঢুকতে দেব না।'

'দেখেন,' ভোলখভ বলে উঠল, 'আমাদের কি আরেকটু কম কর্যে জব্দ করলি চলত না?'

আমি বলল্ম, 'ছেলেরা, তোমরা কী করবে তা নিজেরাই ঠিক করতে পার। আমি এই পর্যন্তই স্যোগস্বিধে দিতে পারি! কলোনিতে শৃঙ্খলা রাখতেই হবে। এ যদি তোমাদের পছন্দ না-হয় তবে তোমরা গিয়ে অন্য কোনো জায়গা বেছে নিতে পার। কিন্তু যারা থাকবে তাদের আইনশৃঙ্খলা মেনে চলতেই হবে। আমরা কিছ্তেই এখানে একটা চোরের আস্তানা গড়ে তুলতে রাজি নই, তা সে তোমরা যা-ই ভাবো না কেন।'

'হাতখানা দিন!' আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে জাদোরভ বললে, 'ঠিক বলেছেন আপনি! ভোলখভ, তুই চুপ কর্ দেখি! এ-সব ব্যাপারে তুই একদম গাড়ল। যাই হোক, আমাদের এখানে কিছ্দিন থাকতে হবে। আর এ-জায়গাটা জেলখানার চেয়ে ভালো, নয় কি?'

'ইশ্কুলে যাওয়াটাও বাধ্যতাম্লক নাকি?' ভোলখভ প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু আমি যদি ল্যাখাপড়া না শির্খতি চাই?.. তাইলে ইশ্কুলে গিয়ে লাভ কী?..'

'ইশ্কুলে যাওয়াটা বাধ্যতাম্লক। পছন্দ কর আর না-কর ইশ্কুল করতেই হবে। এইমাত্র জাদোরভ তোমাকে গাড়ল বলল। তা, লেখাপড়া শিখে একটু চালাক-চতুর হও-না।'

মজার ভঙ্গি করে ভোলখভ মাথা নাড়ল। বলল:

'দার্ণ প্যাঁচে পড়্যে গিইচি এবার!'

জাদোরভকে নিয়ে আগের ঘটনাটা শৃঙ্খলারক্ষার ব্যাপারে একটা পরিবর্তনের দিকচিহ্ন হিসেবে দেখা দিল। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে ও-ঘটনার জন্যে আমি বিবেকের কোনো দংশন অন্ভব করি নি। এটা ঠিকই যে আমি আমার এক ছাত্রকে মেরেছিল্ম। শিক্ষাদানের ব্যাপারে কাজটার অশোভনতা, আমার আচরণের বে-আইনী দিকটা সম্পর্কে আমার অন্ভূতি যেমন তীব্র ছিল, তেমনই একই সঙ্গে আমি এটাও ব্ঝেছিল্ম যে আমার তাৎক্ষণিক কর্তব্যের কাছে আমাদের শিক্ষক-জনোচিত বিবেককে

কিছুটা দাবিয়ে রাখতে হবে। মনকে শক্ত করে আমি সিদ্ধান্ত নিলুম, যদি অন্য সব পদ্ধতি বিফল হয় তাহলে স্বৈরশাসন চালাব। এর অল্প কিছুদিন বাদেই ভোলখভের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে আসতে হল আমাকে। মনিটর হওয়া সত্ত্বেও ও এজমালি শোবার ঘরটা পরিষ্কার করছিল না, এমন কি এজন্যে ধমক খাওয়া সত্ত্বেও তা পরিষ্কার করতে রাজি হচ্ছিল না।

'আমাকে চরম ব্যবস্থা নিতে বাধ্য কোরো না,' কড়া চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললুম, 'ঘর সাফ কর!'

'না-করল্যে কী, ঘুসি মার‍্যে আমার চোখ ফাটায়ে দিবেন, তাই না? আপনার তা করার অধিকার নাই!..'

শার্টের কলার চেপে ধরে টেনে ওকে আমার দিকে আনলুম, তারপর পুরোপুরি আন্তরিকতার সঙ্গে ওর মুখের ওপর হিস্‌হিস করে বললুম:

'শোনো! আমি তোমায় ভালোরকম সাবধান করে দিচ্ছি! ঘুসি মেরে তোমার চোখ ফাটাব না, জীবনের মতো দেগে ছেড়ে দেব তোমায়! তারপর তোমার ইচ্ছে হয় গিয়ে আমার নামে নালিশ করতে পার। আর যদি এজন্যে আমায় জেলও খাটতে হয় তাতেই-বা কী, তা নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না।'

আমার মুঠো থেকে এঁকেবেঁকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ভোলখভ, তারপর নাকিসুরে বলল:

'এই সামান্যি কারণে জেলে যাওয়ার কোনো মানে হয়। ঠিক আছে, ঘর সাফ করব'খন, চুলায় যাও তুমি!'

'খবরদার, আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বোলো না!' গর্জন করে বললুম।

'ঠিক আছে, কেমনভাবে কথা কইলে খুশি হবেন বলেন? তেরি...'

'বল, বল! কী দিব্যি গালতে চাইছ...'

ব্যাপারটা বুঝে উঠতে-না পারার ভঙ্গি করে হঠাৎ ও সজোরে হেসে উঠল। বলল:

'কী লোক রে বাবা... ঠিক আছে, ঘর সাফ করব আমি, আর ধমকাতি হবে না!'

এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে শারীরিক বলপ্রয়োগের মধ্যে দিয়ে আইনশৃঙ্খলা কায়েম করার একটা তোফা উপায় আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি এ-চিন্তা এক মুহূর্তের জন্যেও আমার মনে স্থান পেয়েছিল।

জাদোরভকে জড়িয়ে যে-ব্যাপারটা ঘটেছিল তার জন্যে জাদোরভের যত কষ্ট হয়েছিল তার চেয়ে আমার কষ্ট হয়েছিল বেশি। সব সময়ে তখন আমি ভয়ে-ভয়ে থাকতুম পাছে এই সহজতম পথ অবলম্বনের অভ্যেসটা আমাকে পেয়ে বসে। লিদিয়া পেত্রোভ্‌না তো খোলাখুলি কঠোরভাবে আমাকে সমালোচনা করল। সেই দিন বিকেলে হাতের ওপর থুতনির ভর রেখে সে বলেছিল:

'অবশেষে এই একটা উপায় আপনি আবিষ্কার করলেন? সেকেলে ধর্মীয় ইশ্‌কুলগুলোয় যেমন করে থাকে তেমনই? তাই না?'

'ওসব কথা বাদ দাও, লিদচ্‌কা!'

'না, সত্যি! আমরা কি তাহলে ওদের মারধর করব? আমিও তাই করব তো? নাকি ওটা শুধু আপনার একচেটে ব্যাপার?'

'কিছুদিন পরে তোমাকে এর উত্তর দেব, লিদচ্‌কা। কী করতে হবে এখন আমি নিজেই তা জানি না। একটু সময় দাও আমায়।'

'ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করে থাকব।'

অপরদিকে, ওই ঘটনার পরে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না কয়েক দিন ভুরু কুঁচকে মুখ ভার করে রইলেন, আর আমার সঙ্গে একটু দূরত্ব বজায় রেখে নিছক ভদ্রতাসূচক কথাবার্তা বলতে লাগলেন। তারপর দিন পাঁচেক কেটে যাওয়ার পর তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর্যভরা হাসি নিয়ে আমায় প্রশ্ন করলেন:

'তারপর, এখন কেমন বোধ করছেন?'

'ধন্যবাদ! আমি বেশ আছি।'

'এই ঘটনার সবচেয়ে দুঃখের দিকটা কী, জানেন?'

'দুঃখের দিক?'

'হ্যাঁ। তা হল, ছেলেরা আপনার বীরপনা নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করছে। ওরা তো প্রায় আপনার প্রেমে পড়ে গেছে বলতে গেলে, বিশেষ করে জাদোরভ। কিন্তু এর মানে কী — বুঝছি না। এটা কি দাস-মনোভাবের অভ্যেস থেকে আসছে?'

উত্তর দেয়ার আগে কিছুক্ষণ ভাবলুম। তারপর বললুম:

'না। এটা তা নয়। দাস-মনোভাবের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটা নিশ্চয়ই অন্য কিছু। ব্যাপারটা আরেকটু গভীরভাবে ভেবে দেখা যাক:

যতই যাই হোক, জাদোরভ আমার চেয়ে বেশি শক্তি রাখে। এক ঘুসিতে সেদিন ও আমাকে পঙ্গু করে দিতে পারত। তাছাড়া ওর ভয়ডর বলে কিছু নেই, বুরুন আর বাকি সকলের চেয়ে কোনো অংশে ও কম সাহসী নয়। এই পুরো ব্যাপারটায় ওরা-যে মারের কথাটা মনে রেখেছে তা নয়, ওরা মনে করে রেখেছে একটা মানুষের প্রচণ্ড আবেগ, প্রবল ক্রোধকে। ওরা ভালোই জানে, সেদিন গায়ে হাত তোলার দরকার ছিল না আমার, অনায়াসে জাদোরভকে সংশোধনের অযোগ্য বলে কমিশনের কাছে আমি ফেরত পাঠাতে পারতুম, আর নানাভাবে বাকি সকলের জীবন দুর্বিষহ করে তুলতে পারতুম। কিন্তু আমি এ-সব কিছুই করলুম না, উলটো এমন একটা পথ বেছে নিলুম যা আমার নিজের পক্ষেই বিপজ্জনক ছিল। তবু এই শেষের পথটা ছিল মানবোচিত, আমলাতান্ত্রিক নয়। তাছাড়া, যতই যাই হোক, আমাদের এই কলোনিতে থাকা ওদের সত্যিই দরকার। এছাড়া অন্য কোনো কিছু করা ওদের পক্ষেও অত সহজ নয়। আর ওরা তো দেখছে আমরা ওদের জন্যে কী রকম কাজ করছি। ওরাও তো মানুষ বটে। আর এটাই সবচেয়ে বড় কথা।'

'আপনি যা বলছেন হয়তো ঠিকই,' চিন্তিতভাবে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না বললেন।

কিন্তু সময়টা দার্শনিক গবেষণার উপযোগী ছিল না। এর এক সপ্তাহ পরে, ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে গাড়ি নিয়ে শহরে যেতে হল আমাকে। ফিরলুম সত্যিকার টেনা-পরা জনা পনেরো সত্যিকার বেওয়ারিস পথের বাচ্চা নিয়ে। কাজেই, এই নবাগতদের ধুয়েমুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, কোনোরকমে তাদের পোশাক-আশাক যোগানো, ওষুধ দিয়ে তাদের খোস-চুলকনা সারানো — এই সব একগাদা কাজ এসে পড়ল ঘাড়ে। মার্চ মাস লাগাদ আমাদের কলোনির বাসিন্দা দাঁড়াল ত্রিশটি ছেলে। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল সামাজিক অবহেলার সাংঘাতিক মূর্তিমান উদাহরণ, এই দুর্দম বন্য প্রাণীরা কোনোমতেই সামাজিক ও শিক্ষাগত আদর্শ পূরণের উপযোগী ও আশা জাগানোর মতো মালমশলা ছিল না। যে-সৃষ্টিক্ষমতা শিশুর মানসিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াকে বিজ্ঞানীর মননক্রিয়ার এত নিকটবর্তী করে তোলে বলে সর্বত্র বলা হয়, তখনও পর্যন্ত ওই ছেলেদের সেই সৃষ্টিশক্তি থেকে সম্পূর্ণ বর্জিত বলেই মনে হচ্ছিল।

আমাদের কলোনিতে শিক্ষকেরও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটল। মার্চ মাসের মধ্যে

আমাদের একটা নিয়মিত শিক্ষক-পরিষদ গড়ে উঠল বলা চলে। নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকা ইভান ইভানভিচ ওসিপভ ও তাঁর স্ত্রী নাতালিয়া মার্কভনা সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়ে সঙ্গে করে বেশ কিছু কৌচ, চেয়ার, রান্নাঘরের আলমারি এবং নানাধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ ও ডিশ, ইত্যাদি একগাদা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ে এলেন। ওসিপভদের ঘরের দরজার কাছে এই সব মালপত্র যখন নামানো হল আমাদের রক্ষণাধীন অল্পস্বল্প পোশাক-পরা বাচ্চারা তখন গভীর কৌতূহল নিয়ে তা দেখতে লাগল।

বলা বাহুল্য, এই আগ্রহ মোটেই নিছক মানসিক ব্যাপার ছিল না; জিনিসপত্রের এই বিপুল সমারোহ শিগ্‌গিরই বাজারের দোকানগুলোয় স্থানান্তরিত হতে পারে এই ভেবে আমি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লুম। এর এক সপ্তাহ পরে কলোনির গৃহস্থালির এক তত্ত্বাবধায়িকা এসে হাজির হওয়ায় ওসিপভদের সম্পত্তি সম্পর্কে অত্যধিক কৌতূহলের লক্ষ্যবিন্দু গেল বদলে। এই শেষোক্ত মহিলা কর্মচারিটি ছিলেন অত্যন্ত ভালোমানুষ, বাক্যবাগীশ, সরলমনা এক বৃদ্ধা। ওসিপভদের মতো অত দামি জিনিসপত্রের অধিকারিণী না-হলেও এঁর সম্পত্তির তালিকায় খুবই আকর্ষণীয় কিছু-কিছু পদার্থ ছিল। যেমন, প্রচুর পরিমাণে ময়দা, জ্যামে-ঠাসা কয়েকটা বয়াম ও অন্যান্য খাদ্যবস্তু, বেশ কিছু ছিমছাম ছোট-ছোট বাক্স আর কয়েকটা থলে। বাইরে থেকে এই থলেগুলোর আকার-আয়তন দেখে সেগুলো-যে নানাধরনের ভালো-ভালো জিনিসে ঠাসা তা আমাদের ছেলেদের সুশিক্ষিত চোখ সহজেই ধরে ফেলল।

দেখতে-দেখতে তত্ত্বাবধায়িকা তাঁর ঘরখানি ভারি সুন্দর করে গুছিয়ে ফেললেন, বৃদ্ধা মহিলাদের যা রীতি সেই অনুযায়ী। তাঁর ছোটখাট থলে, ব্যাগ, বাক্স ইত্যাদি ঘরের কোণে-কোণে ও তাকগুলোয় এমনভাবে সাজিয়ে ফেললেন যে দেখে মনে হল ওই কোণ আর তাকগুলো যেন ওই সব জিনিসপত্রের জন্যেই নিরবধি কাল অপেক্ষা করে ছিল। দেখতে-দেখতে কিছু ছেলের সঙ্গে তাঁর রীতিমতো ভাবও জমে উঠল। এই বন্ধুত্বের ভিত্তি ছিল পারস্পরিক আদানপ্রদান: ছেলেরা ওঁকে যোগাত রান্নার কাঠ, ওঁর সামভারে জল ভরে দিত আর আগুন জেবলে দিত, বিনিময়ে উনি মাঝে-মাঝে দু-এক কাপ চা-সহযোগে বিচিত্র সাংসারিক জ্ঞান বিতরণ করে তুষ্ট রাখতেন ওদের। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের কলোনিতে তত্ত্বাবধায়িকার করবার মতো

কোনো কাজ ছিল না। ও'কে-যে কেন ওখানে বহাল করা হল, এ-কথা ভেবে আমি অনেক সময় অবাক হতুম।

এটা নিশ্চিত যে আমাদের কলোনিতে তত্ত্বাবধায়িকার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অবিশ্বাস্যরকমের গরিব ছিলুম আমরা।

শিক্ষক ও কর্মচারিরা যে-অল্প কয়েকখানা ঘরে থাকতেন সেগুলো বাদে সারা বাড়িটার মধ্যে আমরা মাত্র দুটো গোলমতো লোহার চুল্লীসহ একখানা প্রকাণ্ড এজমালি শোবার ঘর মেরামত করে বাসোপযোগী করে নিতে পেরেছিলুম। এই ঘরখানায় ছিল গোটা তিরিশেক ক্যাম্প-খাট আর খান তিনেক টেব্‌ল, যাতে ছেলেরা খাওয়াদাওয়া সারত আবার পড়াশুনোও করত। এছাড়া আরও একটা বড় এজমালি শোবার ঘর, একটা খাওয়ার ঘর, দুটো ক্লাসরুম আর একটা অফিস-ঘর তখনও মেরামতের অপেক্ষায় ছিল।

আমাদের ছিল গড়ে দেড়খানা করে বদলি বিছানার চাদর। তাছাড়া আর কোনো চাদর ইত্যাদির নামগন্ধ ছিল না। আর পরনের জামাকাপড়ের সঙ্গে আমাদের — বলতে গেলে প্রায় একমাত্র — যোগাযোগ ছিল জনশিক্ষা-দপ্তর ও অন্যান্য সরকারি দপ্তরের কাছে আমাদের অন্তহীন আবেদন-নিবেদন মারফত।

জেলা জনশিক্ষা-দপ্তরের সেই প্রধান, যিনি অত আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমাদের কলোনির জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি অপর একটা কাজে ইতিমধ্যে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। আর যিনি তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন তাঁর হাতে অন্য আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকায় আমাদের ব্যাপারে তিনি সামান্যই আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন।

জেলা জনশিক্ষা-দপ্তরের আবহাওয়া আমাদের সমৃদ্ধির স্বপ্ন পূরণের মোটেই অনুকূল ছিল না। ওই সময়ে জেলা জনশিক্ষা-দপ্তর বলতে ছিল একগাদা ছোটবড় ঘরের সমষ্টি আর নানাধরনের মানুষজন, কিন্তু ওরই মধ্যে শিক্ষাদানের ব্যাপারে সত্যিকার সৃষ্টিশীল বিভাগীয় অংশগুলো আবার ঘর কিংবা মানুষের সমষ্টিও ছিল না, ছিল কয়েকখানা টেবিলের সমষ্টি মাত্র। নড়বড়ে, ছালবাকলা-ওঠা, একদিন যেগুলো লাল বা কালো রঙের লেখার টেবিল, ড্রেসিং টেবিল কিংবা তাসখেলার টেবিল ছিল এমন সব ডেস্‌কো আর তাদের ঘিরে একই রকম নানা জাতের চেয়ার — এই নিয়ে ছিল পূর্বোক্ত সব বিভাগীয় অংশ। প্রতিটি টেবিলের ওপর দেয়ালে লটকানো নোটিশ থেকে

বিভাগগুলোর পরিচয় পাওয়া যেত। আর এই টেবিলগুলোর বেশির ভাগই ফাঁকা পড়ে থাকত, কারণ যে-কোনো টেবিলের দখলদার মানুষ-অংশটি শুধু-যে তাঁর নিজ বিভাগীয় প্রধানই হতেন তাই নয়, তিনি একই সঙ্গে অপর কোনো জেলা-দপ্তরে হয় হিসাব-রক্ষক নয়তো অন্য কোনো পদে নিযুক্ত থাকতেন। যদি কখনও এই ধরনের কোনো মনুষ্যমূর্তিকে দৈবাৎ কোনো একটা টেবিলের ধারে আবির্ভূত হতে দেখা যেত, তাহলে অপেক্ষমান লোকজনেরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে তাঁর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত। তারপরে যে-কথাবার্তার লেনদেন চলত তা সীমাবদ্ধ থাকত নিছক জিজ্ঞাসাবাদে; যেমন, ওইটাই সেই সঠিক বিভাগ কিনা, নাকি অপর কোনো বিভাগের কাছে দরখাস্ত পেশ করতে হবে, আর তা যদি হয় তো কেন তা করতে হবে, কোথায়ই-বা করতে হবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিংবা, এটাই যদি সেই সঠিক বিভাগ না-হয় তাহলে গত শনিবার যে-কমরেডটি এই টেবিলে বসে ছিলেন তিনি বললেন কেন যে এটাই সঠিক বিভাগ? এই সব প্রশ্নের উত্তর ও টীকা-ব্যাখ্যা সাফল্যের সঙ্গে দেবার পর বিভাগীয় প্রধানটি দ্রুত টেবিল থেকে নোঙর তুলে ফেলতেন আর অদৃশ্য হয়ে যেতেন উল্কাবেগে।

ফলত, এ-টেবিল ও-টেবিলে ঠোক্কর খেয়ে ঘুরে-ঘুরে কোনো লাভ হল না। আর এর ফলে, ১৯২১ সালের শীতকালে আমাদের কলোনির চেহারাটা ঠিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বা তার ধারকাছ ঘেঁষে ছিল না। ছেলেরা খালি-গা কোনোরকমে ঢেকে থাকত ছেঁড়াখোঁড়া তুলোভরা জ্যাকেট পরে; ওই জ্যাকেটের নিচে শতচ্ছিন্ন শার্টের টুকরো-অবশেষ কদাচিৎ নজরে পড়ত। অত ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরে ছেলেদের যে-প্রথম দলটা এসেছিল, অন্যদের থেকে তাদের পোশাকের বৈশিষ্ট্যও বেশিদিন বজায় রইল না: কাঠ-কাটা, রান্নাঘরের কাজ, ধোপাখানার কাজ, শিক্ষা-সংক্রান্ত এবং এই সমস্ত কাজের মিলিত ফল ছেলেদের জামাকাপড়ের ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়াল বিপর্যয়কর। মার্চ মাসের মধ্যে আমাদের ছেলেদের সাজ-পোশাকের হাল এমন হল যে দারগমিজস্কির 'মৎস্যকন্যা' গীতিনাট্যে ফসলপেষাইওয়ালার ভূমিকায় অভিনয়কারী যে-কোনো অভিনেতার তারা ঈর্ষার পাত্র হতে পারত।

ওদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকেরই পায়ে তখন বুটজুতো ছিল, বেশির ভাগই কাপড়ের পটি পায়ে জড়িয়ে দড়ি দিয়ে তা বেঁধে রাখত। এমন কি পা ঢাকার এই আদিম আস্তরণেরও ঘাটতি দেখা দিয়েছিল।

যে-খাবার আমরা খেতুম তাকে বলা হোত, ‘কন্‌দিওর’*। অন্য ধরনের খাদ্যবস্তু পাওয়ার ওপর ভরসা রাখা যেত না। সেকালের দিনে খাদ্যবস্তুর নানা জাতের র‍্যাশন বা বাঁধা বরাদ্দ মিলত, যেমন, স্বাভাবিক র‍্যাশন, বর্ধিত হারে র‍্যাশন, দুর্বলস্বাস্থ্য ব্যক্তিদের জন্যে র‍্যাশন, স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিদের জন্যে র‍্যাশন, মানসিক দিক থেকে ‘বিকলাঙ্গ’ শিশুদের জন্যে র‍্যাশন, স্বাস্থ্যনিবাসের জন্যে বরাদ্দ র‍্যাশন, হাসপাতালের জন্যে বরাদ্দ র‍্যাশন, ইত্যাদি। আর, নানাভাবে, কখনও অত্যন্ত সূক্ষ্ম কূটনীতির পরিচয় দিয়ে, কখনও স্রেফ ভিক্ষে চেয়ে, কখনও রীতিমতো রণকৌশল অবলম্বন করে, কখনও-বা আমাদের হতদরিদ্র অবস্থা দেখিয়ে, এমন কি কলোনির ছেলেদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়ার ভয় আছে এমন ইঙ্গিত করেও আমরা নানা ছলচাতুরি খাটিয়ে মাঝেসাঝে স্বাস্থ্যনিবাসের জন্যে বরাদ্দ র‍্যাশন কিংবা অন্য কোনো ধরনের বর্ধিত হারের র‍্যাশনের সুবিধে আদায় করে নিতুম। এই শেষোক্ত ধরনের খাবারের র‍্যাশনে জাঁক দেখিয়ে দুধ, প্রচুর পরিমাণে চর্বি ও শাদা রুটির বরাদ্দ থাকত। অবশ্য আমাদের বরাতে ওসব কিছুই জুটত না, তবে আমরা কিছুদিন কালো রুটি ও তুষ বা খোসা-ছাড়ানো জইয়ের অতিরিক্ত বরাদ্দ পেয়েছিলুম। তবে প্রায় প্রতিমাসেই মাঝেসাঝে আমাদের রণনীতির পরাজয় ঘটত, ফলে আবার কিছু দিন সাধারণ মানুষের পর্যায়ে অধঃপতিত হতুম। আর তারপর আবার, ফিরেফিরতি, আমাদের সেই প্রকাশ্য বা গোপন কূটনীতির জটিল জাল-বোনা শুরু করতে হোত। কখনও-কখনও দারুণ চাপাচাপির ফলে আমরা এমন কি মাংস, আগুনে-সেঁকা মাছ আর মিছরির বরাদ্দ পর্যন্ত পেয়ে যেতুম, কিন্তু এটা সহ্য করা আরও কষ্টকর হয়ে উঠত যখন পরে আমরা জানতে পারতুম যে নৈতিক নয় একমাত্র মানসিক দিক থেকে খুঁতওয়ালা লোকেরাই নাকি ওই ধরনের বিলাসিতা ভোগ করার অধিকারী।

সঠিকভাবে যাকে শিক্ষা-বিভাগের চৌহদ্দি বলা চলে মাঝেসাঝে তার সীমানা লঙ্ঘন করে আমরা সোজা গিয়ে হানা দিতুম — হয় খাদ্য-সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত জেলা-দপ্তরে কিংবা প্রথম সংরক্ষিত সেনাবাহিনীর খাদ্য-সরবরাহ দপ্তরে, আর নয়তো অপর কোনো ওই ধরনের কমবেশি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দরবারে। জনশিক্ষা-দপ্তর অবশ্য এই ধরনের নিয়ম-বহির্ভূত পদ্ধতি গ্রহণ

* জোয়ারের দানা দিয়ে তৈরি একরকম পাতলা লপ্‌সি। — অনুঃ

করার ব্যাপারে গ্রুতর আপত্তি জানাত, তাই এই যত্রতত্র হানা দেয়ার কাজটা আমাদের সারতে হোত গোপনেই।

এভাবে হানা দেয়ার সময় অস্ত্র হিসেবে আমাদের কেবল সঙ্গে করে এক টুকরো কাগজ নিয়ে যেতে হোত। সেই কাগজে অত্যন্ত সরল অথচ তাৎপর্যপূর্ণ এই সম্পূর্ণ মনগড়া কথা কটা লেখা থাকত:

'অল্পবয়সী অপরাধীদের এই কলোনি বাসিন্দাদের খাওয়ার জন্যে এক শো পুদ বাজরার ময়দা প্রার্থনা করছে।'

কলোনিতে অবশ্য 'অপরাধী'-র মতো শব্দ আমরা কখনও ব্যবহার করতুম না, আমাদের কলোনির নামের সঙ্গেও ও-রকম বিশেষণ কোনোদিন যুক্ত ছিল না। সে-সময়ে আমাদের উপনিবেশ পরিচিত ছিল কেবল 'নৈতিক দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ' এই নামেই। কিন্তু বাইরের দপ্তরগুলোর কাছে দরবার করতে হলে ওপরের ওই নামে কাজ চলত না, কারণ ওর সঙ্গে শিক্ষা-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সম্পর্কের ব্যাপারটা ছিল বড় বেশি স্পষ্ট।

যাই হোক, ওই ধরনের কাগজরূপ অস্ত্র হাতে নিয়ে উপযুক্ত কোনো দপ্তরের প্রধান অফিস-ঘরের ঠিক দোরগোড়াটিতে বারান্দায় আমি অপেক্ষা করে থাকতুম। ওই দরজা দিয়ে অবিরাম দর্শনার্থীর স্রোত বয়ে চলত। কখনও-কখনও অফিস-ঘর এমন লোকে-লোকাকীর্ণ থাকত যে যে-কেউ ইচ্ছে করলেই ভেতরে সেঁধিয়ে যেতে পারত। আর তারপর, একবার ভেতরে ঢুকতে পারলে, তখন শুধু কনুইয়ের গুঁতো মেরে-মেরে ভিড় ঠেলে টেবিলে-বসা কর্মচারির দিকে এগিয়ে যাওয়া আর একসময় নিঃশব্দে নিজের হাতের কাগজখানি তাঁর হাতে গুঁজে দেয়ার যা-কিছু ওয়াস্তা।

খাদ্য-সরবরাহ দপ্তরগুলোর প্রধানরা সাধারণত শিক্ষাবিভাগ-সংক্রান্ত জটিলতার ধার বড় একটা ধারতেন না, তাই প্রায়ই তাঁরা 'অল্পবয়স্ক অপরাধী' ও শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যেকার সম্পর্কটি ধরতে পারতেন না। তদুপরি, 'অল্পবয়স্ক অপরাধী' এই শব্দ দুটি তাঁদের মনে আবেগের যে-অভিঘাত সৃষ্টি করত তার মাত্রাও ছিল বিলক্ষণ প্রবল। এ-কারণে কোনো কর্মকর্তা-যে আমাদের দিকে কড়াচোখে তাকিয়ে বলবেন, 'এখানে এস্যেছেন ক্যানে? আপনেদের জনশিক্ষা-দপ্তরে দরখাস্ত দিন গে যান,' তার অবকাশ ছিল খুবই কম।

বরং, উলটে, ব্যাপারটা প্রায়ই যা ঘটত তা এই রকম: বেশ কিছু

ভাবনাচিন্তার পর কর্মকর্তাটি একের-পর-এক এই ধরনের প্রশ্ন করতেন। যথা:

'আপনেদের খাবার যোগানোর কথা কাদের — জেল-কর্তৃপক্ষের?'

জবাব: 'আজ্ঞে, না। জেল-কর্তৃপক্ষ আমাদের খাবারের যোগান দেন না। আমাদের ছেলেরা নাবালক কিনা, তাই...'

প্রশ্ন: 'তাইলে খাবার যোগায় কে?'

জবাব: 'আজ্ঞে, যোগান দেয়ার ব্যাপারটা এখনও ঠিক গড়ে ওঠে নি...'

প্রশ্ন: 'এখনও ঠিক গড়ে ওঠে নাই' মানে?.. এ তো অদ্ভুত কথা বলতেছেন আপনে?'

প্রশ্নোত্তরের এই পর্যায়ে কর্মকর্তাটি তাঁর লেখার প্যাডে কিছু লিখে রেখে আমাদের বলতেন এক সপ্তাহ পরে এসে আবার দেখা করতে।

আমি বলতুম, 'তাহলে, আপাতত কাজ চালানোর মতো বিশ পুদ ময়দা যদি দিতে পারেন তো ভালো হয়।'

'বিশ পুদ দিতি পারি না — আপাতত পাঁচ পুদ পেতি পারেন। যত শিঘ্রি পারি ব্যাপারটা আমি তদন্ত কর্যে দেখব'খন।'

স্বভাবতই, এই পাঁচ পুদ প্রয়োজনের তুলনায় কমই হোত, আর তাছাড়া কথাবার্তাও এমন দিকে মোড় নিত যার সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনার মোটেই মিল থাকত না। বলা বাহুল্য, সে-পরিকল্পনায় কোনো ধরনের তদন্তের কোনো স্থান ছিল না।

এই ধরনের সাক্ষাৎকারের একমাত্র সেই ফলাফলই গোর্কি কলোনির কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল যাতে কর্মকর্তাটি অসুবিধাজনক কোনো জিজ্ঞাসাবাদ না করে নিঃশব্দে আমাদের দরখাস্তের কাগজখানি নিয়ে তার এক কোণে এই একটিমাত্র ছোট্ট বাক্য লিখে দেবেন: 'অনুমোদন করা হল'।

ব্যাপারটা যখন এই রকম ঘটত, আমি তখন প্রাণপণে কলোনিমুখো দৌড় লাগাতুম:

'কালিনা ইভানভিচ!.. হুকুম পাওয়া গেছে!.. এক শো পুদ! শিগ্‌গির যাও, ওরা খোঁজখবর নেয়ার আগেই চট্ করে কিছু লোক নিয়ে গিয়ে ময়দাটা নিয়ে এস...'

আর শুনেই আনন্দে ডগমগ হয়ে কাগজখানার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত কালিনা ইভানভিচ:

'এক শত পুদ? কও কি তুমি!.. কোথা থেইক্যা আইল?'

'আরে, দেখছ না? জেলা আইন-দপ্তরের জেলা খাদ্য-সরবরাহ দপ্তর থেকে...'

'এ-সকলের মানে কী?.. দূর হোক গিয়া — কোথা থেইক্যা আসতাছে তা লইয়া আমাগো মাথাব্যথা কিসের, হা-হা-হা!..'

খাদ্য মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনের ব্যাপার। সে-কারণে জামাকাপড়ের পরিস্থিতি আমাদের কাছে খাদ্য-সমস্যার মতো অতটা হতাশাব্যঞ্জক ছিল না। আমাদের রক্ষণাধীন ছেলেরা সারাক্ষণই ক্ষুধার্ত হয়ে থাকত, আর এর ফলে তাদের নৈতিক পুনঃশিক্ষাদানের সমস্যা বেশ কিছু পরিমাণে জটিলতর হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তারা খুব সামান্য পরিমাণেই নিজেদের ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে সক্ষম হোত।

ছেলেদের ব্যক্তিগত খাদ্য-উৎপাদন শিল্পের অন্যতম প্রধান ছিল, মাছ-ধরা। শীতকালে এটা বেশ পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার ছিল। মাছ-ধরার সবচেয়ে সহজ উপায় ছিল, গ্রামের মানুষজন কাছাকাছি নদীতে কিংবা আমাদের হ্রদে যে 'ইয়াতেরি' (চারকোণা পিরামিডের আকারের একরকম মাছ-ধরা জাল) পাততেন তা-ই লুট করা। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে মানবচরিত্রে নিহিত যে-এক ধরনের সাধারণ বোধ কাজ করে সে-অনুযায়ী ছেলেরা গোটা জালগুলো লুট করা থেকে কিছুকাল বিরত রইল। কিন্তু ওদের মধ্যে একজন জীবনের এই সবসেরা নীতিটিও একদিন লঙ্ঘন করে বসল।

ছেলেদের মধ্যে সেই একজন হল তারানেত্স। বহুকালের বনেদী চোরের এক পরিবারের ছেলে ছিল সে। বছর ষোলো বয়স, ছিপছিপে গড়ন, মুখে বসন্তের দাগ। ভারি হাসিখুশি আর চালাকচতুর। তারানেত্স ছিল চমৎকার সংগঠক আর ভারি উদ্যমী ছেলে, কিন্তু যৌথ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের প্রতি তার লেশমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। কয়েকখানা 'ইয়াতেরি' জাল নদী থেকে চুরি করে সে কলোনিতে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ওই জালগুলোর মালিকরা ওর পিছু-পিছু এসে হাজির হয়ে গেল, আর তারপর গোটা ব্যাপারটা নিয়ে বেধে গেল সাংঘাতিক হৈ-হট্টগোল। এ-ঘটনার পরে স্থানীয় কৃষকরা তাঁদের জালের ওপর কড়া নজর রাখতে লাগলেন, ফলে আমাদের শৌখিন জেলেরা মাছ লুট করার আর প্রায় কোনো সুযোগই পেত না। এর অল্প কিছুদিন পরেই অবশ্য

তারানেত্‌স ও অপর কয়েকটি ছেলে তাদের নিজস্ব কয়েকখানা জাল সংগ্রহ করে ফেলল। শোনা গেল, 'শহরের কোন্ এক' রহস্যময় 'বন্ধু' নাকি ওই জালগুলো ওদের উপহার দিয়েছে। তারপর শিগ্‌গিরই ওই সব জালের সাহায্যে আমাদের মাছের চাষ দিব্যি ফুলেফেঁপে উঠল। প্রথম দিকে মাছটা অল্প কয়েকজন বিশেষ সুবিধাভোগীর ভোজ্য হিসেবে রইল, কিন্তু তারপর, শীতের শেষদিকে, তারানেত্‌স একদিন নেহাত হঠকারিতার বশে আমাকেও ওই বাছাই লোকদের সারিতে ঠাঁই দিয়ে বসল।

একদিন এক প্লেট মাছ-ভাজা নিয়ে ও আমার ঘরে এল।

'আপনার জন্যি কিছু মাছ এন্যেছি।'

'তাই তো দেখছি, তবে ও-মাছ আমি খাব না।'

'ক্যানে?'

'কারণ, কাজটা তাহলে ঠিক হবে না। কলোনির প্রত্যেকেরই মাছ পাওয়া উচিত।'

শুনে তারানেত্‌স রাগে লাল হয়ে উঠল।

'ওরা পাবে ক্যানে? জাল যোগাড় করলাম আমি, মাছ ধরলাম আমি, কষ্ট কর্যে নদীর জলে ভিজলাম আমি, আর এখন কিনা সকলের সাথে আমারে মাছ ভাগাভাগি করতি হবে?'

'ঠিক আছে। তোমার মাছ নিয়ে যাও, বাপু। কারণ, আমিও তো জাল যোগাড় করি নি কিংবা নদীতে নামি নি।'

'কিন্তু আমি আপনারে উপহার দিত্যেছি...'

'সে উপহার আমি নিতে রাজি নই। এই সমস্ত ব্যাপারটাই আমার পছন্দ হয় নি। এর মধ্যে কোথাও একটা অন্যায় কিছু আছে।'

'কী অন্যায়?'

'বলছি কী অন্যায়: তুমি তো জালগুলো কেনো নি, তাই না? তুমি বলছ কেউ তোমাকে ওগুলো দিয়েছে?'

'হ্যাঁ, তাই!'

'কিন্তু ওগুলো ঠিক কাকে দেয়া হয়েছে? শুধুই তোমাকে? না, সারা কলোনিকে?'

'কী বলতি চান — 'সারা কলোনিকে' মানে? ওগুলা আমারেই দেয়া হয়্যেছে...'

'কিন্তু আমি মনে করি ওই জালগুলো আমার জন্যে, আমাদের সকলের জন্যে। কার ফ্রাইং প্যান তুমি ব্যবহার করছ? তোমার নিজের? না — সকলের! আর যে-সূর্যমুখীর তেল রাঁধুনির কাছ থেকে তুমি ফুসলে বের করে নিয়েছ — সেটাই-বা কার বলে মনে কর তুমি? নিশ্চয়ই সেটা সকলের! তাছাড়া, রান্নার কাঠ, উনোন, মাছ-ভাজা রাখার পাত্তর — এ-সবই-বা কার? বল, এখন তোমার কী বলার আছে? এখন আমি যদি তোমার 'ইয়াতেরি'-গুলো বাজেয়াপ্ত করে নিই, ব্যস, তাহলেই সব ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু এ-ব্যাপারে তোমার অ-কমরেডসুলভ মনোভাবটাই সবচেয়ে খারাপ। জালগুলো যদি তোমার হয়ই তাতে কী — কমরেডদের কথাও ভাবতে হবে বৈ কি তোমাকে। মাছ তো যে-কেউই ধরতে পারে।'

'ঠিক আছে,' তারানেত্স বলল, 'আপনে যা বলতেছেন তা-ই হবে। কিন্তু মাছটা অন্তত আপনে খান!'

মাছ খেলুম। আর ওই দিন থেকে পালা করে প্রত্যেকে মাছ ধরতে লাগল আর ধরার পর মাছ বারোয়ারি রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিতে লাগল।

খাদ্য-সংগ্রহের অপর একটা বে-সরকারি উপায় ছিল বাজারে যাওয়া। প্রতিদিন কালিনা ইভানভিচ আমাদের 'খোকাবাবু' বা কির্‌গিজ-ঘোড়াটাকে গাড়িতে জুতে রওনা দিত খাবারদাবার সংগ্রহ করতে, কিংবা খাদ্যের হদিশ মেলে এমন সব দপ্তরে হানা দিতে। আর, নিজেদের দরকারেই শহরে যেতে চায় এমন দু-তিনটি ছেলে হয়তো হাসপাতালে চিকিৎসা করানো দরকার, কিংবা কোনো একটা কমিশনের সামনে হাজিরা দিতে হবে এমনিধারা যুক্তি দেখিয়ে ওর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে ঝুলোঝুলি করত, দরকারমতো 'খোকাবাবু'র লাগাম ধরে ওকে সাহায্য করবে এমন ভরসাও দিত। এই সব ভাগ্যবান ছেলে তারপর ভরা পেট নিয়ে শহর থেকে ফিরত এবং কমরেডদের জন্যে সাধারণত কিছু-না-কিছু ভালোমন্দ জিনিস সঙ্গে করে আনত। বাজারে গিয়ে কেউ কোনো কারণে ধরা পড়েছে এমন একটিও ঘটনা ঘটে নি। এই সব অভিযানের ফলে সংগৃহীত জিনিসপত্র কীভাবে পাওয়া গেল তার একটা আইনসম্মত ব্যাখ্যাও মিলত সব সময়ে। যথা, 'আমার মাসি এটা আমায় দিয়েছে', 'এক বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল', এই সব। আমি অবশ্য হীন সন্দেহ প্রকাশ করে কলোনির কোনো সদস্যকে অপমান করার চেষ্টা করতুম না, বরং সব সময়েই ওই সব ব্যাখ্যাকে সন্তোষজনক মেনে নিয়ে গ্রহণ করতুম। আর,

তাছাড়া, অবিশ্বাস করেই-বা লাভ কী ছিল? খিদেয়-আধমরা, হন্যে-হয়ে-খাবার-খোঁজা, চারিদিক-হাঁটকে-বেড়ানো ওই সব ছেলেপিলেকে বাজারের স্টল থেকে একখানা 'বুব্‌লিক' * কিংবা একজোড়া জুতোর সুকতলা ছিনিয়ে নেয়ার মতো তুচ্ছ প্ররোচনার কারণে কোনোরকম নীতিকথা শোনানোর উপযোগী উপাদান বলে সেদিন আমার মনে হয় নি।

আমাদের তৎকালীন সেই অবর্ণনীয় দারিদ্র্য — পরবর্তীকালে যার অস্তিত্ব ছিল না — তার একটা ভালো দিকও ছিল: প্রত্যেকে আমরা — তা সে কি ডিরেক্টর, কি শিক্ষক-শিক্ষিকা আর কি ছাত্র সকলেই — ছিলুম একই রকম ক্ষুধার্ত আর অভাবী। সে-সময়ে আমাদের মাইনের টাকাকড়ির দামও ছিল যৎসামান্য, তাই সকলকে একই জঘন্য 'কন্‌দিওর' গলাধঃকরণ করতে হোত এবং প্রায় একই রকম শতচ্ছিন্ন পোশাকে ঘুরে বেড়াতে হোত। সারা শীত জুড়ে সেবার আমার বুটজোড়ায় কার্যত কোনো সুকতলা ছিল না, আর সারাক্ষণই জুতোর ফাঁক দিয়ে আমার পায়ে-জড়ানো পটি থাকত বেরিয়ে। এ-ব্যাপারে আমাদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন কেবল নিখুঁতভাবে বুরুশ-করা, সযত্নরক্ষিত পোশাক-পরা একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না।

## ৪

## গৃহ-রণাঙ্গনের ক্রিয়াকলাপ

ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন একটা টানা-দেরাজ থেকে আমার ছ-মাসের মাইনের সমান এক বাণ্ডিল নোট গেল উধাও হয়ে।

সে-সময়ে আমার ঘরখানা ছিল একাধারে অফিস, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বসবার ঘর, খাজাঞ্চিখানা আর মাস-মাইনে বিলি করার ঘর। কারণ, আমাকে একাই উপরোক্ত কাজগুলো করতে হোত। চাবিবন্ধ একটা টানা থেকে করকরে ব্যাঙ্কনোটগুলো উধাও হয়ে গেল, অথচ টানার চাবি ভাঙার বিন্দুমাত্র কোনো চিহ্ন ছিল না।

ওই দিন সন্ধেবেলাতেই খবরটা ছেলেদের জানালুম। চুরির কোনো প্রমাণ হাতে নেই, অতএব খুব সহজেই তহবিল তছরুপের দায়ে আমাকে অভিযুক্ত

* 'বুব্‌লিক' — মালার আকারের মাখা-ময়দার বিস্কুটবিশেষ। — অনুঃ

করা যেতে পারে, এই কথা বলে টাকাটা ফেরত চাইলুম। গম্ভীরভাবে চুপচাপ কথাগুলো শুনে গেল ছেলেরা, তারপর যে-যার কাজে চলে গেল। আলোচনার শেষে দালানের একপ্রান্তে আমার ঘরে যাওয়ার পথে অন্ধকার উঠোনে দুটি ছেলে আমায় পাকড়াও করল। তাদের একজন তারানেত্‌স, অপর জন ছোটখাট-চেহারার চট্‌পটে একটি ছেলে, নাম গুত্‌।

'টাকা কে নিয়েছে আমরা জানি,' তারানেত্‌স ফিস্‌ফিস করে বলল, 'কিন্তু সকলের সামনি তা বলা চলে না; টাকাটা কোথায় লুকানো আছে তা অবিশ্যি জানি না। আমরা গোয়েন্দাগিরি করলি ছোঁড়া নিঘ্‌ঘাত টাকা নিয়ি লম্বা দিবে।'

'কিন্তু, ছেলেটা কে?'

'ওই-যে ওই ছোঁড়া...' তারানেত্‌স কথাটা শুরু করতেই গুত্‌ অমনি ওর দিকে চোখ ঘোঁজ করে তাকাল। স্পষ্টত বোঝা গেল, তারানেত্‌স নামটা বলুক এতে ওর সায় নেই। বিড়বিড় করে বলল:

'অত কথায় দরকার কী? ছেলেটারে আচ্ছা করি ঘা-কতক লাগালিই তো হয়...'

'বলি, মারবেটা কে শুনি?' মুখে-মুখে জবাব দিল তারানেত্‌স। 'তুই? এক ঘুসিতে তাইলে তোরে হাঁটুভাঙা-দ বানায়ে ছাড়বে'খন!..'

বললুম, 'তাহলে ছেলেটা কে বলই-না। আমি নিজে তার সঙ্গে কথা বলব'খন।'

'না, তাতে কাজ হবে না!'

বোঝা গেল, ষড়্‌যন্ত্রমূলক গোপনতা-রক্ষার জন্যে কোমর বেঁধেছে তারানেত্‌স।

'ঠিক আছে, বলতে হবে না,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললুম।

তারপর নিজের ঘরে শুতে চলে গেলুম।

পরদিন সকালে ঘোড়ার আস্তাবলে গুত্‌ টাকাটা পেল। সরু জানলার গরাদের ফাঁকে কেউ গুঁজে রেখেছিল টাকাটা, ফলে সারা জায়গায় নোটগুলো ছড়িয়ে পড়ে ছিল। দু-হাতে এলোমেলো, দোমড়ানো-মোচড়ানো নোটগুলো আঁকড়ে ধরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গুত্‌ আমার কাছে দৌড়ে এল।

উচ্ছ্বাসের মাথায় সারা কলোনি দাবড়ে বেড়িয়ে খবরটা সবাইকে জানিয়ে দিল গুত্‌। অন্য ছেলেরাও খুশিতে ঝলমলে হয়ে আমার অবস্থাটা এক-নজর

ঠাহর করে দেখবার জন্যে অনবরত আমার ঘরে ছুটে-ছুটে আসতে লাগল। কেবল তারানেত্‌স গর্বভরে মাথা খাড়া রেখে ইতিউতি ঘুরে বেড়াতে লাগল। আগের দিন রাত্রে আমাদের মধ্যে কথাবার্তার পর ও বা গুত্‌ কী করেছিল তা আর আমি ওদের জিজ্ঞাসা করলুম না।

এর দু-দিন পরে কে একজন মাটির নিচের ঠান্ডা-ঘরের দরজার তালা ভেঙে কয়েক পাউন্ড শুয়োরের চর্বি, অর্থাৎ আমাদের মজুত পুরো চর্বিটা, তালাসুদ্ধ নিয়ে সরিয়ে ফেললে। এরও দু-একদিন পরে ভাঁড়ারঘরের জানলাটা কেউ খুলে নিল। আর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্যে যে-মিষ্টি আমরা জমিয়ে ছিলুম তা আর গাড়ির চাকায় ব্যবহারের বয়াম-কয়েক গ্রিজও গেল উধাও হয়ে। গাড়িতে ব্যবহারের গ্রিজ্‌টা আমাদের কাছে সোনার মতো দামি ছিল।

বাস্তবিক কালিনা ইভানভিচ উৎকণ্ঠায় শুকিয়ে যেতে শুরু করল। এক-এক করে প্রতিটি ছেলের কাছে ঘেঁষে এসে তাদের মুখে তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে ও বোঝাতে শুরু করল:

'শোন্‌! এয়া সব তো তদেরই ল্যোগে, অ কুত্তির বাচ্চারা! অ পরগাছাগুলা! তরা নিজেরাই আপনেগো জিনিস হাতাচ্ছস!'

স্পষ্ট বোঝা গেল, অন্যদের চেয়ে তারানেত্‌স ব্যাপারটার খোঁজখবর রাখে বেশি, কিন্তু সে মুখ খুলতে রাজি নয়। মনে হল, আগে থেকে মতলব ফাঁস করা আদপে তার ধাতে নেই। অন্য ছেলেরা খোলাখুলি এ-ব্যাপারে তাদের মতামত দিচ্ছিল, তবে এর মধ্যে লুকোচুরি খেলার ব্যাপারটা তাদের খুব মনে ধরেছিল। ওদের মাথায় এটা কিছুতেই ঢোকানো সম্ভব হচ্ছিল না যে ওদের নিজেদেরই জিনিস চুরি যাচ্ছে।

এজমালি শোবার ঘরে আমি একদিন খুব খেপে গিয়ে চেঁচামেচি জুড়লুম:

'আচ্ছা, তোমরা কী, বল তো? তোমরা কি মানুষ, না...?'

ঘরের অপর প্রান্তের একটা বিছানা থেকে কে একজন চেঁচিয়ে বললে, 'আমরা ডাকাত!'

'সাংঘাতিক ডাকাত — হ্যাঁ, আমরা তা-ই!'

'না, তোমরা মোটেই ডাকাত নও! তোমরা মামুলি ছিঁচকে চোর, একজন আরেক জনের জিনিস হাতাতে ওস্তাদ! এখন আর তোমাদের বরাতে শুয়োরের

চর্বি জুটবে না, গোল্লায় যাও সব! বার্ষিকী-উৎসবে মিষ্টিও জুটবে না। কেউ আমাদের একফোঁটা দেবেও না আর। বিনা মিষ্টিতে চালাও তাহলে — আমার আর কী, আমার তো বয়েই গেল!'

'কিন্তু আমরা কী করতি পারি, আন্তন সেমিওনভিচ? কে এ-কাজ করেছে তা আমরা কী করে জানব? আপনে নিজেই তা জানেন না, আমরাও না।'

আমি আগাগোড়াই জানতুম যে আমার উপরোধ-অনুরোধ কোনো কাজেই আসবে না। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, বড় ছেলেদের মধ্যে একজন চুরি করছিল, আর তাকে অপর সকলে ভয় করে চলছিল।

পরদিন দুটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আমি শহরে গেলুম। উদ্দেশ্য ছিল, শুয়োরের চর্বির আরেকটা র‍্যাশনের বরাদ্দ কৌশলে আদায়ের চেষ্টা করা। কৌশল খাটাতে বেশ কয়েকটা দিন লেগে গেল, তবে শেষপর্যন্ত কিছুটা চর্বি আদায় করতে সক্ষম হলুম। মিষ্টির নতুন একটা চালানও পেয়ে গেলুম আমরা, তবে তার জন্যে আগে-পাওয়া মিষ্টির বরাদ্দ দিয়ে না-চালাতে পারার অক্ষমতা সম্বন্ধে লম্বা-চওড়া একটা বক্তৃতাও হজম করতে হল। ফিরে এসে আমাদের অ্যাড্‌ভেঞ্চারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে সন্ধেটা কাটানো গেল। অবশেষে শুয়োরের চর্বির বরাদ্দ র‍্যাশন কলোনিতে এসে পৌঁছলে মাটির নিচের ঠান্ডা-ঘরে তা মজুত করা হল। কিন্তু সেই রাত্রেই তা আবার গেল চুরি হয়ে।

এতে আমি প্রায় খুশিই হলুম, বলা চলে। ভাবলুম, এবার আমাদের সম-স্বার্থের সাধারণ, যৌথ প্রকৃতি সবাই উপলব্ধি করবে, এবং চুরির ফয়সলার ব্যাপারে আগের চেয়ে বেশি উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দেবে। কিন্তু, বাস্তবে, ছেলেদের সবাইকে কিছুটা মনমরা হয়ে পড়তে দেখা গেলেও চুরির ফয়সলায় উৎসাহের কোনো বিশেষ প্রকাশ চোখে পড়ল না। আর আবেগের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাওয়ার পর ছেলেরা আবার এটাকে খেলা ধরে নিয়ে এই ভেবে কৌতূহলী হয়ে উঠল যে এমন নিপুণ হাতসাফাইটা করছে কে?

এর কয়েক দিন পর ঘোড়ার গলার চামড়ার বাঁধুনিটা গেল হারিয়ে, ফলে আমাদের এমন কি শহরে যাওয়াও গেল বন্ধ হয়ে। গাঁয়ের লোকের দোরে-দোরে একটা চামড়ার গলবন্ধনী কয়েক দিনের জন্যে ধার চেয়ে ভিক্ষে করে ফিরতে হল আমাদের।

চুরি-চামারি দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। প্রতিদিন সকালে উঠেই দেখা

যেত, একটা-না-একটা জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না। কোনোদিন একটা কুড়ুল, কোনোদিন একখানা করাত, একটা-না-একটা রান্নার থালাবাটি, বিছানার চাদর, জিন-কষবার চামড়ার ফিতে, ঘোড়ার লাগাম, খাবারদাবার, কী নয়। রাত্রে ঘুমোতে না-গিয়ে রিভলবার নিয়ে আমি উঠোনে পায়চারি করতে শুরু করলুম। কিন্তু আমার পক্ষে পরপর দু-তিন রাত্রের বেশি এভাবে পাহারা দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। একদিন ওসিপভকে এক রাত্রের জন্যে পাহারা দিতে বললুম, কিন্তু পাহারা দেয়ার কথায় ও এমন ভয় পেয়ে গেল যে ওর কাছে আর কোনোদিন কথাটা তুলি নি।

অনেকগুলো ছেলের ওপরই আমার সন্দেহ হয়েছিল, গুত্ ও তারানেত্সও তা থেকে বাদ ছিল না। কিন্তু যেহেতু আমার হাতে কোনো প্রমাণ ছিল না, তাই মনের সন্দেহ মনেই চেপে রাখতে বাধ্য হচ্ছিলুম।

একদিন জাদোরভ হো-হো করে হেসে ইয়ার্কির সুরে আমায় প্রশ্ন করলে:

'আচ্ছা, আন্তন সেমিওনভিচ, আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে শ্রম-কলোনিতে খালি কাজ আর কাজই থাকবে, একফোঁটা মজা থাকবে না? দেখুন-না, আরও কত কী হয়! আচ্ছা, যদি আপনি কাউকে ধরতে পারেন তাহলে তাকে নিয়ে কী করবেন ঠিক করেছেন?'

'তাকে জেলে দেব।'

'মাত্তর ওইটুকু। আমি ভেবেছিলাম আপনি তাকে আচ্ছা করে ধোলাই দিতে চান।'

একদিন রাত্রে পুরোদস্তুর পোশাক পরে ও উঠোনে বেরিয়ে এল।

'আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ হাঁটব।'

'দেখো, চোরেদের হাতে যেন তোমার আবার ভোগান্তি না-হয়, তাহলেই হল।'

'না, ওরা জানে আজ রাত্রে আপনি পাহারায় আছেন, আজ আর ওরা চুরি করতে বের হবে না। কাজেই, সবকিছু ঠিক আছে।'

'জাদোরভ, তুমি ওদের ভয় পাও, তাই না? স্বীকার কর, শিগ্গির!'

'চোরেদের ভয় করি কিনা? নিশ্চয়ই করি! কিন্তু আমি ভয় করি কি করি না সেটা আসল ব্যাপার নয় — আপনি তো নিজেই বোঝেন, আন্তন সেমিওনভিচ, যে ইয়ার-দোস্তদের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করাটা ঠিক না।'

'কিন্তু তোমার নিজেরই জিনিসপত্র চুরি হচ্ছে-যে।'

'আমার? আমার কোনো জিনিসই নেই এখানে।'

'কিন্তু তুমি এখানে থাকছ তো।'

'একে আপনি থাকা বলেন, আন্তন সেমিওনভিচ? এটা কি একটা জীবন? আপনার এই কলোনি থেকে কোনো ফায়দাই উঠবে না। এ-সব চেষ্টা ছেড়ে দিলেই ভালো করবেন আপনি। আপনি দেখবেন, চুরি করার মতো যা-কিছু আছে এখানে সবকিছু চুরি করার পর চোরেরা বেমালুম কেটে পড়বে। আপনার উচিত জনা-দুই রাইফেলধারী ষণ্ডামার্কা জোয়ান পাহারাওলা বসানো।'

'না, রাইফেলধারী পাহারাওলা আমি বসাব না।'

'কেন, নয় কেন?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল জাদোরভ।

'পাহারা বসাতে গেলেই মাইনে দিতে হবে। তা, আমরা এত গরিব যে তা সম্ভব নয়। তাছাড়া, এর চেয়ে বড় কথা হল — এটা তোমাদের উপলব্ধি করতেই হবে যে এই সবকিছুর মালিক তোমরাই।'

রাতের চৌকিদার ভাড়া করার কথাটা আরও অনেক ছেলে বলল। এজমালি শোবার ঘরে এ-নিয়ে রীতিমতো একটা বিতর্কসভা বসল।

কলোনিতে আগত দ্বিতীয় দলের ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে যে ভালো ছিল সেই আন্তন ব্রাত্‌চেঙ্কো নামের ছেলেটি এইমর্মে মত প্রকাশ করল:

'একজন চৌকিদার পাহারায় থাকলে চুরি করতে বেরুবে না কেউ। আর যদি কেউ তা সত্ত্বেও বেরোয় তবে তারে এলোপাতাড়ি যেখানে-সেখানে গুলি খেতে হবে। আর এই গুলি শরীরে নিয়ে মাসখানেক বেড়ালেই তার চুরির চালাকি চিরতরে ঘুচে যাবে'খন।'

কিন্তু এর বিরোধিতা করল কোস্তিয়া ভেত্‌কোভ্‌স্কি। সুন্দর চেহারার একটি ছেলে, আগে রাস্তার 'জগতে' যার বিশেষ দক্ষতা ছিল জাল-করা পরোয়ানার বলে লোকের ঘরে খানাতল্লাসি চালানো। ওই সব খানাতল্লাসিতে অবশ্য ওর থাকত গৌণ ভূমিকা, প্রধান ভূমিকা নিত বয়স্করা। ওর সম্পর্কিত 'নথিপত্র' অনুযায়ী, কোস্তিয়া নিজে কখনও কিছু চুরি করে নি, এ-ধরনের কাজে ওর আগ্রহ ছিল নিছক নন্দন-তত্ত্বসম্পর্কিত। ছিঁচকে চোরদের ও সব সময়ে ঘেন্না করত। দীর্ঘ দিন ধরে এই ছেলেটির সূক্ষ্ম ও জটিল চরিত্র আমি অনুধাবন করেছিলুম। আমাকে যা সবচেয়ে অবাক করে দিত তা হল সবচেয়ে দুর্দান্ত ছেলের সঙ্গেও ওর মানিয়ে চলার কৌশল, আর রাজনীতিক ব্যাপারে ওর সর্বস্বীকৃত জ্ঞানগম্যি। কোস্তিয়া বেশ জোর দিয়েই বলল:

'আন্তন সেমিওনভিচ ঠিক বল্যেছেন, চৌকিদার রাখা উচিত নয়। এখনও

পর্যন্ত আমরা সবাই বুঝতেছি না বটে, তবে শিগ্‌গিরই আমাদের বুঝতি হবে যে কলোনিতে কোনো চুরি হওয়া উচিত নয়। এর মধ্যিই আমাদের বেশ কিছু ইয়ার ব্যাপারটা বুঝেছে। শিগ্‌গিরই আমরা নিজেরাই পাহারা দিতি শুরু করব।' কথাগুলো বলে হঠাৎ বুরুনের দিকে তাকিয়ে ও যোগ করল, 'তাই নয় কি, বুরুন?'

'নয় ক্যানে? পাহারা দিতি দোষ কী,' বুরুন জবাব দিল।

ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের তত্ত্বাবধায়িকা কলোনির কাজ ছেড়ে দিলেন। এর আগে তাঁর জন্যে এক হাসপাতালে আমিই একটা কাজ যোগাড় করে দিয়েছিলুম। এক রবিবারে 'খোকাবাবু'-কে মহিলার ঘরের দোরগোড়ায় নিয়ে আসা হল, আর তাঁর পুরনো বন্ধুরা ও দার্শনিক চা-পান সভার সদস্যরা সবাই তাঁর অসংখ্য থলে আর বাক্স শ্লেজগাড়িতে তুলে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এরপর ভালোমানুষ বৃদ্ধাটি তাঁর যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তির ওপর ধীরস্থিরভাবে চেপে বসে 'খোকাবাবু'-র রীতিমাফিক ঘণ্টায় দু-কিলোমিটার বেগে হেলেদুলে তাঁর নতুন জীবনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে যাত্রা করলেন।

কিন্তু 'খোকাবাবু' ওই রাত্রেই ফিরে এল আর সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে এল বৃদ্ধা মহিলাটিকেও। মহিলা তো ফোঁপাতে-ফোঁপাতে আর কাঁদতে-কাঁদতে হুড়মুড় করে আমার ঘরে ঢুকে পড়লেন। শুনলুম, তাঁর জাগতিক বিষয়-আশয়ের প্রায় সবটুকুই চুরি হয়ে গেছে। বন্ধুরা ও সাহায্যকারীরা তাঁর সব ক'টা বাক্স আর থলে শ্লেজে তোলে নি, বেশ কিছুটা হাতসাফাই করে সরিয়ে ফেলেছে — অর্থাৎ, ব্যাপারটা রাহাজানির একটা জঘন্য উদাহরণ। সঙ্গে সঙ্গে আমি কালিনা ইভানভিচ, জাদোরভ আর তারানেত্‌সকে ঘুম থেকে ডেকে তুললুম, তারপর একসঙ্গে গোটা কলোনি আমরা তন্নতন্ন করে তল্লাসি করলুম। এত বেশি মাল চুরি হয়েছিল যে সবকিছু ঠিকমতো লুকিয়ে ফেলা চোরেদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। তত্ত্বাবধায়িকার ধনসম্পত্তি একে-একে উদ্ধার করা গেল ঝোপঝাড় থেকে, বারবাড়িগুলোর চিলেকোঠা থেকে, গাড়িবারান্দার সিঁড়ির তলা থেকে, এমন কি খাটের তলা ও কাবার্ডের পেছন থেকে পর্যন্ত। দেখা গেল, মহিলা সত্যিই রীতিমতো ধনী বৃদ্ধা। কেননা, প্রায় ডজনখানেক নতুন টেবলক্লথ, বেশ কিছু বিছানার চাদর ও তোয়ালে, কিছু রুপোর চামচ, নানা ধরনের ছোট-ছোট কাচের পাত্র, হাতের একটা ব্রেস্‌লেট, কয়েকটা কানের দুল আর যাবতীয় টুকিটাকি জিনিস আমরা উদ্ধার করলুম।

আমার ঘরে বসে মহিলা কাঁদতে থাকলেন। আর, একে-একে ডেকে-আনা সন্দেহজনক ব্যক্তিতে — তাঁর সব পুরনো বন্ধু আর সঙ্গীতে — ঘরটা ক্রমশ ভরে উঠতে লাগল।

প্রথমে ছেলেরা সবকিছুই অস্বীকার করল। তারপর, আমি কিছুটা চেঁচামেচি করার পর অবশেষে অনিশ্চয়তার মেঘ কাটতে শুরু করল। দেখা গেল, বৃদ্ধা মহিলার বন্ধুরা আসল চোর নয়। তাদের চুরি হাত-মুখ মোছার ছোট ঝাড়ন কিংবা চিনির বাটির মতো দু-একটা স্মৃতিচিহ্ন সংগ্রহেই সীমাবদ্ধ। বুরুনই দেখা গেল সমস্ত ব্যাপারটায় প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছে। এই শেষোক্ত আবিষ্কারে সকলেই হতচকিত হল, বিশেষ করে আমি। একেবারে প্রথম থেকেই বুরুনকে মনে হয়েছিল ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য, সর্বদাই গম্ভীর, চুপচাপ অথচ বন্ধুভাবাপন্ন এবং লেখাপড়ায় সবচেয়ে ভালো আর সবচেয়ে পরিশ্রমী বলে। আলোচ্য ব্যাপারে ওর কাজের ব্যাপ্তি আর ত্রুটিহীনতা দেখে আমি তো হতভম্ব: বৃদ্ধার সম্পত্তি ও একেবারে গাঁটরি বেঁধে-বেঁধে পাচার করেছিল। অতঃপর এ-বিষয়ে আর কোনো সন্দেহই রইল না যে কলোনিতে আগেকার সব ক'টা চুরি ছিল ওরই হাতের কাজ।

অবশেষে যত কিছু অন্যায় আর অমঙ্গলের মূলে এসে পেঁছিনো গেল! বুরুনকে আমি 'জনতার আদালত'-এর সামনে সোপর্দ করলুম। আমাদের কলোনির ইতিহাসে সে-ই প্রথম 'জনতার আদালত' বসল।

এজমালি শোবার ঘরে বিছানায় আর টেবিলে সারি-সারি বসে গেল ছেঁড়া জামাকাপড়-পরা, গম্ভীর-মুখ জুরিরা। তেলের বাতির আলো এসে পড়েছিল চাপা উত্তেজনায় টানটান ছেলেদের আর বুরুনের রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে। ভারি, আনাড়ি দেহ আর মোটা গর্দানসহ বুরুনকে একেবারে মার্কামারা আমেরিকান গুণ্ডা-সর্দারের মতোই দেখাচ্ছিল।

দৃঢ়ভাবে, গলায় ঘৃণা আর ক্রোধ ফুটিয়ে ছেলেদের সামনে আমি অপরাধের পুরো বিবরণ পেশ করলুম। এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, যার জীবনের একমাত্র সুখ তুচ্ছাতিতুচ্ছ সম্পত্তি আঁকড়ে থাকায়, কলোনির অপর সকলের চেয়ে বেশি করে ছেলেদের প্রতি যে স্নেহমমতা দেখিয়েছে, সে যখন সে-ই ছেলেদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হল তখন তার যথাসর্বস্ব চুরি করা — এ-কাজ যে প্রাণ ধরে করতে পারে মানুষ-নামক জীবের সঙ্গে তার সবরকম

সাদৃশ্য নিশ্চয়ই লোপ পেয়ে গেছে, সে নিশ্চয়ই নিছক পশু নয়, একেবারে ভোঁদড়-জাতীয়, ইতর জন্তুবিশেষ! আর যাই হোক, মানুষের অন্তত এটুকু আত্মসম্মান-বোধ থাকা উচিত, এতটুকু মনোবল ও অভিমান থাকা উচিত যাতে সে দুর্বল, বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সামান্য পুঁজিপাটাটুকু চুরি না-করে।

আমার এই বক্তৃতা সকলের মনে গভীর রেখাপাত করল, কিংবা ছেলেরা আগে থেকেই যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে ছিল — তা সে যে কারণেই হোক — বুরুন সকলের সম্মিলিত ও প্রচণ্ড আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়াল। পুঁচকে, ঘন চুলো-মাথা ব্রাত্চেঙ্কো বুরুনের দিকে দু-হাত ছড়িয়ে দিয়ে বললে:

'তাহলে, নিজের সপক্ষে তোমার কী বলার থাকতে পারে? তোমারে ফাটকে দেয়া উচিত, জেলে পোরা উচিত তোমারে! তোমার জন্যেই আমাদের না-খেয়ে থাকতে হয়েছে — তুমিই আন্তন সেমিওনভিচের টাকা নিইছিলে।'

হঠাৎ বুরুন প্রতিবাদ করল:

'আন্তন সেমিওনভিচের ট্যাকা নিইচি? প্রমাণ কর্ তো দেখি!'

'হ্যাঁ, প্রমাণ করবই তো।'

'দে, প্রমাণ দে না দেখি!'

'তাহলে বলতে চাও, তুমি নাও নাই — তুমি চুরি কর নাই?'

'আমি নিইচি বলতেছিস, আমি?'

'নিশ্চয়ই তুমি নিয়েছ।'

'আমি আন্তন সেমিওনভিচের ট্যাকা নিইছিলাম! কে প্রমাণ দিতি পারে?'

হঠাৎ ঘরের পেছনদিক থেকে তারানেত্সের গলা শোনা গেল:

'আমি পারি।'

বুরুনের মাথায় যেন বাজ পড়ল। তারানেত্সের দিকে ফিরে, মনে হল, ও তার যুক্তি বুঝি খণ্ডন করতে যাচ্ছে, কিন্তু পরক্ষণেই মত বদলে শুধু বললে:

'তা, নিইছিলাম তো হয়েচেটা কী? ট্যাকা আমি ফিরত দিয়ে দিইচি, দিই নাই?'

আচমকা ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল ছেলেরা। এই কথা-কাটাকাটি ওদের কাছে খুব উপভোগ্য ঠেকছিল। তারানেত্স কিন্তু বীরের মতো আচরণ করছিল। এগিয়ে এসে ও ঘোষণা করলে:

'তবু বলি কী, ওরে তাড়ায়ে দেয়া ঠিক হবে না। কারণ, যা আমাদের করা

উচিত নয় আমরা সকলেই তা-ই করেছি। তবে ওরে আচ্ছা করে ঠেঙানি দেয়াতে কারো আপত্তি হবে না।'

সকলে চুপ করে গেল। ধীরেসুস্থে তারানেত্সের বসন্তের-দাগওয়ালা মুখে একবার চোখ বুলিয়ে নিল বুরুন। তারপর বলল:

'ঠেঙানি দে-না দেখি। তা তুই কিসির জন্যি এত হাঁকপাঁক করত্যেচিস? যতই চেষ্টা পাস না ক্যানে, তোরে কলোনির ডিরেক্টর কেউ কোনোদিন বানাবে না। যদি দরকার হয়, আন্তন আমারে ঠেঙানি দিতি পারেন। তোদের এত মাথাব্যথা কিসির?'

শুনে ভেত্কোভ্স্কি লাফিয়ে উঠল:

'আমাদের 'এত মাথাব্যথা কিসির' মানে? দোস্ত-সব, এডা আমাদের মাথাব্যথা কি? না, না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' বলে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেরা। 'আমরাই ওরে পিটুনি দেব। আন্তনের চেয়ে আমরাই ভালো ধোলাই দিতি পারব!'

বলার সঙ্গে সঙ্গে কে একজন বুরুনের দিকে ছুটে গেল। ব্রাত্চেঙ্কো ওর মুখের কাছে ঘুসি বাগিয়ে নাড়তে লাগল আর শাসাতে লাগল:

'তোমারে চাবকানো উচিত, বোঝলে!'

জাদোরভ আমার কানে-কানে বলল:

'ওকে সরিয়ে নিয়ে যান, নইলে মেরে ফেলবে।'

বুরুনের কাছ থেকে ব্রাত্চেঙ্কোকে টেনে সরিয়ে আনলুম। অন্য দু-তিনটি ছেলেকে জাদোরাভ ধাক্কা দিয় সরিয়ে দিল। অনেক কষ্টে গোলমাল চেঁচামেচি থামানো হল।

'বুরুনরে বলতি দাও! ওর কী বলার আছে আমাদের বলুক!' ব্রাত্চেঙ্কো চিৎকার করে বলল।

মাথা নিচু করে বুরুন বললে:

'আমার কিছুই বলার নাই। তোরাই ঠিক, তোরা সবাই ঠিক কয়্যেচিস। আমারে আন্তন সেমিওনভিচের সাথেই যাতি দে — উনি আমারে যে-শাস্তি দিতি চান দিন!'

নিস্তব্ধ ঘর। আমি দরজার দিকে এগোলুম, মনে-মনে ভয় রয়েছে ভিতরে-চাপা সাংঘাতিক রাগ পাছে উপছে বাইরে প্রকাশ পেয়ে যায়। আমাকে আর বুরুনকে পথ করে দিতে ছেলেরা সব ডাইনে-বাঁয়ে সরে দাঁড়াতে লাগল।

অন্ধকার উঠোনটা পেরিয়ে এলুম। নিঃশব্দে, উড়ন্ত তুষারকণার মধ্যে পথ করে-করে। আমি সামনে, বুরুন পেছনে।

আমার মানসিক অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। বুরুনকে মনে হচ্ছে মানব-সমাজে আবর্জনাস্বরূপ। ওকে নিয়ে যে কী করব, বুঝে উঠতে পারছি না। কলোনিতে ওকে পাঠানো হয়েছিল চোরের দলের একজন হিসেবে উদ্ধার করে। ওর সঙ্গীদের বেশির ভাগই ছিল সাবালক, আর তারা আগেই গুলি খেয়ে মরেছিল। ওর বয়স ছিল মাত্র সতেরো বছর।

দরজার ঠিক ভেতরে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল বুরুন। আর টেবিলে বসে প্রাণপণে আমি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছিলুম পাছে ওর দিকে ভারি কোনো জিনিস ছুড়ে মারি আর ওই সাক্ষাৎকারের অবসান ঘটিয়ে বসি।

অবশেষে বুরুন মাথা তুলল, আর আমার চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল। তারপর খুব আস্তে-আস্তে, প্রত্যেকটি কথার ওপর জোর দিয়ে, ফোঁপানি চাপার ব্যর্থ চেষ্টা করতে-করতে বলতে লাগল:

'আমি... আর... কখনও... চুরি ক্যরব না।'

'মিথ্যে কথা! কমিশনের কাছে এর আগে তুমি এই একই কথা বলেছিলে।'

'সে তো কমিশন! আর এতো আপনে! আমারে আপনের যা ইচ্ছা শাস্তি দ্যান, কেবল কলোনি থ্যেকে খেদায়ে দিবেন না।'

'কেন? কলোনি হঠাৎ এত ভালো লেগে গেল-যে?'

'এখানে আমার ভালো লাগে। এখানে পড়াশুনা হয়। আমি ল্যাখাপড়া শিখতি চাই-যে। আর সব সময়ে আমার ক্ষুধা লাগে, তাই আমি চুরি করি।'

'ঠিক আছে। তিন দিন তোমাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হবে, আর ওই তিন দিন রুটি আর জল ছাড়া অন্য কিছু খেতে পাবে না। আর সাবধান, তারানেত্সের গায়ে হাত তুলবে না!'

'ঠিক আছে।'

ছেলেদের এজমালি শোবার ঘরের লাগোয়া যে-ছোট্ট ঘরখানায় আমাদের আগেকার সংশোধনী বিদ্যালয়ের মাস্টারমশাইরা শুতেন সেই ঘরে বন্দী-অবস্থায় তিন দিন কাটাল বুরুন। আমি অবশ্য ঘরে তালা লাগাই নি, কারণ বুরুন কথা দিয়েছিল আমার অনুমতি ছাড়া সে ওই ঘরের বাইরে যাবে না। প্রথম দিন ওকে সত্যিই রুটি আর জল ছাড়া অন্য কিছু খেতে দিই নি। কিন্তু পরের দিন দয়া হল আমার, ওকে পুরোদস্তুর খানা পাঠিয়ে দিলুম।

ব্রুন জাঁক দেখিয়ে খেতে অস্বীকার করার চেষ্টা করল, কিন্তু আমি চেঁচিয়ে বললুম:

'রাখো, রাখো — আমার কাছে ও-সব চাল দেয়ার চেষ্টা কোরো না!'

মুচকি হেসে ও একবার কাঁধ-ঝাঁকানি দিল, তারপর সুড়সুড় করে হাতে চামচ তুলে নিল।

ব্রুন ওর কথা রেখেছিল। এরপর ও জীবনে আর কখনও চুরি করে নি, কি কলোনিতে, কি অন্য কোথাও।

৫

## রাষ্ট্রীয় গুরুত্বের ব্যাপার

আমাদের ছেলেরা কলোনির সম্পত্তিকে ক্রমশ যেমন খানিকটা নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখতে শিখছিল, বাইরের কিছু লোক আবার সে-ব্যাপারে তেমনই গভীর আগ্রহ দেখাচ্ছিল।

এই সব বাইরের লোকের একটা প্রধান দল খার্‌কভমুখো বড় শড়ক বরাবর থানা গেড়েছিল। এমন একটা রাতও সে-সময়ে কাটত কিনা সন্দেহ যখন ওই রাস্তায় কোনো-না-কোনো পথচারীর যথাসর্বস্ব ডাকাতি হয়ে খোয়া যেত না। স্থানীয় গাঁয়ের বাসিন্দাদের একসার ঘোড়ার গাড়িকে হয়তো করাতে কাটা বেঁটে রাইফেলের একটামাত্র গুলির আওয়াজে আটক করে ডাকাতের দল করত কি, বৃথা বাক্যব্যয় না-করে যে-হাতে রাইফেল নেই সেই খালি হাতটা সোজা মেয়েদের পোশাকের সামনের দিকে ভেতরে চালিয়ে দিত, আর ওই সব মেয়ের স্বামীরা দারুণ বিচলিত হয়ে পড়ে হাতের চাবুক দিয়ে উঁচু বুটজুতোর গায়ে ঘা দিতে-দিতে অবাক হয়ে বলাবলি করত:

'এমনটা হবে, কে ভেব্যেছিল! ট্যাকাকড়ি আমরা সবথ্যেকে নিরাপদ জায়গায় আমাদের ইস্তিরিদের পোশাকের ভিতরি রাখ্যে থাকি। তা, দ্যাখ ওয়াদের কাণ্ডমাণ্ড, অরা সোজা মেয়্যাদের বুকের মধ্যি হাত পুরি দিচ্চে!'

যাকে এই ধরনের বারোয়ারি ডাকাতি বলা চলে, তাতে রক্তপাত কদাচিৎ ঘটত। চুপচাপ থাকার জন্যে যে-সময়টা বেঁধে দিত ডাকাতরা ততক্ষণ চুপটি

মেরে দাঁড়িয়ে থাকার পর ওই স্বামীরা জ্ঞানগম্যি ফিরে পেত আর তারপর আমাদের কলোনিতে এসে সবিস্তারে ঘটনার খুঁটিনাটি বিবরণ দিত। আর খবরটা শুনে বেড়ার খুঁটি বা লাঠিধারী একটা দলকে জড় করে নিজে সঙ্গে রিভলবার নিয়ে আমি সদলবলে ছুটে যেতুম বড় রাস্তায় আর তারপর আশেপাশের জঙ্গলে তন্নতন্ন করে তল্লাসি চালাতুম ডাকাতের খোঁজে। মাত্র একবারই আমাদের এরকম তল্লাসি সফল হয়েছিল: রাস্তা থেকে আধ-কিলোমিটারটাক দূরে জঙ্গলের মধ্যে বাতাসে-জমা তুষারস্তূপে লুকিয়ে-থাকা একটা ছোট দলের সন্ধান মিলেছিল সেবার। আমাদের ছেলেদের হৈ-হল্লার জবাবে ওরা মাত্র একটা গুলি ছুড়ল তারপর ছড়িয়ে পড়ে দৌড় লাগাল নানা দিকে। তবে আমরা ওদের মধ্যে একটাকে ধরতে পেরেছিলুম। তাকে নিয়ে আসা হল কলোনিতে। তার কাছে অবশ্য রাইফেল কিংবা লুটের মাল কিছুই মিলল না, এবং সব অভিযোগই সে জোর গলায় অস্বীকার করল। তবে জেলা অপরাধ-তদন্ত দপ্তরের হাতে তাকে সমর্পণ করার পর অবশ্য জানা গেল যে লোকটা একটা কুখ্যাত ডাকাত। এর অল্প কিছু পরেই ওই পুরো ডাকাত-দলটা ধরা পড়ে। জেলা শাসন-পরিচালক সমিতি এ-জন্যে গোর্কি কলোনিকে সাধুবাদ জানান।

কিন্তু, তা সত্ত্বেও, বড় রাস্তায় রাহাজানি আগের মতোই চলতে থাকল। শীতের শেষের দিকে আমাদের ছেলেরা রাত্তিরবেলা অনুষ্ঠিত কিছু-কিছু ‘রক্তপাতের ঘটনা’-র এক-আধটুকু সুলুক-সন্ধান পেতে শুরু করল। একবার পাইনগাছগুলোর ফাঁকে বরফের মধ্যে থেকে মানুষের একখানা হাত উ'চিয়ে থাকতে দেখা গেল। হাতখানার চারপাশে বরফ খুঁড়ে আমরা একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পেলুম। মেয়েটিকে মুখে গুলি করে খুন করা হয়েছিল। আরেকবার রাস্তার ঠিক ধারেই ঝোপের মধ্যে গাড়োয়ানের কোট-গায়ে একজন মানুষের মৃতদেহ পাওয়া গেল। লোকটির মাথার খুলি ফাটিয়ে দেয়া হয়েছিল। আরেক দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতেই জঙ্গলের ধারে গাছের ডাল থেকে দুটো লোককে মরা-অবস্থায় ঝুলতে দেখা গেল। তারপর, শহর থেকে করোনার এসে পৌঁছনো পর্যন্ত পুরো দুটো দিন লোক দুটো ওইভাবে, কলোনির দিকে ঢেলা-বের-করা চোখ মেলে তাকিয়ে, ঝুলে রইল।

এই সব ঘটনায় ভয় পাওয়া দূরে থাকুক, কলোনির বাচ্চা বাসিন্দারা এ-ব্যাপারে তাদের কৌতূহল গোপন করার চেষ্টা পর্যন্ত করত না। বসন্তকালে

বরফ গলার পর তারা শেয়ালে-খাওয়া মানুষের চাঁছাছোলা করোটির সন্ধানে সারা জঙ্গল ঢুঁড়ে বেড়াত। আর তারপর ওই মুণ্ডুগুলো কাঠির ডগায় বসিয়ে কলোনিতে নিয়ে আসত একটিমাত্র উদ্দেশ্যে — তা হল লিদিয়া পেত্রোভ্‌নাকে ভয় দেখানো। এমনিতেই অবশ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকতেন। যে-কোনো মুহূর্তে ডাকাতের দল কলোনিতে ঢুকে পড়ে খুনোখুনি শুরু করে দিতে পারে — এই ভয়ে বিছানায় শুয়েও তাঁরা থরহরি কাঁপতেন। এঁদের মধ্যে ওসিপভ-পরিবারটি আবার সবচেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত, আর ওদের সম্বন্ধে লোকেরও ধারণা ছিল যে চুরি করার মতো বহু মূল্যবান সম্পত্তির ওরা মালিক।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিকে একদিন সন্ধেবেলা খাদ্যসামগ্রীতে বোঝাই হয়ে আমাদের গাড়ি যখন শহর থেকে তার স্বভাবসিদ্ধ গতিতে ঢিকিস-ঢিকিস করে ঘরে ফিরছিল তখন কলোনিতে ঢোকার মুখে রাস্তার বাঁকের মাথায়ই তাকে আটকানো হল। গাড়িতে মালপত্র বলতে ছিল দানাশস্য আর চিনি, কিন্তু যে-কোনো কারণে হোক ডাকাতদের তা পছন্দ হল না। কালিনা ইভানভিচের সঙ্গেও তামাকের পাইপ ছাড়া আর কোনো দামি জিনিস ছিল না। এতে ডাকাতরা এতদূর ক্ষুব্ধ হল যে খেপে গিয়ে ওর মাথায় তারা বাড়ি মারল। ফলে, বরফের ওপর উলটে পড়ে গেল কালিনা ইভানভিচ, আর ডাকাতের দল একেবারে অদৃশ্য হয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত ওইভাবেই পড়ে রইল। গুদ্‌ও গাড়ির সঙ্গে ছিল, কারণ 'খোকাবাবু'-কে দেখাশোনা করার ভার সব সময়ে তার ওপরই ন্যস্ত থাকত। কিন্তু সে সমস্ত ঘটনাটার নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে ছিল। কলোনিতে ফিরে দু-জনে এই দুঃসাহসিক অভিযানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমাদের শোনাতে লাগল। কালিনা ইভানভিচ জোর দিল ঘটনাটার নাটকীয় দিকের ওপর, আর গুদ্‌ মজার ঘটনাগুলোর ওপর। যাই হোক, সব শোনার পর এই মর্মে একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে এরপর থেকে আমাদের গাড়ি যখন ঘরে ফিরবে তখন তাকে পাহারা দিয়ে আনার জন্যে মাঝপথে একদল রক্ষীকে পাঠানো হবে।

অতঃপর দু-বছর এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলেছিলুম আমরা। আস্তানা থেকে দ্রুত বেরিয়ে বড় রাস্তায় গাড়ি-অবরোধকারীদের এইভাবে আক্রমণ করার একটা সামরিক নামকরণও সে-সময়ে করেছিলুম। তা হল, 'পা ফাঁক করে রাস্তা ডিঙনো'।

গাড়ির সঙ্গী আমাদের এই রক্ষী-বাহিনীতে সাধারণত জনা দশেক করে লোক থাকত। আমার রিভলবার ছিল বলে কখনও-কখনও আমিও ওই দলে থাকতুম। এর কারণ, সকলের হাতে রিভলবার দিয়ে বিশ্বাস করতে পারতুম না, আবার রিভলবার ছাড়া দলটা যথেষ্ট শক্তিশালী হচ্ছে বলেও মনে হোত না। একমাত্র জাদোরভকেই মাঝেসাঝে বিশ্বাস করে রিভলবারটা ছাড়তুম। ও তখন বেশ গর্বের সঙ্গে ছেঁড়া জামাকাপড়ের ওপর ওটাকে 'স্ট্র্যাপে বেঁধে ঝুলিয়ে নিত।

রাস্তা-পাহারা-দেয়ার কাজটা দারুণ চিত্তাকর্ষক ব্যাপার ছিল। রাস্তার দেড় কিলোমিটার অংশ জুড়ে, নদীর ওপরকার ব্রিজের কাছ থেকে কলোনিতে ঢোকার মুখে রাস্তার মোড় পর্যন্ত অংশে, আমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতুম। বরফের ওপর লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে ছেলেরা নিজেদের গরম রাখার চেষ্টা করত আর সংযোগ যাতে নষ্ট না-হয় তার জন্যে পরস্পরকে চিৎকার করে ডাকাডাকি করে চলত। এর ফলে সন্ধের ঝোঁকে দেরিতে ঘর-ফিরতি পথচারীর মনে ডাকাতের হাতে আচমকা মারা পড়ার ভয় জাগত। রাস্তার ধারে-ধারে নিয়মিতভাবে-সাজানো ভয়াবহ ভুতুড়ে চেহারার কতগুলো মনুষ্য-আকৃতির পাশ দিয়ে ঘরমুখো গাঁয়ের লোকেরা প্রাণপণে চাবুক হাঁকড়িয়ে নিঃশব্দে ঘোড়া দাবড়ে পালাত। সোভ্‌খোজ বা রাষ্ট্রীয় কৃষি-খামারের ডিরেক্টর এবং শাসন-কর্তৃপক্ষের অন্যান্য প্রতিনিধিরাও এমনভাবে দ্রুত চলে যেতেন তাঁদের ঝরঝরে গাড়িতে চেপে যাতে ছেলেরা তাঁদের হাতের দো-নলা বন্দুক আর করাতে-কাটা বেঁটে রাইফেলগুলো স্পষ্ট দেখতে পায়। এছাড়া যে-সব যাত্রী পায়ে হেঁটে রাস্তা চলাচল করত অন্যান্য সহযাত্রীর সঙ্গে মিলে দল ভারি করার আশায় তারা ওই ব্রিজের কাছে অপেক্ষা করে থাকত।

আমি যেদিন সঙ্গে থাকতুম সেদিন ছেলেরা কারো ওপর জবরদস্তি-করা কিংবা ভয়-দেখানো, এ-সব কিছুই করত না। কিন্তু আমি সঙ্গে থেকে ওদের সংযত না-রাখলে কখনও-কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। তাই, কয়েক দিন পরে সঙ্গে যাওয়ার জন্যে জাদোরভ আমাকে পীড়াপীড়ি শুরু করল, আমি গেলে আমার রিভলবারটা ও কাছে রাখতে পারবে না এটা জেনেও। ফলে রক্ষীদলের সঙ্গে আমি প্রত্যেক খেপেই বেরুতে শুরু করলুম, তবে জাদোরভকে তার সু-অর্জিত আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে না-চাওয়ায় রিভলবারটা ওকেই রাখতে দিতুম।

দূর থেকে ‘খোকাবাবু’ আসছে নজরে পড়লেই আমরা ‘দাঁড়াও! হাত তোল!’ বলে চেঁচিয়ে অভ্যর্থনা জানাতুম।

শুনে কালিনা ইভানভিচ একটু মুচকি হাসত, আর দারুণ খুশি হয়ে ঘনঘন পাইপ টানতে থাকত। এইভাবে সারা পথটা জ্বলতে থাকত ওর পাইপ। ‘সময় চলিয়া যায় অগোচরে,’ এই প্রবাদবাক্যাংশটি এক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য ছিল।

পথ চলতে-চলতে রক্ষীবাহিনী ক্রমে ‘খোকাবাবু’-র পিছু-পিছু সার বেঁধে আসতে থাকত। কলোনির এলাকায় ঢোকার পর অবশ্য জটলা করে সবাই হৈ-হল্লা করতে-করতে আসত, আর খাদ্য-সরবরাহের ব্যাপারে সর্বশেষ খবর জানবার জন্যে কালিনা ইভানভিচকে তুলত উদ্ব্যস্ত করে।

ওইবারই শীতকালে আমরা এমন একটা কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলুম যার গুরুত্ব কলোনির সংকীর্ণ স্বার্থের সীমানা অনেকদূর ছাপিয়ে গেল — কাজটা ছিল জাতীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বন-রক্ষীদের প্রধান একদিন কলোনিতে এসে জঙ্গল-পাহারা-দেয়ার কাজে আমাদের সাহায্য চাইলেন, বললেন এত বেশি বে-আইনী গাছ-কাটা শুরু হয়েছে যে ওঁর লোকজনের পক্ষে তাল রেখে পাহারা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

সরকারি বন-পাহারা-দেয়ার কাজটা নেয়ায় নিজেদের চোখেই আমাদের মর্যাদা অনেকখানি বৃদ্ধি পেল। তাছাড়া, এর ফলে আমরা দারুণ মজাদার একটা কাজ পেয়ে গেলুম, আর শেষপর্যন্ত এতে লাভও বড় কম হল না।

রাত তখন গভীর। ভোর হব-হব করছে, কিন্তু তখনও বেশ অন্ধকার রয়েছে। জানলায় একটা ধাক্কার আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙল। চোখ খুলে জানলার শার্সিতে তুষারের আঁকিবুকি-নক্‌শার ফাঁকে-ফাঁকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলুম, একটা নাক শার্সিতে লেপটে চেপটে আছে, আর চোখে পড়ল এলোমেলো চুলে-ভরা একটা মাথা।

‘কী হয়েছে?’

‘আন্তন সেমিওনভিচ, জঙ্গলে কেউ গাছ কাটতেছে!’

রাতের বাতিটা জেবলে তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিলুম। তারপর আমার রিভলবারটা আর একটা দো-নলা বন্দুক উঠিয়ে নিয়ে বাইরে এলুম।

বাইরে বেরিয়ে দেখি সিঁড়িতে দুই তুখোড় নৈশ অ্যাড্‌ভেঞ্চার-প্রেমী

দাঁড়িয়ে — বুরুন, আর একটি সরল, ভালোমানুষ বাচ্চা ছেলে, নাম শেলাপুতিন।

বুরুন আমার হাত থেকে বন্দুকটা নিল, তারপর আমরা জঙ্গলে ঢুকলুম।

'গাছ কাটছে কোথায়?'

'একটু শোনেন!'

দাঁড়িয়ে পড়লুম। প্রথমে কিছুই কানে এল না, তারপর ক্রমে রাত্রির নানারকম মিশ্র শব্দ ও আমাদের নিশ্বাসের শব্দের ফাঁকে শুনতে লাগলুম কাঠের গুঁড়িতে ইস্পাত দিয়ে ঘা-মারার ভোঁতা আওয়াজ। শব্দ লক্ষ্য করে আমরা এগোতে লাগলুম — গাছ-কাটিয়েদের নজর এড়ানোর জন্যে কুঁজো হয়ে-হয়ে। শিশু পাইনগাছের ডালে ঘষা লেগে আমাদের মুখ ছড়ে যেতে লাগল, আমার চশমা-জোড়া খালি খুলে-খুলে পড়তে লাগল, আমাদের দেহে ঝরে পড়তে লাগল তুষার। কুড়ুলের আওয়াজ মাঝে-মাঝে থেমে যাচ্ছিল, আর তখন কোন্‌দিকে যাব বুঝে উঠতে না-পারায় আবার আওয়াজ শুরু হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। তবে মাঝে-মাঝেই আওয়াজটা শুরু হচ্ছিল ফিরে-ফিরে, আর মিনিটে-মিনিটে তা ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছিল আর কাছে ঘনিয়ে আসছিল।

চোর যাতে ভয় পেয়ে না-পালায় সে-জন্যে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোবার চেষ্টা করছিলুম। কিছুটা ভল্লুকের মতো চট্‌পট হেঁচড়ে-হেঁচড়ে চলছিল বুরুন, খুদে শেলাপুতিন চলছিল ওর পিছুপিছু তিড়িং-তিড়িং নাচতে-নাচতে আর শরীর গরম রাখার জন্যে জ্যাকেটটা গায়ের ওপর নিবিড় করে জড়াতে-জড়াতে। আমি যাচ্ছিলুম সকলের পেছনে।

অবশেষে অকুস্থলে এসে পেঁছনো গেল। একটা পাইনগাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকাতেই নজরে পড়ল ঢ্যাঙা সরুমতো একটা গাছ আগাগোড়া কেঁপে-কেঁপে উঠছে আর তার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে কোমরে বেল্‌ট্‌-বাঁধা একটা মূর্তি। কয়েকটা অনির্দিষ্ট, এলোমেলো কোপ দেয়ার পর কুড়ুল-হাতে লোকটা একবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চারিদিক ঠাহর করে দেখল, তারপর ফের গাছ-কাটা শুরু করল। আমরা তখন লোকটার কাছ থেকে পাঁচ গজখানেক দূরে দাঁড়িয়ে। বন্দুকে গুলি ভরে নলটা ওপর দিকে তুলে বুরুন আমার দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়াল।

আমার পাশে গ‍ুড়ি মেরে বসে আমার কাঁধে হেলে পড়ে শেলাপ‍ুতিন ফিস্‌ফিসিয়ে শ‍ুধোল:

'সময় হয়েছে? গ‍ুলি ছ‍ুড়ব?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল‍ুম। সঙ্গে সঙ্গে ব‍ুর‍ুনের কোটের হাতায় আস্তে টান দিল শেলাপ‍ুতিন।

প্রচণ্ড আওয়াজ করে গ‍ুলি ছ‍ুটল। গাছপালার মধ্যে প্রতিধ্বনি উঠল গমগম করে।

সহজাত প্রবৃত্তির বশে কুড়‍ুল-হাতে লোকটা সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে বসে পড়ল। তারপর সব চুপ। আমরা ওর কাছে গেল‍ুম। শেলাপ‍ুতিন কাজের ছেলে, দেখল‍ুম কুড়‍ুলখানা ইতিমধ্যে হাতিয়ে ফেলেছে। হঠাৎ ব‍ুর‍ুন খ‍ুশিভরা-গলায় চেঁচিয়ে সম্ভাষণ জানাল:

'আহা, ম‍ুসি কার্‌পভিচ-যে! স‍ু-প্রভাত!'

ম‍ুসি কার্‌পভিচের কাঁধ চাপড়ে দিল ও, কিন্তু জবাবে লোকটির ম‍ুখ দিয়ে টঁু-শব্দটিও বেরোল না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে ও খালি যন্ত্রের মতো কোটের বাঁ-হাতার ওপর থেকে তুষারের প‍ুঁড়ো ঝাড়তে লাগল।

আমি জিজ্ঞাসা করল‍ুম:

'আপনার ঘোড়াটা কই?'

ম‍ুসি কার্‌পভিচের ম‍ুখে তখনও কথা নেই। ব‍ুর‍ুনই ওর হয়ে উত্তর দিল:

'ওই তো ওখেনে!.. এই, ইদিকে এস দিকি!'

পাইন-ডালের পরদার ফাঁক দিয়ে মাত্র তখনই আমার নজরে পড়ল একটা ঘোড়ার মাথার দিক আর খামারী শ্লেজগাড়ির ঘোড়া জোতার ডাণ্ডার সামনের ধন‍ুকের মতো অংশটা।

ম‍ুসি কার্‌পভিচকে হাত ধরে টানল ব‍ুর‍ুন। হাসিখ‍ুশি গলায় বলল:

'এই দিকি অ্যামব‍ুলেন্সে আসেন দেখি, ম‍ুসি কার্‌পভিচ।'

অবশেষে ম‍ুসি কার্‌পভিচের মধ্যে প্রাণের লক্ষণ দেখা যেতে লাগল। টুপি খ‍ুলে ও নিজের মাথায় একবার হাত ব‍ুলিয়ে নিল, তারপর আমাদের দিকে না-তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগল:

'হায় ভগমান!.. হায় ভগমান!..'

একসঙ্গে আমরা শ্লেজগাড়ির দিকে এগোলুম।

আস্তে-আস্তে শ্লেজের মুখ ঘোরানো হল। তারপর অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ির চাকার গভীর দাগ-বরাবর এগিয়ে চললুম; তুলোর মতো হালকা তুষারে দাগগুলো ইতিমধ্যে প্রায় ঢেকে এসেছিল। আমাদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল প্রকাণ্ড টুপি মাথায় আর বেঢপ সাইজের বুটজুতো পায়ে বছর চোদ্দ বয়সের একটি ছেলে। ঘোড়ার উদ্দেশ্যে মুখে চুঃ-চুঃ আওয়াজ করে আর মুহ্যমানভাবে লাগাম নেড়ে গাড়ি ছাড়ল ছেলেটা। গাড়ি চালাতে-চালাতে সারাক্ষণ ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে লাগল ও। মনে হল, ছেলেটা একদম ভেঙে পড়েছে। চুপচাপ চললুম আমরা।

বনের সীমানার কাছাকাছি আসার পর বুরুন ছেলেটার হাত থেকে লাগাম নিয়ে নিল। বলল:

'তুই তো ভুল পথ ধর্‌যেচিস রে! বোঝা বয়্যে আনলি এটা অবিশ্যি ঠিক পথ হোত। কিন্তু এখন তো শুধু তোর বাপেরে নিয়্যে চল্যেচিস। এখন এইটা ঠিক পথ...'

'কলোনিতে যাতিছেন নাকি?' ছেলেটা প্রশ্ন করল। কিন্তু ওকে লাগামটা আর ফেরত না-দিয়ে বুরুন ঘোড়ার মাথা কলোনির রাস্তায় ঘুরোল।

ততক্ষণে সবে ভোর হচ্ছে।

হঠাৎ বুরুনের হাতের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে রাশটা টেনে ধরে ঘোড়া থামিয়ে দিল মুসি কার্‌পভিচ, তারপর অন্য খালি হাতটা দিয়ে মাথার টুপি খুলে ফেলল। অনুনয় করে বলল:

'আন্তন সেমিওনভিচ! আমারে যাতি দ্যান! এই পের্‌থম আমি গাছ কাটতি গিয়েলাম... আমাদের আগুন জ্বালানোর কাঠ ছিল না... যাতি দ্যান আমারে!'

রাগ করে এক ঝট্‌কায় বুরুন মুসি কার্‌পভিচের হাতটা লাগাম থেকে ছাড়িয়ে দিল, কিন্তু ঘোড়া ছাড়ল না। আমি কী বলি তাই শোনবার জন্যে অপেক্ষা করে রইল।

বললুম, 'না-না, মুসি কার্‌পভিচ, তা হবে না। আমাদের একটা জবানবন্দী লিখে ফেলতে হবে। আপনি তো জানেন — এটা সরকারের ব্যাপার।'

এমন সময় শেলাপ্রতিনের রিন্‌রিনে সর্ গলার ঝঙ্কার র্পোর টাকার মতো ভোরাই আকাশে বেজে উঠল:

'আর, তাছাড়া, মোটেই এটা পের্‌থম বার নয়। পের্‌থম বার নয়, এটা নিয়ি তিন বারের বার হল। পের্‌থম বার আপনের ভাসিলি ধরা পড়্যেছিল, তারপর পরের বার...'

কিন্তু নিখাদের র্পোলি স্র কেটে গেল ব্র্নের ধরা-ধরা দরাজ প্র্ষালি গলার আওয়াজে:

'এখানে মিথ্যে আটকে থ্যেকে লাভ কী? এই, আন্দ্রেই, যা বাড়ি যা! তুই তো নেহাত প্চকে চুনোপ্টি! যা দেখি, তোর মায়েরে গিয়্যে বল্‌ তোর বাপ ধরা পড়্যে গ্যাচে। এখন সোয়ামির জন্যি কিছ্ খাবার রেঁধে পাঠানোর বেবস্তা কর্ক।'

ভয়ে হতব্দ্ধি হয়ে গিয়ে আন্দ্রেই হাঁচড়পাঁচড় করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল, তারপর নিজেদের খামারবাড়ির দিকে ছ্ট লাগাল প্রাণপণে। আমরা আবার আমাদের পথে যাত্রা করল্ম। কলোনির এলাকায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একদল ছেলের সঙ্গে দেখা। ওরা আমাদের সন্ধানে বেরোচ্ছিল।

'আরে, আরে! আমরা তো ভাবলাম আপনাদের কেউ নিশ্চয় খ্ন করতেছে, তাই আপনাদেরে বাঁচাতি আমরা বের‍্যায়ে পড়ছিলাম।'

'চোর-ধরা অভিযান আমাদের প্রা সফল হয়্যেচে!' ব্র্ন হেসে বলল।

আমার ঘরে ভিড় করে এল সবাই। ম্সি কার্‌পভিচ একেবারে মনমরা হয়ে পড়েছিল। আমার ম্খোম্খি একটা চেয়ারে বসল ও। ব্র্ন বসল জানলার তাকে, হাতে তখনও তার বন্দ্কটা ধরা। শেলাপ্‌তিন রাতের অ্যাড্‌ভেঞ্চারের ভয়ঙ্কর সব খ্‌টিনাটি বিবরণ ইয়ারদোস্তদের কানে-কানে শোনাতে লাগল। ছেলেদের মধ্যে দ্-জন বসল আমার বিছানায়, বাকিরা সারি-সারি বসে গেল বেঞ্চিগ্লোয়। সবাই তন্ময় হয়ে জবানবন্দী নেয়ার ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগল।

হৃদয়-বিদারক সব প্ঙখান্প্ঙখ তথ্য দিয়ে জবানবন্দী তৈরি হতে লাগল।

'আপনাদের তো বারো দেসিয়াতিনা* জমি আছে, তাই না? আর তিনটে ঘোড়া?'

* দেসিয়াতিনা —৬ বিঘা ৭ শতক। — অন্ঃ

'ঘোড়া!' ককিয়ে উঠল মুসি কার্পভিচ। 'ওদের এট্টারে তো ঘোড়া কইতিই লারবেন... মাত্তর দু-বছরের এঁড়ে এট্টা...'

'না-না, তিনটে ঘোড়া,' মুসি কার্পভিচের কাঁধে সদয়ভাবে চাপড় দিয়ে বুরুন ভুল শোধরাতে চাইল।

আমি লিখে চললুম:

'...ছ-ইঞ্চি মোটা একটা গাছ কাটা হয়েছিল...'

হতাশভাবে দুই হাত ছড়িয়ে দিল মুসি কার্পভিচ:

'কী বল্‌তিছেন, আন্তন সেমিওর্নভিচ! ভগমানের দোহাই! হিসাবটা পাতিছেন কোথা থেকি? গাছটা তো মাত্তর ইঞ্চি চারেক মোটা ছিল।'

ফিস্‌ফিসিয়ে গল্প বলার মাঝখানে হঠাৎ কথা থামিয়ে শেলাপুতিন হাত ছড়িয়ে দিয়ে আধ-মিটারখানেক মেপে ফেলল, তারপর মুসি কার্পভিচের মুখের ওপর হি-হি করে হেসে উঠে বলল:

'এতখানি মোটা? এত মোটা গাছ কাটা হয়্যেছিল, তাই না?'

যেন এই বাধাদানের ব্যাপারটা চোখেই পড়ে নি এমন ভান করে মুসি কার্পভিচ বিনীতভাবে চোখ দিয়ে আমার কলমের চলন অনুসরণ করে চলল।

জবানবন্দী লেখা শেষ হল। দুনিয়াটা যেন ভালোমানুষদের জন্যে নয় যাবার সময় এমনই একটা আহত হওয়ার ভাব করে আমার সঙ্গে করমর্দন করলে মুসি কার্পভিচ, তারপর উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে বুরুনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে। বললে:

'ছেলেরা, তোমাদের এ-সব কাজ করা ঠিক লয়। আমাদিগের সবারে বাঁচতি হবে তো।'

ইয়ার্কিভরা বিনয়নম্র ভঙ্গি করে বুরুন জবাব দিল:

'আর বলবেন না, আপনার সেবা করতি পারল্যে সদাই খুশি হই...' তারপর, হঠাৎ কথাটা মাথার মধ্যে উদয় হল ওর, 'আমি বলি কী, আন্তন সেমিওর্নভিচ, গাছটার কী গতি হবে?'

কথাটা সবাইকে ভাবাল। গাছটা তো প্রায় কেটে ফেলাই হয়েছে বলতে গেলে, এখন কালকের মধ্যে কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই বাকিটুকু কেটে বমাল সরিয়ে ফেলবে। আমাদের এই ভাবনার ফলাফল শেষপর্যন্ত কী দাঁড়াল তা শোনার জন্যে অপেক্ষা না-করে বুরুন দরজার দিকে এগোল। ঘর থেকে

বেরিয়ে যাওয়ার মুখে পেছন থেকে ইতিমধ্যে-সম্পূর্ণ-পর্যুদস্ত মুসি কার্পভিচকে লক্ষ্য করে একটা মন্তব্য ছুড়ে দিল।

'কিস্সু ভাববেন না — ঘোড়াটা ঠিক ফিরায়ে আনব-নে! আচ্ছা, ছেলেরা, আমার সাথে কে-ডা কে-ডা যাবে? ঠিক আছে — ছয় জনই যথেষ্ট। আচ্ছা, মুসি কার্পভিচ, আপনার সাথে দড়িদড়া কিছু আছে নাকি?'

'শ্লেজে বাঁধ্যে রাখছি দড়াগাছ।'

সকলেই বাইরে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে একটা ঢ্যাঙা পাইনগাছ কলোনিতে নিয়ে এল ওরা। ওটাই হল আমাদের পুরস্কার। তাছাড়া বহুকালের প্রচলিত প্রথা অনুসারে কুড়ুলটাও কলোনিতে রয়ে গেল। আর এরপর অনেক দিন ধরে যখনই কলোনির ভাঁড়ারে মজুত জিনিসপত্রের ফিরেফিরতি হিসেবনিকেশ করা হোত তখন কলোনির বাসিন্দারা পরস্পরকে বলত:

'আমাদের তো তিনডা কুড়াল ছিল। তিনডা কুড়াল বুঝায়্যে দিয়েছিলাম তোরে। এখন তো দেখি দুডা আছে — তেসরা কুড়ালডা গেল কোথা?'

'তেসরা? কোন্ তেসরা?'

'কোন্ডা আবার? মুসি কার্পভিচের কাছ থেক্যে কাড়্যে আনা হইছিল যে-কুড়ালখান, সেইডা।'

আসলে, নৈতিক শিক্ষাদান কিংবা মাঝে-মাঝে মেজাজ-দেখানোর ফলে যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি করে প্রতিকূল শক্তি বা উপাদানের বিরুদ্ধে এই ধরনের চিত্তাকর্ষক ও সঞ্জীবনী সংগ্রামই সুস্থ যৌথ-চেতনার প্রথম দ্বিধাগ্রস্ত বিকাশকে লালন করে তুলছিল। কোনো-কোনো সন্ধ্যায় দীর্ঘ আলোচনায় মেতে থাকতুম আমরা, কখনও প্রাণভরে হাসতুম, কখনও-বা আমাদের দুঃসাহসিক অভিযানগুলোর বর্ণনা দিতুম রঙ-ফলিয়ে। আর এইভাবে ওই সব অভিযানে যোগ দেয়ার মধ্যে দিয়েই আমরা ক্রমে-ক্রমে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিলুম, ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠছিলুম গোর্কি কলোনি নামে পরিচিত সেই সংহত, অখণ্ড, একক সত্তায়।

৬

# লোহার জলের ট্যাংক দখল

এই গোটা সময়টা ধরে আমাদের কলোনির অস্তিত্বের বৈষয়িক দিকটা ক্রমশ সংহত হয়ে উঠছিল। চরম দারিদ্র্য, পোকামাকড়ের উৎপাত, পায়ের আঙুলে তুষারক্ষত — এর কোনো কিছুই অপেক্ষাকৃত সুখী ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা থেকে আমাদের ঠেকাতে পারছিল না। যদিও আমাদের মধ্যবয়সী 'খোকাবাবু' আর বীজ-বোনার প্রাচীন যন্ত্রটা ফলাও করে চাষবাস করার পক্ষে মোটেই আশাব্যঞ্জক ছিল না, তবু করে খামার গড়াই ছিল আমাদের সব স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দু। চাষের কাজের পক্ষে আমাদের 'খোকাবাবু'-র অশ্ব-শক্তি এতই অপ্রতুল ছিল যে ওর লাঙল টানার কথা ভাবতে গেলে কল্পনাকে রাশ আলগা দিয়ে উদ্দাম দৌড় করানো দরকার হোত। তাছাড়া, আমাদের বাকি সকলের মতোই 'খোকাবাবু'ও পর্যাপ্ত খাবার পেত না। খড় পাওয়া দূরে থাক, ওর জন্যে অনেক কষ্ট করে তবে উলুখড় কিংবা মাঝে-মাঝে শুকনো ঘাস যোগাড় হোত। সারা শীতকাল ধরে আমরা কোথাও যাতায়াত করতে পারি নি, কেননা ওকে দিয়ে গাড়ি টানানোই ছিল একটা একটানা যন্ত্রণার ব্যাপার। তখন চাবুক না-হাঁকড়ানো পর্যন্ত 'খোকাবাবু' এক-পাও নড়ত না, আর ওই চাবুক হাঁকড়ে ভয় দেখাতে-দেখাতে কালিনা ইভানভিচের ডান হাতে তো স্থায়ী শূলব্যথাই জন্মে গেল।

এর চেয়েও বড় কথা, আমাদের কলোনির এক্তিয়ারভুক্ত জমি ছিল চাষবাসের পক্ষে একান্ত অযোগ্য। সে-জমির সঙ্গে নিছক বালির ফারাক ছিল উনিশ-বিশ, আর একটু হাওয়া দিলেই ধুলো সরে থাকে-থাকে ঢেউ খেলিয়ে যেত।

আজ এতকাল পরেও আমি ভেবে পাচ্ছি না যে আমরা যেখানে ছিলুম অমন একটা জায়গায় থেকে কী করে খামার গড়ার মতো এমন উদ্ভট কাজের ঝুঁকি নিতে সাহস করেছিলুম। অথচ ঠিক ওই ঝুঁকিটা নেয়ার ফলেই পরে আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছিলুম।

কাজটা শুরু হল কিন্তু এক মহা-আজগবি ধরনে।

একবার ভাগ্যদেবী কী কারণে যেন হঠাৎ আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হলেন, আমরা ওক-কাঠের একটা চালান পাওয়ার অনুমতি পেলুম। বলা

হল, যেখানে গাছ কাটা হচ্ছে সেই বন থেকে সরাসরি কাঠের চালান সংগ্রহ করতে হবে। যদিও ওই বিশেষ বনটা আমাদের গ্রাম-সোভিয়েতের এলাকাভুক্ত ছিল, তবু এর আগে আমরা ওদিকে আর কোনোদিন যাই নি।

কাছের খামারবাড়িটা থেকে আমাদের দু-জন প্রতিবেশীকে সঙ্গে নেয়ার ব্যবস্থা করলুম। একাধিক ঘোড়ার যোগান দিল ওরাই। অতঃপর একদিন আমরা অজ্ঞাত দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালুম। জায়গাটায় গিয়ে পেঁছনোর পর কালিনা ইভানভিচ ও আমার দু-জনেরই চোখ পড়ে গেল একটা বরফ-জমা ছোট নদীর ওপারের শরবনের মাথা ছাড়িয়ে অনেকখানি খাড়া-হয়ে-ওঠা দূরের একসার পপ্‌লারগাছের দিকে। স্লেজে কাঠ বোঝাই-করা আর রাস্তায় গাড়ি থেকে যাতে কাঠকাটরা পড়ে না-যায় সেজন্যে কাঠবোঝাইয়ের কাজ তদারকির উদ্দেশ্যে কাটা গাছগুলোর কাছে গাড়োয়ানদের রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

বরফ পেরিয়ে নদীর অপর পাড়ে একটা বীথিপথ-জাতীয় শড়ক ধরে আমরা একটা পাহাড়ে চড়লুম আর গিয়ে হাজির হলুম এক মৃত্যুপুরীতে। আমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় খানদশেক নানা আকারের দালান-ঘর — পাকা বাড়ি, গুদাম, চালাঘর, বারবাড়ি, আরও কত কি। তবে সবই প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সব বাড়িঘরেরই ছিল অনেকটা একরকম জরাজীর্ণ অবস্থা। একদিন যেখানে ঘর-গরম করার চুল্লী ছিল, দেখলুম সেখানে জড় করা রয়েছে তুষারে অর্ধেকটা চাপা-পড়া ইটের স্তূপ আর মাটির তাল। বাড়িগুলোর অনেকগুলো দেয়াল, ভিত, জানলা আর সিঁড়ি ধ্বসে পড়েছিল, কোথাও-কোথাও আবার ইটের দেয়াল আর ঘরের ছাদ গোটাটাই উপড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রকান্ড আস্তাবলটার মধ্যে অবশিষ্ট বলতে ছিল তার পেছন আর সামনের দেয়ালদুটো, আর ওই দুই দেয়ালের মাথায় ভর দিয়ে শূন্যে বিষণ্ণভাবে আর আহাম্মকের মতো দোদুল্যমান একটা আশ্চর্য সুন্দর লোহার ট্যাঙ্ক বা জলাধার। মনে হচ্ছিল, ট্যাঙ্কটার গায়ে যেন সদ্য রঙ করা হয়েছে। গোটা তালুকটাতে আর সবকিছুকেই মনে হচ্ছিল বাসি মড়া, একমাত্র ওই ট্যাঙ্কটাতেই ছিল যা-কিছু প্রাণের স্পন্দন।

তবে এ মড়া বাসি হলেও কিন্তু ছিল খুবই জাঁকালো। উঠোনের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল একটা প্লাস্টার বা আস্তর না-দেয়া নতুন দোতলা বাড়ি, তবে বাড়িটায় কিছুটা ফ্যাশনদুরস্ত ভাব ছিল। বিরাট উঁচু-উঁচু, প্রকান্ড ঘরগুলোর ছাদে তখনও টুকরো-টুকরো প্লাস্টারের ছাঁচ লেগে ছিল, আর

ছিল মার্বেল-পাথর বসানো জানলার তাকগুলো। উঠোনের বিপরীত দিকে ফাঁপা কংক্রিটে তৈরি একটা নতুন আস্তাবলও ছিল। এমন কি দালানগুলোর মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে জরাজীর্ণ অবস্থায় পৌঁছেছিল, কাছ থেকে পরীক্ষা করার পর সেই বাড়িগুলোরও ভিতের শক্ত গাঁথুনি, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ওক-কাঠের কড়ি, শক্তসমর্থ বাঁধুনি, পাতলা-পাতলা বরগা, আর উল্লম্ব রেখাগুলো আশ্চর্য নিখুঁত মাপজোকে তৈরি দেখে তাজ্জব না-বনে পারলুম না। বোঝা গেল, ওই বলিষ্ঠ-গড়ন আর্থিক কাঠামোটা জরা আর রোগের কবলে পড়ে মারা যায় নি, ওটাকে ওর যৌবনকালেই সুস্বাস্থ্য আর শক্তির সচ্ছলতা সত্ত্বেও গায়ের জোরে ধ্বংস করা হয়েছিল।

ঐশ্বর্যের এই বিপুল সমারোহ দেখে কালিনা ইভানভিচ ককিয়ে উঠল। চেঁচিয়ে বলল:

'দ্যাখেন, একবার দ্যাখেন ব্যাপারখান! নদী, বাগান — আর কী সব আবাদী জমি!..'

তালুকটাকে তিন দিক থেকে ঘিরে ছিল নদী। আমাদের সমতলভূমিতে যা দুষ্প্রাপ্য বস্তু সেই পাহাড়ের পা-ঘেঁষে বয়ে যাচ্ছিল নদীটা। নদীর দিকে ঢালু হয়ে নেমে-যাওয়া ফলের বাগানটা ছিল তিনটে থাক-কাটা। প্রথম থাকে ছিল চেরিগাছের বাগান, দ্বিতীয় থাকে আপেল আর নাশপাতির বাগান, আর সবচেয়ে নিচের থাকটা ঘন হয়ে বোঝাই হয়ে ছিল কালো ক্যারাণ্ট-ফলের ঝোপে।

প্রধান দালানটার অপর দিকের উঠোনে ছিল প্রকাণ্ড, পাঁচতলা একটা ময়দা-কল। কলের পাখাগুলো ঘুরে চলেছিল পুরোদমে। ওই কলের শ্রমিকদের কাছ থেকে আমরা জানলুম যে তালুকটা আগে ছিল ত্রেপ্‌কে-ভাইদের সম্পত্তি। বাড়িতে যা-কিছু ছিল সব ফেলে রেখে ত্রেপ্‌কেরা দেনিকিনের সেনাবাহিনীর সঙ্গে পালিয়ে যায়। বাড়িগুলোর অস্থাবর সম্পত্তি যা-কিছু ছিল সে-সমস্তই পাশের গন্‌চারোভ্‌কা গাঁয়ে আর কাছের খামারবাড়িগুলোয় অনেক আগেই স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল, আর ওই সময়ে বাড়িগুলোও লোকে ভেঙে নিয়ে যেতে শুরু করেছিল।

দেখেশুনে উত্তেজিত হয়ে কালিনা ইভানভিচের বকবকানি গেল বেড়ে। ও একেবারে যেন ফেটে পড়ল:

'বর্বর কাঁহাকা! শুয়োরের বাচ্চারা! ইডিয়টগুলান! সম্পত্তিডার দিক একবার তাকাইয়া দ্যাখ্! কী থাকনের দালানকোঠা! কী সব আস্তাবল! তরা,

কুত্তির বাচ্চাগুলান, এখানে থাকস নাই ক্যান? এখানে তোফা থাকতে পারতি, জমি চাষ-আবাদ করতি, আরামে কফি খেতি — তা না, তরা খালি জানস কুড়াল দিয়া কাইট্যা ঘরদোরেরে চেলাকাঠ বানাইতে। ক্যান? না, তগো মহামূল্যবান ময়দার পুডিং বানানো লাগবে, আর কুঁড়ের বাদশারা কাঠ চেলা করতে রাজি না তা-ই... ওই পুডিং তগো গলায় বাধুক, গর্দভগুলা, ইডিয়টগুলা! অরা কবরে যাওয়া'তক অমনধারাই রইয়া যাবে — কোনো বিপ্লবেই অদের মতন মানুষির কিছু যাবে-আসবে না... শুয়ারের বাচ্চারা, হতচ্ছাড়াগুলান, নারকী মোটামাথা যত সব! গোল্লায় যা সব!..' বক্তৃতার এই পর্যায়ে পাশ দিয়ে কলের একজন শ্রমিককে যেতে দেখে কালিনা ইভানভিচ গিয়ে তাকে ধরল, 'আমারে কইতে পারেন, কমরেড, ওই হোথায় ট্যাংকটারে পাওয়া যায় কীভাবে? ওই-যে, আস্তাবলের মাথায় খাড়াইয়া আছে? জিনিসটা তো ওখানে পইড়্যা-পইড়্যা নষ্ট হইয়া যাবে গিয়া, কারো কোনো ভোগেই লাগব না।'

'ওই ট্যাংকটা? তা, আমি শালার জানব কোত্থেকে? এখানকার সবকিছুর জন্যি গ্রাম-সোভিয়েত দায়ী...'

'তাই বুঝি? হুঁ, তাইলে তো এট্টা কিছু আছে!' কালিনা ইভানভিচ বলল। অতঃপর আমরা ঘরের দিকে রওনা দিলুম।

ফিরতি-পথে প্রতিবেশীদের শ্লেজগাড়িগুলোর পেছন-পেছন রাস্তার মসৃণ সমতলের ওপর দিয়ে বাড়ির দিকে হেঁটে আসছিলুম আমরা। ইতিমধ্যেই রাস্তাটা আসন্ন বসন্তের প্রভাবে ধরা দিতে শুরু করেছিল। হাঁটতে-হাঁটতেই কালিনা ইভানভিচ দিবাস্বপ্ন দেখতে শুরু করল: ওই ট্যাংকটারে যদি পাইয়া যাই তো চমৎকার হয়। ওটারে কলোনিতে আইন্যা ফালাইয়া ধোপাখানার ছাদে বসাইয়া দিমু'আনে, ধোপাখানাটারে তাইলে ইস্টিমের গোসলখানা বানাইয়া ছাড়ুম, না কী কন?

পরদিন সকালে আবার সেই বনের দিকে রওনা দেবার আগে কালিনা ইভানভিচ আমাকে পাকড়াও করল:

'লক্ষ্মী ভাইডি আমার, ওইটার ল্যেগে আমার হাতে গ্রাম-সোভিয়েতের কাছে একখান চিরকুট লেইখ্যা দ্যাও দেখি। পাছ-পকেটে কুত্তার যেমন কাম নাই, ওয়াদেরও ট্যাংক লইয়া তেমন কাম নাই, বরং আমাগো ইস্টিমের গোসলের ল্যেগে ট্যাংকের প্রেয়জন আছে...'

কালিনা ইভানভিচকে খুশি করার জন্যে দরখাস্ত একখানা লিখে দিতে

হল। ও ফিরল সঙ্ঘের দিকে, রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে:

'আ মরণ পরগাছাগুলার! সবকিছু অরা তত্ত্বকথার চোখ দিয়া দেখে, কাজের মানুষির চোখ দিয়া দ্যাখতে অপারগ! চুলায় যাক অরা! কয় কি, ওই একখান ট্যাংক নাকি রাষ্ট্রের সম্পত্তি। এমন গাড়লের মতন কথা শোনছ নি কোনোদিন? দয়া কইর‍্যা আমারে আরেকখান চিরকুট লেইখ্যা দ্যাও দেখি — আমি সোজা ভোলস্ত্* কার্যকরী কমিটির কাছে দরবার করতে যামু।'

'কিন্তু সেখানে যাবে কী করে? সে তো এখান থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে। কিসে যাবে তুমি?'

'আমার জানা একজন ওইমুখে যাইত্যাছে, সে আমারে সাথে লইয়া যাইব।'

কালিনা ইভানভিচের স্টিমের গোসলখানার প্রস্তাব কলোনির সকলের মনেই খুব ধরেছিল, কিন্তু ওর ট্যাংকটা পাওয়া সম্পর্কে কারো কোনো আস্থা ছিল না।

'ট্যাংকটা ছাড়াই আমরা ইস্টিমের গোসলখানার ব্যবস্থা করি না ক্যানে? কাঠের এট্টা ট্যাংক বানায়ে নিলিই হল।'

'ভারি তো বুঝদার দ্যাখতাছি! লোকে লোহার ট্যাংক বানাইত ক্যান? অরা বুঝত লোহার ট্যাংক না হইলে কাম চলে না। ট্যাংক আমি আদায় করুমই, অগো প্যাট হইতে অরে উগ্‌রাইতেই হইব...'

'কিন্তু ওটারে এখানে আনবেন কী উপায়ে? 'খোকাবাবু' ওটারে টেনে আনতি পারবে?'

'সে জন্য ভাবনার কিছু নাই! খাওনের দানা জোটলে শুয়ারের অভাব হয় না।'

ভোলস্ত্ কার্যকরী কমিটির কাছ থেকে কিন্তু কালিনা ইভানভিচ ফিরে এল আরও ক্ষিপ্ত হয়ে। মুখে ওর গালাগালির খৈ ফুটতে লাগল, গালিগালাজ ছাড়া অন্য শব্দ যেন ভুলেই গেল ও।

পরের সারা সপ্তাহটা জুড়ে আমার পিছু-পিছু ও ঘ্যানঘ্যান করতে-করতে ঘুরে বেড়াল। ছেলেরা যতই ওকে নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল ততই ও জিদ ধরতে লাগল 'উয়েজ্‌দ্** কার্যকরী কমিটির কাছে' আবার একখানা 'চিরকুট লেইখ্যা' দিতে।

* ভোলস্ত্ — জেলার অন্তর্গত ক্ষুদ্র অংশ বা অঞ্চল। — অনুঃ

** উয়েজ্‌দ্ — কয়েকটি ভোলস্ত্ নিয়ে গঠিত অঞ্চল বা পরগনা। — অনুঃ

'খ্যামা দাও দেখি, কালিনা ইভানভিচ। তোমার ওই ট্যাংক ছাড়া আরও অনেক জিনিস নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর আছে!'

'দয়া কইর‍্যা একখান চিরকুট লেইখ্যা দ্যাও! এয়াতে তোমার ক্ষতিবৃদ্ধি কী! কাগজ নষ্ট হইত্যাছে বইল্যা দিবার চাইত্যাছ না, না আর কিছু, কও দেখি? তুমি একবার শুধু লেইখ্যা দ্যাও, আর দ্যাখ তোমারে আমি ট্যাংকখান আইন্যা দিই।'

কালিনা ইভানভিচের জন্যে এবারও দরখাস্ত লিখে দিতে হল আমাকে। সেখানা পকেটজাত করার পর তবে অবশেষে ও সহজ হতে পারল, মুখে হাসি ফুটল:

'দ্যাশে কখনও এমন নিব্বুদ্ধির আইন কি থাকবার পারে — ভালো-ভালো সম্পত্তি সব নষ্টভ্রষ্ট হইয়া যাইব আর সক্কলে বইয়া-বইয়া দ্যাখব? আমরা তো এখন আর জারের রাজত্বে বাস করি না।'

কিন্তু ওই দিন একটু রাত করে উয়েজ্দ্ কার্যকরী কমিটির কাছ থেকে ফেরার পর কালিনা ইভানভিচ কি এজমালি শোবার ঘরে কি আমার ঘরে কোথাও দেখা দিল না। পরদিন সকালে ও যখন আমার ঘরে এল তখন জগৎ-সংসার সম্পর্কে কেমন-একটা নিস্পৃহ তাচ্ছিল্যের ভাব, নিঃসঙ্গ মানুষের উপযোগী গাম্ভীর্য নিয়ে জানলার বাইরে দূরের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল।

'না, কিস্সু হইল না,' দরখাস্তখানা আমাকে ফেরত দিয়ে ও সংক্ষেপে বলল।

দেখলুম, পুঙখানুপুঙখভাবে-বর্ণনা-দেয়া দরখাস্তখানার ওপর সরাসরি আড়াআড়িভাবে লাল কালিতে কাটখোট্টারকমের সংক্ষিপ্ত একটিমাত্র শব্দ, নির্ধারক আর হৃদয়-বিদারক চরম একটি কথা, লেখা আছে — 'না-মঞ্জুর'।

এই বিপর্যয়ের ব্যাপারটা নিয়ে কালিনা ইভানভিচ দীর্ঘ সময় গভীরভাবে বিচলিত হয়ে আর গুমরে-গুমরে কাটাল। প্রায় দু-সপ্তাহ ওর মধ্যে সেই আনন্দদায়ক বয়স্ক-জনোচিত প্রাণোচ্ছল ভাবটা দেখা গেল না।

ওই ঘটনার পরের রবিবার, মার্চ মাস যখন তুষারের অবশিষ্টাংশ সজোরে ঝেঁটিয়ে সাফ করছিল, তখন আমি ছেলেদের কয়েক জনকে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্যে ডাকলুম। খুঁজেপেতে কোনোরকমে কিছু গরম জামাকাপড় ওরা গায়ে চড়ানোর পর আমরা বেরিয়ে পড়লুম... ত্রেপ্কে তালুকের উদ্দেশ্যে।

'আচ্ছা, আমাদের কলোনিটাকে যদি এইখেনে উঠিয়ে নিয়ে আসি তাহলে কী হয়?' আমার চিন্তা সরব হয়ে উঠল।

''এইখেনে' মানে?'

'এই বাড়িগুলোয়।'

'তা কী করে হয়? এগুলো তো বাসযোগ্য নয়...?'

'আমরা সারিয়ে-সুরিয়ে মেরামত করে নিতে পারি।'

হো-হো করে হেসে উঠল জাদোরভ, তারপর উঠোনটার চারিধারে পাক খেতে শুরু করল।

'এখনও আমাদের তিন-তিনটে বাড়ি মেরামত করা বাকি। সারা শীতকালের মধ্যে আমরা তা করিয়ে উঠতে পারি নি।'

'জানি, জানি। কিন্তু ধর, যদি আমরা এই জায়গাটাকে মেরামত করিয়ে নিতে পারি?'

'ওহ্! তাহলে একটা কলোনির মতো কলোনি হয় বটে! নদী আছে — বাগান আছে — আবার একটা ময়দা-কলও আছে।'

হাঁচড়পাঁচড় করে ভগ্নস্তূপের মধ্যে ইতিউতি ঘুরে বেড়াতে লাগলুম আমরা, আর কল্পনার পাখা দিলুম মেলে: এইখানে আমাদের এজমালি শোবার ঘর হবে, এইটে হবে খাবার ঘর, এটা চমৎকার ক্লাব-ঘর হতে পারবে, আর স্কুলের ঘরগুলো হবে ওই দিকে।

ক্লান্ত, তবু প্রবল কর্ম-চঞ্চলতা নিয়ে ঘরে ফিরলুম সকলে। এজমালি শোবার ঘরে আমাদের ভবিষ্যৎ কলোনির খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে তুমুল হৈ-হল্লাসহ আলোচনা জমে উঠল। সভাশেষে রাত্রের মতো যে-যার ঘরে চলে যাবার আগে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না বললেন:

'ব্যাপারটা কী জান, ছেলেরা, দিবাস্বপ্নে মশগুল হওয়াটা স্বাস্থ্যকর নয়। এটা বলশেভিক ধরন নয়।'

এজমালি শোবার ঘরটায় একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল।

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্নার দিকে খ্যাপাটে চোখে একবার তাকিয়ে টেবিলের ওপর সজোরে একটা ঘুসি মেরে আমি ঘোষণা করলুম:

'আমি কথা দিচ্ছি! আজ থেকে এক মাসের মধ্যে ওই তালুক আমাদের হবে! কেমন, এটা বলশেভিক ধরন হচ্ছে তো?'

হাসিতে আর হাততালিতে ফেটে পড়ল ছেলেরা। ওদের সঙ্গে আমিও

হাসতে লাগল্ম, হাসতে লাগলেন একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্নাও।

ওই রাত্রে সারা রাত জেগে জেলা কার্যকরী কমিটির উদ্দেশ্যে আমি একটা বিবৃতি তৈরি করে ফেলল্ম।

এর এক সপ্তাহ পরে জেলা জনশিক্ষা-দপ্তর-প্রধান আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন:

'আপনার মতলবটা মোটেই খারাপ ঠেকচে না তো, -- চলেন, জায়গাটা একবার সরেজমিনে দেখেই আসা যাক।'

আরও একটা সপ্তাহ চলে গেল। আমাদের পরিকল্পনাটা নিয়ে জেলা কার্যকরী কমিটিতে আলোচনা চলতে লাগল। বোঝা গেল, বেশ কিছ্ সময় ধরে এই তাল্কের চিন্তাটা কর্তৃপক্ষের মাথায় ঘ্রছিল। আর আমিও সেই স্যোগে তাঁদের কাছে আমাদের কলোনির দারিদ্র্য ও অবহেলিত অবস্থা, আমাদের ভবিষ্যৎ বিকাশের স্যোগের অভাব, এবং আমাদের এই কলোনিতে যে-জীবন্ত একটা যৌথ সত্তা গড়ে উঠেছে — সেই খবরগ্লো জানিয়ে দিল্ম।

সব শ্নে জেলা কার্যকরী কমিটির চেয়ারম্যান বললেন:

'জায়গাটার মালিক দরকার হয়ে পড়্যেছে। ইদিকে এই সব লোকজন দেখতেছি, যারা কাজে নামতি চায়। কাজেই ওরাই জায়গাটার মালিক বন্যে যাক!'

অতঃপর ফিরে এল্ম আমি — হাতে নিয়ে ষাট দেসিয়াতিনা আবাদী জমিসহ্ধ প্রাক্তন ত্রেপ্কে তাল্ক ও তার মেরামতের ব্যাপারে আমার দেয়া হিসাবের অন্মোদন-সম্পর্কিত হ্কুমনামাখানা। এজমালি শোবার ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে আমার যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্ন নয়। আমাকে ঘিরে তখন উত্তেজিত ছেলেদের জটলা, উৎসাহের ঘ্র্ণিবাত্যা, উত্তোলিত হাতের অরণ্য।

'কই দেখি তো, দেখি তো একবার!'

এমন সময় একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না ঘরে ঢুকলেন। ছেলেরা ছ্টে গিয়ে নির্দোষ পরিহাসে ওঁকে অভিষিক্ত করতে লাগল। শেলাপ্তিনের রিন্রিনে সর্ গলা সব কিছ্ ছাপিয়ে বেজে উঠল:

'এটা কি বলশেভিক ধরন, না, অন্য কিছ্? এবারে বলেন দেখি!'

'ব্যাপার কী? কী হল?'

'এটা কি বলশেভিক ধরন? একবার দ্যাখেন দেখি!..'

কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারটায় কালিনা ইভানভিচের চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হয় নি।

'তুমি, মশয়, দারুণ লোক। ব্যাপারখান ঘটল দেখি সেই প্রেকার, ধর্মপ্রচারকগণ সেই-যে বইল্যা গ্যাছেন-না — 'প্রার্থনা কর, তুমি নিশ্চয় পাইবে, আঘাত কর, তোমার নিকট সকলই খুলিয়া যাইবে, এবং তুমি প্রাপ্ত হইবে...' '

'থুতনিতে এক জোরালো ঘুসি,' বলল জাদোরভ।

' 'থুতনিতে' আবার কী হইল? এয়া হইল গিয়া হুকুমনামা।' কালিনা ইভানভিচ বলল, জাদোরভের দিকে ফিরে।

'আপনি ধাক্কাধাক্কি করেছিলেন ট্যাঙ্কের জন্যে, কিন্তু পেলেন নাকের বদলে নরুন, মুখের ওপর এক ঠুসো। কিন্তু এখন যা হল — এটা হল গিয়ে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বের ব্যাপার, এটা নিছক আমাদের চাওয়ার বদলে পাওয়া নয়...'

'শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করার মতন বয়স হয় নাই তোমার, বোঝছ?' পালটা রসিকতা করে বলল কালিনা ইভানভিচ। ওই মুহূর্তে তাকে দমিয়ে দেবার সাধ্য কারো ছিল না।

এর পরের রবিবারই আমার ও এক পাল ছেলের সঙ্গে ও-ও চলল আমাদের নতুন জমিদারির তদারকিতে। আর কালিনা ইভানভিচের পাইপ থেকে জয়োল্লাসে-ভরা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ত্রেপ্‌কে-ভগ্নস্তূপের প্রতিটি ইটকে অভিসিঞ্চিত করতে লাগল। আত্মগরিমায় পূর্ণ হয়ে ট্যাঙ্কটার পাশ দিয়েও গটগট করে হেঁটে গেল ও।

বুরুন বিলকুল গম্ভীর হয়ে ওকে শুধোল, 'আচ্ছা, কালিনা ইভানভিচ, ট্যাঙ্কটা আমরা এখান থেকে সরাব কখন?'

'ক্যান? সরাইমু ক্যান?' কালিনা ইভানভিচ বলল। 'এখানেই ওটারে কোনো এট্টা কাজে লাগানো যাবে'খন। বোঝছ নি, এই আস্তাবলগুলান যে তৈয়ার করছে-না, এয়া হইল প্রয়োগবিদ্যার একবারে শেষ কথা!'

৭

## ‘প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো কাজের উপযুক্ত!’

ত্রেপ্‌কেদের উত্তরাধিকার এসে দখল নেয়ার ব্যাপারে আমাদের আনন্দোচ্ছ্বাসকে বাস্তব ঘটনার ভাষায় রূপদান করতে আমরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সক্ষম হলুম না। মেরামতির জন্যে প্রয়োজনীয় টাকা আর মালমশলা সরবরাহের অনুমতিদান একটা-না-একটা কারণে পিছিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু এ-ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়াল ছোট্ট, অথচ ভারি দুষ্টু, একটা নদী — কলমাক। আমাদের কলোনি আর ত্রেপ্‌কে তালুকের মধ্যে দিয়ে ছিল নদীটার গতিপথ, আর এপ্রিল মাসে দেখা গেল সে-নদী প্রাকৃতিক শক্তির এক জবরদস্ত প্রতিনিধি। প্রথমে আস্তে-আস্তে একগুঁয়ের মতো দুই কূল ভাসিয়ে দিল নদী, তারপর আরও ধীরগতিতে ফিরে এল নিজের ছোট্ট সীমানার মধ্যে, আর পেছনে রেখে দিল নতুন এক দুর্বিপাক — মানুষ কিংবা পশুর পথচলার অসাধ্য — কাদা।

‘ত্রেপ্‌কে’ (নতুন অর্জিত তালুককে ইতিমধ্যেই আমরা এই নামে অভিহিত করতে শুরু করেছিলুম) তাই এর পরেও দীর্ঘদিন ভগ্নস্তূপ হয়েই পড়ে রইল। ইতিমধ্যে ছেলেরা আনন্দে মেতে রইল বসন্তের আগমনে। সকালবেলা জলখাবারের পালা সাঙ্গ হলে পর কাজে বেরুনোর ঘণ্টা পড়ার জন্যে অপেক্ষা করার সময় তারা সার বেঁধে বসে থাকত গোলাঘরের বাইরেটায়। সূর্যের আলোয় গা খুলে বসে রোদ পোহাত তারা, আর উঠোনটা ছেয়ে থাকত তাদের অযত্নে ছুড়ে-ফেলা জ্যাকেটে। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা কথা না-বলে চুপচাপ রোদ্দুরের মধ্যে বসে থাকতে পারত ছেলেরা। এইভাবে শীতের মাসগুলোর শোধ তুলছিল ওরা, কেননা শীতকালে, এমন কি এজমালি শোবার ঘরের ভেতরেও, নিজেকে গরম রাখা বিষম শক্ত ছিল।

কাজের ঘণ্টার আওয়াজ শুনে ছেলেরা অবশ্য উঠে পড়তে বাধ্য হোত। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছাভরে পা ঘষটে-ঘষটে যে-যার জায়গায় চলে যেত। কিন্তু এমন কি কাজের সময়েও প্রায়-প্রায়ই যে-কোনো ছুতোনাতায় রোদ্দুরে গা-হাত-পা গরম করে নিত।

এপ্রিলের গোড়ায় ভাস্‌কা পলেশ্‌চুক কলোনি থেকে পালিয়ে গেল। যাকে বলা যায় কলোনির মনের মতো সদস্য, তা সে ছিল না। আগের ডিসেম্বরে জনশিক্ষা-দপ্তরের কোনো একটা টেবলে আমি ওর দেখা পাই: নোংরা, ছেঁড়াখোঁড়া জামাকাপড়-পরা একটা ছেলে, ছোট্ট একটা ভিড় ওকে ঘিরে ছিল। বিকৃতমস্তিষ্ক শিশুদের তত্ত্বাবধান-দপ্তর ওকে মানসিক দিক থেকে খুঁতওয়ালা বলে ঘোষণা করেছিল আর ওই রকম ছেলেদের একটা আশ্রমে ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু ছেঁড়া টেনা-পরা ছেলেটা এতে আপত্তি করে কাঁদতে-কাঁদতে বলছিল যে ও মোটেই পাগল নয়, ওরা ওকে ক্রাস্‌নদারে নিয়ে ইশ্‌কুলে ভরতি করে দেবে কথা দিয়ে নাকি ভুলিয়ে শহরে নিয়ে এসেছে।

'এত কান্নাকাটি কিসের?' আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম।

'অরা কতিছে, আমি নাকি পাগল...'

'ঠিক আছে — তোমার কথা শুনেছি। এখন চিৎকার থামিয়ে আমার সঙ্গে এস দিকি।'

'কিসে চাপ্যে যাব?'

'কিসে আবার? দুই পায়ে। চলে এস!'

'হি-হি-হি!..'

বাচ্চা ছেলেটার মুখে ঠিক-যে বুদ্ধির ছাপ ছিল তা নয়। কিন্তু ওর মধ্যে থেকে প্রাণশক্তি বিকীরিত হচ্ছিল। আমি মনে-মনে ভাবছিলুম: 'কী কাণ্ড! প্রত্যেকেই তো কোনো-না-কোনো কাজের উপযুক্ত...'

বিকৃতমস্তিষ্ক শিশুদের তত্ত্বাবধান-দপ্তর তাদের রক্ষণাধীন ছেলেটির দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করে খুশি হল। আমরাও কলোনির দিকে জোর কদমে রওনা দিলুম। পথে আসতে ছেলেটা সেই এক মামুলি কাহিনী শোনাল — বাপ-মা'র মৃত্যু আর চরম দারিদ্র্য দিয়ে যার শুরু। নিজের নাম বলল, ভাস্‌কা পলেশ্‌চুক। পেরেকোপ-আক্রমণে যোগ দিয়ে, ওর নিজের ভাষায়, ও নাকি 'আহত'-এর তালিকাভুক্ত হয়ে যায়।

কলোনিতে আসার পর প্রথম দিন ও সম্পূর্ণ বোবা হয়ে ঘুরে বেড়াল। শিক্ষক-শিক্ষিকারা বা ছেলেরা কেউই ওর মুখ থেকে একটা কথা বের করতে পারল না। সম্ভবত এ-ঘটনার আগেও এই রকমই কোনো কিছু ঘটায় আমাদের পণ্ডিতপ্রবররা সিদ্ধান্ত করে বসেছিলেন যে পলেশ্‌চুক মানসিক দিক থেকে খুঁতওয়ালা।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে অন্য ছেলেদের মনে ধাঁধা লাগল। আমার কাছে ওরা অনুমতি চাইল ওর ওপর ওদের নিজস্ব পদ্ধতি প্রয়োগ করবে বলে। বললে, আর কিছু করবে না ছেলেটাকে শুধু ভয় দেখাবে, আর তাহলেই ও কথা বলবে। কিন্তু আমি সোজা বারণ করে দিলুম, ও-সব কিছু করা চলবে না। ওই বোবা ছেলেটাকে কলোনিতে নিয়ে এসেছি বলে তখনই আমার অনুতাপ হচ্ছিল।

আর তারপর, হঠাৎই একদিন পলেশ্‌চুক কথা বলতে শুরু করল, আপাতদৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র কোনোরকম খোঁচখুঁচি ছাড়াই। হতে পারে হয়তো নিছক উষ্ণ বসন্তদিনের প্রভাবেই, ভেজা-মাটি থেকে তখনও পর্যন্ত সূর্য যে-বাষ্প শুষে নিচ্ছিল তারই সোঁদা সৌগন্ধ্যে ভরপুর দিনের নেশায় বুঁদ হওয়ায়। পলেশ্‌চুক কথা বলতে লাগল তীক্ষ্ন তারস্বরে, অনর্গল, কথার ফাঁকে-ফাঁকে কখনও হাসিতে ফেটে পড়তে লাগল, কখনও-বা লাফালাফি জুড়ে দিল। দিনের-পর-দিন ও আমার পাশ ছাড়ত না, অবিশ্রান্ত বকবক করে যেত লাল ফৌজে কী-আনন্দের জীবন ছিল ওর সে-সম্পর্কে আর কম্যান্ডার জুবাতের কথা নিয়ে।

'আহা, কী লোক ছিলেন! ওঁর চোখদুটো এমন কুচকুচে কালো, এত নীল যে উনি কারো দিকি তাকালি সে ভয়ে হিম হয়্যে যেত। উনি যখন পেরেকোপে ছিলেন আমাদের জোয়ানরাই ওঁর ভয়ে তটস্থ থাকত।'

'তুই তো খালি জুবাত-জুবাত করিস, জুবাতের ঠিকানা জানিস?' ছেলেরা ওকে শুধোত।

'ঠিকানা, মানে?'

'ওঁর ঠিকানা — ওঁরে কোথায় চিঠি লিখতি হয় জানিস?'

'না, জানি না। আমি ওঁরে চিঠিই-বা লিখতি যাব ক্যানে? আমি সোজা নিকলায়েভের কাছে যাব, আর ওখেনেই ওঁরে পায়্যে যাব...'

'যা-যা, সে তোরে ভাগায়ে দিবে...'

'কখনও না! অন্য জনাই আমারে ভাগায়ে দিইছিল। সে-লোকটা কইল কি: 'এই হাবাটারে নিয়ি মাথা ঘামায়ে লাভ কী?' কিন্তুক আমি তো হাবা নই, হাবা কী?'

দিনের-পর-দিন যাকে সামনে পেত পলেশ্‌চুক তার কাছেই জুবাতের গল্প সাত কাহন করে ফেঁদে বসত — তাঁর সুন্দর চেহারা, তাঁর সাহস, আর

গালাগালি দেবার সময়ও তিনি কেমন সত্যিকার খারাপ কথা মুখে আনতেন না, এই সব।

'তুই কি পালাতি চাস?' ছেলেরা ওকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করত।

প্রশ্ন শুনে আমার দিকে এক ঝলক তাকাত পলেশ্‌চুক, তারপর চিন্তায় ডুবে যেত। ব্যাপারটা নিয়ে ও-যে বেশ মাথা ঘামিয়েছে তা বোঝা যেত তখন, যখন বাকি সবাই ওর কথা ভুলে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময় যে-ছেলেটি ওকে ওপরের ওই প্রশ্নটা করেছিল তাকে আচমকা পাকড়াও করে ও শুধোত:

'আন্তন কি রাগ করবেন?'

'কেন, কী জন্যি?'

'এই — যদি আমি পালাই?'

'তাই তো মনে হয়! তোর জন্যি উনি তো অনেক কষ্টস্বীকার করেছেন!..'

শুনে ভাস্‌কা আবার চিন্তায় ডুবে যেত।

তারপর একদিন, সকালের জলখাবারের পালা শেষ হওয়ার পরেই, শেলাপুতিন আমার ঘরে ছুটে এল।

'ভাস্‌কারে কলোনির কোথাও খুঁজি পাওয়া যাচ্ছে না... ও সকালের জলখাবারও খায় নাই — ও নিঘ্‌ঘাত পালায়েছে! জুবাতের কাছে চল্যে গেছে!'

উঠোনে ছেলেরা আমায় ঘিরে ধরল। ভাস্‌কার চলে যাওয়ার ব্যাপারটা আমি কীভাবে নিতে যাচ্ছি তা ওরা দেখতে চাইছিল।

'পলেশ্‌চুক নিশ্চয়ই পালায়েছে, যতই যাই হোক...'

'বসন্তকাল বল্যেই...'

'ক্রিমিয়ায় পালায়েছে ও...'

'ক্রিমিয়ায় নয়, নিকলায়েভে...'

'রেলস্টেশনে গেলি এখনও আমরা ওরে ধরতি পারতাম...'

ভাস্‌কাকে নিয়ে গর্ব করার মতো কিছু ছিল না, তবু ওর এই দলত্যাগে আমার বেশ কষ্ট হল। এটা স্বীকার করে নিতে মনে বেশ তিক্ততার সঞ্চার হচ্ছিল যে ওখানে এমন একজন ছিল যে আমাদের সামান্য উপচার গ্রহণযোগ্য মনে করল না, আরও ভালো কিছুর সন্ধানে আমাদের ছেড়ে গেল যে। সেই

সঙ্গে এটাও আবার আমি ভালোই জানতুন যে আমাদের দারিদ্র্যপীড়িত কলোনির পক্ষে মানুষকে আমাদের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলা সম্ভব ছিল না।

ছেলেদের বললুম:

'ও চুলোয় যাক! ও যদি চলে গিয়ে থাকে, তো গ্যাছে! আমাদের অন্য অনেক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর আছে।'

এপ্রিল মাসে কালিনা ইভানভিচ হালচাষ শুরু করে দিল। একটা একেবারে অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে এটা সম্ভব হয়ে উঠল। শিশু ও কিশোর অপরাধী-সম্পর্কিত কমিশনের সামনে ঘোড়া-চোর একটা বাচ্চা ছেলেকে উপস্থিত করা হয়। অপরাধীকে তো কোনো একটা জায়গায় চালান করে দেয়া হল, কিন্তু ঘোড়ার মালিককে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। একটা সপ্তাহ কমিশনের কাটল খুবই যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে, কারণ ঘোড়ার মতো এমন ঝঞ্ঝাটের বৈষয়িক সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে কমিশনকে তার আগে আর কখনও নাড়াচাড়া করতে হয় নি। এমন সময় কালিনা ইভানভিচ কমিশনের ত্রাণকর্তা হিসেবে অকুস্থলে আবির্ভূত হল। পাথরে-বাঁধানো উঠোনের মাঝখানে পরিত্যক্ত-অবস্থায় দাঁড়িয়ে-থাকা নিরীহ অবোলা জীবটার এহেন শোচনীয় দুর্গতি সচক্ষে দেখে বিনা বাক্যব্যয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে কলোনিতে নিয়ে এল সে। পিছু-পিছু তার নিশ্চয়ই কমিশন-সদস্যদের স্বস্তির নিশ্বাসের সুবাতাসও বয়ে এল।

কালিনা ইভানভিচ কলোনিতে উপস্থিত হলে আনন্দোচ্ছ্বাস আর বিস্ময়সূচক হাঁকডাকে একটা সাড়া পড়ে গেল। নিজের কাঁপা-কাঁপা হাতে কালিনা ইভানভিচের হাত থেকে লাগামজোড়া তুলে নিল গুত্, আর তার মনের উদার প্রান্তরে কালিনা ইভানভিচের সনির্বন্ধ অনুরোধের বীজ গভীরভাবে বোনা চলতে লাগল:

'দেইখ্যো, সাবধান কিন্তু! তমরা আপনেগো সাথে যেমন ব্যাভার কইর‍্যা থাক, উয়ার সাথে অমনটি করলে চলব না! উয়া তো নিরীহ জীব মাত্র — তায় আবার অবোলা। ভালোই বোঝো, উ নালিশ পর্যন্ত জানাইতে পারব না। কিন্তু যদি উয়ারে উত্ত্যক্ত কর আর উ তমার মাথার চাঁদিতে একখান লাথ্থি ঝাড়ে তো আন্তন সেমিওনভিচের কাছে কাইন্দ্যে কূল পাইবা না! কাইন্দ্যে বুক ভাসাইয়া দিলেও লাভ কিছু হইব না। উলটা, আমিই তমারে পাকড়াও কইর‍্যা মুন্ড ভাঙুম!'

গুরুগম্ভীর আলোচনারত ওই দু-জনকে ঘিরে আমরা বাকি সকলে তখন ভিড় জমিয়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু গুতের মাথার ওপর শাসানির এই ভয়ঙ্কর খড়গ দোলাতে দেখেও কেউ তাতে আপত্তি করার কথা কল্পনাতে আনছিল না। মুখে পাইপ, খুশিতে-ঝলোমলো কালিনা ইভানভিচ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একটানা শাসানি দিয়ে বক্তৃতা করে চলেছিল। ঘোড়াটা দেখলুম উৎকৃষ্ট জাতের বাদামি রঙের, বয়সও তেমন বেশি নয়, আর বেশ হৃষ্টপুষ্টও।

কালিনা ইভানভিচ আর ছেলেদের মধ্যে কেউ-কেউ কয়েক দিন ধরে গুদামঘরে ব্যস্ত হয়ে রইল। হাতুড়ি, স্ক্রু-ড্রাইভার আর লোহার টুকরো-টাকরা দিয়ে এবং অবিশ্রান্ত নীতিগর্ভ বাগাড়ম্বরের সঙ্গত সহযোগে পূর্ববর্তী কলোনির ফেলে-যাওয়া জঞ্জালের মধ্যে খুঁজে-পাওয়া এটা-ওটা-সেটা থেকে কোনোরকমে জোড়াতাড়া দিয়ে ওরা একধরনের একখানা লাঙল বানিয়ে ফেলল।

অবশেষে সেই পরম সুখের দিনটি এসে উপস্থিত হল যেদিন বুরুন আর জাদোরভ জমিতে লাঙল দিল। কালিনা ইভানভিচ ওদের পাশে-পাশে যেতে-যেতে অনবরত ফুট কাটতে লাগল:

'আরে-আরে, পরগাছাগুলান! এয়ারা দেখি হাল পর্যন্ত ঠেলবার পারে না — ওই তো ওইখানে ভুল হইত্যাছে, আরে ওইখানে, ওইদিকেও...'

ছেলেরাও নির্দোষ রসিকতা করে জবাব দিতে লাগল:

'কেমন করে লাঙল দিতে হয় নিজে একবার দেখিয়ে দ্যান না, কালিনা ইভানভিচ। আপনি নিশ্চয় জীবনে কখনও একবারের জন্যেও লাঙল ধরেন নি।'

মুখ থেকে তামাকের পাইপ সরিয়ে মূর্তিটা যতদূর ভয়ঙ্কর করা সম্ভব তা করে কালিনা ইভানভিচ বলল:

'আমি? আমি কখনও লাঙ্গল ধরি নাই? আরে, নিজে হাতে আবার চাষ করন লাগে নাকি? ব্যাপারখান ভালো কইর‍্যা বোঝন লাগে খালি, বোঝলা? তমরা যেই ভুল করত্যাছ আমি অমনে ধইর‍্যা ফ্যালাইতাছি — কিন্তু তমরা ধরবার পারত্যাছ না।'

গুত্ আর ব্রাত্চেঙ্কোও ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। গুত্ আগাগোড়া চোরা-চাউনিতে লক্ষ্য রাখছিল লাঙলধারীরা ঘোড়াটার ওপর দুর্ব্যবহার করছে কিনা, আর ব্রাত্চেঙ্কো মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে খালি 'লালু'-র

পিছু-পিছু যাচ্ছিল। গুতের রক্ষণাবেক্ষণে নিজেকেই ও আস্তাবলের পরিচারক নিযুক্ত করেছিল।

বড় ছেলেদের মধ্যে কেউ-কেউ গুদামঘরে-রাখা বীজ-বোনার পুরনো যন্ত্রটা নিয়ে বেজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সফ্রোন গলভান ওদের কাজকর্মের তদারকি আর চেঁচামেচি করে বেড়াতে লাগল, প্রযুক্তিবিদ্যায় ওর বিশাল পাণ্ডিত্যে ওদের সহজে ছাপ-রেখে-যায় এমন হৃদয় বিনম্র শ্রদ্ধায় পূর্ণ করে দিয়ে।

সফ্রোন গলভান এমন কিছু-কিছু প্রাণবন্ত চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল যা তাকে আশপাশের লোকজন থেকে পৃথক করে চিনিয়ে দিত। ওর ছিল জান্তব প্রাণশক্তিতে ভরপুর প্রকাণ্ড চেহারা। কোনো সময়ে সত্যিকার মাতাল না-হয়েও সর্বদাই এক-আধটুকু গোলাপি নেশায় ভোর-হয়ে-থাকা লোকটার দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে নিজস্ব মতামত থাকত, যদিও সে-সবই হোত আশ্চর্যরকম ভ্রান্ত মতামত। গলভান ছিল কুলাক (ধনী) চাষী আর কামারের এক মারাত্মক সংমিশ্রণ। ওর ছিল দু-খানা চালা-বাড়ি, তিনটে ঘোড়া, দুটো গরু, আর একখানা কামারশাল। কুলাক-সুলভ ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও ও কিন্তু দক্ষ কামার ছিল, আর ওর মাথার চেয়ে হাত দুখানা ছিল আরও নিপুণ, আরও সাফ। সফ্রোনের কামারশাল ছিল খার্কভমুখো বড় রাস্তার ওপর সরাইখানাটার একেবারে পাশেই। গলভান-পরিবারের পয়সার কপাল খুলে যাওয়ার মূলে ছিল কামারশালটার ওই বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান।

কালিনা ইভানভিচের আমন্ত্রণে গলভান কলোনিতে এসেছিল। আমাদের গুদামঘরগুলোয় যন্ত্রপাতি যা-হোক তবু মিলেছিল, কেবল কামারশালটাই পড়ে ছিল ভাঙাচোরা অবস্থায়। ওর নিজস্ব নেহাই আর হাপর, সেই সঙ্গে আরও কয়েকটা বাড়তি যন্ত্রপাতিও কলোনিতে নিয়ে আসার এবং কামারের কাজ শেখানোর ভার নেয়ার প্রস্তাব ও নিজে থেকেই দিয়েছিল। নিজের খরচে আমাদের কামারশালাটা মেরামত করে দিতেও রাজি ছিল ও। আমাদের সাহায্য করার ব্যাপারে ওর এই আগ্রহের কারণ প্রথমটা আমি ধরতে পারি নি, তবে কালিনা ইভানভিচের সান্ধ্য 'প্রতিবেদন' পেশ করার সময় আমার সব সংশয়ের অবসান ঘটল।

তামাকের পাইপ ধরাতে আমার বাতির চিমনির ভেতরে খবরের কাগজের লম্বা টুকরোটা পুরে দিয়ে কালিনা ইভানভিচ খবর দিল:

'ওই পরগাছা সফ্রোন-ব্যাটার আমাগো কাছে আসতে চাওয়ার জবর কারণ

আছে। মুজিক-চাষীলোকগুলা উর পিছে লাগছে, বোঝলা নি, আর উ ভয় পাইত্যাছে অরা উয়ার কামারশালখান বাজেয়াপ্ত কইর‍্যা লইব। কিন্তু উ যদি এখানে থাকে — ব্যাপারখান বোঝলা নি — তাইলে সবাই মনে করব উ বুঝি সোভিয়েতের হইয়া কাম করত্যাছে।'

'লোকটাকে নিয়ে কী করা যায় বল তো?' আমি প্রশ্ন করলুম।

'আরে, উয়ারে থাকতে দ্যাও! নাইলে আমাগো কাছে আর কে আসব? নাইলে হাপর পামু কোথা থেইক্যা? আর, যন্তরপত্তর হেনা-তেনা? হাতের কাম শিখানোর ম্যাস্টররেই বা থাকতে দিমু কোন্ চুলায়? আর একখান ঘর বেশি ব্যাভার করন লাগলে আমাগো ছুতার ডাকবার পড়ব না? তাছাড়া...' বলতে-বলতে কালিনা ইভানভিচ চোখদুটো কোঁচকাল, 'উ কুলাক আছে তো হইছে কী?.. সৎ লোকের মতন উ কাম করবে-আনে, দ্যাখবা।'

চিন্তিতভাবে আমার ঘরের নিচু ছাদের দিকে মুখ করে ভকভক করে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে হঠাৎ হাসি ছড়িয়ে বলল কালিনা ইভানভিচ:

'মুজিকগুলা, ওই পরগাছাগুলা, উয়ার কামারশালখান বাজেয়াপ্ত করবেই, ছাড়ব না উয়ারা। কিন্তু তাইতে কার কী ভালো হইব কও দেখি? ওয়া তো এমনেই বেকার পইর‍্যা রইব। বরং এয়ার মধ্যি আমাগো কামারশালখান তৈয়ার হইয়া যাইব-আনে — সফ্রোন-ব্যাটারও যা দু-চার পয়সা আসে আসুক। এখন উয়ারে সাথে রাইখ্যা চলুম, তারপর আমাগো কাম ফতে হইলেই উয়ারে কাচকলা দেখামু। তখন উরে কমু-আনে, আমাগো এয়া সোভিয়েত প্রতিষ্ঠান, আর তুই, তুই ব্যাটা কুত্তির বাচ্চা, রক্তচোষা জোক ছাড়া তুই কী, তুই ব্যাটা জনগণের শোষক কোথাকার। হোঃ, হোঃ, হোঃ!..'

ইতিমধ্যে তালুক মেরামতের জন্যে নির্দিষ্ট বরাদ্দ অর্থের একটা অংশ আমরা পেয়ে গেলুম, কিন্তু সে-অংশটা পরিমাণে এতই কম ছিল যে আমাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে প্রাণপণে কাজে লাগাতে হল। সবকিছু নিজ হাতে করার দরকার হয়ে পড়ল, তাই আমাদের প্রয়োজন হল নিজস্ব কামারশালা আর ছুতোরশালা গড়ে তোলার। কোনোরকমে কাজ-চালানোর মতো কাঠমিস্ত্রির কাজের টেবিল আমাদের ছিল, যন্ত্রপাতি আমরা কিনে নিলুম, তারপর শিগ্গিরই ছুতোরশালে কাজ শেখানোর শিক্ষক যোগাড় হয়ে গেল। শিক্ষকের পরিচালনায় ছেলেরা উৎসাহের সঙ্গে শহর থেকে আমদানি-করা কাঠের তক্তা চেরাই শুরু করে দিল; এইভাবে তৈরি হতে লাগল নতুন

কলোনির জানলার কাঠামো আর দরজা। দুঃখের বিষয় আমাদের ছুতোর-মিস্ত্রিদের কারিগরি জ্ঞান এত নিচুস্তরের ছিল যে নতুন বাসস্থানের উপযোগী জানলা-দরজা তৈরির কাজ প্রথম দিকে রীতিমতো যন্ত্রণাদায়ক-রকমের কঠিন হয়ে দাঁড়াল। কামারশালেও আমাদের প্রচুর কাজ করবার ছিল, কিন্তু সেখানেও প্রথম দিককার কাজ গর্ব করবার মতো কিছু ছিল না। সোভিয়েত রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের পর্যায় শেষ করার ব্যাপারে সফ্রোনের কোনো তাড়া ছিল না। প্রশিক্ষক হিসেবে ও যা মাইনে পেত তা মোটেই বেশি ছিল না, এবং মাইনের দিন সবাইকে দেখিয়ে-দেখিয়ে মাইনের পুরো টাকাটাই যে-কোনো ছেলের হাতে তুলে দিয়ে তাকে 'তিন বোতল ফাস্টো কেলাস' কিনে আনতে পাঠিয়ে দিত মদ-চোলাইয়ের কারবার করে এমন এক বুড়ির বাড়ি।

প্রথম দিকে কিছুদিন আমি এ-সবের কিছুই জানতুম না। আমি তখন পুরোপুরি আলতারাপ, কব্জার পাত, কব্জা, তালা, ইত্যাকার শব্দের যাদুতে মোহিত হয়ে ছিলুম। আমাদের কাজকর্মের পরিধি হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ায় ছেলেরাও আমারই মতো উত্তেজিত অবস্থায় ছিল। খুব শিগ্‌গিরই ওদের মধ্যে থেকে ছুতোর-মিস্ত্রি আর চাবিতালা বানানেওয়ালা গজিয়ে উঠল, আর ইতিমধ্যে খরচ করার মতো কিছু অর্থও আমাদের হাতে এসে গেল।

কামারশাল চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে-উদ্দীপনা দেখা দিল তাতে আমরা রীতিমতো রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলুম। সকাল আটটা থেকে নেহাইয়ের প্রাণমাতানো ঠন্‌ঠন আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ত সারা কলোনিতে; কামারশাল থেকে সব সময়েই ভেসে আসত হাসির শব্দ, হাট-করে-খোলা ওর দরজাগুলোর মুখে সর্বদাই দু-তিন জন গাঁয়ের লোক ভিড় জমিয়ে থাকত আর ওখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই কৃষিকাজ, খাজনা, কোম্‌বেত*-এর সভাপতি ভের্‌খোলা, গরুঘোড়ার জাবনা, আর আমাদের বীজ-বোনার যন্ত্রটা নিয়ে নিত্য আলোচনার বড়-একটা হেরফের ঘটতে দেখা যেত না। খামারীদের ঘোড়ার পায়ে নাল-লাগানো, গাড়ির চাকায় রবারের টায়ার ফিট্ করা, আর লাঙল মেরামতির কাজ আমরাই করতে লাগলুম। অপেক্ষাকৃত গরিব চাষীদের কাছ থেকে কাজ-বাবদ আমরা অর্ধেক দাম নিতে লাগলুম আর এ-ব্যাপারটা সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের বিচার সম্বন্ধে অন্তহীন আলোচনার ইন্ধন যোগাল।

* কোম্‌বেত — গরিব কৃষকদের সমিতি। — অনুঃ

সফ্রোন আমাদের একখানা এক্কাগাড়ি বানিয়ে দিতে চাইল। কলোনির গুদাম আর চালাঘরগুলোয় ভরতি জঞ্জালের স্তূপ থেকে খুঁড়ে বের করা হয়েছিল গাড়ির কাঠামো-জাতীয় একটা কিছু। কালিনা ইভানভিচ শহর থেকে নিয়ে এল গোটা দুই চাকা-বাঁধুনি ডাণ্ডা। পুরো দুটো দিন ওই ডাণ্ডাদুটোকে নেহাইয়ে ফেলে বড়-ছোট নানারকম হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হল। অবশেষে সফ্রোন জানিয়ে দিল এক্কাগাড়ি প্রায় তৈরি, এখন খালি খান দুই করে স্প্রিং আর চাকা হলেই গাড়ি চালু করা যায়। কিন্তু আমাদের স্প্রিং বা চাকা কিছুই মজুত ছিল না। একবারের হাত-ফিরতি পুরনো স্প্রিংয়ের সন্ধানে আমি সারা শহরটা চষে বেড়াতে লাগলুম, আর কালিনা ইভানভিচ জমাল গ্রামাঞ্চলের অভ্যন্তরে লম্বা পাড়ি। পুরো একটা সপ্তাহ কালিনা ইভানভিচ বাইরে কাটাল। তারপর ফিরে এল দু-জোড়া আনকোরা নতুন চাকার বেড় আর অভিজ্ঞতা আর ধারণার রীতিমতো একটা পুঁজি সঙ্গে নিয়ে। এই সব ধ্যানধারণার মধ্যে প্রধান ছিল:

'মুজিকরা কত-না গণ্ডমুখ্যু!'

একদিন সফ্রোন সঙ্গে করে নিয়ে এল খামারখোলার এক বাসিন্দা, কোজিরকে। চল্লিশ বছর বয়স্ক, শান্ত-স্বভাব, ভদ্র মানুষ কোজিরের মুখে সব সময়ে একটা উজ্জ্বল হাসি লেগে থাকত, আর নিজের দেহে কথায়-কথায় ক্রুশচিহ্ন আঁকা ছিল ওর নেশা। ও তখন সবে পাগলাগারদ থেকে ছাড়া পেয়েছে, আর স্ত্রীর নাম শুনলেই ভয়ে কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে ওর। এর কারণ, জেলার মনোরোগ-বিশেষজ্ঞদের ভুল রোগ-নির্ণয়ের মূলে ছিল ওর স্ত্রী। কোজিরের পেশা ছিল গাড়ির চাকা বানানো। চারখানা চাকা বানানোর ফরমায়েস করায় ওর আনন্দ দেখে কে। ওর শোচনীয় পারিবারিক জীবনের কারণে আর সন্ন্যাস-জীবন যাপনের দিকে ঝোঁক থাকায় একটা বিশুদ্ধ বাস্তব প্রস্তাব করে বসল ও:

'কমরেডস — (ভগমান ক্ষমা কর!) — আপনেরা এই বুড়া মানুষটারে ডাইক্যে পাঠায়েছেন, তাই না? তা, ধরেন ক্যানে, আমি যদি এখন এইখেনেই থাইক্যে যাই আপনেদের সাথে মিলেমিশি, তাইলে?'

'কিন্তু তোমাকে আমরা থাকতে দেব কোথায়?'

'তা নিয়ে ঘাবড়াইবেন না। জায়গা আমি ঠিক খুঁজিপেতি বার কর্যে নেব'খন। ভগমান সহায়! এখন তো গ্রীষ্মিকাল, শীতকাল আল্যে ও চালায়ে

দেব একরকম করি। আমি তো দিব্যি ওইখেনে ওই চালাঘরডার ভিত্রি থাকতি পারি, খুব আরামেই থাকব-নে...'

'ঠিক আছে — থাকতে পার তাহলে।'

শুনে দেহে ক্রুশচিহ্ন আঁকল কোজির। তারপর, পরক্ষণেই আসল ব্যাপারে কাজের কথায় এল:

'চাকার বেড় ঠিক যোগাড় হয়্যে যাবানে। এ কালিনা ইভানভিচের কম্মো নয়, আমিই জানি কী করতি হবে। চাকার বেড় আপনা থেকি গড়গড় করি আমাদের কাছে আসবে, মুজিকরাই নিয়্যে আসবে, দ্যাখবেন'খন। ভগমান আমাদের অভাবের মধ্যি কখ্‌খনো রাখব্যে না।'

'কিন্তু চাকার বেড় দিয়ে আমাদের আর দরকার কী, চাচা?'

'দরকার নাই, দরকার নাই? ভগমানের দোহাই!.. আপনেদের প্রেয়োজন না থাকতি পারে, কিন্তু অন্য লোকের আছে। গাড়ির চাকা ছাড়া মুজিক বাঁচবে কী প্রেকারে? তা আপনেরা চাকা বেচি দু-পয়সা কামাই করতি পারেন, ছেলেপেলেদের লাভ হবে বৈ তো নয়।'

কালিনা ইভানভিচ হেসে উঠে কোজিরের এই সনির্বন্ধ মিনতিকে সমর্থন জানাল। বলল:

'ধুত্তোরি, লোকটা থাউক। প্রিকৃতি বড় আজব জিনিস, বোঝলা কিনা — এমন কি মানুষিও একটা-না-একটা কাজে লাইগ্যা যায়।'

কোজির কলোনির সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। এজমালি শোবার ঘরের পাশেই ছোট্ট ঘরখানায় বাসা বাঁধল ও। ওখানে ও স্ত্রীর হাত থেকে পুরোপুরি নিরাপদ হতে পারল। ওর স্ত্রীটি ছিল সত্যিই দুর্দান্ত মর্দানী স্ত্রীলোক। মহিলাটির আক্রমণ থেকে কোজিরকে রক্ষা করার কাজটা ছেলেরা দারুণ উপভোগ করত। কলোনিতে সে-মহিলার দেখা দেয়া মানেই ছিল চিৎকার-চেঁচামেচি আর গালাগালির তুফান ছুটিয়ে দেয়া। সে এসেই দাবি জানাত তার স্বামীকে পরিবারের কোলটিতে ফিরিয়ে দেয়া হোক, সেই সঙ্গে তার পারিবারিক সুখশান্তি নষ্ট করার দায়ে আমাকে, ছেলেদের, সোভিয়েত গভর্নমেন্টকে আর 'ওই ভবঘুরে সফ্রোনটা'কে দোষী সাব্যস্ত করত। বিশেষ কোনো রাখঢাকের ধার না-ধেরে ছেলেরা ব্যাজস্তুতি করে মহিলাকে বোঝাত যে কোজির স্বামী হিসেবে মোটেই উপযুক্ত নয়, আর তাছাড়া গাড়ির চাকা বানানো পারিবারিক সুখশান্তির চেয়ে অনেক বেশি দরকারি জিনিস। আর

এই গোটা আলোচনার সময়টায় কোজির তার ছোট্ট ঘরখানায় জড়সড় হয়ে বসে থাকত, স্ত্রীর আক্রমণ শেষপর্যন্ত প্রতিহত না-হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করত। একমাত্র যখন হ্রদের অপর পার থেকে ওর অভিমানাহত স্ত্রী-রত্নের দুঃসহ বিলাপোক্তি কানে আসত, বহুদূর থেকে শোনা যেত ওর উদ্দেশে '...বাচ্চা কোথাকার... চুলায় যাক তোর...' ইত্যাকার সব মধুর বাণীবর্ষণ, তখনই ওর আশ্রয়-কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসত কোজির, আর মুখে বলত:

'খোকারা, পরমেশ্বর আমাদিগে মুক্তি দিক! ওহ্, কী হুজ্জুতে মেয়্যালোক রে বাবা...'

পরিস্থিতি যদিও অনুকূল ছিল না তবু চাকা-বিক্রির ব্যবসায়ে লাভ হতে শুরু করল। নিজের দেহে ক্রুশচিহ্ন আঁকতে-আঁকতেই কোজির ফলাও কারবার ফেঁদে বসল। আমাদের তরফে বিন্দুমাত্র চেষ্টা ছাড়াই হু-হু করে চাকার বেড়ের আমদানি হতে লাগল, তার জন্যে আমাদের নগদে দামও দিতে হোত না। কোজির সত্যিই চমৎকার চাকা-বানিয়ে মিস্ত্রি ছিল, ওর হাতের কাজের সুখ্যাতি আমাদের জেলা ছাড়িয়ে ছিল বহুদূর পরিব্যাপ্ত।

আমাদের জীবনযাত্রা আরও জটিল হয়ে উঠল, আর হয়ে উঠল অনেক বেশি আনন্দময়। কালিনা ইভানভিচ শেষপর্যন্ত পাঁচ দেসিয়াতিনার মতো জমিতে জই বুনে তবে ছাড়ল, 'লালু' আমাদের আস্তাবল অলংকৃত করে রইল, আর আমাদের উঠোনে মোতায়েন রইল নতুন এক্কাগাড়িখানা। গাড়িখানা ছিল অস্বাভবিক রকমের উঁচু — এইটেই ছিল তার একমাত্র ত্রুটি। মাটি থেকে গাড়ির মাথা সাত ফুট আন্দাজ উঁচু হয়ে থাকায় গাড়ির সওয়ারির কাছে সব সময়েই মনে হোত, সামনে নিঃসন্দেহে একটা ঘোড়া জোতা থাকলেও সেটা গাড়ির মাথা থেকে অনেক নিচে কোথাও আছে।

দেখতে-দেখতে কাজকর্ম এতদূর বেড়ে উঠল যে আমরা কাজের লোকের অভাব অনুভব করতে লাগলুম। এজমালি শোবার ঘর হিসেবে ব্যবহারের জন্যে তাড়াতাড়ি আরও একটা দালান মেরামত করার দরকার হয়ে পড়ল, আর এবার মালমশলা এসে পেঁছিতে দেরি হল না। এর আগে আমরা যেসব মালমশলার সরবরাহ পেয়েছিলুম তা থেকে এবারের জিনিসপত্রও ছিল একেবারে ভিন্ন জাতের।

ওই সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক কসাক-মোড়ল খতম হয়ে গিয়েছিল। তাদের

অল্পবয়সী যে-সব চেলাচামুণ্ডার ফৌজী কাজের আর রাহাজানির ভূমিকা নিছক ঘোড়ার সহিস কিংবা রাঁধুনির কাজে সীমাবদ্ধ ছিল তাদের অনেককে কলোনিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রের কারণেই কলোনির সদস্য-তালিকা কারাবানভ, প্রিখোদ্‌কো, গোলস, সরোকা, ভের্‌শ্‌নেভ আর মিতিয়াগিনের মতো নতুন-নতুন নামে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

## ৮

## চারিত্র্য ও সংস্কৃতি

কলোনিতে নতুন সদস্যদের আগমন ঘটায় আমাদের তখনও-পর্যন্ত অস্থিতিশীল যৌথ সত্তার ভিত্তিমূল উঠল নড়ে। আবার আমাদের মধ্যে পুরনো বদভ্যাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগল।

আমাদের আদি সদস্যদের দিয়ে একেবারে প্রাথমিক স্তরের একধরনের আইনশৃঙ্খলা মানাতে পারা গিয়েছিল। নবাগতরা তো শৃঙ্খলা-বস্তুটার সঙ্গেই পরিচিত ছিল না, কাজেই তারা কোনো ধরনের আইনশৃঙ্খলা মেনে নেয়ার ব্যাপারে আরও কম প্রস্তুত ছিল। তবে এখানে বলা দরকার যে কলোনি-জীবনের সূচনায় যেমনটা হয়েছিল পরে আর কখনও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে সে-রকম প্রকাশ্য বিদ্রোহ কিংবা গুণ্ডামি প্রকাশ পেতে দেখা যায় নি। মনে হয় জাদোরভ, বুরুন, তারানেত্‌স ও অন্যান্যরা গোর্কি কলোনির সেই প্রথম দিনগুলোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নবাগতদের শুনিয়ে ব্যাপারটা সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল করে তুলতে পেরেছিল। পুরনো আর নতুন সব শিক্ষার্থীই এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে ওখানকার শিক্ষক-সম্প্রদায় ওদের শত্রু নয়। এই ধারণা জন্মানোর পেছনে প্রধান কারণটা নিঃসন্দেহে নিহিত ছিল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিজেদের কাজের মধ্যেই। আর সে-কাজ এত আত্মস্বার্থলেশহীন আর স্পষ্টতই এত কষ্টসাধ্য ছিল যে সহজপ্রবৃত্তিবশেই ছেলেদের মধ্যে তা শ্রদ্ধার জন্ম দিয়েছিল। তাই, একেবারেই এক-আধটা ব্যতিক্রম ছাড়া, ছেলেরা আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে চলছিল, আর কাজ করার এবং ইশ্‌কুলে পড়ার প্রয়োজনীয়তাও মেনে নিয়েছিল। ওরা

ভালো করেই বুঝেছিল যে এতে আমাদের উভয়পক্ষের সুবিধে। তাই কুঁড়েমি করা আর কষ্টস্বীকার না-করতে চাওয়া নিছক জৈব অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পেত, প্রতিবাদের অভিব্যক্তিতে নয়।

আমরা নিজেরাও এ-ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিলুম যে আমাদের শৃঙ্খলার অবস্থার যা-কিছু উন্নতি ঘটছিল সবই ছিল আইনশৃঙ্খলা কায়েম করার বিশুদ্ধ বাহ্য ধরনের ফলাফল, তার সঙ্গে সংস্কৃতির, এমন কি একেবারে প্রাথমিক স্তরের সংস্কৃতিরও, বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না।

কিন্তু পালিয়ে না-গিয়ে আমাদের দারিদ্র্যের মধ্যে ছেলেদের থেকে যেতে রাজি-হওয়া আর যে-কাজ রীতিমতো শ্রমসাধ্য তাতে হাত লাগানোর কারণটা অবশ্যই নিছক শিক্ষাগত মানের মধ্যে খুঁজলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, ১৯২১ সালে আমাদের দেশে রাস্তার জীবন এমন কিছু আকর্ষণীয় ছিল না। দুর্ভিক্ষপীড়িত জেলার নামের তালিকায় আমাদের জেলার নামটা ছিল না বটে, কিন্তু তা না হলে কী হবে, এমন কি শহরেও পরিস্থিতি ছিল চরম সংকটজনক, বুভুক্ষা তো ছিলই। তাছাড়া, গোড়ার দিকের বছরগুলোয় যে-সব ছেলে আমরা পেয়েছিলুম তারা রাস্তায়-রাস্তায় টহল দেওয়ার মতো পাকাপোক্ত সত্যিকার ঝানু নিরাশ্রয় ছেলেপিলে ছিল না। আমাদের ছেলেদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল সেই ধরনের যারা সবেমাত্র পারিবারিক বন্ধন কেটে বাড়ি ছেড়েছিল।

আবার, ওই একই সঙ্গে, অত্যন্ত বিচিত্র সব চরিত্রের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কলোনি-বাসিন্দারা সাধারণভাবে সকলেই নিম্নতম সাংস্কৃতিক মানের অধিকারী ছিল। বিশেষ করে এই ধরনের ছেলেপিলেদেরই আমাদের কলোনিতে পাঠানোর জন্যে বাছা হোত, কারণ কলোনিটা ছিল বিশেষ করে বাগ-মানানো-শক্ত এমন ছেলেপিলেদের জন্যেই। এই ছেলেপিলেদের প্রায় সকলে ছিল হয় অর্ধ-সাক্ষর, আর নয়তো সম্পূর্ণ নিরক্ষর, এদের প্রায় সকলেই নোংরা আর উকুন-ছারপোকার মধ্যে ছিল বসবাসে অভ্যস্ত, আর আশপাশের ইয়ারবন্ধুদের প্রতি এদের মনোভাব দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে আগ-বাড়িয়ে আক্রমণের মেকি-বাহাদুরি দেখানোর ভঙ্গিতে।

ছেলেদের মধ্যে কিছুটা বেশি মাত্রায় বুদ্ধি ধরত যারা — যেমন, জাদোরভ, বুরুন, ভেত্‌কোভ্‌স্কি, ব্রাত্‌চেঙ্কো, আর পরবর্তী দলের মধ্যে কারাবানভ আর মিতিয়াগিন — অন্যদের মধ্যে তারা ছিল বিশিষ্ট। বাকিরা ক্রমে-ক্রমে আর

খুব আস্তে-আস্তে মানব-সংস্কৃতির অর্জিত গুণাবলীর কাছাকাছি আসছিল, তবে আমাদের দারিদ্র্য আর বুভুক্ষার মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওদেরও চারিত্রিক উন্নতি ঘটার কাজ ব্যাহত হচ্ছিল।

প্রথম বছরটায় সবচেয়ে বেশি বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ছেলেদের নিজেদের মধ্যে কথায়-কথায় ঝগড়া বাধানোর ঝোঁক, যে-কোনো যৌথ-জীবনে যা একান্ত আবশ্যিক সেই পারস্পরিক যোগসূত্রের ভয়াবহ ক্ষীণতা। এই যোগসূত্র ওদের ক্ষেত্রে তুচ্ছতম কারণে মুহূর্তে-মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে যেত। এর কারণ যতটা-না পারস্পরিক শত্রুতা, তার চেয়ে আরও অনেক বেশি করে ছিল রাজনৈতিক চেতনার বিন্দুমাত্র ছোঁয়াচ-বর্জিত ওই সেই মেকি-বাহাদুরির ভঙ্গি। ওদের মধ্যে অনেকে যদিও শ্রেণীশত্রুর শিবিরে বাস করে এসেছিল, তবু ওরা-যে কোনো বিশেষ শ্রেণীর লোক সে-সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চেতনার বালাই ওদের মধ্যে ছিল না। শ্রমিক-পরিবারের কোনো ছেলে আমাদের মধ্যে ছিল কিনা সন্দেহ। ছেলেদের কাছে প্রলেতারিয়েত ছিল দূরের অজ্ঞাত কোনো বস্তু, আর কৃষিকাজে জনমজুরি সম্পর্কে ওদের বেশির ভাগেরই মনে ছিল প্রগাঢ়, নিদারুণ ঘৃণা আর অবজ্ঞা। কিংবা, বলা যেতে পারে, দিনমজুরের কাজটা সম্পর্কে যত-না, তার জীবনযাত্রা আর মনোবৃত্তি সম্পর্কে ততোধিক ঘৃণা আর অবজ্ঞা। অতএব, আত্মিক নিঃসঙ্গতার ফলে নীতিভ্রষ্ট, আধা-বর্বরতার পাঁকে নিমজ্জিত সব ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ হিসেবে নানা ধাঁচের উৎকেন্দ্রিকতার প্রকাশ ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছিল।

যদিও মোটের ওপর দেখতে গেলে ছবিটা যথেষ্ট হতাশাব্যঞ্জক ছিল, তবু ওই প্রথমবারের শীতে যৌথ-চেতনার যে-অঙ্কুর আমাদের মধ্যে মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছিল কোন্ এক রহস্যময় কারণে তা ক্রমশ লকলকিয়ে বড় হয়ে উঠতে লাগল। আর এই চারাগুলোকে যে-কোনো মূল্যে লালন করে তোলা - - কোনো অনাত্মীয় আগাছা এই কোমল সবুজিমাকে যাতে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলতে না-পারে তা দেখা — হয়ে দাঁড়াল আমাদের কাজ। ওই সময়ে এই নতুন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটাকে খেয়াল করে লক্ষ্য করা আর এর মূল্য যথাযথভাবে যাচাই করতে পারাকেই আমি আমার প্রধান কৃতিত্ব বলে মনে করি। ওই প্রথম অঙ্কুরগুলো লালন করা এমন একটা শ্রমসাধ্য ও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে তা যদি আগে থেকে আমি বুঝতে পারতুম তাহলে হয়তো ভয় পেয়ে গিয়ে হাল ছেড়ে

দিতুম। কিন্তু আমি, যাকে বলে, দুর্মর আশাবাদী — সাফল্য একেবারে হাতের মুঠোয় এমন একটা আস্থা সব সময়ে মনে-মনে পোষণ করায় অমি শেষপর্যন্ত বেঁচে গিয়েছিলুম।

ওই সময়টায় আমার জীবনের প্রতিটি দিন ছিল বিশ্বাস, আনন্দ আর হতাশার সংমিশ্রণে গড়া।

যেমন, এক দিনের ঘটনা বলি। সবকিছু সেদিন চমৎকার চলছিল। শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁদের দিনের কাজ শেষ করেছিলেন, ছেলেদের বই পড়ে শোনানো, গল্প করা কিংবা অন্য নানাভাবে তাদের খুশি করার কাজও সমাধা করে শুভরাত্রি জানিয়ে তাঁরা যে-যার ঘরে চলেও গিয়েছিলেন। ছেলেরাও ছিল খুব ঠাণ্ডা মেজাজে, শুয়ে পড়ার তোড়জোড় চলছিল ওদের মধ্যে। আমার ঘরেও দিনের কাজকর্মের নাড়ির স্পন্দন থেমে আসছিল: কালিনা ইভানভিচ বসে-বসে তার বাঁধিগৎ স্বতঃসিদ্ধ সূত্রগুলো আউড়ে চলেছিল, অপেক্ষাকৃত কৌতূহলী দুটি-একটি ছেলে তখনও কাছেপিঠে ঘোরাঘুরি করছিল, ব্রাত্‌চেঙ্কো আর গুত্‌ দাঁড়িয়ে ছিল দরজায় — ঘোড়ার জাবনার বরাদ্দের ব্যাপারে কালিনা ইভানভিচের ওপর যথারীতি আক্রমণ শুরু করার সুযোগের অপেক্ষায়, এমন সময় আচমকা হৈ-চৈ চিৎকারে চারিদিক সরগরম হয়ে উঠল:

'শোবার ঘরে ছেলেরা ছুরি-মারামারি করছে!'

শুনেই ঘর থেকে ছুটে বেরোলুম। এজমালি শোবার ঘরে গিয়ে দেখি হুলস্থুল কাণ্ড। ঘরের এক কোণে হিংস্র, ক্ষিপ্ত দুটো দল ঝটাপটি লাগিয়েছে। মারমুখো ভাবভঙ্গি আর লম্ফঝম্পর সঙ্গে কুৎসিততম গালিগালাজ বিনিময় চলেছে। একজন আরেকজনের কানে ঘুসি মারছে। দেখলুম, বুরুন জনেক বীরপুঙ্গবের হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিচ্ছে, আর তাতে ঘরের অন্য দিক থেকে আপত্তি করে কে যেন বলছে:

'তোমারে কে নাক গলাতি কয়েচে? ঘুসো একখান খাতি চাও নাকি?'

ওদিকে একদল সমর্থক-পরিবৃত হয়ে বিছানার ধারে বসে আহত অপর এক বীরপুঙ্গব বিছানার চাদর-ছেঁড়া একটুকরো ন্যাকড়া দিয়ে নিঃশব্দে নিজের রক্তাক্ত হাতখানায় ব্যান্ডেজ বাঁধছিল।

আমার ঠিক পেছনটায় দাঁড়িয়ে কালিনা ইভানভিচ সন্ত্রস্তভাবে ফিস্‌ফিস করে বলছিল:

'উঃ শিগ্‌গিরি, শিগ্‌গিরি থামাও গিয়া লক্ষ্মী ভাইডি, নাইলে পরগাছাগুলান একে অপরের গলা কাটবে-আনে...'

আমি এটা নীতি হিসেবেই ঠিক করে নিয়েছিলুম যে মারামারির সময় দু-পক্ষকে আটকানো বা আলাদা করে দেয়ার চেষ্টা করা, কিংবা তাদের ধমকধামক দেয়া এ সব কিছুই করব না। তাই নিঃশব্দে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমি দৃশ্যটা দেখতেই থাকলুম। আস্তে-আস্তে ছেলেরা আমার উপস্থিতি টের পেয়ে চুপ করে যেতে লাগল। আর হঠাৎ এই নিস্তব্ধতা নেমে আসায় ওদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্দান্তরাও কেমন মিইয়ে গেল। ছুরিগুলো ওরা সরিয়ে ফেলল, উদ্যত ঘুসি নিল নামিয়ে, মধ্যপথে ছুটন্ত গালাগালি গেল থেকে। তবু আমি তখনও চুপ করে আছি, যদিও ভেতরে-ভেতরে ওই বুনো ছেলের দঙ্গলের জগৎটার ওপর রাগে আর ঘেন্নায় ফুঁসছি। আমি ভালোই জানতুম আমার রাগটা ছিল নিষ্ফল আক্রোশের, কারণ, জানতুম ছুরি-মারামারির শেষ দিন ওটা কখনই হবে না।

অবশেষে এজমালি শোবার ঘরটায় একটা থমথমে, ভুতুড়ে নিস্তব্ধতা নেমে এল। এমন কি ফোঁসফোঁস করে উত্তেজিত নিশ্বাস ফেলার শব্দও থেমে গেল।

এরপর আমি সত্যিকার মানবিক ক্রোধে ফেটে পড়লুম। মনে-মনে দৃঢ় ধারণা ছিল যে ন্যায্য কাজই করছি।

'ছুরিগুলো সব টেবিলে রাখ! জল্‌দি, দেরি না-হয়!..'

টেবিলে জমা হয়ে উঠল ছুরির স্তূপ: ছোরা, রান্নাঘর থেকে মারামারি করার উদ্দেশ্যে চুরি-করা তরি-তরকারি মাছ-মাংস কাটার ছুরি, কলম-কাটা ছুরি, আর কামারশালে বানানো ঘরে-তৈরি কিছু ব্লেড। এজমালি শোবার ঘর তখনও নিস্তব্ধ। টেবিলের কাছে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে জাদোরভ — প্রিয়, সুদর্শন জাদোরভ। একমাত্র ওকেই তখন আমার আপনজন, আমার আত্মীয়বন্ধু বলে মনে হচ্ছে। আবার কাটখোট্টাভাবে হুকুম জারি করলুম:

'মুগুরটুগুর আছে? থাকলে বের কর!'

'আমার কাছে একটা আছে। আমি কেড়ে নিয়েছি,' জাদোরভ বলল।

চারপাশে ছেলের দল দাঁড়িয়ে আছে মাথা নিচু করে।

'যাও, শুতে যাও সব!..'

যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি ছেলে বিছানায় না-ঢুকল আমি ঘর ছেড়ে নড়লুম না।

পরদিন ছেলেরা আগের রাত্রের মারামারির কথা তুললই না, একেবারে এড়িয়ে গেল। আমিও আর সে-কথা ঘুণাক্ষরে উল্লেখ করলুম না।

এ-রকম ঘটনার পর মাসখানেক-মাস দুই হয়তো মোটামুটি শান্তিতে কেটে যেত। তার মধ্যে এখানে-ওখানে, লুকিয়ে-চুরিয়ে হয়তো-বা কোনো ঘরের কোণে ছেলেদের কারো-কারো মধ্যে পুষে-রাখা শত্রুতার আগুন ধুঁইয়ে জ্বললেও, দাউদাউ করে জ্বলে ওঠার লক্ষণ প্রকাশ পেলেই ছেলেদের যৌথ-সমাজ তা দ্রুত নিবিয়ে দিত। তারপর আচমকা আবার একদিন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটত, ক্রোধোন্মত্ত ছেলেরা মানবিক সমস্ত লক্ষণ বিসর্জন দিয়ে ছুরি-হাতে আবার পরস্পরকে তাড়া করে ফিরত।

এই রকম এক লড়াইয়ের দিন সন্ধেবেলা আমি হঠাৎ উপলব্ধি করলুম— এদেশে যেমনটা বলা হয় তেমনি — নাটবল্টু এবার শক্ত করে আঁটতে হবে আমাকে। চোবত নামে একটা ছেলে ছিল চাকু-চালানোয় অক্লান্ত ওস্তাদদের একজন। ওই দিন লড়াই থামলে পর আমি চোবতকে আমার ঘরে যেতে হুকুম দিলুম। একেবারে মেষশাবকটির মতো সে সুড়সুড় করে চলে এল। ঘরে এসে আমি বললুম:

'তোমাকে কলোনি ছেড়ে চলে যেতে হবে!'

'কনে যাব?'

'আমি বলি কী, যেখানে তুমি অন্য লোককে ছুরি মারতে পার সেখানে যাও। যেহেতু তোমার একজন সাথী খাবার টেবিলে তার জায়গাটা তোমায় ছেড়ে দেয় নি, তাই তুমি আজ তার গায়ে ছুরি দিয়ে খোঁচা দিয়েছ। ঠিক আছে, তাহলে এমন একটা জায়গা খুঁজে নাও গে যেখানে ছুরি চালিয়ে ঝগড়ার নিষ্পত্তি করা হয়।'

'আমারে কখন যেতি হবে?'

'কাল সকলেই।'

মুখ ভার করে ও বেরিয়ে গেল। পরদিন সকালে, জলখাবারের সময়, ছেলেরা সবাই মিলে এসে অনুরোধ জানালে: চোবত থাকুক -- ওরাই ওর আচরণের জন্যে দায়ী থাকবে।

'এ-ব্যাপারে তোমরা কী গ্যারাণ্টি দিতে পার?'

কথাটা ওরা ধরতে পারল না।

‘তোমরা ওর দায়িত্ব নেবে কীভাবে? ধর, ও যদি ফের ছুরি চালায় — তাহলে তোমরা তার কী করতে পারবে?’

‘তখন ওরে আপনি তাড়ায়ে দিবেন।’

‘কাজেই, বোঝা যাচ্ছে, তোমরা কোনো গ্যারান্টি দিতে পারছ না? না-না, ওকে যেতেই হবে।’

জলখাবারের পালা শেষ হলে পর চোবত নিজেই আমার কাছে এল:

‘বিদায়, আন্তন সেমিওনভিচ! আমারে যে-শিক্ষে দেছেন তার জন্যি ধন্যবাদ...’

‘বিদায়। মনে কোনো রাগ নিয়ে যেও না। বাইরে থাকা যদি খুব কঠিন হয়ে ওঠে, তবে ফিরে এস। কিন্তু দু-সপ্তার আগে ফেরা চলবে না।’

এর মাসখানেক বাদে ছেলেটা ফিরে এল, আরও রোগা হয়ে, ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে।

‘ফির্যে আলাম, আপনি যেমন কয়েছিলেন তেমনই।’

‘তোমার পছন্দসই জায়গা খুঁজে পেলে না বুঝি?’

ও হাসল।

‘পালাম না আবার? এমন ক-তো জায়গা আছে... কিন্তু আমি কলোনিতিই থাকব, ছুরি আর ব্যাভার করব না।’

এজমালি শোবার ঘরে দু-জনে একসঙ্গে যেতেই ছেলেরা আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

‘তাইলে আপনি ওরে ক্ষমা করি দিয়েছেন। আমরা জানতাম আপনি দিবেনই!’

## ৯

## ‘ইউক্রেনে বীরব্রতের যুগ আজও শেষ হয় নাই’

এক রবিবারে অসাদ্‌চি মাতাল হয়ে ফিরল। এজমালি শোবার ঘরে শান্তিভঙ্গ করার দায়ে ওকে আমার কাছে ধরে আনা হল। আমার ঘরে বসে মত্ত অবস্থায় জড়িয়ে-জড়িয়ে অনর্গল অর্থহীন অভিযোগ উগরে গেল ও। ওর সঙ্গে তর্ক করা বাজে সময় নষ্ট জ্ঞান করে ওকে ওইখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে

পড়তে বলে আমি বেরিয়ে এলুম। বিনীতভাবে আমার কথা মেনে ও ঘুমিয়ে পড়ল।

এজমালি শোবার ঘরটায় ঢুকতেই এক-ঝলক মদের গন্ধ নাকে এল। স্পষ্ট বোঝা গেল, অনেকগুলি ছেলেই আমাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। দোষীদের খুঁজে বের করার চেষ্টায় আর সোরগোল তুলতে চাইলুম না, শুধু বললুম:

'একা অসাদ্‌চি-যে মদ খেয়েছে তা নয়। তোমাদের আরও কয়েক জনও খেয়েছ।'

এর দিন কয়েক পরে কলোনির সদস্যদের কয়েক জনকে আবার মদ খেয়ে ফিরতে দেখা গেল। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ আমাকে এড়িয়ে গেল, কিন্তু অন্যরা উলটো আমার কাছে হাজির হয়ে মদের ঝোঁকে অনুতাপে পূর্ণ হয়ে অনবরত বকবক করতে লাগল আর আমার প্রতি তাদের ভালোবাসা জানাতে লাগল।

কাছের খামারখোলায় ওরা-যে যাতায়াত করে থাকে তা ওরা গোপন করল না।

সন্ধেবেলায় এজমালি শোবার ঘরে মদ খাওয়ার কুফল সম্পর্কে আলোচনা হল। দোষীরা প্রতিজ্ঞা করল, তারা আর মদ স্পর্শ করবে না। আমিও ভান করলুম ওদের কথায় যেন সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছি। মদ খাওয়ার জন্যে কাউকে শাস্তি পর্যন্ত দিলুম না। ইতিমধ্যে আমার অভিজ্ঞতার সঞ্চয় কিছুটা বেড়েছিল, আমি ভালোই জানতুম, মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হলে কলোনির বাসিন্দাদের মারধর করে কিছু হবে না — এর পেছনে যারা আছে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। আর সেই পেছনের লোকজনকে খুঁজে পেতেও বেশি দূর যেতে হল না।

আমরা ছিলুম সামগোন*-এর সমুদ্রে-ঘেরা দ্বীপের মতো হয়ে। মাতাল হয়ে লোকজন — কর্মচারিরা, চাষীরা — প্রায়ই কলোনিতে এসে হাজির হোত। তাছাড়া আমি তখন সবেমাত্র জানতে পেরেছি যে গলভান মদ আনতে ছেলেদের প্রায়ই বাইরে পাঠাত। কথাটা ওকে জিজ্ঞাসা করতে ও অস্বীকার করার চেষ্টাটুকুও করল না।

* সামগোন — বে-আইনীভাবে ঘরে চোলাই-করা একজাতীয় ভোদ্‌কা। — অনুঃ

'তা, হয়েছে কী তাতে?'

কালিনা ইভানভিচ নিজে মদ স্পর্শ করত না। সে প্রচণ্ড ধমক দিল গলভানকে:

'আ মর্, পরগাছা কোথাকার, সোভিয়েত সরকার কারে কয় জানস কিছু? তরা ভাবছস কী, সোভিয়েত সরকার তগো চোলাই মদ গেলার ল্যেগে কায়েম হইছে, নাকি?'

অপ্রতিভভাবে গলভান তার নড়বড়ে, ক্যাঁচকোঁচ-আওয়াজ-করা চেয়ারটাতে নড়েচড়ে বসল। তারপর ওজর দেখাতে চেষ্টা করল:

'তা, হয়েছেটা কী? মদ কে খায় না, কন দেখি... পেত্যেকের বাড়িতি মদ-চোলাইয়ের যন্তর আছে, পেত্যেকেই যত খুশি মদ গিল্যে চলেছে। আগে সোভিয়েত সরকার নিজেই মদ খাওয়া বন্ধ করুক, তবে নে...'

'সোভিয়েত সরকার মানে?'

'আরে, মশয়, সবাই, সক্কলে! অরা শহর-বাজারে মদ খেতিছে, গাঁয়েও মদ খেতিছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তুমি জানো এখানে সামগোন বিক্রি করে কে?'

'আমি জানব কী প্রেকারে? আমি কোনোদিন সামগোন কিনি নাই। আপনি যদি চান — কারেও পাঠায়ে দ্যান-না। কিন্তু আমারে এ-সব জিজ্ঞেসা করতিছেন ক্যানে? আপনি কি সবকিছু বাজেয়াপ্ত করতি চান নাকি?'

'ভাবো কী তুমি? নিশ্চয়ই চাই...'

'হায়, হায়! দ্যাখেন-না, মিলিত্‌শিয়া কতই তো বাজেয়াপ্ত করল, তা তার ফল কিছু হল্য?'

পরদিন শহরে গিয়ে আমাদের গ্রাম-সোভিয়েতের অধীন এলাকার মধ্যে যে-কোনো বে-আইনী মদ-চোলাইয়ের আড্ডার বিরুদ্ধে নির্মম লড়াই শুরু করার উপযোগী হুকুমনামা করিয়ে নিয়ে এলুম। ওইদিন সন্ধেয় কালিনা ইভানভিচের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলুম। কালিনা ইভানভিচ কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটায় সন্দেহ প্রকাশ করল:

'এই নোংরা ব্যাপারডায় দয়া কইর‍্যা জড়াইও না। আমি তোমারে কইত্যাছি, উরা সক্কলে চোরে-চোরে মাউসাতো ভাই, বোঝলা নি — গ্রাম-সোভিয়েতের চেয়ারম্যান ওই গ্রেচানিরে চিনো তো — উ ব্যাটাও উয়াদের দলে। আর গাঁয়ের যে-কোনো ভিটায় তুমি হানা দ্যাও না ক্যান, উয়ারা পেরায় সক্কলেই

গ্রেচানির মতন! উয়ারা কেমনধারা লোক জানো — চাষের জন্যি উয়ারা ঘোড়া ব্যাভার করে না, হালে একজোড়া বলদ জোতে। এই-যে, দ্যাখো — গন্‌চারোভ্‌কারে উয়ারা এমনে রাখছে!' বলে একখানা হাত মুঠো করে ওপরে তুলে দেখাল কালিনা ইভানভিচ। 'গেরামডারে উয়ারা একবারে হাতের মুঠায় রাখছে. মরণ যত্তো সব! তুমি কিস্‌স্যুটি করবার পারবা না।'

'আমি ঠিক বুঝছি না, কালিনা ইভানভিচ। এ-সবের সঙ্গে মদ-চোলাইয়ের সম্পর্ক কী?'

'তুমি আচ্ছা মজার লোক তো, আবার তুমি কিনা শিক্ষিত লোক! আরে বোঝলা-না, উয়াদের হাতেই তো যা-কিছু খ্যামতা? উয়াদের গায়ে হাত না-দেয়াই ভালো, নাইলে উয়ারা তোমার রক্ত দ্যাখবেই দ্যাখবে — বোঝলা!'

এজমালি শোবার ঘরে গিয়ে ছেলেদের বললুম:

'ছেলেরা, এই আমি বলে রাখলুম — কিছুতেই তোমাদের মদ খেতে দেব না। খামারবাড়িগুলোর বে-আইনী মদ চোলাই করে যে-দলটা তাদেরও আমি দমন করবই। এখন, কে-কে আমায় সাহায্য করতে চাও?'

শুনে বেশির ভাগই ইতস্তত করতে লাগল। কিন্তু কিছু ছেলে আমার প্রস্তাব শুনে উৎসাহে লাফিয়ে উঠল।

কারাবানভ বলল, 'দারুণ প্রস্তাব — সত্যি, দারুণ প্রস্তাব!' বলতে-বলতে ওর ঘোড়ার মতো বড়ো বড়ো কালো চোখদুটো যেন জ্বলে উঠল। 'এখন এই কুলাকদের পিছনে... এক-আধটুকু লাগার সত্যিই সময় হয়েছে!'

ছেলেদের মধ্যে তিনজনের সাহায্য নিলুম আমি — জাদোরভ, ভোলখভ আর তারানেত্‌স। শনিবার একটু বেশি রাত্রে আমরা যুদ্ধের পরিকল্পনা ছকে ফেললুম। আমার ঘরে বাতির আলোয় আগে-থেকে আমার-তৈরি খামারখোলার নক্‌শার ওপর ঝুঁকে পড়লুম আমরা। নিজের গোছা-গোছা লাল চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিল তারানেত্‌স। বসন্তের-দাগে-ভরা ওর নাকটা ঝুঁকে রইল কাগজখানার ওপর।

'এট্টা ঘরে আমরা হানা দিতি-দিতি অন্য সব কুঁড়ে থ্যেকে যন্তর-পাতি বিলকুল অরা হাওয়া কর‍্যে দেবে। এ মাত্তর তিনজনার কম্মো নয়।'

'অতগুলো কুঁড়েয় মদ-চোলাইয়ের ভাটিখানা আছে নাকি?'

'পেরায় প্রেতিটি ঘরে আছে! মুসি গ্রেচানি, আন্দ্রেই গ্রেচানি, আর স্বয়ং

চেয়ারম্যান সের্গেই গ্রেচানি — মদ-চোলাই কে না করে? ভের্‌খোলার বাড়ির সব পুরুষলোক ওই কাজ করে, আর মেয়্যারা শহরে মদ বেচতি যায়। আমাদের সাথে আরও লোক দরকার, নাইলে অরা আচ্ছা কর্যে গোবেড়ন দিবে আমাদের। ব্যস, খতম হয়্যে যাবে'খন।'

ভোলখভ এতক্ষণ ঘরের এককোণে বসে খালি-খালি হাই তুলছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল:

'গোবেড়ন দিবে! চালাকি নাকি, কখ্‌খনো নয়! শুধু একা কারাবানভরে সাথে নেয়া যাক, আর কাউরে নয়। তাইলেই কাউরে আর আমাদের গায়ে হাত তোলতি হবে না। আমি এই সব কুলাকদেরে ভালোই চিনি। অরা আমাদেরে — ছেলেপিলেদেরে — যমের মতো ডরায়।'

এ-ব্যাপারটায় হাত লাগাতে এমনিতে ভোলখভের বিশেষ উৎসাহ দেখা যাচ্ছিল না। তখনও পর্যন্ত ও আমাকে কিছুটা এড়িয়ে চলছিল -- ছেলেটা আইনশৃঙ্খলা বিশেষ পছন্দ করত না, এই আর-কি! কিন্তু ও ছিল গভীরভাবে জাদোরভের প্রতি অনুরক্ত, তাই নীতি-টীতির ধার বেশি না-ধেরেও ও জাদোরভের নেতৃত্বে চলত।

জাদোরভের যেমন রীতি — শান্ত আর প্রত্যয়ে-ভরা হাসিটুকু ওর মুখে লেগে ছিল। শক্তির বাড়তি অপচয় না-ঘটিয়ে আর নিজের ব্যক্তিত্বের ছিটেফোঁটাও না-হারিয়ে কাজ করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ওর। আর বরাবরের মতো তখনও ওর ওপর যতখানি আস্থা ছিল আমার ততটা আর কারো ওপর ছিল না। আমি জানতুম, ভবিষ্যৎ জীবনে যা-কিছুই ঘটুক-না কেন, জাদোরভ যে-কোনো ত্যাগস্বীকারের জন্যে প্রস্তুত, আর বিন্দুমাত্র ব্যক্তিত্ব না-হারিয়ে ও সবকিছুর সম্মুখীন হতে সমর্থ।

তারানেত্‌সের দিকে তাকিয়ে ও বলল:

'অত অস্থির হচ্ছিস কেন, ফিওদর! তুই শুধু বল্‌ দেখি, কোন কুঁড়েটা থেকে শুরু করতে হবে আর কোথায়-কোথায় যেতে হবে। আর, তারপর, কাল দ্যাখ্‌-না কী হয়। ভোলখভ ঠিকই বলেছে, কারাবানভকে সঙ্গে নিতে হবে। কুলাকদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, ও জানে - ও নিজেই কুলাকের ঘর থেকে এসেছে তো। তাহলে আমরা ঘুমোতে যাই এবার, কাল সকাল-সকাল উঠতে হবে আবার, গাঁয়ের লোকজন মাতাল হবার আগেই। তাই না, গ্রিত্‌স্‌কো? '

'হ্‌-হ্‌', খ্‌শি হয়ে উঠে ভোলখভ বলল।

আলোচনা-সভা ভেঙে গেল। লিদচকা আর একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না উঠোনে হে'টে বেড়াচ্ছিলেন। লিদচ্‌কা আমায় ডেকে বলল·

'ছেলেরা বলছিল আপনি নাকি মদ-চোলাইওয়ালাদের ঘরে-ঘরে তল্লাসি চালাতে যাচ্ছেন? এটা আবার আপনার মাথায় ঢোকাল কে? একে আপনি শিক্ষাদানের কাজ বলেন নাকি? আমি তো একে শিক্ষাদানের অবমাননা বলি!'

'হ্যাঁ, ঠিক একেই আমি শিক্ষাদানের কাজ বলি, কাল তুমিও আমাদের সঙ্গে চল-না।'

'আপনি কি ভাবছেন আমি ভয় পেয়েছি? আমি নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব, এটা মোটেই শিক্ষাদানের কাজ নয়...'

'তুমি সত্যিই যাবে নাকি?'

'যাব।'

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না আমায় একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন: 'বাচ্চা মেয়েটাকে আবার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছেন কেন?'

'উ'হ্‌, ও-সব কথা নয়!' লিদিয়া পেত্রোভ্‌না দ্‌র থেকে হে'কে বলল। 'যাব যখন বলেছি আমি যাবই!'

অতএব আমাদের অভিযাত্রী দলের লোক-সংখ্যা দাঁড়াল — পাঁচ।

পরদিন সকালে যখন ঠিক সাতটা বাজছে আমরা তখন গিয়ে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী আন্দ্রেই গ্রেচানির দরজায় ঘা দিচ্ছি। আমাদের দরজা-ধাক্কাটা যেন সংকেতের কাজ করল, সঙ্গে সঙ্গে শ্‌র্‌ হয়ে গেল বিস্তারিত সারমেয় ঐকতান-সঙ্গীত। চলল মিনিট পাঁচেক ধরে।

ঐকতান-সঙ্গীত শেষ হওয়ার পর, ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত সেইভাবেই, আসল নাটকের যবনিকা উঠল।

নাটক শ্‌র্‌ হল মঞ্চে আন্দ্রেই গ্রেচানির আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে। ছোটখাট মান্‌ষটি, মাথায় প্রায় টাক পড়ে এসেছে, পরিচ্ছন্নভাবে ছাঁটা দাড়ি।

'কী চাই?' র্‌ক্ষভাবে প্রশ্ন করল গাঁও-ব্‌ড়া আন্দ্রেই।

'আপনার একটা বে-আইনী ভাটিখানা আছে, আমরা তা ভেঙে দিতে এসেছি,' আমি বলল্‌ম। 'জেলা মিলিত্‌শিয়ার কাছ থেকে পরোয়ানা নিয়ে এসেছি...'

'বে-আইনী ভাটিখানা?' বিচলিত গলায় গাঁও-ব্‌ড়া আন্দ্রেই আমার কথার

পুনরাবৃত্তি করল। কথা বলার সময় ওর তীক্ষ্ন চোখদুটো আমাদের মুখের ওপর আর ছেলেদের রকমারি পোশাকের ওপর ঘুরতে লাগল।

কিন্তু সেই মুহূর্তে সারমেয় ঐকতান-সঙ্গীত হঠাৎ আবার প্রচণ্ড নিখাদে ককিয়ে উঠল। কারাবানভ ইতিমধ্যে গাঁও-বুড়ার পাশ কাটিয়ে তার পেছনে — মঞ্চের পেছনদিকে — চলে গিয়েছিল। আর ওইভাবে যাবার সময় ও বুদ্ধিমানের মতো সঙ্গে করে যে-মোটা লাঠিগাছখানা নিয়ে গিয়েছিল তা দিয়ে বড়-বড় থোকা-থোকা লোমওয়ালা বালিরঙের একটা কুকুরের পিঠে সজোরে এক-ঘা বসিয়ে দিয়েছিল। ফলে নাটকের শুরুতেই কুকুরটা স্বাভাবিক সারমেয়-কণ্ঠের চেয়ে কমপক্ষে আরও দু-পর্দা গলা চড়িয়ে কানফাটানো একক সঙ্গীত শুরু করল।

ওই ফাঁক দিয়ে এবার আমরাও ঢুকে পড়ে কুকুরগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দিলুম। ভোলখভ জোরালো হেঁড়ে গলায় ওদের দিকে ফিরে চিৎকার করায় কুকুরগুলো লেজ গুটিয়ে উঠোনের কোণে-কোণে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল, আর তারপর সেখান থেকেই মাঝে-মাঝে কেঁউকেঁউ সুরে অনুযোগপূর্ণ অনির্দিষ্ট সঙ্গীত পরিবেশন করতে থাকল। কারাবানভ ইতিমধ্যেই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছিল, গাঁও-বুড়ার সঙ্গে আমরা যখন সেখানে ঢুকলুম তখন বিজয়ীর ভঙ্গিতে ও আমাদের ওর আবিষ্কারটা দেখাল — তা আর কিছুই নয়, মদ-চোলাইয়ের যন্ত্রপাতি আর সাজ-সরঞ্জাম!

‘এই তো পাওয়া গেছে!’

গীতিনাট্য-অভিনেতার পোশাকের মতো দেখতে মোটা সুতীকাপড়ে-তৈরি কোট গায়ে দিয়ে গাঁও-বুড়া আন্দ্রেই কুঁড়েময় দাপিয়ে বেড়াতে লাগল।

‘গতকালই চোলাই করছিলেন?’ জাদোরভ শুধোল।

‘হ, করতেছিলাম,’ অন্যমনস্কভাবে দাড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে স্বীকার করল গাঁও-বুড়া আন্দ্রেই। ওর চোখ তখন নিবদ্ধ তারানেত্‌সের দিকে। কাছেই কোণের দিকে একটা বেঞ্চির তলা থেকে তারানেত্‌স তখন গোলাপি-বেগুনি রঙের সুরার এক গ্যালনের একটা বোতল টেনে বের করছিল।

হঠাৎ সাংঘাতিক খেপে উঠে গাঁও-বুড়া আন্দ্রেই তারানেত্‌সের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্বভাবতই ওর মনে হয়েছিল, বেঞ্চি, আইকন আর টেবিলের জটলার মধ্যে ওই ঘুপচি কোণটায় তারানেত্‌সের সঙ্গে এঁটে ওঠা ওর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। তারানেত্‌সকে ও পাকড়ে ধরেও ছিল, কিন্তু

তারানেত্‌স ধীরস্থিরভাবে গাঁও-ব‍ুড়ার মাথার ওপর দিয়ে বোতলটা জাদোরভের হাতে পাচার করে দিল। আর অত কষ্ট করার পর গাঁও-ব‍ুড়া নগদবিদায় যা পেল তা হল, পাগল-করে-তোলার মতো তারানেত্‌সের সরল মিষ্টি হাসিটুকু আর শান্তভাবে তার ফোড়ন কাটাটুকু:

'হল কী, চাচা?'

উষ্ণভাবে ব‍ুড়ো আন্দ্রেই চেঁচিয়ে বলল, 'তমাদের লজ্জা হওয়া উচিত! এভাবে লোকের ঘরে-ঘরে ঘ‍ুইর‍্যা ল‍ুটপাট করতে শরম লাগে না? আবার বেব‍ুশ্যাগ‍ুলারে পর্যন্ত সাথে কইর‍্যা লইয়া আইছস? মান‍্ষে কি শান্তিতে থাকবার পারব না? তগো উচিত সাজা হইব কবে?..'

ভেঙ্‌চি কেটে ওর অন‍ুকরণে কারাবানভ বললে, 'আরে, গাঁও-ব‍ুড়া-মশাই, আপনে তো দেখি কবিলোক!' লাঠিতে ভর দিয়ে গাঁও-ব‍ুড়ার সামনে আভূমি সেলামের একটা চমৎকার ভঙ্গি করল ও।

'দ‍ূর হইয়া যা আমার ঘর থেইক্যা!' ব‍ুড়ো আন্দ্রেই চিৎকার করে উঠল। তারপর চুল্লীর পাশ থেকে প্রকাণ্ড একটা লোহার চিমটে তুলে নিয়ে ভোলখভের কাঁধে এলোমেলো একটা বাড়ি লাগাল।

হেসে উঠে ভোলখভ চিমটেখানা কেড়ে রেখে দিল। তারপর আরেক দিকে গাঁও-ব‍ুড়ার দ‍ৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল:

'দেখেন, দেখেন, ওদিক পানে একবার দেখেন।'

ফিরে তাকিয়ে ব‍ুড়ো দেখতে পেল, তখনও ম‍ুখে সেই নির্দোষ হাসিটি ফুটিয়ে তারানেত্‌স চুল্লীর মাথা থেকে সামগোনের আরও একটা এক-গ্যালনের বোতল নিয়ে হ‍ুড়‍ুমদ‍ুড়‍ুম করে নামার চেষ্টা করছে। হতাশার একটা ভঙ্গি করে ঘাড়ম‍ুড়ো গ‍ুঁজে ব‍ুড়ো আন্দ্রেই একটা বেঞ্চিতে ঝুপ করে বসে পড়ল।

লিদচ্‌কা তাড়াতাড়ি গিয়ে ওর পাশটিতে বসে সদয়কণ্ঠে বলল:

'আন্দ্রেই কার‌্পভিচ! আপনি তো জানেন ভাটিখানা চালানো বে-আইনী কাজ। তাছাড়া, এতে কতটা ফসল-দানা নষ্ট হয় ভাব‍ুন তো, এদিকে চারপাশে লোকে পেটভরে খেতে পাচ্ছে না।'

'খাইতে পায় না তারাই যারা কাম করে না, ফাকি দেয়। কাজের লোক খাইতে পায় না এমন হইতেই পারে না।'

'কিন্তু আপনে কি কাজ করেন, গাঁও-ব‍ুড়া-মশাই?' চুল্লীর ওপর থেকে

হালকা, রিন্‌রিনে গলায় বলে উঠল তারানেত্‌স। 'স্তেপান নেচিপরেঙ্কোই আপনের হয়্যে কাজ করে নাকি?'

'স্তেপান?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্তেপান! আপনে তো ওরে খেদায়ে দেছেন, বেতন পর্যন্ত দেন নাই, পরনের জামাকাপড় তো দেনই নাই। ও এখন কলোনিতে ঢোকার চেষ্টা করতেছে।'

বুড়োকে ভেঙচি কেটে মুখের মধ্যে জিভ দিয়ে একটা মজার আওয়াজ করে তারানেত্‌স চুল্লীর ওপর থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ল।

'এ-সব নিয়ে এখন কী করা যায়?' জাদোরভ শুধোল।

'বাইরে নিয়ে গিয়ে ভেঙে ফেল সব।'

'চোলাইয়ের যন্তরপাতিও?'

'চোলাইয়ের যন্ত্রপাতিও।'

যন্ত্রপাতির বধ্যভূমিতে বুড়ো আর বেরিয়ে এল না — লিদিয়া পেত্রোভ্‌না একের-পর-এক অর্থনৈতিক, মনস্তত্ত্বগত ও সামাজিক যে-সব যুক্তিতর্কের উপস্থাপনা করে চলেছিল ভারি চমৎকারভাবে তাই শুনতে লাগল ঘরে বসে। উঠোনে মালিকপক্ষের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে রইল কুকুরের পাল, বেশ কিছুটা নিরাপদ দূরত্বে ক্রুদ্ধভাবে পাছায়-ভর-দিয়ে বসে। আর কাজ সেরে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার পর তবে ওদের কেউ-কেউ দেরিতে হলেও নিষ্ফল প্রতিবাদ জানাতে লাগল।

লিদচ্‌কাকে সময়মতো ঘর থেকে ডেকে নেয়ার মতো সুবিবেচনা দেখাল জাদোরভ:

'আমাদের সঙ্গে চলে আসুন, নইলে বুড়ো আন্দ্রেই আপনাকে থুড়ে স্যসেজের কিমা বানাবে...'

ছুটে বেরিয়ে এল লিদচ্‌কা। মনে হল, বুড়ো আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ও খুব খুশি হয়েছে। বলল:

'উনি সবকিছু মেনে নিলেন কিন্তু! ভাটিখানা চালানো যে অপরাধ তাও স্বীকার করলেন।'

শুনে ছেলেরা হো-হো হাসিতে ফেটে পড়ল একেবারে।

'স্বীকার কর্যে নিল, তাই না?' আধবোজা-চোখে লিদচ্‌কার দিকে তাকিয়ে কারাবানভ শুধোল, 'দারুণ ব্যাপার! আপনে যদি আরও কিছু সময়

ওর সাথে থাকতেন তাইলে বোধকরি ভাটিখানাটা ও নিজিই ভ্যেঙে ফেলত? কী বলেন?'

'ভগমানেরে ধন্যবাদ দ্যান যে ব্‌ড়ার ব্‌ড়ি ঘরে নাই,' তারানেত্‌স বলল। 'ব্‌ড়ি গির্জায় গেছে — গন্‌চারোভ্‌কায়। কিন্তু ভের্‌খোলা-গিন্নির সাথে আপনার কথা না-কয়্যে ছাড়ান নাই।'

ল্‌কা সেমিওনভিচ ভের্‌খোলা নানারকম কাজে অনবরত কলোনিতে আসত। দর্‌কারে-অদরকারে অনেক সময় আমরাও ওর সাহায্য নিতুম — যেমন, কখনও ঘোড়ার গলবন্ধনী, কখনও গাড়ি, কখনও-বা একটা পিপে ধার নেয়া, ইত্যাদি। ল্‌কা সেমিওনভিচ ছিল কূটনীতিতে পাকাপোক্ত, বাক্যবাগীশ, অমায়িক, দরকারে-অদরকারে সর্বত্র সদাই হাজির। লোকটা দেখতেও ছিল রীতিমতো স্‌ন্দর, ঢেউ-খেলানো লাল দাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আর নিয়মমাফিক ছাঁটায় ওর যত্নও ছিল খ্‌ব। ওর ছিল তিন ছেলে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ইভান ত্রি-স্তর ভিয়েনা-দেশী অ্যাকর্ডিয়ন বাজানোর জন্যে আর তাক-লাগানো, মন-ভোলানো সব্‌জ-রঙের টুপি পরার কারণে আশপাশের দশ কিলোমিটারের মধ্যে আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠেছিল।

আমরা গিয়ে পেঁছিতেই ল্‌কা সেমিওনভিচ সাদর অভ্যর্থনা জানাল:

'আহ্‌, আমার পড়্‌শি স্‌জনরা-যে! আস্তাজ্ঞে হোক! আস্তাজ্ঞে হোক! আমি শ্‌ন্যেছি, সব শ্‌ন্যেছি! আপনেরা 'সামভার'-এর খোঁজে বার হয়্যেছেন! খ্‌ব ভালো! খ্‌ব ভালো! বসেন, বইস্যে পড়েন! অ খোকাবাব্‌, বেঞ্চিটাতে বসেন গো! তারপর, কেমন চলতিছে সব? ত্রেপ্‌কে-তাল্‌কের জন্যি রাজমিস্তিরি পেয়্যেছেন নাকি? না পেইল্যে, আমি আসচে কাল ব্রিগাদিরভ্‌কা যাব তো, সেখান থ্যেকে কয়েক জনরে আনব-আনে। রাজমিস্তিরি কারে কয় দ্যাখবেন'খন!.. আরে, খোকাবাব্‌, আপনে বইস্‌তেছেন না ক্যানে? আমার ও-সব মদ-চোলাইয়ের কারবার-টারবার নাই — বোঝলেন! ও-সব আমার গিয়ি পোষায় না। ও তো আইনবির্‌দ্ধ! আমি তো এই ব্‌ঝি, সোভিয়েত সরকার যখন মদ-চোলাই নিষিদ্ধ করিছে তখন ও-কাজ করা চলে না!.. আরে গিন্নি, জল্‌দি কর, জল্‌দি, — এঁয়ারা হলেন গিয়ে মান্যিগন্যি অতিথ্‌!'

কানায়-কানায় ছাপাছাপি এক জামবাটি-ভরতি টক মাঠা আর একটা ডিশে স্তূপাকার পনিরের-প্‌র-দেয়া পিঠে এসে হাজির হয়ে গেল টেবিলে। গোলামির মনোভাব কিংবা বাড়াবাড়ি-রকমের শ্রদ্ধাভক্তির ভাব না-দেখিয়েও ল্‌কা

সেমিওনভিচ ওই সব মুখরোচক খাবারের সদ্ব্যবহার করতে আমাদের আমন্ত্রণ জানাল। ওর দরাজ গম্ভীর গলার ডাকটা ঠেকছিল বন্ধুর মতো, ধরনধারণও লাগছিল রীতিমতো বনেদী অভিজাত-বংশীয়ের মতো। বুঝতে পারছিলুম মাঠা দেখে ছেলেদের মন দুর্বল হয়ে পড়েছে — ভোলখভ আর তারানেত্স তো ওই প্রাচুর্যের প্রদর্শনী থেকে চোখই ফেরাতে পারছিল না। লাল-হয়ে-উঠে হাসিমুখে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে ছিল জাদোরভ, একটা-যে অসম্ভব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা ও পুরো বুঝতে পারছিল। আমার ঠিক পাশেই বসে ছিল কারাবানভ, এক মুহূর্ত একটু ফাঁক পেয়ে ও আমার কানেকানে ফিস্ফিস করে বলল:

'কুত্তির বাচ্চার কাণ্ডটা দেখ্যেছেন!.. যাই হোক, আর লোভ সামলানো যাতিছে না, বুয়েছেন! ভগমান জানেন, আমারে খাতিই হবে খানিকটে। ভগমান জানেন, আমি আর লোভ সামলাতি পারতেছি নে, সত্যিই পারতেছি নে।'

লুকা সেমিওনভিচ জাদোরভের কাছে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিল:

'খায়্যে ফেলান, পড়শি-ভাইরা! খান! আমি আপনেদের কিছুটা জলপানও দিতি পারতাম, কিন্তু আপনেরা আবার যে-কাজে বাইরিয়েছেন...'

আমার বিপরীত দিকে চেয়ারে বসে চোখদুটো নামিয়ে একেবারে অর্ধেকটা পনিরের পিঠে মুখে পুরে দিল জাদোরভ। খেতে গিয়ে ঘন মাঠায় ওর থুতনিটা মাখামাখি হয়ে গেল। তারানেত্সের তো দুই কান-জোড়া মাঠার গোঁফই গেল তৈরি হয়ে। কোনোদিকে না-তাকিয়ে চোখকান বুজে একটার-পর-একটা পিঠে সাবাড় করে চলল ভোলখভ।

'আরও পিঠা নিয়ি আস দেখি,' স্ত্রীকে হুকুম করল লুকা সেমিওনভিচ। 'ইভান, এট্টা ভালো দ্যেখে সুর বাজা দেখি...'

ওর স্ত্রী আপত্তি করে বলল, 'গির্জায় এখন প্রার্থনা হতিছে-যে।'

'তাতে কী হয়্যেচে!' লুকা সেমিওনভিচ বলল। 'আমাদের পড়শি-ভাইদের জন্যি একবারের মতো নিয়মের অন্যথা করা চলে।'

নির্বাক, ছিমছাম ইভান 'জ্যোৎস্নালোকে' সুরটা বাজাতে লাগল। হাসতে-হাসতে কারাবানভ তখন টেবিলের নিচে পড়ে যায় আর-কি:

'ভ্যালা অতিথ্ বটে আমরা!..'

ভোজের পর কথাবার্তা শুরু হল। লুকা সেমিওনভিচ প্রবল উৎসাহে ত্রেপ্কে-তালুক সম্পর্কিত আমাদের পরিকল্পনাকে সমর্থন জানাল। বলল,

হাতে যা-কিছু সহায়-সঙ্গতি আছে তাই দিয়েই আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত ও।

আমাদের পরামর্শ দিল, 'এই জঙ্গলে পইড়্যে থাকবেন ক্যানে! যত শিগ্‌গিরি পারেন ওখেনে চল্যে যান! মালিকরে সবকিছু চোখে-চোখে রাখতি হয়। আর ওই ময়দা-কলডার দখল নিয়ি নেন -- বোঝলেন, ওডার দখল নিয়ি নেন! ওয়াদের একটা বোর্ড আছে বটে --- তবে ওভাবে ব্যাবসা চলে না! চাষীরা দুঃখ করে — কী দুঃখডাই-না জানায় অরা! ঈস্টার-পরবের জন্যি পিঠা বানাতি কেকের ময়দা দরকার তাদের, তা মাসখানেক ধর্যে দিনের-পর-দিন ময়দা পাওয়ার জন্যি ঘুরছে তো ঘুরছেই। চাষীভুষিদের পিঠা না-বানালি চলবেই না, তা আসল বস্তুডা --- কেকের ময়দা -- না-পালি পিঠা বানান যায় কীভাবে?'

বললুম, 'ময়দা-কল চালানোর মতো ক্ষমতা এখনও আমাদের হয় নি।'

' 'খ্যামতা হয় নাই' মানে কী? আপনেরা সাহায্য পেতি পারেন... আপনে তো জানেন, এখেনে গোটা তল্লাটের লোকজন আপনেরে কতখানি ছেদ্দাভক্তি করে! সবাই বলে — 'কী চমৎকার মানুষ উনি!' '

আলোচনা যখন মর্মস্পর্শী তুঙ্গে উঠেছে ঠিক সেই মুহূর্তে দোরগোড়ায় দেখা দিল তারানেত্‌স, আর সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কিত গৃহকর্ত্রীর আর্ত চিৎকারে ঘরটা গমগম করে উঠল। দেখা গেল, তারনেত্‌সের দুই হাত জোড়া রয়েছে একটা খুব ভালো চোলাই-যন্ত্রের একটা অংশ --- যন্ত্রটার সবচেয়ে দরকারি অংশ — প্যাঁচানো তারের একটা কুণ্ডলী দিয়ে। তারানেত্‌স এর আগে কখন-যে সরে পড়েছিল আমরা কেউ তা খেয়াল করি নি।

'ছাদের চিলেকোঠায় পায়্যে গেলাম', বলল তারানেত্‌স। 'মদটাও ওখেনে আছে। এখনও হাতে-গরম।'

লুকা সেমিওনভিচ হাতের মুঠোয় নিজের দাড়িটা চেপে ধরল। এক মুহূর্তের জন্যে ওকে যেন গম্ভীর দেখাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল ও। আস্তে-আস্তে তারানেত্‌সের কাছে গিয়ে হাসি-হাসি মুখে ওর সামনে দাঁড়াল। তারপর মাথার পিছনটা একবার চুলকে নিয়ে আর আমার দিকে চোখ ঠেরে বলল:

'এই খোকাডার ভবিষ্যৎ আছে। তাইলে, ব্যাপারডা যা দাঁড়াল্য, আমার আর বলার কিছুই নাই... আমি অসন্তুষ্টও হই নাই। আইন হল্য গিয়ে আইন।

তা, মনে নিতেছে আপনারা কলডারে নষ্ট করি ফ্যালবেন, তাই না? তাইলে... ইভান, যা উয়াদের সাহায্য কর্ গিয়্যে...'

কিন্তু সাধুসন্ত স্বামীর আইনশৃঙ্খলার প্রতি যে-রকম শ্রদ্ধাভক্তি দেখা গেল, ভের্‌খোলা-গিন্নির মধ্যে তার ছিটেফোঁটা মালুম হল না। তারানেত্‌সের হাত থেকে প্যাঁচানো তারের কুণ্ডলীটা একটানে ছিনিয়ে নিয়ে স্ত্রীলোকটি চিৎকার করে বলল:

'কে তমাদেরে কল ভাঙতি দিবে শুনি? কে দিবে? খালি জিনিসপত্তর ভাঙাচোরা করতেই শিখ্যেছ! নিজি-নিজি একটা কল বানাও-না, দেখি মুরোদ কত! যমের অরুচি বাউণ্ডুলে যত সব! দূর হ, দূর হ, নইলে সব কয়ডার মাথা ভেঙ্যে থোব...'

ভের্‌খোলা-গিন্নির ইত্যাকার বচনসুধা-বর্ষণ চলতেই থাকল। লিদচ্‌কা এর আগে পর্যন্ত ঘরের এককোণে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার সে ঘরে-চোলাই মদের কুফল সম্বন্ধে শান্তভাবে আলোচনা শুরু করার প্রয়াস পেল। কিন্তু ভের্‌খোলা-গিন্নি, দেখা গেল, প্রচণ্ড শক্তিশালী একজোড়া ফুসফুসের অধিকারিণী। চোলাই মদের বোতলগুলো ইতিমধ্যে ভাঙা হয়ে গেল, উঠোনের মাঝখানে লোহার একটা ডাণ্ডা দিয়ে মদ-চোলাইয়ের যন্ত্রটাকে ভেঙে প্রায় শেষ করে আনল কারাবানভ, লুকা সেমিওনভিচ সহৃদয়ভাবে আমাদের বিদায় জানাতে-জানাতে আবার আসবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল আর বারে-বারে বলতে লাগল যে সে বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হয় নি, জাদোরভ ইভানের সঙ্গে করমর্দন করল, তারপর ইভান তার অ্যাকর্ডিয়নে ক্যাঁ-কোঁ আওয়াজ তুলে কর্কশ একটা সুর বাজাতে লাগল -- অথচ তখনও ভের্‌খোলা-গিন্নি চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে গালাগালি দিয়ে চলেছে, আমাদের আচরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে ক্ষণে-ক্ষণে নতুন বিশেষণ প্রয়োগ করে আর আমাদের ভবিষ্যৎ-যে কতখানি ঝরঝরে তার জানান দিয়ে। আশপাশের বাড়ির উঠোনে স্ত্রীলোকরা তখন দাঁড়িয়ে গেছে স্থাণুর মতো, উঠোনগুলোয় আড়াআড়িভাবে মাথার ওপর টাঙানো তারের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে-দেয়া চেনগুলো টানাটানি করতে-করতে কুকুরগুলো ঘেউঘেউ বা কেঁউকেঁউ করে ডাক ছেড়ে চলেছে, আর বাড়ির আস্তাবলে-আস্তাবলে কর্মরত পুরুষরা আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে মাথা নাড়ছে।

ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম আমরা। দৌড়তে গিয়ে কারাবানভ তো বেড়ার ঘন বাবলা-ঝোপে ধাক্কা খেয়ে পড়েই গেল।

'উহ্, মর্যে যাব! ভগমান, মর্যে যাব! বলে কিনা, পড়শি-ভাইরা — উহ্, উহ্! টক মাঠা দিয়্যে তোদের নিজেদের প্যাটে পচন ধরা গিয়্যে! অ্যাই, ভোলখভ, তোর কি প্যাট কামড়াচ্ছ্যে নাকি?'

ওই একই দিনে ছ-ছটা ভাটিখানা আমরা নষ্ট করে দিলুম। আমাদের মধ্যে হতাহত হল না কেউ। ভাটিখানা-ধ্বংসযজ্ঞ শেষ করে যখন শেষ কুঁড়েটা ছেড়ে চলে আসছি ঠিক তখনই গ্রাম-সোভিয়েতের চেয়ারম্যান সের্গেই পেত্রোভিচ গ্রেচানির সম্মুখীন হলুম। কালো, মসৃণ, চকচকে একমাথা চুল আর মোম-লাগানো পাকানো গোঁফসমেত চেয়ারম্যানকে দেখতে ছিল হুবহু কসাক-মোড়লের মতো। রীতিমতো অল্প বয়সেই তিনি ওই এলাকার সবচেয়ে সমৃদ্ধ খামারী হয়ে উঠেছিলেন এবং অত্যন্ত যোগ্য কাজের লোক হিসেবে সর্বত্র গণ্য হচ্ছিলেন। অল্প কিছুটা দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে উনি হাঁক পাড়লেন:

'ওহে, এই-যে! এক মিনিট খাড়াও দেখি!'

আমরা দাঁড়িয়ে পড়লুম।

'শুভদিন। শুভকামনা জানাই... কিন্তু জিজ্ঞেসা করতে পারি কি, অন্যের উপর এইভাবে জবরদস্তি হস্তক্ষেপের অধিকার তোমাদেরে দেছে কে? লোকের ভিটার ভাটিখানা, জিনিসপত্তর সর্বকিছু ভাঙচুর করার? এমনধারা ব্যাভার করার কী অধিকার আছে তোমাদের?'

গোঁফজোড়ায় আবার একবার ভালোমত মোচড় দিয়ে নিয়ে উনি এবার আমাদের নেহাতই বে-সরকারি মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

আমার 'জবরদস্তি হস্তক্ষেপ'-এর পরোয়ানাখানা নিঃশব্দে ওঁর হাতে তুলে দিলুম।

কাগজখানা বারে-বারে উলটেপালটে দেখলেন উনি, তারপর স্পষ্ট অসন্তোষের ভাব দেখিয়ে ওখানা আমায় ফেরত দিলেন:

'এখানা হুকুমনামা ঠিকই, কিন্তু লোকে বিরক্ত হইত্যাছে। যে-কোনো কলোনি যদি এমনিধারা ব্যাভার করার অনুমতি পায়, তাইলে সোভিয়েত সরকারের কপালে-যে কত দুগ্গতি ল্যাখা আছে কে জানে... ইদিকে আমি নিজেই বলে বে-আইনী মদ-চোলাই বন্ধ করার ল্যেগে কত চেষ্টা করত্যাছি।'

'অ, তাই বুঝি আপনের নিজির বাড়িতেই ভাটিখানা রেখ্যেছেন,' মৃদু স্বরে বলল তারানেত্‌স। ওর অন্তর্ভেদী উদ্ধত চোখদুটো তখন চেয়ারম্যানের মুখের ওপর ঘুরছে।

উলিডুলি জামা-গায়ে তারানেত্‌সের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে এক-নজর তাকালেন চেয়ারম্যান। বললেন:

'তুমি তোমার নিজির চরকায় তেল দ্যাও দেখি! নিজিরি বড় কেউকেটা ঠাওরাইতাছ, না? কলোনির লোক তুমি, কেমন? আমরা ব্যাপারটারে নিয়া সব থেইক্যা উপর-মহলে দরবার করুম-আনে, দেখুম স্থানীয় কর্তৃপক্ষরে অপমান কইর‍্যা একদল দুর্বৃত্ত পার পাইয়া যায় ক্যামনে।'

আলোচনা ফুরোল। উনি চলে গেলেন ওঁর পথে, আমরা আমাদের পথে।

আমাদের অভিযানের পরিণতিতে সুফল ফলল। পরদিন কামারশালের দোরগোড়ায় ভিড়-জমিয়ে-থাকা আমাদের খরিদ্দারদের কাছে জাদোরভ ঘোষণা করে দিল:

'আসচে রবিবার আমরা আরও ভালো ফল দেখাব — পুরো কলোনিই — পঞ্চাশ জনই — আমরা বেরিয়ে পড়ব।'

গ্রামবাসীরা তড়িঘড়ি দাড়ি নেড়ে-নেড়ে সম্মতি জানাল, বলল:

'ঠিকই তো, কামটা ঠিকই করতেছেন আপনেরা। এয়াতে ফসল তো নষ্ট হয়ই, আর তাছাড়া এয়া বে-আইনী যখন, তখন এডারে বন্ধ করাই উচিত।'

এর পর কলোনিতে আর কাউকে মাতলামি করতে দেখা গেল না বটে, তবে একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিল — তা হল, জুয়াখেলা। ক্রমশ আমরা লক্ষ্য করতে লাগলুম যে কিছু-কিছু ছেলে দুপুরবেলায় খাবার সময়ে রুটি খাচ্ছে না, আর ঘরদোর পরিষ্কার করা কিংবা ওই ধরনের অপেক্ষাকৃত কম মজাদার কাজগুলো যেদিন যাদের করবার কথা সেদিন তারা তা না-করে অন্য ছেলেরা করছে। যেমন:

'এ কি, তুমি আজ ঘর সাফ করছ কেন, ইভানোভ করছে না?'

'ও আমারে অর হয়্যে ঘর সাফ করতি কয়েচে।'

'অন্যের হয়ে' কাজ করা প্রতিদিনকার ঘটনা হয়ে দাঁড়াল, এবং ক্রমে এই ধরনের 'উপযাচক'-এর কয়েকটা সুনির্দিষ্ট দলই গড়ে উঠল। নিজেরা না-খেয়ে নিজেদের অংশটা অন্যদের দিয়ে দিচ্ছে এমন ছেলের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়তে শুরু করল।

কিশোর-কিশোরীদের কোনো উপনিবেশের পক্ষে জুয়াখেলার চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা আর হতে পারে না। সাধারণ হাত-খরচায় জুয়াড়ির চলার কথা নয়, বাড়তি টাকা-পয়সার সন্ধান তাকে করতেই হয়, আর এই সন্ধানের একমাত্র অর্থ হল, চুরি করা। এই নতুন অনর্থের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করার ব্যাপারে আমি বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ করলুম না।

অভ্চারেঙ্কো নামে একটি হাসিখুশি চট্পটে ছেলে দিব্যি আমাদের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল। একদিন সে হঠাৎ পালিয়ে গেল। ওর পালানোর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ব্যর্থ হলুম। এর পরদিন শহরে রাস্তার বাজারের ভিড়ের মধ্যে ছেলেটার সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি আমার দেখা — কিন্তু আমার সাধ্যমত তাকে বোঝানো সত্ত্বেও সে আর কলোনিতে ফিরতে রাজি হল না। ছেলেটি আমার সঙ্গে যেভাবে কথাবার্তা বলল তাতে বোঝা গেল, ও জুয়ার দেনার দায়ে অসম্ভব বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

আমাদের রক্ষণাধীন ছেলেপিলেদের কাছে জুয়াখেলার দরুন দেনা তখন দলিল-ছাড়া সত্যবদ্ধ পণ হিসেবে গণ্য হচ্ছিল। ওই ধরনের দেনা পরিশোধ করতে না-পারলে কেবলমাত্র মারধর কিংবা অন্যান্য শারীরিক নির্যাতনই-যে ভোগ করতে হোত তা-ই নয়, বারোয়ারিভাবে তিরস্কারও কপালে জুটত।

উপনিবেশে ফিরে এসে সন্ধেবেলা ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলুম:

'অভ্চারেঙ্কো পালাল কেন?'

'আমরা তা কী করো জানব?'

'তোমরা ভালোই জান!'

সব চুপ।

ওই রাত্রেই, সাহায্যের জন্যে কালিনা ইভানভিচকে ডেকে নিয়ে আমি তন্নতন্ন করে তল্লাসি চালালুম। আর এর ফল যা দাঁড়াল তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম: বালিশের নিচে, ট্রাঙ্কে, ছোটখাট বাক্সে, এমন কি কিছু-কিছু ছেলের জামার পকেট থেকেও, মজুত-করা গাদা-গাদা চিনি বেরুল। দেখা গেল, এ-ব্যাপারে সবচেয়ে ধনীলোক হল বুরুন — আমার অনুমতি নিয়ে ছুতোরশাল থেকে সে নিজের জন্যে যে-ট্রাঙ্কটা বানিয়েছিল, তার মধ্যে চিনি পাওয়া গেল তিরিশ পাউন্ডেরও বেশি। কিন্তু এহ বাহ্য। মিতিয়াগিনের কাছে যা পাওয়া গেল তাতে আমাদের চোখ ছানাবড়া হবার যোগাড়। ওর

বালিশের নিচে পুরনো একটা ভেড়ার লোমের টুপির মধ্যে লুকনো ছিল রুপো আর তামার মুদ্রায় মিলিয়ে পঞ্চাশ রুব্‌ল।

অত্যন্ত মনমরা হয়ে বুরুন খোলাখুলি স্বীকার করল:

'তাসখেলায় চিনিডা বাজি জিত্যে পেয়্যেছি।'

'অন্য ছেলেদের কাছ থেকে?'

'উঁ? হুঁ!'

কিন্তু সমস্ত জেরার উত্তরে মিতিয়াগিন খালি একটা কথাই বলল:

'আপনারে কিচ্ছুটি বলব না।'

তল্লাসির ফলে চিনি আর আরও নানাবিধ জিনিস, যেমন মেয়েদের পরনের ব্লাউজ, রুমাল আর হাতব্যাগ, সবচেয়ে বেশি করে মজুত আছে দেখা গেল সেই ঘরে যেখানে আমাদের তিনটি মেয়ে-সদস্য, ওলিয়া, রাইসা আর মারুসিয়া থাকত। জিনিসগুলো যে কার মেয়েরা কিছুতেই তা ফাঁস করতে রাজি হল না। ওলিয়া আর মারুসিয়া খানিকটা কান্নাকাটি করল, কিন্তু রাইসা চুপ করে রইল।

কলোনিতে মোটমাট ওই তিনটি রক্ষণাধীন মেয়েই ছিল। লোকের বাসাবাড়িতে চুরি করার অপরাধে কমিশন থেকে ওদের কলোনিতে পাঠানো হয়েছিল। ওদের মধ্যে একজন -- ওলিয়া ভোরনভা -- (সম্ভবত আকস্মিকভাবেই) অল্পবয়সী চাকরানীদের জীবনে যা হামেশা ঘটত এমন ধরনের একটা কুৎসিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু মারুসিয়া লেভ্‌চেঙ্কো এবং রাইসা সকলোভা ছিল অত্যন্ত ধৃষ্ট ও অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল। ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে ওরা মদ খেত আর গালিগালাজেও ছিল সমান পটু, বাজি রেখে তাসখেলাতেও যোগ দিত সমান উৎসাহে। খেলাটা সাধারণত মেয়েদের ঘরেই জমত। তদুপরি, মারুসিয়া ছিল উৎকট-রকমের হিস্টিরিয়াগ্রস্ত; প্রায়ই সে মেয়ে-বন্ধুদের অপমান করত, এমন কি কখনও-কখনও মারতও, এবং সব সময়েই একেবারে অসম্ভব সব কারণে ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাত। নিজেকে ও 'সব-খোয়ানো মনিষ্যি' বলে গণ্য করত, আর উপদেশ দিতে গেলে বা তিরস্কার করলে সেই একঘেয়ে একটা জবাবই দিত:

'কর‍্যে লাভ কী? আমার তো সব্বোনাশ হইতে আর কিছু বাকি নাই।'

গোলগাল-চেহারার, নোংরা, অগোছালো, কুঁড়ের বাদশা রাইসা ছিল খিলখিলিয়ে হাসতে ওস্তাদ। কিন্তু ও মোটেই হাবাগবা ছিল না, বরং বলতে

গেলে অন্যদের তুলনায় কিছুটা লেখাপড়াও জানত। কোনো এক সময়ে মেয়েটা নাকি হাইস্কুলেও পড়েছিল, তাই আমাদের শিক্ষিকারা ওকে 'রাব্‌ফাক'-এর উপযোগী করে তৈরি করে দিতে চাইছিলেন। ওর বাবা এক সময়ে আমাদের শহরে মুচির কাজ করত, কিন্তু যখনকার কথা বলছি তার দু-বছর আগে মাতাল-অবস্থায় মারামারি করার সময় ছুরি খেয়ে সে মারা পড়ে; মেয়েটার মা-ও মদ খেত আর ভিক্ষে করে বেড়াত। রাইসা অবশ্য আমাদের জানিয়েছিল যে ওরা নাকি ওর সত্যিকার বাপ-মা ছিল না, একেবারে বাচ্চা বয়সে ওকে কেউ সকলোভদের দোরগোড়ায় ফেলে রেখে গিয়েছিল। ছেলেরা কিন্তু এ-সব বানানো গল্প বলে উড়িয়ে দিত।

'দ্যাখবেন, এরপর কোনদিন হয়তো ও কবে অর বাপ রাজপুত্তুর ছিল।'

রাইসা আর মারুসিয়া ছেলেদের সঙ্গে আচরণে কিছুটা স্বাধীনতা বজায় রেখে চলত। ছেলেরাও ওদের অভিজ্ঞ 'বেশ্যা' হিসেবে খানিক খাতির করত। এই কারণে মিতিয়াগিন ও অন্যান্যদের নোংরা ষড়্‌যন্ত্রের পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু-কিছু খুঁটিনাটি কাজের দায়িত্ব ওদের ওপর ন্যস্ত থাকত।

মিতিয়াগিন আসার ফলে কলোনিতে গুণ্ডামি-রাহাজানির প্রবণতাটা পরিমাণগত ও গুণগত উভয় দিক থেকেই বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মিতিয়াগিন ছিল চুরিবিদ্যেয় পাকা, মাথা খাটিয়ে কৌশল উদ্ভাবনে দক্ষ, অসমসাহসী, আর এ-কাজে সব সময়েই উত্‌রে যেত সে। আর এই সবকিছুসুদ্ধ ছেলেটা ছিল অসম্ভব আকর্ষক এক চরিত্র। ওর বয়স ছিল বছর সতেরো, কিংবা তার চেয়ে অল্প কিছু বেশি।

মিতিয়াগিন ছেলেটার মুখে ছিল ফ্যাকাশে রঙের ঝাঁপালো একজোড়া ভ্রূর 'বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক চিহ্ন'। ওর নিজের ভাষায়, এই 'বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক চিহ্ন' প্রায়ই ওর কাজে সাফল্যের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিত। এটা কিছুতেই ওর মাথায় ঢুকত না যে চুরি বাদ দিয়ে অন্য অনেক কিছুই ওর পক্ষে করা সম্ভব। যেদিন ও কলোনিতে এসে পেঁছিল সেই দিনই সন্ধেবেলায় আমার কাছে এসে খুব খোলাখুলি, বন্ধুত্ব-পাতানোর ঢঙে বললে:

'ছোঁড়ারা তো আপনের সম্বন্ধে ভালো কথাই কয় দেখি, আন্তন সেমিওনভিচ।'

'হুঁ, তাতে হয়েছে কী?'

'খ্ব ভালো কথা! ছোঁড়ারা যদি আপনারে পছন্দ করে তাইলে ওদের সময়টা কাটব্যে ভালো।'

'তাহলে তোমাকেও আমায় পছন্দ করতে হবে, তাই তো?'

'ওহ্, না-না... আমি কলোনিতি বেশি দিন থাকতেছি না।'

'কেন নয়?'

'থাকতে যাব কিসির জন্যি? আমি তো চেরকাল চোরই থাকব।'

'অভ্যেসটা তুমি ছেড়ে দিতেও তো পার।'

'জানি, জানি। কিন্তু ছ্যেড়ে দিয়ি লাভ?'

'এ তুমি চাল-মারা কথা বলছ, মিতিয়াগিন।'

'না-না, চাল দিতেছি না। চুরি করায় কত মজা! ক্যামনে চুরি করতি হয় শ্ধ্ তা-ই জানলিই হল্য -- খালি দেখতি হয় ঝুটম্ট যে-কোনো লোকরি যেন না-ঠকাই! কিছ্-কিছ্ শোরের বাচ্চা আছে যারা ঝুটম্ট লোক ঠকাতি চায়, কিন্তু কিছ্ মানষেরে সবেবান্বাস্ত করা একদম ঠিক না।'

'ঠিক বলেছ,' আমি বলল্ম, 'কিন্তু যার চুরি যায় সে নয়, যে চুরি করে সে-ই সত্যিকার কষ্ট পায়।'

''কষ্ট পায়'? কথাডার মানে কী?'

'ব্ঝিয়ে বলছি! ধর, তুমি চুরি করতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে, আর কাজ করতে হয়ে পড়লে অনভ্যস্ত। কাজেই তোমার কাছে সবকিছ্ দিব্যি সহজ হয়ে গেল, তুমি মদ খাওয়াও ধরলে; এক কথায়, হয়ে দাঁড়ালে অপদার্থ রক্তচোষা একটি জীব ছাড়া কিছ্ নয়। তারপর জেলে গেলে, আর জেল থেকে বেরিয়ে আর কোথাও...'

'জেলখানায় য্যান মান্ষ নাই, নাকি! এমন ঢের-ঢের মান্ষ আছে যারা জেলখানার থ্যেকে 'বাইরি'-ই খারাপ থাকে। কিছ্ই বলতি পারেন না আপনে।'

'অক্টোবর বিপ্লবের কথা শ্নেছ কখনও?'

'আলবত্ শ্ন্যেছি! আমি তো লালরক্ষীদের সাথে ছিলাম।'

'ঠিক আছে, শোনো বলি! এখন জেলখানার চেয়ে বাইরে মান্ষের জীবন আগের চেয়ে অনেক ভালো হতে চলেছে।'

'হয় কিনা, দেখা যাক,' মিতিয়াগিন চিন্তিতভাবে বললে। 'এখনও ঢের-ঢের রক্তচোষা শয়তান চারদিকি ঘ্রিফিরি বেড়াচ্ছে। যেভাবে হোক অরা

নিজিদের সুবিধা করি নেবেই। কলোনিরই চারপাশি যারা ঝাঁক বেঁধ্যে আছে তাদেরই দ্যাখেন-না ক্যানে! ব্যস রে, ব্যস!'

কলোনির ভেতরে জুয়ার আড্ডা ভেঙে দিলুম যখন, ওর টুপির খোলে টাকা এল কোত্থেকে মিতিয়াগিন তা জানাতে অস্বীকার করল।

'এ তোমার চুরির টাকা?'

ও হাসল। বলল:

'আপনে এমন মজার লোক আন্তন সেমিওনভিচ যে কী বলি!.. বোঝতেই পারেন, এ আমি উপায় করি নাই! দুনিয়ায় এখনও ঢের-ঢের হাবাগবা-লোক রয়্যে গেছে। হাবাগবারা এই ট্যাকা এক-জায়গায় এন্যে জড় করিছে, আর তারপর মাটিতি লুটোপুটি খায়্যে কুর্নিশ কর্যে-কর্যে পেটমোটা বদমাসদের হাতে তা তুল্যে দিচ্ছে। তা ভাবলাম, আমিই-বা এর জন্যি খুঁতখুঁত করব ক্যানে? ইচ্ছা করলিই আমি তো সব আত্মসাৎ করতি পারি। তা. ঠিক আছে -- আমিই নিয়্যে নিলাম। কিন্তু মুশকিল কি, আপনের কলোনিতি কোনো কিছু লুকানোর জায়গা নাই। আমি ভাবি নাই যে আপনে সবকিছু তল্লাস করবেন...'

'ঠিক আছে। কলোনির কাজে টাকাটা আমি নেব। এখনই এ-সম্বন্ধে একটা এজাহার লিখে ফেলব, আর টাকাটা ঋণ হিসেবে নেয়া হল বলে খাতায় দেখানো থাকবে। এখন অবশ্য তোমার নামটা উল্লেখ করব না।'

চুরির ব্যাপারটা নিয়ে এরপর ছেলেদের সঙ্গে কথা বললুম:

'জুয়োখেলা আমি সরাসরি নিষিদ্ধ করে দিচ্ছি। এখানে আর তোমাদের তাসখেলা চলবে না। তাসখেলা মানে, তোমাদের সাথীদের পকেট মারা।'

'অরা খেলে ক্যানে, না-খেললিই পারে।'

'ওরা গণ্ডমূর্খ তাই খেলে। আমাদের কলোনির বহু সদস্য আধপেটা খেয়ে থাকে, চিনি, রুটি এ-সব খেতে পায় না। জুয়োখেলার জন্যেই অভ্‌চারেঙ্কোকে কলোনি ছাড়তে হল, আর এখন ও নাকের-জলে-চোখের-জলে হয়ে চোরেদের বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'তা বটে... অভ্‌চারেঙ্কোর ব্যাপারডা খারাপই দাঁড়ায়েছে বটে,' মিতিয়াগিন বলল।

আমি বলে চললুম:

'মনে হচ্ছে কলোনিতে এমন কেউ নেই যে দুর্বল কমরেডকে রক্ষা করতে

পারে। কাজেই, কাজটা আমাকেই করতে হবে দেখছি। তাসখেলায় নির্বুদ্ধিতার দায়ে ছেলেরা না-খেয়ে থাকবে আর তার ফলে তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হবে, এ আমি হতে দিতে পারি না। এ আমি হতে দেব না। কী করতে চাও এখন, তা নিজেরাই ঠিক কর। মনে কোরো না, তোমাদের এজমালি ঘরগুলো তল্লাস করে আমি আনন্দ পাই। কিন্তু অভ্‌চারেঙ্কোকে শহরের পথে কেঁদে-কেঁদে ঘুরতে আর সর্বনাশের পথে পা-বাড়াতে দেখে আমি ঠিক করেছি আর তোমাদের সঙ্গে ভদ্রতা বজায় রেখে চলব না। এখন, যদি চাও তবে এস নিজেদের মধ্যে আমরা একটা চুক্তি করি যে এখানে আর জুয়োখেলা হবে না। এ-ব্যাপারে তোমরা কি আমায় কথা দিতে পার? আমার কেবল ভয় এই যে... তোমাদের কথার বিশেষ কিছু দাম নেই: বুরুন কথা দিয়েছিল...'

অন্যদের ঠেলে বুরুন হঠাৎ সামনে এগিয়ে এল। সজোরে বলল:

'আপনে ঠিক বলতিছেন না, আন্তন সেমিওনভিচ! মিথ্যা কথা কইতি আপনের লজ্জা হওয়া উচিত!.. আপনেও যদি মিথ্যা কথা কয়েন, তাইলে আমরা... তাসখেলার ব্যাপারে আমি এট্টা কথাও কই নাই।'

'দুঃখিত, তুমি ঠিকই বলেছ। আমারই দোষ হয়েছে, ওই একই সঙ্গে তুমি-যে তাসও খেলবে না এই কথাটা নিয়ে নেয়া তখনই উচিত ছিল আমার। আর সেই সঙ্গে সামগোন না-খাওয়ার ব্যাপারটাতেও...'

'আমি সামগোন খাই না।'

'ঠিক আছে, এতেই হবে। আচ্ছা, তাহলে কী করা যাবে এখন?'

এবার কারাবানভ আস্তে-আস্তে সামনে এগিয়ে এল। আকৃষ্ট না-হয়ে পারা যায় না এমন প্রাণবন্ত ও সুমার্জিত কারাবানভ তার রীতি অনুযায়ী তখনও অল্প একটু দেখানেপনার ভাব করছিল। স্তেপভূমিতে থাকার সময় স্তেপের বাসিন্দা মহিষের গুরুভার শক্তির কিছুটা ও আত্মস্থ করতে পেরেছিল। আর সেই শক্তিকে আয়ত্তে রাখার যে-বিশেষ ধরন ওর জানা ছিল তার ফলে তা আরও কার্যকর বলে মনে হোত।

'দোস্ত-সব, সবকিছু এখন দিনির আলোর মতন পরিষ্কার হয়্যে গেছে। তাসখেলায় আর আমরা নিজিদের কমরেডদের গাঁট কাট্যে যেতি পারি না। আমার উপর তোমরা চটো আর যাই কর, আমি জুয়াখেলার বিরুদ্ধে দাঁড়াতি চাই। কাজেই, বুঝ্যেছ তো, আমি এখন থ্যেকে আর কিছুর বিরুদ্ধে নয়, শুধু জুয়াখেলার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করব। এ আমি করবই করব! আর নয়তো

যাদের আমি তাস খেলতি দ্যাখব তাদের জামার কলার ধর্যে এক-আধটুক লাড়াচাড়া দিব আর-কি। অভ্চারেঙ্কোরে চল্যে যেতি দেখ্যেছি আমি। এ তো চল্যে যেতি দেয়া নয়, ছোঁড়ারে কবরে পাঠানোর সামিল। আর তোমরা ভালোই জান, অভ্চারেঙ্কো হাতসাফাই করতি পারত না। বুরুন আর রাইসাই গাঁট কাট্যে অরে পথে বসাইছিল। তা, আমি বলি কি, অরা দু-জনা এখন বাইরি যাক আর গিয়ি অর তল্লাস করুক। আর ছোঁড়ারে না-পাওয়া পেয্যন্ত অরা যেন না-ফির্যে আসে।'

বুরুন এ-প্রস্তাব সোল্লাসে সমর্থন করল। তবে বলল:

'রাইসারে নিয়ি আমার কী ছাই উবগারটা হবে? আমি নিজিই ছোঁড়ারে খুঁজ্যে বার করব'খন।'

এরপর বাচ্চারা একসঙ্গে কলকল করে কথা বলতে শুরু করল। যে-চুক্তি হল তাতে সবাই খুশি। সব ক-জোড়া তাস বাজেয়াপ্ত করে বুরুন নিজের হাতে সেগুলো ময়লা-ফেলার বালতিতে ফেলে দিল। কালিনা ইভানভিচ হাসতে-হাসতে চিনির সঞ্চয় এক জায়গায় জড় করে ফেলল। বলল:

'ধন্যবাদ, পোলাপানরা! বহুত্ খরচ বাইচ্যা গেল।'

এজমালি শোবার ঘরের বাইরে মিতিয়াগিন আমার সঙ্গে দেখা করল। জিজ্ঞাসা করল:

'আমারে কি চল্যে যেতি হবে?'

বিষণ্ণভাবে জবাব দিলুম:

'তুমি আরও কিছুদিন থাকতে পার।'

'আমি কিন্তু ফাঁক পাল্যেই চুরি কর্যে যাব।'

'ঠিক আছে, চুলোয় যাও তুমি। চুরি করেই যাও তাহলে। যা ভালো বোঝ, কর।'

হকচকিয়ে গিয়ে ও চলে গেল।

পরদিন সকালে অভ্চারেঙ্কোর খোঁজে বুরুন শহরে যাত্রা করল। আর পিছু-পিছু পায়ে-পায়ে চলল ছেলেরা, রাইসাকে তাদের সঙ্গে টেনে নিয়ে। বুরুনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে কারাবানভ সারা কলোনিকে শুনিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল:

'ইউক্রেনে বীরব্রতের যুগ আজও শেষ হয় নাই!'

কামারশাল থেকে একমুখ হাসি নিয়ে মাথা বের করে ব্যাপারটা দেখছিল জাদোরভ। এবার আমার দিকে ফিরে ওর স্বভাবসিদ্ধ সহজ ভঙ্গিতে একান্তে কথাবলার ধরনে বলল:

'শয়তান ভবঘুরে যত সব — তবু দারুণ সব ছেলেপিলে, সত্যি।'

'আর তুমি নিজিরে কী ঠাউরেছ কও তো হে?' প্রচণ্ড তীব্র কণ্ঠে শুধোল কারাবানভ।

অ্যাটেন্‌শনের ভঙ্গিতে সটান খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে এবার জাদোরভ জবাব দিল, 'আগে ছিলাম বংশগত ভবঘুরে, আর এখন মাক্সিম গোর্কি শ্রম-কলোনির কর্মকার শ্রীমান আলেক্সান্দর জাদোরভ!'

'সহজভাবে ঢিলা হয়্যে দাঁড়াও!' বলেই কামারশালের পাশ দিয়ে গট্‌গট করে হেঁটে চলে গেল কারাবানভ।

ওই দিন সন্ধেয় বুরুন ফিরিয়ে আনল অভ্‌চারেঙ্কোকে — অনাহারক্লিষ্ট তবু মনেপ্রাণে খুশিতে ওপছানো অভ্‌চারেঙ্কো।

## ১০

## 'সামাজিক শিক্ষাক্ষেত্রে বীরবৃন্দ'

আমাকে ধরে সবসুদ্ধ ছিলুম আমরা পাঁচজন। আমরা পরিচিত ছিলুম 'সামাজিক শিক্ষাক্ষেত্রে বীরবৃন্দ' নামে। আমরা-যে কেবল নিজেদের ওই নামে ডাকতুম না তাই নয়, বিশেষ করে বীরোচিত কোনো কাজ-যে করছি তা-ই কোনোদিন মাথায় আসে নি আমাদের — তা কি কলোনির অস্তিত্বের গোড়ার দিকে, কি তার অষ্টম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময়েও।

কেবল-যে গোর্কি কলোনির ক্ষেত্রেই 'বীরবৃন্দ' কথাটা তখন ব্যবহার করা হচ্ছিল তা নয়। তবু আমরা সকলেই মনে-মনে বিশ্বাস করতুম যে শিশু-আশ্রম ও উপনিবেশগুলোর কর্মীদের মনোবল বাড়ানোর জন্যে নিছক ধর্‌তাই বুলি হিসেবে ওই ধরনের কথা বলা হচ্ছে। কারণ, যে-সময়ের কথা বলছি তখন সোভিয়েত জীবন ও বিপ্লবী আন্দোলন বীরোচিত ঘটনাবলীতে পূর্ণ ছিল, বরং আমাদের বিশেষ ধরনের কাজই মূলগতভাবে ও অনুষ্ঠিত কীর্তিকলাপের বিচারে ছিল নিছক গদ্যময়।

*যথেষ্ট পরিমাণ ত্রুটিবিচ্যুতিসহ আমরা ছিলুম নিতান্তই সাধারণ মানুষ।* এমন কি নিজেদের কাজও-যে ভালোভাবে বুঝতুম তা নয়: আমাদের কাজের দিনগুলো ভরে থাকত ভুলভ্রান্তিতে, সংশয়ে-ভরা চালচলনে, বিশৃঙ্খল চিন্তায়। আর সামনের পথ ছিল অচ্ছেদ্য কুয়াশায় ঢাকা, যার মধ্যে দিয়ে শিক্ষাদান-সম্পর্কিত আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের অস্পষ্ট আদরাটুকু প্রাণপণ চেষ্টায় কোনোরকমে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল মাত্র।

আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপকেই তখন যে-কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করা যেত, কেননা প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল অ-পরিকল্পিত। আমাদের কোনো কাজকেই তখন বলা চলত না অকাট্য বা তর্কাতীত। আর যখন আমরা তর্ক শুরু করতুম ব্যাপারটা তখন আরও খারাপ দাঁড়াত, কারণ ওই সব তর্কাতর্কি থেকে কখনও সত্যের উদ্ভব ঘটত না।

কেবলমাত্র দুটো ব্যাপার ছিল যাতে কারো মনে কখনও সন্দেহের উদ্রেক হয় নি: তার একটা হল, আরব্ধ কাজ মাঝপথে ছেড়ে না-দিয়ে তাকে যে-কোনো একধরনের পরিণতি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় সিদ্ধান্ত, তা সে পরিণতির অর্থ যদি ব্যর্থতা হয় তবুও; আর দ্বিতীয়টা হল, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা — কলোনির ভেতরে ও কলোনিকে ঘিরে।

ওসিপভ-পরিবার কলোনিতে আসার পর প্রথমদিকে কলোনির বাচ্চা বাসিন্দাদের সম্পর্কে তাঁদের অসম্ভব ভয় আর বিরূপ ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আমাদের নিয়ম অনুযায়ী ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে ছেলেদের সঙ্গে বসে একসঙ্গে দুপুরের খাবার খেতে হোত। কিন্তু ইভান ইভানভিচ ও তাঁর স্ত্রী জোরগলায় জানিয়ে দিলেন যে তাঁরা ছেলেদের সঙ্গে এক টেবিলে বসতে রাজি নন, কারণ, তাঁদেরই ভাষ্য অনুযায়ী, উন্নত রুচির ব্যত্যয় ঘটাতে নাকি তাঁরা অপারগ।

আমি তখন বলেছিলুম:

'আচ্ছা, দেখা যাবে।'

এজমালি শোবার ঘরে সান্ধ্য দায়িত্বপালনের সময় ইভান ইভানভিচ সে সময়ে কখনও ছেলেদের বিছানায় বসতেন না। বসবার অন্য কোনো জায়গা ছিল না বলে সারা সন্ধেটা তিনি কর্তব্য করে যেতেন পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে। ইভান ইভানভিচ ও তাঁর স্ত্রী প্রায়ই অবাক হতেন আমি কী করে অবলীলায় ওই সব ছারপোকা-পোষা বিছানায় বসছি তাই দেখে।

আমি বলতুম:

'ও কিছু না। শেষে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে'খন। উকুন-ছারপোকা আমরা তাড়াবই, কিংবা অন্য কোনো উপায় খুঁজে বের করব...'

কিন্তু তিন মাস যেতে-না-যেতে দেখা গেল ইভান ইভানভিচ শুধু-যে ছেলেদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে গপাগপ খেয়ে চলেছেন তা-ই নয়, খাওয়ার টেবিলে সঙ্গে করে নিজের চামচ আনাও বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। টেবিলের মাঝখানে জমা-করা চামচের স্তূপ থেকে একখানা কাঠের চামচ বেছে নিয়ে তার ওপরে শুধু একবার নিজের আঙুলগুলো বুলিয়েই তিনি তখন সন্তুষ্ট থাকছেন।

আর সন্ধেবেলায় হয়তো দেখা যেত এজমালি শোবার ঘরে দুরন্ত একদল ছেলেতে পরিবৃত হয়ে ওদেরই একজনের বিছানায় বসে ইভান ইভানভিচ 'চোর-পুলিশ' খেলায় মেতে উঠেছেন। 'চোর-পুলিশ' খেলতে হলে সব খেলুড়িকেই প্রথমে একখানা করে টিকেট টানতে হোত — টিকেটগুলোতে লেখা থাকত 'চোর', 'গোয়েন্দা', 'তদন্তকারী,' 'বিচারক' কিংবা 'জল্লাদ', এই সব। 'গোয়েন্দা'-লেখা টিকেট যে টানত তার হাতে থাকত বানিয়ে-নেয়া একখানা চাবুক। চোর-যে কে, তা অনুমান করতে হোত তাকেই। খেলা শুরু হলে পালা করে প্রত্যেকেই হাত বাড়িয়ে দিত, আর কে চোর তা অনুমান করে নিয়ে যার ওপর তার সন্দেহ জন্মাত গোয়েন্দা বেছে-বেছে তার বাড়ানো-হাতে কষিয়ে দিত চাবুকের এক-ঘা। গোয়েন্দার অবশ্য এ-ব্যাপারে প্রায়ই ভুল হোত, প্রায়ই সে হয়তো বিচারক কিংবা তদন্তকারীর হাতে বেত মেরে বসত। আর তখন, এই অযথা-সন্দেহে নিজেদের অপমানিত জ্ঞান করে ওই সব সৎ নাগরিক গোয়েন্দার হাতেই উলটে কষে বেত লাগাত। এ-খেলায় অপমান করলে তার প্রচলিত মাশুল ছিল এ-ই। এরপর গোয়েন্দা যখন আসল চোরকে ধরতে সমর্থ হোত, তখন তারও কষ্টের অবসান ঘটত, আর কষ্ট শুরু হোত চোরের। কারণ, বিচারক তখন রায় দিত — পাঁচ-ঘা জোরসে, দশ-ঘা জোরসে, পাঁচ-ঘা আস্তে, ইত্যাদি। চাবুকখানা তখন দখল করত জল্লাদ, আর দণ্ডদান যেত শুরু হয়ে।

খেলাটায় খেলুড়িদের ভূমিকা সারাক্ষণই বদলাত, একবার যে চোর হোত পরের বার সে হয়তো হোত বিচারক কিংবা জল্লাদ। তাই এ-খেলার প্রধান আকর্ষণই ছিল পালা করে যন্ত্রণা-ভোগ আর প্রতিশোধ নেয়া। বিচারক

হিসেবে কেউ হয়তো খুব কড়া কিংবা জল্লাদ হিসেবে নির্মম হল, পরের বার সে গোয়েন্দা কিংবা চোর হলে সেবারকার বিচারক কিংবা জল্লাদের হাতে তাকে তার কৃতকর্মের পুরো মাশুল গুনতে হোত, কারণ ওই বিচারক বা জল্লাদ তার আগের বারের দণ্ডাদেশ কিংবা শাস্তিদানের কথা মনে রেখে তার ওপর উচিত শোধ তুলত।

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না ও লিদিয়া পেত্রোভ্নাও এই খেলায় যোগ দিতেন। কিন্তু মহিলা বলে ছেলেরা সৌজন্যপূর্ণ বীরপনা দেখিয়ে তাঁদের বড়জোর তিন কি চারবার আস্তে বেত লাগানোর দণ্ডাদেশ দিত, আর যত মৃদুভাবে বেত উ'চনো সম্ভব তাই উ'চিয়ে জল্লাদ তাঁদের নরম মেয়েলি হাতে কোনোক্রমে চাবুকটা ছোঁয়াত।

আমি যখন ছেলেদের সঙ্গে খেলতুম তখন কিন্তু ওরা আমার সহনশক্তি পরীক্ষার ব্যাপারে চরম কৌতূহল দেখাত, ফলে তখন সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হয়ে পরীক্ষায় ওত্রানো ছাড়া উপায়ান্তর থাকত না। আবার বিচারক হিসেবে আমি এমন সব শাস্তির হুকুম দিতুম যা শুনে জল্লাদ পর্যন্ত আঁতকে উঠত। আর যখন হাতে-কলমে শাস্তি দেয়ার পালা আসত আমার, তখন আমার দাপটে চোর লাজলজ্জা ভুলে ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়ত। বলত:

'আস্তন সেমিওনভিচ, বড্ড জোর লাগতিছে!'

এর শোধবোধ হিসেবে আমাকেও কড়া-নরম সহ্য করতে হোত। ফলে সব সময়ে বাঁ-হাতের ফোলা তেলো নিয়ে ঘরে ফিরতে হোত আমাকে -- কারণ শাস্তির সময় হাত-বদলানো গণ্য হোত মর্যাদাহানিকর, তাছাড়া লেখালেখির জন্যে ডান হাতখানা সুস্থ রাখাও আমার পক্ষে দরকার হয়ে পড়ত।

প্রথম দিকে নিছক কাপুরুষতার বশে ইভান ইভানভিচ ওসিপভ খেলায় মেয়েলি পদ্ধতি নিয়ে চলতেন, ছেলেরাও গোড়ার দিকে ও'র প্রতি নরম-সরম আচরণ করত। আমি একদিন ইভান ইভানভিচকে বললুম ও'র পক্ষে এ-ধরনের পদ্ধতির আশ্রয় নেয়াটা ভুল: কারণ আমাদের ছেলেদের সাহসী আর ডানপিটে হয়ে গড়ে ওঠা দরকার। বিপদ দেখে ওদের ভয় পেলে চলবে না, শারীরিক যন্ত্রণাকে তো নয়-ই। ইভান ইভানভিচ কিন্তু এ-ব্যাপারে একমত হলেন না।

একদিন সন্ধেবেলা আমরা দু-জনে একসঙ্গে খেলায় যোগ দেয়ার পর বিচারকের ক্ষমতাবলে আমি ও'কে জোরসে বারো কোড়া লাগানোর শাস্তি

দিয়ে বসলুম আর তার পরের বারই জল্লাদ হিসেবে আমার চাবুক শিস্ দিয়ে নির্মমভাবে ও'র হাতে কেটে বসতে লাগল। এতে উনি মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না। ও'র পালা এল যখন তখন আমার ওপর এর শোধ তুললেন। আর ইভান ইভানভিচের এই আচরণের ফলে আমার ভক্তরাও প্রতিশোধ না-নিয়ে ছাড়ল না, তাদের একজন তো শাস্তির সময়ে হাত-বদল করার মতো কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিতে পর্যন্ত বাধ্য করল ওঁকে।

পরদিন সন্ধেয় ইভান ইভানভিচ এই 'বর্বর খেলা' এড়িয়ে চলতে প্রয়াস পেলেন, কিন্তু ছেলেদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের চোটে লজ্জা পেয়ে শেষপর্যন্ত যোগ দিলেন। আর, এরপর থেকে এই অগ্নি-পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে লাগলেন তিনি, বিচারক হিসেবে শাস্তি দিতেও আর কাঁচুমাচু হয়ে যেতেন না, গোয়েন্দা বা চোর হলে তাড়াতাড়ি সন্ধি করতেও ব্যস্ত হতেন না।

ওসিপভ-পরিবার প্রায়ই এই বলে অনুযোগ করতেন যে অন্য জায়গা থেকে তাঁরা ঘরে ছারপোকা বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি বলতুম:

'আমাদের ঘর থেকে নয়, এজমালি শোবার ঘর থেকেই ছারপোকা দূর করা দরকার...'

এ-ব্যাপারে আমরা চেষ্টাও করেছিলুম প্রাণপণে। বহু কষ্টে মাথাপিছু দু-প্রস্থ করে বিছানার চাদর আর পোশাক সংগ্রহ করেছিলুম। পোশাকগুলো অবশ্য জোড়াতালির সমষ্টি ছিল মাত্র, তবু গরম জলের ভাপ লাগিয়ে সেগুলো কাচা সম্ভব হচ্ছিল, ফলে পরে সেগুলোয় আর ছারপোকা ছিল কিনা সন্দেহ। তবু কলোনিতে অনবরত নবাগতের সমাগম হতে থাকায় ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ, ইত্যাদির ফলে ছারপোকা একেবারে নির্মূল করতে আরও বেশ কিছু সময় লেগে গিয়েছিল।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাজকে আনুষ্ঠানিকভাবে সার্বিক দায়িত্ব, বিশেষ দায়িত্ব ও সন্ধ্যাবেলার দায়িত্ব, এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এ-ছাড়াও প্রতিদিন সকালে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আর-একটা কাজ ছিল তা হল পড়ানো।

সার্বিক দায়িত্বের অর্থ ছিল, ভোর পাঁচটা থেকে রাত্রে শুতে যাওয়ার ঘণ্টা পড়া পর্যন্ত একধরনের একটানা কঠিন পরিশ্রমের কাজ। সার্বিক দায়িত্বরত শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে কলোনির সারা দিনের কর্মসূচি ঠিক-ঠিক

প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা দেখতে হোত, ভাঁড়ার থেকে খাবার বের করার তদারক করতে হোত, সমস্ত কাজ ঠিকমতো সমাধা হচ্ছে কিনা তার খবরদারি করতে হোত, এছাড়া ঝগড়া-বিবাদ মেটানো, দুই পক্ষকে শান্ত করা, আপত্তির মীমাংসা করা, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ চেয়ে তালিকা তৈরি ও দাখিল করা, কালিনা ইভানভিচের ভাঁড়ারঘরে কী আছে আর কী নেই তা পরীক্ষা করে দেখা এবং ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের বিছানার চাদর ও পরনের পোশাক বদলানো হয়েছে কিনা তা দেখা — এ-সমস্তই করতে হোত। এই সার্বিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করণীয় কাজ এত অসম্ভব বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে কলোনির জীবনে দ্বিতীয় বছরের সূচনা থেকেই আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কিছু-কিছু — হাতে লাল কাপড়ের ঘের-বাঁধা ছেলেমেয়েরা — শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এ-কাজে সাহায্য করতে শুরু করেছিল।

যে-শিক্ষক বা শিক্ষিকার ওপর বিশেষ কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত হোত তাঁর কাজ ছিল তখন কলোনিতে বড় ধরনের যে-কাজ চলছে, বিশেষ করে যে-কাজে বেশি সংখ্যক ছেলে নিযুক্ত আছে কিংবা যে-কাজে নিযুক্ত ছেলেদের মধ্যে নবাগতের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি, সেই কাজে নিছক ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ। সেই বিশেষ দিনে যে-কাজটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে শারীরিকভাবে, প্রত্যক্ষত যোগদানই ছিল শিক্ষক বা শিক্ষিকার করণীয় — আমাদের ওই পরিস্থিতিতে এছাড়া আর কোনো কিছু করতে গেলে তা অসম্ভব হয়ে উঠত। এইভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকারা কাজ করতেন কলোনির কারখানাগুলোয়, বনে গিয়ে গাছ কাটতেন, কাজ করতেন খেতে আর সব্জি-বাগানে, এবং যেখানে যা-কিছু আসবাব বা অন্যান্য জিনিসপত্র মেরামতির দরকার পড়ত সেখানেও।

সন্ধ্যাবেলার দায়িত্ব অবশ্য নিছক আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের চেয়ে সামান্যই বেশি ছিল। কারণ, দায়িত্ব থাকুক আর না-থাকুক সন্ধেগুলোয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা সকলেই গিয়ে জড় হতেন এজমালি শোবার ঘরগুলোয়। এতে বীরত্বের কোনো ব্যাপার ছিল না, কারণ ওছাড়া আমাদের আর যাবার জায়গাও ছিল না। তেলে-ভাসানো পল্‌তের টিমটিমে আলো-জ্বলা আমাদের ফাঁকা ঘরগুলো রাত্রে আরামদায়ক তো ছিলই না বরং ছিল কিছুটা ভয়-জাগানে। অথচ অপরদিকে আমরা নিশ্চিত জানতুম যে সন্ধেবেলার চা-পান পর্ব শেষ হবার পর কলোনির বাচ্চা বাসিন্দারা অধীর আগ্রহে আমাদের পথ চেয়ে অপেক্ষা করে আছে — তাদের খুশিখুশি মুখ আর ধারালো চোখ, সত্যিমিথ্যেয়

মেশামেশি তাদের অফুরন্ত গল্পের সঞ্চয়, সাময়িক, দার্শনিক, রাজনৈতিক আর সাহিত্য-ব্যাপারে তাদের অবিরাম প্রশ্নের ধারাস্রোত নিয়ে; তারা অপেক্ষা করে আছে আমাদের সঙ্গে 'বেড়াল-ইঁদুর' থেকে শুরু করে 'চোর-পুলিশ' পর্যন্ত রকমারি খেলা খেলবে বলে। ওদের ওই ঘরগুলোয় বসে আমাদের তৎকালীন জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনাবলী আলোচিত হোত, আশপাশের কৃষক-প্রতিবেশীদের নিয়ে চলত চুলচেরা তীক্ষ্ন বিশ্লেষণ আর জিনিসপত্র মেরামতির নানা উপায় ঠাওরানো এবং তর্ক চলত নতুন কলোনিতে আমাদের ভবিষ্যৎ সুখী জীবন গঠন সম্বন্ধে।

মিতিয়াগিন কখনও-কখনও খোশগল্প ফেঁদে বসত ওখানে। গল্প-বলায় ও ছিল সিদ্ধহস্ত; ভারি কায়দা করে গল্প বুনত ও, আর তার ফাঁকে-ফাঁকে নাটকীয় ভাবভঙ্গি ও গলার স্বর ইত্যাদি চমৎকারভাবে নকল করাও বাদ যেত না। একেবারে কমবয়সী বাচ্চারা ছিল মিতিয়াগিনের খুব প্রিয়, ওর গল্প শুনে তাদেরও মন আনন্দে নেচে উঠত। অথচ ওর গল্পে অলৌকিক বা যাদুর ব্যাপার বড় একটা থাকতই না। বেশির ভাগ গল্পই ছিল ওর বোকা চাষী আর চালাক চাষী, জবুস্থবু ধনীলোক, ধূর্ত কারিগর, মাথা-ওয়ালা ডানপিটে চোর, হতবুদ্ধি পুলিশম্যান, সাহসী, যুদ্ধজয়ী সৈনিক আর আনাড়ি, মোটাবুদ্ধি পাদ্রিকে নিয়ে।

এজমালি ঘরগুলোয় প্রায়ই আমরা সান্ধ্য পাঠচক্রের অধিবেশন বসাতুম। একেবারে গোড়া থেকে লাইব্রেরি গড়ে তোলায় মন দিয়েছিলুম আমরা। আমি বই কিনতে শুরু করেছিলুম প্রথম থেকেই, লোকের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে চেয়েচিন্তেও বই সংগ্রহ করছিলুম। শীতের শেষ লাগাদ রুশ ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রায় সব বই-ই যোগাড় হয়ে গিয়েছিল, এছাড়া সংগৃহীত হয়েছিল রাজনৈতিক ও কৃষি-সংক্রান্ত বেশ কিছু পুথি। জেলা জনশিক্ষা-দপ্তরের আগোছাল গুদামঘরগুলো থেকে বিজ্ঞানের নানা শাখার বেশ কিছু জনপ্রিয় রচনাও আমি যোগাড় করে ফেলেছিলুম।

আমাদের রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েদের অনেকেই বই-পড়ার ভক্ত ছিল, কিন্তু বইয়ের বিষয়বস্তু আয়ত্ত করার ক্ষমতা যে সকলের ছিল মোটেই তা নয়। এ-কারণেই আমরা পাঠচক্রের আয়োজন করতুম। এই চক্রে নিয়ম করে সকলে যোগ দিত। বই পড়ত জাদোরভ, কখনও-কখনও পড়তুম আমি। জাদোরভের উচ্চারণ ছিল নিখুঁত। প্রথম বছরের শীতে আমরা পুশ্‌কিন, করলেঙ্কো,

মাখিন-সির্বিরিয়াক আর ভেরেসায়েভের গ্রন্থাবলীর অনেকখানি অংশ পড়ে ফেলেছিলুম — তবে সবচেয়ে বেশি করে পড়েছিলুম গোর্কি-রচনাবলী।

গোর্কির রচনাবলী শ্রোতাদের মনে প্রবল অথচ দ্বৈত একটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারাবানভ, তারানেত্স, ভোলখভ এবং আরও কিছু-কিছু ছেলেকে গোর্কির রোমান্টিকতাই আকর্ষণ করত, লেখকের বিশ্লেষণী দৃষ্টির প্রতি ওদের কোনো আগ্রহ ছিল না। জ্বলজ্বলে চোখ মেলে ওরা 'মাকার চুদ্রা' গল্পটা শুনত, ইগ্নাত গর্দেয়েভের চরিত্র-বর্ণনার সময় উত্তেজনায় ঘনঘন নিশ্বাস ফেলত আর সেই কল্পিত লোকটির উদ্দেশ্যে সমর্থনসূচক মুঠো দেখাত। কিন্তু 'আর্খিপ-দাদু আর লিওন্কা'র বিয়োগান্ত কাহিনী ওদের ক্লান্ত করে তুলত। কারাবানভ বিশেষ করে সেই দৃশ্যের বর্ণনাটা ভারি পছন্দ করত যেখানে বুড়ো গর্দেয়েভ তাকিয়ে আছে বরফস্তূপের ভাঙনে ধ্বসে-পড়া তার 'বইয়ারিনিয়া' নামে গাধাবোটের দিকে। শুনতে-শুনতে দাঁতে-দাঁত চেপে নাটকীয় ঢঙে সেমিওন বলে উঠত:

'এরেই কয় মানুষের মতন মানুষ! আহ্, পেত্যেকেই যদি অমনধারা হোত!'

একই রকম উদ্দীপনা নিয়ে 'তিনজন' গল্পে ইলিয়ার মৃত্যুর বর্ণনা শুনত ও।

'দারুণ লোক! দারুণ লোক! পাথরে মাথা ঠুক্যে মরা··· এরেই তো সত্যিকার মিত্যু কয়!'

মিতিয়াগিন, জাদোরভ আর বুরুন কিন্তু আমাদের রোমান্টিকদের উদ্দীপনা দেখে প্রশ্রয়দানের ভঙ্গিতে হাসত, আর সুযোগমত তাদের দুর্বলতম স্থানটিতে আঘাত দিতে ছাড়ত না:

'তোরা, ছোঁড়ারা, শুনিস বটে, তয় কানে নিস না কিছু।'

'আমি কথা কানে নিই না, কইতি চাস? '

'নিস, তয় কোন্ কথাটা কানে নিস — না, ঠুক্যে মাথা ফাটায়্যে ঘিলু বার করা। তা, এর মধ্যি অত বাহাদুরির কী আছে? ওই-যে তোর ওই ইলিয়া,ও তো এট্টা পাঁড় মুখ্যু, এট্টা ভুষিমাল! আরে, কোন্ মেয়্যাছেলে অর দিকি কড়া চোখি তাকাল্য আর ও চক্ষির জলে ভাইস্যে গল্যে গেল। আমি যদি অর মতন হতাম তো আরও এট্টা ব্যাবসাদারেরে টুঁটি টিপ্যে মারতাম — অদের সব কয়টারে টুঁটি টিপ্যে মারা দরকার, তোর গর্দেয়েভ্রে পেয্যন্ত!'

'নিচের তলা' নাটকে লুকা-চরিত্রের বিচার সম্বন্ধেই একমাত্র দুই প্রতিপক্ষ একমত হতে পারত। মাথা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে কারাবানভ বলত:

'তোরা যা-ই কস না-ক্যানে, অমনধারা বুড়া-মানুষিরাই বহুত ক্ষেতি করে লোকের। খালি বাজে বকর-বকর করব্যে, আর তারপর হঠাৎ নিপাত্তা হয়্যে যাবে'খন... এই সব লোকেরে আমার ভালোই চেনা আছে।'

মিতিয়াগিন বলত, 'বুড়া লুকা সবজান্তা লোক। অর পক্ষে সবকিছুতিই সুবিধা — ও সবকিছু বোঝে, সব জায়গায় ও নিজির পথ কর্যে নেয়। এই চিটিংবাজি করত্যেছে, এই চুরি করত্যেছে, আবার এই দ্যাখ, এক্কেবারে সবার আপনজন বন্যে যাচ্ছে বুড়া। নিজি কিন্তু ও সব সময় ঠিক নিজির মতনই থাকত্যেছে।'

'আমার ছেলেবেলা' ও 'পৃথিবীর পথে' বই দুটো ওদের সকলের মনেই গভীর রেখাপাত করেছিল। নিশ্বাস বন্ধ করে ওরা পড়া শুনত, 'অন্তত রাত বারোটা অব্দি' পড়া চালিয়ে যেতে উপরোধ-অনুরোধ করত। মাক্সিম গোর্কির নিজের জীবনের কাহিনী আমি যখন শোনালুম, প্রথমে তো ওরা আমার কথা বিশ্বাসই করতে চায় না। গল্প শুনে প্রথমটা ওরা হতভম্ব হয়ে রইল, তারপর হঠাৎই কথাটা মাথায় চমক দিয়ে উঠল:

'অ, গোর্কি তাইলে আমাদেরই মতন ছেলেন? মাইরি, দারুণ ব্যাপার তো!'

আর এই ধারণাটা ওদের গভীরভাবে আলোড়িত করল, আনন্দে বিহ্বল করে দিল।

মাক্সিম গোর্কির জীবন আমাদেরই জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়াল যেন। সে-জীবনকথার নানা ঘটনা আমাদের জীবনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে তুলনার উপাদান হয়ে উঠল, হয়ে উঠল নতুন-নতুন নামকরণের সংগ্রহক্ষেত্র, তর্ক-বিতর্কের পশ্চাৎপট এবং মানবিক মূল্যবোধ পরিমাপের তুলাদণ্ডস্বরূপ।

আমাদের থেকে তিন কিলোমিটার দূরে যখন করলেঙ্কো শিশু-উপনিবেশ গড়ে উঠল, তখন ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে আমাদের ছেলেরা বিশেষ সময় নষ্ট করল না। জাদোরভ বলল:

'ওই সব ছেলের পক্ষে করলেঙ্কোই উপযুক্ত নাম! তবে আমরা হলাম গিয়ে গোর্কি-বালকবাহিনী!'

কালিনা ইভানভিচেরও দেখা গেল ওই এক মত।

'ওই করলেঙ্কোর সাথে আমার একবার দেখা হইছিল, কথা পের্যন্ত হইছিল ওনার সাথে — ভদ্দরলোক মহাশয়-ব্যক্তি। আর তরা — তত্ত্ব আর প্রেয়োগ দুই দিক থেইক্যাই বিচার কইর‍্যা তগো ভবঘুরে কওন লাগে!'

সরকারি কোনো সিদ্ধান্ত কিংবা অনুমোদন ছাড়াই আমরা গোর্কি কলোনি নামে অভিহিত হতে লাগলুম। আমাদের নিজেদের ওই নামে অভিহিত করার ব্যাপারটায় শহরেও কর্তৃপক্ষ ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন, এবং আমাদের নামের নতুন সিলমোহর ও রবার-স্ট্যাম্প সম্পর্কে কোনো আপত্তি তুললেন না। কেবল, দুঃখের বিষয়, আমাদের শহরে কেউ আলেক্সেই মাক্সিমভিচের ঠিকানা না-জানায় গোড়ার দিকে আমরা তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করতে পারলুম না। একমাত্র ১৯২৫ সালে ছবিওয়ালা একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকায় ইতালিতে গোর্কির জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ নজরে এল। এই প্রবন্ধে ইতালীয় কায়দায় ওঁর নামকরণ করা হয়েছিল — 'মাস্‌সিমো গোর্কি'। এটা দেখে — দৈবক্রমে যদি উনি পেয়ে যান এই ভরসায় — ওঁকে আমরা একখানা চিঠি লিখলুম। সেই আমাদের প্রথম চিঠি, তার লেফাফায় ছিল একেবারে আড়ম্বর-বর্জিত এই সংক্ষিপ্ত ঠিকানা: ইতালি, মাস্‌সিমো গোর্কি।

বয়োজ্যেষ্ঠ থেকে বয়ঃকনিষ্ঠ, কলোনির সব ছেলেই গোর্কির লেখা গল্প ও গোর্কির জীবনকথা সম্পর্কে পরম আগ্রহী হয়ে উঠেছিল, যদিও বয়ঃকনিষ্ঠদের বেশির ভাগই ছিল অক্ষর-পরিচয়হীন।

কলোনিতে প্রায় ডজন-খানেকের মতো বয়ঃকনিষ্ঠ ছেলে ছিল। গড়পড়তা এদের বয়স ছিল দশ বছর কিংবা তার চেয়ে সামান্য বেশি। এই ছোট্ট দলটার সব কজনাই ছিল ছটফটে, পাঁকাল মাছের মতো পিছল, হাতসাফাইয়ে পটু আর বিনা-ব্যতিক্রমে অকল্পনীয় রকমের নোংরা। এই ধরনের ছেলেপিলেরা সব সময়েই কলোনিতে এসে পৌঁছত যারপরনাই শোচনীয় অবস্থায় — হাড়চামড়া-সার, পুঁইয়ে-পাওয়া, গণ্ডমালা-রোগগ্রস্ত দেহ নিয়ে। আমাদের স্ব-নিযুক্ত ফেল্‌ড্‌শার* ও নার্স একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না এদের নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত হয়ে থাকতেন। ওঁর কঠোর বহিরাবরণ সত্ত্বেও ছেলেরা ওঁর দিকেই ভিড়ত। মায়ের মতো করে কীভাবে ওদের ধমকাতে হয় তা উনি

* ফেল্‌ডশার — সহকারী চিকিৎসা-কর্মী। — অনুঃ

জানতেন, বুঝতেন ওদের সকল দুর্বলতা, ওরা যা বলত তা কিছুতেই বিশ্বাস করতেন না (এটা এমন একটা কৃতিত্বের ব্যাপার যা কোনোদিন আমি অর্জন করতে পারি নি), একটা অন্যায়ও কোনোদিন উপেক্ষা করতেন না, এবং কোনো ব্যাপারে কোথাও শৃঙ্খলা ভাঙলেই খোলাখুলি রাগ দেখাতেন।

অথচ বাচ্চা ছেলের সঙ্গে ওঁর মতো আর কেউই অত সহজভাবে, অতখানি মানবিক দরদ নিয়ে কথা বলতে পারত না। উনি কিন্তু দিব্যি গল্প জমিয়ে তুলতেন ছেলেটির জীবন সম্পর্কে, ওর মা-র কথা নিয়ে, বড় হয়ে ও কী হবে—জাহাজের নাবিক, না লালফৌজের কম্যান্ডার, নাকি এঞ্জিনিয়র—সে-সম্পর্কেও। এক অন্ধ, অভিশপ্ত জীবন ওই দুখের বাচ্চাদের দেহে-মনে যে-মারাত্মক আঘাত হেনেছিল, সেই ক্ষতস্থানের গভীরতা মাপতে ওঁর মতো আর কেউ সমর্থ ছিল না। তদুপরি, আমাদের সরবরাহ বিভাগের যাবতীয় নিয়মকানুন চুপিচুপি উলটেপালটে দিয়ে এবং দু-একটা মিষ্টি কথায় কালিনা ইভানভিচের কড়া সরকারি কেতাকে পরাস্ত করে ওই ছেলেদের পেটপুরে খাওয়ার ব্যবস্থাও তিনি ঠিক করে ফেলতেন।

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার সঙ্গে কলোনির কনিষ্ঠতম বাসিন্দাদের প্রত্যেকের এই যোগাযোগ বয়োজ্যেষ্ঠ ছেলেরা লক্ষ্য করেছিল। একে তারা শ্রদ্ধাও করত। তাই দেখা যেত একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না যখন ছোটখাট নানা ধরনের কাজ করে দিতে তাদের অনুরোধ জানাতেন — যেমন, কোনো বাচ্চা সারা গায়ে সাবান মেখে ঠিকমতো স্নান করছে কিনা তা দেখতে বলতেন, কিংবা আরেক জন যেন সিগারেট না-খায়, বা জামাকাপড় না-ছিঁড়ে ফেলে, অথবা অপর একজন যেন পেতিয়ার সঙ্গে মারামারি না-করে সেদিকে খেয়াল রাখতে বলতেন — তখন রীতিমতো খুশিমনে ও তাঁকে খুশি করার উদ্দেশ্যে তারা এক কথায় রাজি হয়ে যেত। এ-ব্যাপারে কোনো ব্যতিক্রম দেখা যেত না।

বলা যেতে পারে, প্রধানত একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার জন্যেই কলোনির বয়োজ্যেষ্ঠ ছেলেরা বাচ্চা ছেলেদের ভালোবাসতে পেরেছিল এবং স্নেহ দিয়ে, শাসন করে ও বিবেচনার পরিচয় দিয়ে ছেলেরা ছোট্ট ভাইদের যে-চোখে দেখে ওই বড়রা বাচ্চাদের ঠিক তেমনটি দেখতে শিখেছিল।

## ১১

# বীজবোনা-যন্ত্র-মঙ্গল কথা

ক্রমশ এটা বেশি-বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে আমাদের কলোনির এক্তিয়ারভুক্ত জমি চাষবাসের পক্ষে অনুপযুক্ত। তাই আমাদের দৃষ্টি সর্বদাই আটকে ছিল সেই নতুন জায়গাটার দিকে, কলমাকের সেই তীরভূমিতে, বসন্ত যেখানে ফলের বাগানগুলোকে অজস্র পুষ্পসম্ভারে সাজিয়ে ঘুম থেকে আস্তে-আস্তে জাগিয়ে তুলছিল, মাটি যেখানে ঝলমল করছিল আপন ঐশ্বর্যে সেজে।

কিন্তু নতুন কলোনিতে মেরামতির কাজ চলছিল একেবারে শম্বুকগতিতে। নামমাত্র মজুরিতে যে-স্তরের ছুতোর-মিস্ত্রিকে কাজে নিযুক্ত করতে আমাদের সামর্থ্যে কুলিয়েছিল তারা বড়জোর গাছের গুঁড়ি পুঁতে চালাঘর বানানোর উপযুক্ত ছিল, কিন্তু চালাঘরের চেয়ে আরেকটু জটিল নক্শা আর মাপজোখের দালান বানাতে গিয়ে তারা খেই হারিয়ে ফেলল। হাজার টাকা ফেলেও বাজারে তখন কাচ মিলছিল না কোথাও, আর আমাদের তো কথাই নেই, আমাদের টাকাই ছিল না। গ্রীষ্মের শেষাশেষি অবশ্য বড় বাড়িগুলোর মধ্যে দু-তিনখানাকে অনেক কষ্টে বাগে এনে এক-রকম দাঁড় করানো গেল, কিন্তু জানলায় শার্সির কাচের অভাবে সেখানেও বাস করা গেল না। আমরা অবশ্য কয়েকটা বাড়ির কিছু ছোট-ছোট বাড়তি অংশের মেরামতি শেষ করতে পেরেছিলুম, কিন্তু সেগুলো ছুতোর, রাজমিস্ত্রি, চুল্লী-বানানোর মিস্ত্রি আর চৌকিদারদের মাথাগোঁজার জন্যে দরকার হচ্ছিল। তাছাড়া ওই ঘরগুলোয় ছেলেদের থাকার ব্যবস্থা করারও কোনো মানে ছিল না, কারণ তখনও পর্যন্ত কারখানা-ঘর আর কাজের সামগ্রী না-থাকায় ছেলেদের করবার মতো কোনো কাজ ছিল না।

আমাদের ছেলেরা অবশ্য প্রতিদিনই নতুন কলোনিতে যেত, কারণ মেরামতি-কাজের একটা বড় অংশ তারাই নিজ হাতে করছিল। গ্রীষ্মের সময় প্রায় জনা দশেক ছেলে মাথাগোঁজার মতো কতগুলো অস্থায়ী আস্তানা বানিয়ে নিয়ে ফলের বাগানগুলোয় কাজ শুরু করল। পুরনো কলোনিতে একদিন তারা কয়েক গাড়ি আপেল আর নাশপাতি পর্যন্ত দিল পাঠিয়ে। তাদের

যত্নের ফলে ত্রেপ্‌কের ফলবাগানগুলো আবার ভদ্রস্থ হয়ে উঠল, তবে তখনও আরও উন্নতির অবকাশ রয়ে গিয়েছিল।

ত্রেপ্‌কের ভগ্নস্তূপে নতুন মালিকদের আবির্ভাবে গন্‌চারোভ্‌কা গাঁয়ের বাসিন্দারা কিন্তু বড়ই বিচলিত হয়ে পড়ল। তার ওপর যখন তারা দেখল যে সেই নতুন মালিকরা ছেঁড়া জামাকাপড়-পরা ও একেবারেই সম্ভ্রান্ত নয় এবং তাদের মধ্যে কর্তৃত্বের ভাবও বড়-একটা দেখা যাচ্ছে না তখন তো তাদের মেজাজ গেল আরও বিগড়ে। আমি তো দেখে মুষড়ে গেলুম যে ষাট দেশিয়াতিনা জমির মালিকানাসূচক যে-হুকুমনামা আমরা পেয়েছিলুম তা নেহাত এক-টুকরো কাগজ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, দেখা গেল, ত্রেপ্‌কে-তালুকের অন্তর্ভুক্ত সবটুকু আবাদী জমি, এমন কি যে-এলাকা আমাদের নামে বিলি করা হয়েছিল তাও, ১৯১৭ সাল থেকেই স্থানীয় কৃষকরা চাষ করে আসছে। আমাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব দেখে শহরের কর্তাব্যক্তিরা শুধু হাসলেন:

'তোমাদের নামে যদি হুকুমনামা থ্যেকে থাকে তার মানে তোমরাই জমির মালিক। এখন মাঠে চল্যে যাও আর জমিতি লাঙ্গল দিতি শুরু কর্যে দ্যাও।'

কিন্তু, দেখা গেল, গ্রাম-সোভিয়েতের চেয়ারম্যান সের্গেই পেত্রোভিচ গ্রেচানি এ-ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন। ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন:

'ব্যাপারডা কি বোঝলেন নি, আইনের নিয়ম কাঁটায়-কাঁটায় মাইন্যা খাইট্যা-খাওয়া চাষী যখন জমিনের দখল পায়, তখন সে চাষ কইরবারে লাগে। আর এই সব হুকুমনামা দলিল-দস্তাবেজ যারা মুসাবিদা করত্যাছে তারা আর কিছুই না শুধু খাটিয়ে-মানুষির পিঠে ছুরি মারত্যাছে। বোঝলেন নি। আমি আপনারে কই কি, এই হুকুমনামা লইয়া আপনে এয়ার মধ্যি মাথা গলাইতে যায়েন না।'

নতুন কলোনিতে যাওয়ার পায়েচলার রাস্তা যেহেতু কলমাক নদীর পার পর্যন্ত গিয়ে আবার ওপার থেকে শুরু হয়েছিল, আমরা তাই খেয়া-পারাপারের একখানা নৌকো বানিয়ে নিয়েছিলুম। আমাদের ছেলেরা পালা করে এই নৌকোয় মাঝির কাজ করত। কিন্তু মালপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে হলে, কিংবা ঘোড়ার পিঠে বা গাড়িতে চেপে যাওয়ার দরকার পড়লে, একটা ঘুরপথ ধরতে হোত, আর পুলে উঠে গন্‌চারোভ্‌কার ভেতর দিয়ে আসতে

হোত। কিন্তু সেখানে বিরোধীর সংখ্যা বড় কম ছিল না। আমাদের হতদরিদ্র সাজসজ্জা ও সরঞ্জাম দেখে গাঁয়ের ছেলেরা টিট্‌কিরি দিত:

'হেই, ও — লোচ্চা ছোঁড়ারা! আমাদের পুলে ছারপোকার বংশ ঝাড়া দিবি নে, খবরদার কিন্তু! ইদিকে পা না-মাড়ালি ভালো করতি — ত্রেপ্‌কেয় তদের থাকা আমরা বার কর্‍্যে দিতেছি, দ্যাখবি অখন।'

গন্‌চারোভ্‌কায় আমরা নিজেদের অধিষ্ঠিত করলুম শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশী হিসেবে নয়, অবাঞ্ছিত বিজেতা হিসেবে। আর ওই অবস্থায়, আমাদের ওই সামরিক পরিস্থিতিতে, যদি শক্তভাবে পা-গেড়ে না-দাঁড়াতে পারতুম, যদি ওই বিরোধে নিজেদের অসম-প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রমাণ করতুম, তাহলে তালুক-মুলুক, জমিজায়গা, সবকিছু ফেলে রেখে পালিয়ে-আসা আমাদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াত। কৃষকরা জানত, বিবাদের সালিশ সরকারি দপ্তরে হবে না, সরাসরি আবাদেই করতে হবে। এর আগের তিন বছর ধরে ত্রেপ্‌কের আবাদ ওরা চাষ করে আসছিল এবং জমিতে একধরনের বে-আইনী দখলী স্বত্ব কায়েম করে ফেলেছিল। ওদের দাবির ভিত্তি ছিল এটাই। এই দখলী স্বত্বের সময়টা যে-কোনো উপায়ে আরও বাড়িয়ে নেয়া ওদের পক্ষে একান্ত দরকার হয়ে পড়েছিল, কারণ এই কৌশলের ওপরই ওদের সমস্ত আশা-ভরসা নির্ভর করছিল।

আর ওই একই রকম, আমাদেরও আশা-ভরসা একমাত্র নির্ভর করছিল জমিতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চাষ-আবাদ শুরু করতে পারার ওপর।

গ্রীষ্মকালে জরিপ-বিভাগের লোকজন আমাদের জমির সীমানা নির্দিষ্ট করে দিতে এল। কিন্তু কৃষকদের ভয়ে জরিপের যন্ত্রপাতি মাঠে নিয়ে যেতে সাহস পেল না ওরা, কেবল একটা ম্যাপের ওপর কোথায়-কোথায় খানা-খন্দ, উঁচু জমি আর ঝোপঝাড়-গাছপালা আছে তা-ই আমাদের চিনিয়ে দিল। বলল, ওই অনুযায়ী আমরা নিজেদের জমি মেপে নিতে পারব। জরিপ-বিভাগের এই নক্‌শাটি পকেটস্থ করে ও বড় ছেলেদের মধ্যে কয়েক জনকে সঙ্গে নিয়ে অতঃপর গন্‌চারোভ্‌কার দিকে পা-বাড়ালুম।

ওই সময়ে গ্রাম-সোভিয়েতের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন আমাদের পুরনো দোস্ত লুকা সেমিওর্নভিচ ভের্‌খোলা। সৌজন্য দেখিয়ে উনি আমাদের অভ্যর্থনা করলেন, ঘরে এসে বসতেও বললেন, কিন্তু জরিপ-বিভাগের নক্‌শাটার দিকে একবারের জন্যেও তাকাতে রাজি হলেন না।

বললেন, 'প্রিয় কমরেড্স, আমি আপনেদের জন্যি কিস্স্যুটি করতি পারি নে। এ-জমি আমাদের গরিব চাষীভাইরা বহুদিন ধরো আবাদ করত্যেছে। ওদিগে আমি চটাত্যে লারব। আমি বলি কী, অন্য কোনো জাগায় জমি খুঁজ্যে নেন-না ক্যানে!'

কৃষকরা যখন আমাদের জমিতে নেমে লাঙল দেয়া শুরু করল, আমি তখন জমির ধারে এই মর্মে একটা নোটিশ লটকে দিলুম যে কলোনির জমিতে লাঙল দেয়ার জন্যে কলোনি থেকে তাদের কিন্তু পয়সা দেয়া হবে না।

এ-ব্যবস্থা নিতে অবশ্য আমার নিজেরই মন চাইছিল না। কারণ আমার বুক বসে যাচ্ছিল এই ভেবে যে কঠোর-পরিশ্রমী যে-কৃষকদের কাছে জমি নিশ্বাস-বায়ুর মতো একান্ত প্রয়োজনীয় সেই কৃষকদের কাছ থেকেই আমাদের জমি কেড়ে নিতে হবে।

আর এরপর, দিন কয়েক বাদে এক সন্ধেবেলা, জাদোরভ একটি অচেনা ছেলেকে এজমালি শোবার ঘরে আমার কাছে নিয়ে এল। গাঁ থেকে এসেছিল ছেলেটি। জাদোরভকে ভীষণ উত্তেজিত ঠেকছিল।

ও বলল, 'শুনুন — ও কী বলছে একবার শুনুন!'

কারবানভের মধ্যেও ওর উত্তেজনা সংক্রামিত হয়ে গিয়েছিল। সে ততক্ষণে গপাক*-নাচের তালে-তালে পা ফেলে সারা এজমালি ঘরখানায় ঘুরে বেড়াতে আর চেঁচাতে লাগল।

'হো-হো! কত-ধানে-কত-চাল ভের্খোলা-বাছাধনরে দেখ্যাব এবার!'

ছেলেরা সবাই আমাদের ঘিরে ধরল।

দেখা গেল, আগন্তুক ছেলেটি গন্চারোভ্কার কম্সমোলের সদস্য।

'গন্চারোভ্কায় কম্সমোল-সদস্য অনেক আছে নাকি?' আমি প্রশ্ন করলুম।

'আমরা মাত্তর তিনজনা আছি।'

'মাত্র তিনজন?'

'বলতি পারি, আমাদের খুব ঝামেলার মধ্যি কাটাতি হচ্ছে,' ছেলেটি বলতে শুরু করল। 'গাঁ-টা পুরা কুলাকদের হাতের মুঠায় — ওই-যে খামারখোলাগুলান, বোঝলেন, ওইগুলাই সব ব্যাপারে কত্তামি করে। বন্ধুরা

* গপাক — ইউক্রেনীয় লোকনৃত্য। — অনুঃ

আমারে আপনেদের কাছে বলতি পাঠাল্য যে যত তাড়াতাড়ি পারেন আপনেরা চল্যে আইসেন — তাইলে অদের মজাখান টের পাওয়াবনে! আপনের ছেল্যারা সব ভারি জবরদস্ত। ইস, আমাদেরও যদি এমনধারা কয়েকজনা থাকত!'

'কিন্তু এই জমি-দখলের ব্যাপারটা নিয়ে কী-যে করা যায়, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

'ওই জন্যিই তো আমার আসা। জোর কর্যে জমি দখল করেন। ওই লালচুলো লুকা শয়তানডার কথায় একবারে কান দিবেন না। আপনে কি খবর রাখেন যে-জমি আপনেদের নামে বিলি-বন্দোবস্ত হয়্যেছে সে-জমি কারা চাষ করত্যেছে?'

'কারা?'

'কও, স্পিরিদোন, আমাদেরে কও!'

আঙুলের কর গুনে-গুনে স্পিরিদোন একে-একে নামগুলো বলতে শুরু করল:

'গ্রেচানি আন্দ্রেই কার্‌পভিচ...'

'গাঁও-বুড়া আন্দ্রেই! কিন্তু তার তো এই অঞ্চলে জমি আছে।'

'তা তো আছেই। আচ্ছা, তারপর... পেত্রো গ্রেচানি, অনোপ্রি গ্রেচানি, স্তমুখা — ওই-যে, যে-লোকডা গির্জার ঠিক পাশডাতিই থাকে... ও, হ্যাঁ, সেরিওগা... স্তমুখা ইয়াভ্‌তুখ, আর লুকা সেমিওনভিচ নিজিই। মোটমাট এই ছয়জনা।'

'বল কী? কিন্তু কী করে এটা সম্ভব হল? তোমাদের গরিব চাষীর সংগঠন কম্‌বেতেই বা কী বলে?'

'আমাদের কম্‌বেত তো এতটুকুন এট্টা সংগঠন। কী কর্যে ব্যাপারটা ঘটল তবে বলি শোনেন: জমিডা তালুকের সাথেই থাকার কথা, কী এট্টা যেন দরকারে ওডারে কাজে লাগানোর কথা হয়্যেছিল। এদিকে গ্রাম-সোভিয়েত ছিল অদের কব্জায়। তা, সব জমি ভাগ-বাঁটোয়ারা কর্যে অরা নিজিরাই মার্যে দিল — এই আর-কি!'

'এখন সবকিছু লাড়াচাড়া শুরু হবে!' কারাবানভ চেঁচিয়ে বলল। 'লুকা, এবার হুঁশিয়ার!'

সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে একদিন আমি শহর থেকে ফিরছি।

তখন দুপুর প্রায় দুটো। আমাদের ঢ্যাঙা এক্কাগাড়িখানা হেঁচড়ে-হেঁচড়ে আস্তে-আস্তে এগোচ্ছিল; 'লালু'-র খামখেয়ালিপনা সম্পর্কে আন্তনের সারগর্ভ আলোচনা আমার কানের পাশ দিয়ে অস্ফুট স্বপ্নের মতো গুনগুনিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। আলোচনা শুনতে-শুনতে একই সঙ্গে কলোনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হরেক সমস্যা নিয়েও মনে-মনে তোলাপাড়া করে যাচ্ছিলুম।

আচমকা ব্রাত্‌চেঙ্কো চুপ করে গেল। রাস্তার সামনের দিকে কিছু দূরের কোনো একটা-কিছুর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ও আসন ছেড়ে উঁচু হয়ে উঠল তারপর ঘোড়ার পিঠে সজোরে চাবুক হাঁকড়াল। পাথুরে খোয়ার ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝর্‌ঝর আওয়াজ তুলে ছুটল আমাদের গাড়ি। 'লালু'-র পিঠে অনবরত চাবুক হাঁকড়ে চলল আন্তন (এমন কাজ এর আগে সে আর কখনও করে নি) আর সেই অবস্থায় চিৎকার করে আমাকে কী যেন বলল। অনেক কষ্টে অবশেষে আমি ওর কথা ধরতে পারলুম। শুনলুম ও বলছে:

'আমাদের ছেল্যারা... একখান বীজবোনার কল নিয়ে আসত্যেছে!'

কলোনির দিকে মোড় নেয়ার মুখে পুরো দমে ছুটে-আসা বীজবোনার একখানা যন্ত্রের সঙ্গে আমাদের গাড়ির ধাক্কা লাগার উপক্রম হল। বেগে ছুটে আসার সময় যন্ত্রটা থেকে অদ্ভুত একটা ধাতব আওয়াজ বের হচ্ছিল। তামাটে-রঙের একজোড়া ঘোড়া আগে-আগে ছুটে আসছিল পাগলের মতো, ওদের পেছনকার অপরিচিত রথখানার প্রচণ্ড সোরগোলে ভয় পেয়েই সম্ভবত। বীজবোনার যন্ত্র-গাড়িখানা ভারিক্কি চালে বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে এসে বালুজমির ওপর দিয়ে গুমগুম-শব্দে গড়িয়ে গেল, তারপর কলোনিমুখো রাস্তায় পড়ে ফের বজ্রগর্জনে যাত্রা শুরু করল। এদিকে এক্কা থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল আন্তন, আর লাগামজোড়া আমার হাতে গুঁজে দিয়েই দৌড় লাগাল বীজবোনা-কলের পিছু-পিছু। কলের গাড়ির ওপর কারাবানভ আর প্রিখোদ্‌কো তখন টানটান লাগামজোড়া জাপটে ঝুলে আছে কোনোরকমে, আর যেন কোন্‌ এক অলৌকিক কৌশলে নিজেদের স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা করে চলেছে। প্রাণপণ চেষ্টায় আন্তন অবশেষে ওই কিম্ভূত গাড়িখানাকে দাঁড় করাতে সক্ষম হল। উত্তেজনা আর অবসাদে কারাবানভের তখন দম ফুরিয়ে এসেছে। ব্যাপারটা কী ঘটেছিল ওই অবস্থায় তার বর্ণনা দিল:

'আমরা তখন উঠানে, ইটের গাদা সাজাতি লেগ্যেছি। হঠাৎ দেখি কী, একখান বীজবোনার যন্তর আর তার পিছু-পিছু জনা পাঁচেক লোক খেতের দিকি ধেয়্যে চলতিছে। সে একখান দ্যাখবার মতন জিনিস হইছিল! ছুট্যে কাছে গ্যালাম। বললাম, 'তমরা এবার কেট্যে পড় দেখি!' দলে ছিলাম আমরা চারজনা — আমরা এই দু-জনা, চোবত্ আর... আর কে যেন?'

'সরোকা,' প্রিখোদ্‌কো মনে করিয়ে দিল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক — সরোকা! তা, আমি বললাম, 'কেট্যে পড়! যাই কর-না বাপু, এখানে তোমাদের বীজ বোনতে হচ্ছে না! শুন্যে অদের ভিত্‌রি একজনা — ওই-যে কালোপানা, বেদের মতন দ্যাখতে লোকডা, বোঝতে পারতেছেন তো কার কথা কচ্ছি — সে চোবত্‌রে লক্ষ্য কর্যে চাবুক হাঁকড়াল। তা, চোবত্‌ও ঝাড়্যে দিল লোকডার থুতনিতে এক ঘুসো। হঠাৎ দেখি কী, বুরুন একগাছ ঠ্যাঙ্গা নিয়ি ছুট্যে আসতেছে। আমি তো গিয়ে চাপ্যে ধরলাম এট্টা ঘোড়ার লাগামগাছখান। তা দেখ্যে চেয়ারম্যান-সায়েব ছুট্যে এসি আমার কামিজের সামনে-দিকডা মুঠা কর্যে পাকড়ে ধরল...'

'কোন্ চেয়ারম্যান?'

''কোন্' আবার? আমাদের ওই লালচুলো লোকডা, লুকা সেমিওনভিচ। তা, প্রিখোদ্‌কো পিছু থ্যেকে এসি এমন একখান লাথ ঝাড়লে অরে যে মাটিতি নাকমুখ গুঁজড়্যে উলট্যে পড়ল লোকডা। আমি চেঁচায়ে প্রিখোদ্‌কোরে বললাম, 'বীজ-কলে উঠ্যে পড়্!' তারপর আর কী, ছুট দেলাম যন্তরডারে নিয়ি! গন্‌চারোভ্‌কা গাঁয়ের মধ্যি দিয়ি আসতেছি যখন, দেখি গাঁয়ের ছেল্যারা রাস্তায় ঘুরতিছে — একবার ভাবলাম, কী করা?.. তা, আচ্ছাসে চাবুক হাঁকড়ায়ে ঘোড়া দুইডারে পুলের উপর দিয়ি দৌড় করায়ে দিলাম। তারপর এসি ওঠলাম এক্কেবারে বড় রাস্তায়... আমাদের তিন সাঙাত এখনও ওখানে রয়্যে গেছে। মনে লিচ্ছে কী, মুজিকরা অদের এতক্ষণে আড়ং-ধোলাই দেছে।'

যুদ্ধজয়ের উত্তেজনায় আপাদমস্তক রিরি করে কাঁপছিল কারাবানভ। আর ধীরেসুস্থে সিগারেট পাকাতে-পাকাতে আপমনে মৃদু-মৃদু হাসছিল প্রিখোদ্‌কো। এদিকে আমি এই মজাদার ইতিবৃত্তের পরের অধ্যায়গুলো মনে-মনে জল্পনা করে চলেছি: কমিশনের পর কমিশনের অধিবেশন, জেরার পর জেরা, তদন্ত, আরও কত-কী...

'গোল্লায় যাও তোমরা! আবার আমাদের একটা ঝামেলায় ফেললে দেখছি!'

আমার এবংবিধ প্রতিক্রিয়ায় কারাবানভ একেবারে চুপসে গেল: 'কী করব, অরাই আগ বাড়ায়ে শুরু করল তো...'

'ঠিক আছে, এখন কলোনিতে ফিরে চল। ওখানেই আমরা এ-নিয়ে আলোচনা করব'খন।'

কলোনিতে ঢুকতেই বুরুনের সঙ্গে দেখা। দেখলুম, ওর কপালে প্রকাণ্ড একটা কালশিরার তিলক, একদল ছেলে হাসিমুখে ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। চোবত্ আর সরোকা জলের পিপের ধারে হাত ধুচ্ছে।

বুরুনের দুই কাঁধ চেপে ধরল কারাবানভ।

'আচ্ছা! তাইলে তুই অদের খপ্পর থ্যেকে পলায়ে আসতি পের‍্যেছিস! সাবাস ব্যাটা!'

'পেরথম অরা বীজবোনার যন্তরডার পিছু-পিছু ছুট লাগায়ে ছিল,' বুরুন বলল, 'তারপর ওয়াতে ফায়দা নাই দেখ্যে আমাদের উপর ঝাঁপায়ে পড়ল। ওহ্, যা একখান দৌড় দিছি-না!'

'তা অরা এখন আছে কোন্ চুলায়?'

'আমরা খেয়া-নৌকায় পার হয়্যে আলাম, আর অরা ওপারে দাঁড়ায়্যে-দাঁড়ায়্যে গাল পাড়তি লাগল। অদের ওইখানেই ছাড়্যে চলি আলাম।'

'আমাদের কোনো ছেলে ওখানে রয়ে গেল নাকি?' আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

'বাচ্চারা কয়জনা রয়্যে গেছে -- তোস্কা আর আরও জনা দুই। তবে অদের গায়ে কেউ হাত দিবে না।'

এর ঘণ্টাখানেক পরে দু-জন গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে লুকা সেমিওনভিচ কলোনিতে এসে উদয় হলেন। আমাদের ছেলেরা বিনয়ের অবতার হয়ে ওঁদের অভ্যর্থনা জানাল:

'আপনেদের বীজবোনার যন্তরের জন্যি আলেন বুঝি?'

কৌতূহলী দর্শকের ভিড়ে আমার ঘরে হাঁটাচলা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। পরিস্থিতি বেশ অস্বস্তিকর ঠেকছিল।

চেয়ার টেনে নিয়ে নিজেই টেবিলের ধারে বসে পড়ে লুকা সেমিওনভিচ প্রথম কথা শুরু করলেন।

ওঁর দাবি হল:

'যে-ছোকরারা আমারে আর আমার সঙ্গী-দুইজনারে মেরোছে তাদের ডাক্যে পাঠান!'

আমি বললুম, 'দেখুন, লুকা সেমিওনভিচ! যদি আপনি মার খেয়ে থাকেন তাহলে আপনার যেখানে খুশি চলে যান, গিয়ে নালিশ করুন। আমি এখুনি কাউকে ডাকতে রাজি নই। এখন বলুন, আপনি কী চান, আর কলোনিতেই-বা এসেছেন কেন।'

'তাইলে, আপনে অদের ডাক্যে পাঠাতি রাজি না?'

'না, রাজি নই!'

'ও! আপনে রাজি না, তাই না? তাইলে, ব্যাপারডা নিয়ি অন্যত্তর আমাদের আলোচনা করতি হবে।'

'ঠিক আছে।'

'বীজবোনার যন্তরডা ফিরত দিবে কে?'

'কিন্তু কাকে ফেরত দিতে হবে?'

'অরে। ও-ই হল্য গে অর মালিক।'

বলে উনি কালোমতো, কোঁকড়াচুলো, গম্ভীর-মুখ একজনকে দেখিয়ে দিলেন।

'ওটা কি তোমারই বীজবোনার যন্ত্র?'

'হ্যাঁ, আমার।'

'ঠিক আছে, আমি তাহলে যন্ত্রটা জেলা মিলিত্‌শিয়া-দপ্তরে পাঠিয়ে দেব। বলব, অন্যের ভূসম্পত্তিতে বে-আইনীভাবে বীজবোনার সময় ওটাকে আটক করা হয়েছে। আর তুমি, আমাকে তোমার নামটা দাও দেখি।'

'আমার নাম? গ্রেচানি অনোপ্রি! কিন্তু 'অন্যির ভূসম্পত্তি' কইলেন ক্যানে? ওয়া তো আমার জমিন। চেরকাল ওয়া আমারই ছেল...'

'আচ্ছা, আচ্ছা, জমি কার তা নিয়ে এখুনি মাথা ঘামানোর দরকার নেই। এখন বে-আইনীভাবে প্রবেশ আর মাঠে কর্মরত অবস্থায় কলোনির সদস্যদের মারধর করার ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের একটা এজাহার লিখে ফেলতে হবে।'

এমন সময়ে বুরুন এগিয়ে এল।

বলল, 'ওই-যে, ওই লোকডা, ও আমারে পেরায় মার্যে ফেলাচ্ছিল।'

'তুই তার যুগ্যি হলি তবে তো!.. হুঃ, মারো ফেলাচ্ছিল! সত্যি?.. তর মুখি পোকা পড়ুক!'

এই ধারায় কথাবার্তা চলল অনেকক্ষণ ধরে। দুপুর আর রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার কথা আমি বেমালুম ভুলে গেলুম। রাত্রে শুতে যাবার ঘণ্টাও পড়ে গেল। তখনও আমরা একই ভাবে বসে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত — কখনও আপসের মনোভাব নিয়ে, কখনও উত্তেজনায় কাঁটা হয়ে আর ভয় দেখাতে-দেখাতে, আবার কখনও শ্লেষ আর ব্যাজস্তুতির সূক্ষ্ম-জটিল জাল বিস্তার করে।

আগাগোড়া আমি আমার মত আঁকড়ে রইলুম — বীজবোনার যন্ত্র আমি কিছুতেই ফেরত দেব না, আর এজাহার একটা তৈরি করবই করব। ভাগ্যক্রমে গ্রামবাসীদের দেহে সেদিনকার লড়াইয়ের কোনো ক্ষত-চিহ্ন ছিল না, কিন্তু আমাদের ছেলেরা বেশ কিছু কাটাছেঁড়া আর কালশিরার দাগ দেখিয়ে দিল। শেষপর্যন্ত জাদোরভই সব যুক্তিতর্কের অবসান ঘটাল। টেবিলের ওপর হাত দিয়ে সজোরে এক চাপড় মেরে ও একটা ছোটখাট বক্তৃতাই দিয়ে ফেলল:

'ভাইসব, যথেষ্ট হয়েছে, আর-না! ও-জমি আমাদের, আপনারা আমাদের ব্যাপারে মাথা না-গলালেই ভালো করবেন। আমাদের জমিতে আমরা আর আপনাদের ঢুকতে দিচ্ছি নে। জানেন তো, আমরা এখানে পঞ্চাশটি ছেলে আছি — আর আমাদের কিন্তু যে-কথা-সেই-কাজ।'

কথাটা নিয়ে লুকা সেমিওর্নভিচ অনেকক্ষণ ভাবলেন। অবশেষে দাড়িতে কয়েকবার হাত বুলিয়ে ও মুখে ঘোঁত্‌ঘোঁত আওয়াজ করে বললেন:

'ঠিক আছে... মরুক গে যাক! কিন্তু আপনে অন্তত লাঙ্গল দেয়ার খরচাটা দিবেন তো!'

'না,' আমি নিরুত্তাপ গলায় বললুম। 'লাঙল না-দিতে আমি আপনাদের আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিলুম।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

'ঠিক আছে, তাইলে যন্তরডা আমাদের ফিরত দ্যান ক্যানে।'

'দেব, আপনারা যদি জরিপ-বিভাগের নক্‌শাটায় সই করে দেন।'

'ঠিক আছে... নক্‌শাখান দ্যান তাইলে।'

শেষপর্যন্ত, ওই হেমন্তে নতুন কলোনির জমিতে আমরা বাজরা বুনে

ছাড়লুম। নিজেরাই ছিলুম আমরা নিজেদের কৃষি-বিশারদ। চাষবাসের ব্যাপারটা কালিনা ইভানভিচ খুব সামান্যই বুঝত, আমরা বাকিরা বুঝতুম আরও কম। কিন্তু লাঙল আর বীজবোনার যন্ত্র নিয়ে কাজ করায় সকলেই হয়ে উঠেছিলুম অসম্ভব উৎসাহী। তার মানে, একমাত্র ব্রাত্‌চেঙ্কোকে বাদ দিয়ে সকলেই। ওর প্রাণের প্রিয় ঘোড়াগুলোর জন্যে ব্রাত্‌চেঙ্কো কেবল থেকে-থেকে অসম্ভব উৎকণ্ঠা বোধ করত, আর জমি, বাজরা-ফসল আর আমাদের উৎসাহকে অভিশাপ দিতে থাকত।

মাঝে-মাঝে ও অনুযোগ করে বলত, 'শুধু গমের দানা ওদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, ওদের বাজরাও দেয়া দরকার!'

অক্টোবর মাসের মধ্যে আট দেশিয়াতিনা জমি তর্‌তাজা চারাগাছে ঝলমলে সবুজ হয়ে উঠল। রবারের নাল-লাগানো লাঠিগাছটা উঁচিয়ে কালিনা ইভানভিচ বেশ গর্বের সঙ্গে পূর্বদিকের অনির্দেশ্য একটা জায়গা দেখিয়ে বলতে লাগল:

'ওইখানে আমাগো মসুরি বোনা উচিত। আহ্‌, মসুরির ডাইল যা জিনিস-না!'

বসন্তের রবিশস্য বোনার জন্যে নির্দিষ্ট জমিটা চষতে লাগল 'লালু' আর 'ডাকাতনী'। আর, ক্লান্ত হয়ে, ধুলো মেখে সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে জাদোরভ প্রায়ই বলতে লাগল:

'চুলোয় যাক চাষবাস — এই মুজিকের কাজ বড় কঠিন। আমি বাবা আমার কামারশালেই ফিরে যাব।'

আমাদের চাষের কাজ মাত্র অর্ধেক এগিয়েছে এমন সময় তুষারপাত শুরু হয়ে গেল। মনে হল, শিক্ষানবিশদের পক্ষে কাজটা নেহাত মন্দ করি নি আমরা।

## ১২

## ব্রাত্‌চেঙ্কো বনাম জেলা সরবরাহ-দপ্তরের অধ্যক্ষ

আমাদের চাষবাসের ব্যাপারটা অলৌকিক নানা ঘটনা আর দুঃখযন্ত্রণার জটিল পথ ধরে এগিয়ে চলল। কোনো একটা সরকারি দপ্তর থেকে হেফাজতের সম্পত্তি বিলি-বন্দোবস্ত করার সময় কালিনা ইভানভিচ কী কৌশলে যেন

তা থেকে একটা বুড়ো গোরু যোগাড় করে ফেলল। যদিও গোরুটা কালিনা ইভানভিচের নিজের ভাষায়ই ছিল 'জন্মশুক্‌না', তবু ব্যাপারটাকে অলৌকিক কাণ্ডই বলতে হবে। আরও একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটল যখন আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন কোনো একটা বিশুদ্ধ কৃষি-দপ্তর থেকে আমরা একই রকম প্রাচীন একটা কালোরঙের মাদী ঘোড়া পেয়ে গেলুম। অবশ্য মাদীটা ছিল পেটমোটা, কুঁড়ে, আর ফিটের ব্যামোয়-ধরা। এরপর তৃতীয় অলৌকিক ব্যাপার হল, আমাদের আস্তাবলে একে-একে কয়েকখানা ফসল-বওয়া খামারের গাড়ি, একখানা আর্‌বা,* এমন কি একখানা ফিটনগাড়ি পর্যন্ত এসে জুটে গেল। দু-ঘোড়ায় টানার উপযোগী ফিটনগাড়িখানা সেসময়ে আমাদের চোখে ভারি সুন্দর ঠেকেছিল, তাছাড়া গাড়িখানা ছিল খুবই আরামদায়ক। কিন্তু ওই গাড়ির সঙ্গে মানানসই একজোড়া ঘোড়া পেতে হলে আরও একটা যে-অলৌকিক ব্যাপার ঘটা দরকার ছিল তা আর ঘটল না।

আস্তাবলের কাজ ছেড়ে গুত্‌ জুতো-তৈরির কারখানা-ঘরে কাজ করতে যাওয়ায় আন্তন ব্রাত্‌চেঙ্কো হেড-সহিসের পদে বহাল হয়েছিল। ব্রাত্‌চেঙ্কো ছিল ভারি কর্মঠ ছেলে। সম্মানবোধ ওর এত সূক্ষ্ম ছিল যে ওই বাহারে গাড়িখানার কোচবাক্সে রোগা-পটকা, লম্বা-ঠ্যাঙ্‌ওয়ালা 'লালু' আর ভুঁড়োপেটা, বাঁকা-ঠেঙো 'ডাকাতনী'-র পেছনদিকে বসে ও যেন মরমে মরে থাকত। আন্তন ওই কালো মাদী ঘোড়াটার (সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবেই!) নামকরণ করেছিল 'ডাকাতনী'। চলতে গিয়ে প্রতি পদে হোঁচট খেত 'ডাকাতনী', কখনও-কখনও একদম চিৎপাত হয়ে পড়েও যেত, আর তখন শহরের মাঝমধ্যিখানে আমাদের নিদারুণ জুড়িগাড়িখানাকে চাকার ওপর খাড়া করে দাঁড় করাতে দেখে অন্য সব কোচোয়ান আর রাস্তার ছোকরারা টিট্‌কিরি দিতে থাকত। এই টিট্‌কিরি শুনে আন্তন প্রায়ই খেপে উঠত, আর তারপর ওর অপছন্দ দর্শকদের সঙ্গে বেধে যেত প্রচণ্ড বচসা। ফলে গোর্কি কলোনির আস্তাবলের বদনাম তাতে বাড়ত বৈ কমত না।

লড়াই পেলে আন্তন ব্রাত্‌চেঙ্কো আর কিছু চাইত না, যে-কোনো ঝগড়ায় প্রতিপক্ষকে হারিয়ে তবে ছাড়ত, আর শাপশাপান্ত করতে

* আর্‌বা — মহিষে-টানা একধরনের গাড়ি। — অনুঃ

আর কটাক্ষ করে ইঙ্গিতে কথা বলতে ছিল ভারি দড়। সেই সঙ্গে অন্যের হুবহু নকল করে তাকে ভেঙচি কাটারও রীতিমতো ক্ষমতা রাখত ও।

আন্তন রাস্তার বেওয়ারিস ছেলে ছিল না। শহরের এক রুটির কারখানায় কাজ করতেন ওর বাবা। মাও বেঁচে ছিলেন ছেলেটার। ও ছিল সৎ গৃহী বাপমায়ের একমাত্র সন্তান। কিন্তু একেবারে ছেলেবেলা থেকে গৃহপালিত জীবনের প্রতি আন্তনের কেমন যেন বিতৃষ্ণা জন্মেছিল; রাত্রে শুধু ও শুতে আসত ঘরে, আর বাকি সময়টা ব্যস্ত থাকত রাস্তার ছেলেপিলে আর শহরের চোরেদের মধ্যে ব্যাপক আলাপীর সংখ্যা গড়ে তুলতে। বেশ কয়েকটা দুঃসাহসিক ও মজাদার রোমাঞ্চকর অভিযানে নাম কিনে এবং অল্পদিনের জন্যে বারকয়েক জেল খেটে অবশেষে ও এসে জুটে গিয়েছিল আমাদের কলোনিতে। মাত্র পনেরো বছর বয়স ছিল ছেলেটার। দেখতেও ছিল সুন্দর; কোঁকড়া চুল, নীল চোখ, পাতলা একহারা চেহারা। অসম্ভব-রকমের সঙ্গলিপ্সু ছেলে ছিল ও, একটা মুহূর্তও নিজের মনে একা কাটাতে পারত না। যে-কোনো ভাবেই হোক ছেলেটা লিখতে-পড়তে শিখেছিল, দুঃসাহসিক অভিযানের অনেক গল্পের বই ছিল একেবারে কণ্ঠস্থ; কিন্তু কিছুতেই ক্লাসের পড়াশুনো করতে চাইত না, প্রাণপণ শক্তিতে ক্লাস-রুমে ধরে রাখতে হোত ওকে। প্রথম-প্রথম প্রায়ই ও কলোনি ছেড়ে পালিয়ে যেত, তবে সব সময়েই অবশ্য ফিরে আসত দু-এক দিনের মধ্যে, আর তখন ওর মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র অন্যায়বোধ লক্ষ্য করা যেত না। টো-টো করে ঘুরে বেড়ানোর এই প্রবণতাটা কাটিয়ে উঠতে ও নিজেই অবশ্য চেষ্টা করত। বলত:

'আমার সাথে যতটা পারেন কড়া ব্যবহার করবেন কিন্তু, আন্তন সেমিওনভিচ, নইলে আমি নিঘ্‌ঘাত ভবঘুরে হয়ে বেরিয়ে যাব।'

কলোনিতে থাকতে ব্রাত্‌চেঙ্কো কোনোদিন কিছু চুরি করে নি, যা সত্য তার সপক্ষে দাঁড়াতেই বরং ভালোবাসত। কিন্তু শৃঙ্খলার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও একেবারেই বুঝতে পারত না, কেবল একটা বিশেষ মুহূর্তে সংঘটিত ঘটনাবলীর কার্যকারণ থেকে উদ্ভূত নীতির সঙ্গে ও যতখানি একমত হতে পারত ততখানি পরিমাণে শৃঙ্খলা মেনে নিতে রাজি হোত মাত্র। কলোনির নিয়মকানুন মেনে চলার ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা ও মানত না, আর

এই না-মানাটা গোপনও করত না কখনও। এটা ঠিক যে আমাকে ও কিছুটা ভয়ই করে চলত, কিন্তু আমার ধমকধামক কখনও শেষপর্যন্ত শুনত না, মাঝপথে আমাকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই আবেগময় ভাষায় বক্তৃতা শুরু করত। আর সে-বক্তৃতায় বারবার ওর অসংখ্য শত্রুদের নানা ধরনের অপরাধে একই ভাবে দোষী সাব্যস্ত করত — যেমন, অমুক আপনাকে তোষামোদ করে বশ করার চেষ্টা করছে, তমুক অন্যের নামে মিথ্যে বদনাম রটাচ্ছে, কিংবা তৃতীয় কেউ কাজের তদারকিতে গোলমাল করছে, ইত্যাদি। তারপর অনুপস্থিত সেই সব শত্রুর উদ্দেশ্যে চাবুক নাচাতে-নাচাতে চটেমটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেত, যাবার সময় সজোরে ভেজিয়ে দিয়ে যেত দরজাটা। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে আন্তন অসহ্যরকম রূঢ় ব্যবহার করত, কিন্তু সেই রূঢ়তার মধ্যেও এমন একধরনের আকর্ষণ থাকত যে আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাতে দোষ নিতেন না। ওর আচরণে কখনও ধৃষ্টতা, বা এমন কি প্রতিকূল ভাবটুকুও ফুটত না, কারণ তখন সবচেয়ে প্রধান হয়ে উঠত একটা সাবেগ মানবিক সুর। তাছাড়া নিজ ব্যক্তিস্বার্থের ব্যাপার নিয়েও কখনও ও বিবাদ করত না।

কলোনিতে আন্তনের আচরণ নির্ধারিত হোত ঘোড়া আর আস্তাবলের কাজ সম্পর্কে ওর তীব্র অনুরাগ থেকে। ওর এই অনুরাগের উৎসসন্ধান বড় সহজ ছিল না। কলোনির গড়পড়তা সাধারণ বাসিন্দা থেকে ও ছিল অনেক বেশি বুদ্ধিমান। কথা বলত শুদ্ধ শহুরে রুশভাষায়, তবে মাঝে-মাঝে লোকদেখানোভাবে কথার মধ্যে ইউক্রেনীয় কথ্যবুলি মিশিয়ে দিত মাত্র। নিজেকে ও পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করত, পড়াশুনো করত বিস্তর, আর বইয়ের ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসত। তা সত্ত্বেও কিন্তু প্রায় সারাটা সময় আস্তাবলে কাটাতে ওর বাধা হোত না। সেখানে সারাক্ষণই হয় ঘোড়ার লাদ সাফ করত, নয় ঘোড়াগুলোকে বারে-বারে সাজ পরাত আর খুলত, নয়তো লাগামে আর ঘোড়ার পেছনদিকে বাঁধবার চামড়ার বাঁধুনিতে পালিশ লাগাত, কিংবা হয়তো-বা চাবুকে চামড়ার ফিতের বিনুনি বাঁধত। আবহাওয়া যেমনই হোক-না-কেন শহরে কিংবা নতুন কলোনিতে গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে ওর ক্লান্তি ছিল না কোনোদিন, যদিও সর্বদাই ওকে আধপেটা খেয়ে থাকতে হোত, তবু। ওর অর্ধাহারে থাকার কারণ, দুপুর কিংবা রাতে খাবার সময়ে দেরি করে ফেলা ছিল ওর রেওয়াজ। আর তখন

যদি কেউ মনে করে ওর বরাদ্দ খাবারটা আলাদা করে তুলে রেখে না-দিত তো খাবারের কথা নিজে থেকে ও কখনও উল্লেখ পর্যন্ত করত না।

আস্তাবলের পরিচারক হিসেবে ওর নানা কাজের একটা বড় অঙ্গ ছিল কালিনা ইভানভিচ, কামারশালের কর্মীরা, ভাঁড়ারঘরের তত্ত্বাবধায়করা, এবং সবচেয়ে বেশি করে যে-কেউ ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে বাইরে যেতে চাইত তার সঙ্গে তুচ্ছ কারণে অনবরত খিটিমিটি-বাধানো। ঘোড়াগুলোর প্রতি কবে কী নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে সেই অভিযোগের ফিরিস্তি সাতকাহন করে শুনিয়ে, 'লালু' আর 'ডাকাতনী' কবে ঘাড়ে থ্যাঁত্‌লানো-ঘা নিয়ে বাইরে থেকে ফিরেছিল সেই সব দিনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে এবং আরও বেশি করে ঘোড়াদের দানা সরবরাহ ও খুরের নতুন নাল বানিয়ে দেয়ার দাবি জানিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ঝগড়াঝাঁটি করার পর তবেই আন্তন গাড়িতে ঘোড়া জুতে অন্যদের নিয়ে কোথাও যাবার নির্দেশ পালন করত। কখনও-কখনও এমনও হোত যে কলোনি থেকে গাড়ি নিয়ে অন্য কোথাও যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ত এই সহজ কারণে যে সে-সব সময়ে কি আন্তন, কি ঘোড়াগুলো কারও পাত্তা পাওয়া যেত না, এবং তারা-যে কোথায় গেছে তার বিন্দুমাত্র হদিশও মিলত না। তারপর কলোনির অর্ধেক বাসিন্দা মিলে বহু পরিশ্রম করে এদিক-ওদিক তল্লাসি চালানোর পর হয়তো ত্রেপ্‌কের জমিতে কিংবা কাছের কোনো মাঠে ওদের সন্ধান মিলত।

ঘোড়াগুলোর প্রতি আন্তন যেমন আসক্ত ছিল তেমনই ওর প্রতি আসক্ত দুটি বা তিনটি ছেলে সব সময়ে ওকে ঘিরে থাকত। ওই ছেলেদের দিয়ে নিয়মশৃঙ্খলা মানিয়ে তাদের ভালোই বশে রাখত ব্রাত্‌চেঙ্কো। ছেলেরা আস্তাবল পরিষ্কার রাখত নিখুঁতভাবে পরিপাটি করে — মেঝে ধুয়ে-মুছে রাখত, ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জাম যেখানে যেমনটি রাখা দরকার তেমনই গুছিয়ে রাখত, গাড়িগুলো রাখত লম্বা লাইন-বন্দী অবস্থায়। তাছাড়া প্রতিটি ঘোড়ার মাথার ওপর একটা করে মরা ম্যাগ্‌পাই পাখি রাখত ঝুলিয়ে আর ঘোড়াগুলোর কেশরে বিনুনি বেঁধে লেজগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ে তাদের দেখাশোনাও করত যত্ন নিয়ে।

জুন মাসে একদিন সন্ধে উত্‌রে যাওয়ার পর একটু বেশি রাত্রে এজমালি ঘরটা থেকে কটি ছেলে দৌড়তে-দৌড়তে এসে আমাকে খবর দিলে:

'কোজিরের বড্ড অসুখ — ও একবারে মর্যো যাতিছে...'

' 'মরে যাচ্ছে', বল কী?'

'হ্যাঁ, মর্যো যাতিছে: অর গা তেত্যো আগুন হয়্যো গেছে, ও নিশ্বেস নিতি পারত্যেছে না।'

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নাও ওদের কথা সমর্থন করলেন। বললেন, কোজির মারাত্মক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছে, এখনি ডাক্তার ডাকা দরকার। আন্তনকে ডেকে পাঠালুম। ও এল বটে, তবে বোঝা গেল, আমি যা-ই নির্দেশ দিই না-কেন তাতে আপত্তি করবে বলে আগে থেকেই যেন বদ্ধপরিকর হয়ে এসেছে।

'আন্তন, এখুনি গাড়িতে ঘোড়া জোত! এই মুহূর্তে তোমাকে একবার শহরে যেতে হবে...'

কিন্তু, দেখা গেল, আন্তন আমাকে আর কিছু বলতে দিতেই রাজি নয়:

'আমি এখন কোথাও যাব না, আপনারেও ঘোড়া নিতে দেব না!.. আজ সারাটা দিন কাজ করে-করে ওদের পা-গুলার আর কিছু বাকি নেই — একবারের জন্যিও শরীর জুড়নোর সুযোগ পায় নি বেচারারা... না, ওদের আমি চালাতে পারব না!'

'বুঝছ না, ডাক্তার ডাকতে হবে-যে?'

'কার-না-কার অসুখ করেছে তাতে আমার তো ভারি বয়েই গেল! 'লালু'-রও তো অসুখ, কই তার জন্যি তো কেউ ডাক্তার ডাকছে না।'

বলতে গেলে আমার মেজাজ খারাপই হয়ে গেল:

'এই মুহূর্তে আস্তাবলের দায়িত্ব অপ্রিশ্‌কোর হাতে ছেড়ে দাও তুমি! তোমার সঙ্গে চলা অসম্ভব!..'

'নিক-না ভার, আমার কী এস্যে-যায় তাতে! দেখব, দেখব, অপ্রিশ্‌কো কেমন আস্তাবল চালায়। লোকে যা বলে আপনে তাই বিশ্বাস করেন দেখতে পাই — হুঃ, 'অমুকের অসুখ, অমুক মারা যাচ্ছে', যত্তো সব, কই ঘোড়াগুলার জন্যি তো কারো এতটুকু দরদ দেখি না — মরুক সব, মরুক... ঠিক আছে কিন্তু, আমি কিছুতেই আপনারে ঘোড়া নিতে দেব না।'

'তুমি শুনেছ আমি কী বললুম? তুমি আর হেড-সহিস নও, এখুনি আস্তাবলের ভার অপ্রিশ্‌কোর হাতে তুলে দাও!'

'ঠিক আছে — তাই দেব... নিক-না, যে-চায় ভার নিক-না। আমার কী। আমি আর কলোনিতে থাকব না।'

'তোমার যা-খুশি করতে পার। কেউ তোমাকে বেঁধে রাখে নি!'

দু-চোখ ভরা জল নিয়ে আন্তন পকেট হাতড়াতে লাগল, তারপর একগোছা চাবি বের করে টেবিলের ওপর রাখল। আন্তনের ডান হাত বলে পরিচিত অপ্রিশ্‌কো এই সময় ঘরে ঢুকে সর্দারকে কাঁদতে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে রইল। ব্রাত্‌চেঙ্কো ওর দিকে ঘেন্নার চোখে তাকাল, একবার কী-যেন বলতেও গেল, কিন্তু তারপর জামার হাতা দিয়ে নাকটা শুধু মুছে একটিও কথা না-বলে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ওই রাত্রেই ও চলে গেল কলোনি ছেড়ে, যাবার আগে এজমালি শোবার ঘরে পর্যন্ত ঢুকল না। যারা সেদিন ডাক্তার আনতে গাড়ি করে শহরে গিয়েছিল তারা ওকে রাস্তা ধরে হাঁটতে দেখেছিল। ও তখন নিজে থেকে তো গাড়িতে উঠতে চায়ই নি, গাড়ি করে যাওয়ার জন্যে অন্যরা ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও ও হাত নেড়ে তাদের চলে যেতে বলেছিল।

এর দু-দিন পরে এক সন্ধেবেলা অপ্রিশ্‌কো কাঁদতে-কাঁদতে আমার ঘরে এসে আছড়ে পড়ল। দেখলুম, রক্তে ওর মুখ ভেসে যাচ্ছে। ব্যাপারখানা কী তা জিজ্ঞাসা করে ওঠার আগেই সেদিনের সার্বিক দায়িত্ব যার ওপর ছিল সেই লিদিয়া পেত্রোভ্‌না দারুণ বিচলিত অবস্থায় দৌড়ে আমার ঘরে এসে ঢুকল। চেঁচিয়ে বলল:

'আন্তন সেমিওনভিচ, শিগ্‌গির একবার আস্তাবলে আসুন — ব্রাত্‌চেঙ্কো এসে তুলকালাম কান্ড শুরু করে দিয়েছে...'

আস্তাবলে যাওয়ার পথে বিশালদেহী সহকারী সহিস ফেদরেঙ্কোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বনজঙ্গল মাঠপ্রান্তর কাঁপিয়ে দেখি ও চিৎকার করে চলেছে।

'কী, তোমার আবার কী হল?'

'আমি... ও... ওর কী অধিকার আছে?.. ঘোড়ার লাগাম দে ও আমার মুখি মেরেছে...'

'কে — ব্রাত্‌চেঙ্কো?'

'ব্রাত্‌চেঙ্কো! ব্রাত্‌চেঙ্কো!'

আস্তাবলে ঢুকে দেখলুম আন্তন আর আস্তাবলের কর্মী আমাদের আরেকটি ছেলে প্রাণপণে কাজ করে চলেছে। গম্ভীর মুখে আন্তন আমাকে

নমস্কার জানাল, কিন্তু আমার পেছনে অপ্রিশ্‌কোকে দেখতে পেয়ে আমার উপস্থিতি বিলকুল ভুলে তেড়ে এল ওর দিকে:

'শিগ্‌গিরি দূর হ এখান থেকে, নইলে আবার তোরে ঘোড়ার বাঁধুনি দিয়ে অ্যায়সা প্যাঁদানি দেব! মস্ত কোচোয়ান হইছিস তুই, না! দ্যাখেন, দ্যাখেন, 'লালু'র কী অবস্থা করেছে ও, দ্যাখেন!'

ধাঁ-করে একটা লণ্ঠন তুলে নিয়ে আন্তন আমাকে 'লালু'র কাছে টেনে নিয়ে গেল। দেখলুম, সত্যি 'লালু'র ঘাড়ের সন্ধিতে উ'চু জায়গাটায় বিশ্রি একটা ঘা হয়েছে। ঘা-টা তখন পরিষ্কার এক-টুকরো কাপড় দিয়ে ঢাকা। সাবধানে কাপড়ের টুকরোটা খুলে আমাকে ঘা দেখিয়ে আবার ওটা ও যথাস্থানে বসিয়ে দিল।

'ঘাটায় আমি ক্‌সেরোফর্‌মের গংড়া লাগিয়ে দিয়েছি,' ও গম্ভীরভাবে বলল।

'তা তো বুঝলুম, কিন্তু বিনা অনুমতিতে আস্তাবলে ঢুকে প্রতিহিংসা মেটানোর আর লোকজনকে মারধর করার কী অধিকার আছে তোমার, শুনি?..'

'আপনি ভেবেছেন ওরে মারধর করার পালা শেষ হয়েছে? ভালো চায় তো ও আমার কাছ থেকে দূরে থাকুক — নইলে আবার ওরে প্যাঁদানি দেব!'

আস্তাবলের দরজার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে একদল ছেলে হাসাহাসি করছিল। তার নিজের আর তার ঘোড়াগুলোর নির্দোষিতা সম্পর্কে ব্রাত্‌চেঙ্কোকে এত বেশি নিশ্চিত মনে হচ্ছিল যে তার ওপর রাগ করতে মন উঠছিল না।

বললুম, 'আন্তন, শোনো, ছেলেদের মারধর করার জন্যে আজ সারা সন্ধে আমার ঘরে তোমাকে গ্রেপ্তার হয়ে থাকতে হবে।'

'অত সময় নাই আমার!'

চে'চিয়ে উঠে বললুম, 'চুপ, একদম চুপ!'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে... তাইলে এখন আমারে ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হবে...'

সেদিন ও সারা সন্ধে আমার ঘরে একখানা বই-হাতে মুখ গোমড়া করে বসে রইল।

১৯২২ সালের শীতকালটা আন্তনের আর আমার পক্ষে খুব খারাপ সময় গেল। আল্‌গা বালুজমিতে সার না-দিয়ে কালিনা ইভানভিচ যে-জই বুনেছিল তাতে বিশেষ কিছু ফসল তো ফললই না, এমন কি তা থেকে বলার মতো এমন কিছু খড়ও পাওয়া গেল না। আমাদের নিজস্ব কোনো আবাদও ছিল না ওই সময়ে। জানুয়ারি মাস লাগাদ দেখা গেল ঘোড়াগুলোকে খেতে দেয়ার মতো খড়বিচুলি নেই। প্রথম দিকে অবশ্য কখনও শহর থেকে, কখনও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে ভিক্ষেসিক্ষে করে খড়বিচুলি যোগাড় করলুম কোনোরকমে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই লোকে ভিক্ষে দেয়া বন্ধ করে দিলে। কালিনা ইভানভিচ আর আমি সরকারি দপ্তরগুলোর দোরে-দোরে হানা দিয়েও বিশেষ কিছু যোগাড় করতে পারলুম না।

অবশেষে একদিন সত্যিকার বিপর্যয় ঘনিয়ে এল। চোখে জল নিয়ে ব্রাত্‌চেঙ্কো জানালে যে ঘোড়াগুলো দু-দিন যাবৎ খেতে পাচ্ছে না। কী আর বলব, আমি চুপ করে রইলুম। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে আর গালাগাল দিতে-দিতে আন্তন আস্তাবল পরিষ্কার করে চলল, ওর কাজ করার আর কিছুই ছিল না। ঘোড়াগুলো মাটিতে এলিয়ে পড়ে ছিল। বিশেষ করে সে-দিকে আন্তন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল।

পরদিন কালিনা ইভানভিচ শহর থেকে ফিরে এল অসম্ভব খারাপ মেজাজ নিয়ে।

‘কী করা যায়? উয়ারা আমাদের কিস্‌সু দিবে না... কী করা যায় কও দেখি?’

দরজার কাছে এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল আন্তন।

ব্রাত্‌চেঙ্কোর দিকে এক-নজর তাকিয়ে কালিনা ইভানভিচ দুই হাত ছড়িয়ে দিল:

‘তাইলে কি আমরা বাইরে বেরায়্যে চুরি করুম — নাকি কও দেখি? কী করতে পারি এখন?.. আহা, বেচারা আবোলা জীব যতোসব!’

হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ঘর থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল আন্তন। ঘণ্টাখানেক পরে খবর পেলুম ও কলোনিতে নেই।

জিজ্ঞাসা করলুম, ‘কোথায় গেল?’

‘কী করে জানব?.. যাবার আগে ও কাউকে একটা কথাও বলে যায় নি।’

পরদিন ফিরল আন্তন, সঙ্গে একজন গ্রামবাসী আর এক গাড়ি-বোঝাই ফসল নিয়ে। গ্রামবাসীটির পরনে ছিল নতুন কোট আর একটা চমৎকার টুপি। তালে-তালে খটাখট আওয়াজ করতে-করতে গাড়িখানা এসে উঠোনে ঢুকল — দেখা গেল, ওটার যন্ত্রপাতি-কাঠকাটরা বেশ আঁটো করে বাঁধা, ঘোড়াগুলোর মসৃণ গা পর্যন্ত চক্‌চক করছে। গাঁয়ের লোকটি কালিনা ইভানভিচকে দেখেই একজন কর্তাব্যক্তি বলে ঠাউরে নিল। বলল:

'রাস্তায় এক ছোকরা আমারে কয়েল যে ফসলে খাজনা নাকি এখেনে লওয়া হয়...'

'কোন্ ছোকরা?'

'এই তো এই মাত্তর এখেনেই ছেল... ও-ই তো আমার সাথে-সাথে এয়েল...'

দেখি, আন্তন আস্তাবলের ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে হাত-মুখ নেড়ে আমাকে কী যেন বলার চেষ্টা করছে।

পাইপের ফাঁকে মৃদু-মৃদু হাসতে-হাসতে কালিনা ইভানভিচ আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল।

'কী করা যায় কও দেখি? উঁ? ওয়ার কাছ থেইক্যা মালটা তো লইয়া লওয়া যাক, তারপরে সে দেখা যাবে-আনে।'

ব্যাপারটা কী ঘটেছে ইতিমধ্যে আমি তা বুঝতে পেরে গেছি।

গাঁয়ের লোকটিকে শুধোলুম, 'কতটা ফসল আছে?'

'তা, আপনের, বোধকরি বিশ পুদটাকে হবে। আমি ওজন করি নাই।'

শোনার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে আন্তনের আবির্ভাব। আপত্তি জানিয়ে বলল:

'রাস্তায় আসতি-আসতি তুমি নিজিই তখন কইলে না যে মাত্তর সাতেরো পুদ আছে? আর এখন কইত্যেছ কিনা বিশ পুদ? মোটেই না, সাতেরো পুদ।'

'মাল খালাস কর। তারপর আপিসে এসো, তোমাকে এর রসিদ দেব'খন।'

অফিস-ঘরে, কিংবা, বলা যায়, কলোনি-বাড়ির বাকি অংশ থেকে পর্দা টেনে যে-ছোট্ট খুপ্‌রিখানা শেষপর্যন্ত বের করে নিয়েছিলুম, সেখানে বসে একখানা ফর্‌ম টেনে নিয়ে আমার এই পাপী হাতে আমি লিখলুম, নাগরিক অনুফ্রি ভাত্‌সের কাছ থেকে ফসলে-দেয় খাজনা বুঝে নেয়া

বাবদ সতেরো পদ্দ জইয়ের খড় গ্রহণ করা হল। অতঃপর দিলনুম দস্তখত আর সিলমোহর।

নিচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে এবং বোধহয় তার নিজেরও অজানা কোনো কারণে আমাকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে লোকটা বিদায় নিল।

এত খনুশি হয়ে উঠল ব্রাত্‌চেঙ্কো যে রীতিমতো গান জনুড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সাকরেদদের নিয়ে আস্তাবলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। আর, অস্বস্তির হাসি হেসে কালিনা ইভানভিচ দনুই হাত কচলাতে-কচলাতে বলল:

'গোল্লায় যাউক! এই ব্যাপারখান লইয়া তোমারে বিপদে পড়তে হইব! কিন্তু কীই-বা করবার পারতা? জীবগনুলারে উপাস দিয়া তো রাখবার পারা যায় না! যাই কও, অরাও তো রাষ্ট্রের সম্পত্তি!'

বললনুম, 'কিন্তু, বনুঝতে পারছি না, যাবার সময় লোকটি অত খনুশি হয়ে গেল কেন?'

'খনুশি হইব না ক্যান? উ ভাবছিল, উয়ারে শহরে যাইতে লাগব, পাহাড়-পব্বত ডিঙ্গাইতে হইব, তারপর সেখানে গিয়া লাইনে খাড়াইতে হইব। আর এখানে উ, পরগাছাটা, খাশা সতারো পনুদ কইয়া চালাইয়া দিল, কেউ এট্টা হিসাব-নিকাশ করল না পেয্যন্ত। কে জানে, হয়তো মাত্তর পনারো পনুদ ফসল আছে।'

দনু-দিন যেতে-না-যেতে খড়ে-বোঝাই আর-একখানা ঘোড়ার গাড়ি আমাদের উঠোনে ঢুকল।

'মালে খাজনা দিতি এস্যেছি। ভাত্‌স কয়্যেল এখেনেই সে খাজনা দিয়ি গেছে...'

'নাম কী তোমার?'

'আমিও ভাত্‌স-গনুষ্টির একজনা। আমার নাম, ভাত্‌স — স্তেপান ভাত্‌স।'

'এক মিনিট সবনুর কর!'

কালিনা ইভানভিচের সন্ধানে গেলনুম। ওর সঙ্গে ঝটপট পরামর্শ সেরে ফেরার পথে দোরগোড়ায় আন্তনের সঙ্গে দেখা। বললনুম:

'কেমন হল তো, ফসলে খাজনা দেয়ার জায়গা যেমন ওদের দেখিয়ে দিয়েছ, এখন বোঝ ঠেলা...'

'নিয়ে নেন, আন্তন সেমিওনভিচ — যা-হোক করে এরপর আমরা বুঝে দেব অখন।'

জিনিসপত্র এভাবে নেয়াও যেমন অসম্ভব ছিল, ফিরিয়ে দেয়াও ছিল তেমনই অসম্ভব। কেননা, ফিরিয়ে দিলে প্রশ্ন উঠবে, ভাত্‌স-গুষ্টির একজনের কাছ থেকে খাজনা নিয়ে আরেক জনকে ফিরিয়ে দিচ্ছি কোন্ নিয়মে?

'যাও, গাড়ি থেকে খড় নামাও গিয়ে। আমি তোমাকে রসিদ লিখে দিচ্ছি।'

এরপর আরো দুই গাড়িভরতি আঁটি-বাঁধা খড় আর চল্লিশ পুদ জই অগত্যা নিতে হল আমাদের।

ভয়ে থরহরি কাঁপতে-কাঁপতে সমুচিত শাস্তির অপেক্ষায় রইলুম। কখনও-কখনও আন্তনকে চিন্তিতভাবে আমার দিকে তাকাতে দেখতুম, কিন্তু তখনও ঠোঁটের কোণে ওর অস্পষ্ট একটা হাসি লেগে থাকত। তবে কারো ঘোড়ার দরকার পড়লে ও কিন্তু তখন আগের মতো আর লড়াই লাগাচ্ছিল না, আর গাড়িতে করে মালপত্র বওয়ার ব্যাপারে হাসিমুখে সব নির্দেশ পালন করে যাচ্ছিল। আস্তাবলে ও তখন দিনরাত এমন খাটা খাটছে, যেন হার্‌কিউলিস।

অবশেষে একদিন এই সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ চিঠিটি হাতে এল:

'এতদ্বারা আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে আপনি অবিলম্বে আমাদিগকে জানান, কোন্ অধিকার-বলে কলোনি নিজে ফসলে খাজনা আদায় করিতেছে।'

জেলা সরবরাহ-বিভাগের অধ্যক্ষ
আগেয়েভ

তদন্তের এই ব্যাপারটা এমন কি কালিনা ইভানভিচের কাছেও চেপে গেলুম। নিজেও চিঠির কোনো জবাব দিলুম না। আর, তাছাড়া, জবাব দেবারই বা কী ছিল?

এপ্রিল মাসে একদিন একজোড়া কালো ঘোড়ায়-টানা একখানা গাড়ি হুড়মুড় করে কলোনির উঠোনে এসে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রস্ত ব্রাত্‌চেঙ্কো ছুটে এল আমার অফিস-ঘরে।

হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'এসে গেছে! এসে গেছে!'

'কে আবার এসে গেল?'

'ওই খড়ের ব্যাপারটা নিয়ে বোধহয়... লোকটা সাংঘাতিক চটে আছে দেখলাম।'

ঘর-গরম-করার চুল্লীর কোণ ঘেঁষে পেছনদিকে গিয়ে ও বসল। তারপর চুপ করে গেল।

জেলা সরবরাহ-বিভাগের অধ্যক্ষ, দেখলুম, ওই ধরনের লোক যেমন হয় ঠিক তেমনটি। চামড়ার জ্যাকেট-গায়ে, সঙ্গে রিভল্‌বার, অল্পবয়সী, চট্‌পটে।

ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করলেন, 'আপনিই ডিরেক্টর?'

'আজ্ঞে।'

'আমার চিঠি পেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি।'

'জবাব দেন নি কেন? এ-সবের মানে কী — আমাকে নিজেকেই আসতে হবে নাকি? ফসলে খাজনার আদায় নিতে কে আপনাকে হুকুম দিয়েছে শুনি?'

'কোনো নির্দেশ ছাড়াই আমরা ফসলে খাজনার আদায় নিয়েছি।'

জেলা সরবরাহ-বিভাগের অধ্যক্ষ এবার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বললেন:

' 'কোনো নির্দেশ ছাড়াই' — এর মানে কী? এর অর্থ কী বোঝেন? আপনি জানেন যে এর জন্যে আপনাকে এখুনি গ্রেপ্তার করা হবে?'

আমি তা জানতুম।

'আপনার যা করার করতে পারেন,' জেলা সরবরাহ-বিভাগের অধ্যক্ষকে ফাঁপা-গলায় বললুম আমি। 'আমি আত্মপক্ষ-সমর্থনের চেষ্টা করছি না, এ-ব্যাপারে আমার দায়িত্ব অস্বীকারও করছি না। তবে, দয়া করে চেঁচাবেন না। আপনি যা ভালো মনে করেন, করুন।'

আমার বেচারা অফিস-ঘরখানার এককোণ থেকে আরেক কোণে পায়চারি শুরু করলেন অধ্যক্ষ-মশাই।

'আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেছে যা-হোক!' যেন খানিকটা আত্মগতভাবেই

বিড়বিড় করে বললেন উনি, তারপর যুদ্ধের ঘোড়ার মতো নাক দিয়ে আওয়াজ বের করলেন।

চুল্লীর পেছনের কোণটা থেকে এই সময়ে বেরিয়ে এল আন্তন। জেলা সরবরাহ-বিভাগের তেলে-বেগুনে জ্বলে-ওঠা অধ্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখদুটো তখন ঘুরছে। হঠাৎ ভোমরার গুন্‌গুনুনির মতো একটা নিচু গলা শোনা গেল:

'ঘোড়াগুলো যদি চারদিন দানাপানির অভাবে শুকিয়ে থাকে তাহলে জিনিসটা ফসলের খাজনা কি অন্য কী-ব্যাপার তা নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না, বোঝলেন! আপনের সুন্দর কালো ঘোড়াগুলো যদি চারদিন যাবৎ কিচ্ছু না-খেয়ে শুধু খবরকাগজ পড়ে কাটাত, তাহলে যেমনধারা টগ্‌বগিয়ে আপনে কলোনিতে এসে ঢুকলেন তা পারতেন কি?'

পায়চারি বন্ধ করে আগেয়েভ অবাক হয়ে তাকালেন:

'তুমি কে বট হে বাপু? তোমার এখানে কী কাজ?'

আমি বললুম, 'ও আমাদের হেড-সহিস — বলতে পারেন, ও-ও এ-ব্যাপারে কম-বেশি উৎসাহী।'

জেলা সরবরাহ-বিভাগের অধ্যক্ষ আবার কোণাকুণি পায়চারি শুরু করলেন। তারপর হঠাৎ আন্তনের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন:

'অন্ততপক্ষে তোমাদের খাতাপত্রে ব্যাপারটা লেখাজোকা আছে তো, নাকি? আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেছে যা-হোক!..'

এক লাফে আমার টেবিলের কাছে এসে উৎকণ্ঠিতভাবে আন্তন ফিস্‌ফিসিয়ে বলল:

'মালগুলোর হিসাব লেখা আছে তো, তাই না, আন্তন সেমিওনভিচ?'

ওর রকম দেখে কি আগেয়েভ, কি আমি আমরা কেউ না-হেসে পারলুম না।

'হ্যাঁ, সব হিসেব লেখা আছে।'

'এমন চৌকস বাচ্চা পেলেন কোথায়?' জেলা সরবরাহ-বিভাগের অধ্যক্ষ প্রশ্ন করলেন।

হেসে বললুম, 'এরা আমাদেরই হাতে-গড়া।'

জেলা সরবরাহ-বিভাগের অধ্যক্ষের মুখের দিকে চোখ তুলে গম্ভীরভাবে বন্ধুত্ব পাতানোর ভঙ্গিতে ব্রাত্‌চেঙ্কো শুধোল:

'আপনের কালো ঘোড়া দুটারে দানাপানি দেব?'
'হ্যাঁ, যাও। দানাপানি দাও গিয়ে।'

## ১৩

## অসাদৃঢ়

১৯২২ সালের শীত আর বসন্ত ঋতু গোর্কি কলোনির জীবনে ভয়াবহ নানা বিস্ফোরক ঘটনায় চিহ্নিত হয়ে আছে। ঘটনাগুলো ঘটেছিল একের-পর-এক, মাঝখানে প্রায় নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত পর্যন্ত না-দিয়ে। আর আজ ওরা দুর্ভাগ্যের একটা তালগোল-পাকানো পিণ্ডের মতো আমার স্মৃতিতে একাকার হয়ে আছে।

কিন্তু তবু, যাকে দুঃখজনক বিয়োগান্ত ঘটনা বলে তার অত বেশি প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও, ওই দিনগুলো ছিল বৈষয়িক ও নৈতিক দু-দিক থেকেই আমাদের বিকাশের কাল। কী করে এই দুটো আপাত-বিরোধী ব্যাপার — বিয়োগান্ত ঘটনাবলী আর অগ্রসরমান বিকাশ -- পাশাপাশি যুক্তিসম্মতভাবে টিকে থাকতে পারে, আজ এতদিন পরে তা ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে কিছুটা কষ্টসাধ্য। তবু, তখন এটা সম্ভব হয়েছিল। কলোনির জীবনে প্রতিটি সাধারণ দিন, এমন কি তখনও, ছিল একেকটা আশ্চর্য দিন, শ্রম, পারস্পরিক বিশ্বাস ও মানবিক সাথীত্বের অনুভূতিতে পূর্ণ। আর এই সবকিছুর ওপরে যেটা ছিল বাড়তি তা হল সব সময়েই হাসি, ঠাট্টা, উৎসাহ-উদ্দীপনার আবহাওয়া, আর একটা চমৎকার প্রাণোচ্ছল ভাব। অথচ, তা সত্ত্বেও, এমন একটা সপ্তাহও তখন কাটত কিনা সন্দেহ যখন অবিশ্বাস্য কোনো-না-কোনো দুর্ঘটনা আমাদের অতলস্পর্শ খাদে ঠেলে ফেলে দিত না, জড়িয়ে ফেলত না সর্বনাশা ঘটনার ধারাস্রোতে — যার ফলে আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি যেত প্রায়-গুলিয়ে, বহির্বিশ্বের প্রতি ক্ষতবিক্ষত স্নায়ুর প্রতিক্রিয়া-সমেত আমরা হয়ে উঠতুম যেন অসুস্থ মানুষ।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ইহুদি-বিদ্বেষ একদিন আমাদের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তার আগে কলোনিতে কোনো ইহুদি বাসিন্দা ছিল না। আগের হেমন্তে প্রথম একটি ইহুদি ছেলে এল, আর তারপর এক-এক

করে এসে পড়ল আরও কয়েক জন। এদের মধ্যে একজন জেলা অপরাধ-তদন্ত দপ্তরে কিছুদিন কী-একটা ধরনের যেন কাজ করে এসেছিল। আমাদের আদি-বাসিন্দাদের উন্মত্ত ক্রোধের পুরো ধাক্কাটা এসে প্রথম তার ওপরই পড়ল।

প্রথম-প্রথম আমি ধরতেই পারছিলুম না এ-ব্যাপারে কারাই-বা মুখ্য আর কারা অ-প্রধান অপরাধী। যারা পরে কলোনিতে এসেছিল তারা ইহুদি-বিদ্বেষী ছিল এই সহজ কারণে যে তারা নিজেদের গুণ্ডামির মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার উপযোগী একটা নিরীহ উপাদান পেয়ে গিয়েছিল, অপর দিকে পুরনো বাসিন্দাদের পক্ষে ইহুদি ছেলেদের অপমান ও নির্যাতন করার সুযোগসুবিধা ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি।

আমাদের কলোনির প্রথম ইহুদি বাসিন্দার নাম ছিল অস্ত্রমুখভ।

সে-বেচারা অন্যদের হাতে যখন-তখন কারণে-অকারণে মার খেত। মার খাওয়া, সব সময়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ সহ্য করা, সুন্দর একটা চামড়ার বেল্‌ট্‌ কিংবা ভালো একজোড়া বুটজুতো দিয়ে দিতে ও তার বদলি ছেঁড়া-পুরনো জিনিসপত্র নিতে বাধ্য হওয়া, প্রাপ্য খাবারের চেয়ে কম খাবার পেয়ে ঠকা, কিংবা নোংরা-ফেলা খাবার পাওয়া, অনবরত জ্বালাতন সহ্য করা, অপমানজনক নানা ধরনের নাম-ধরে ডাক শোনা, আর সবচেয়ে যা অসহ্য সেই আতঙ্ক ও মর্যাদাহানির আবহাওয়ায় সর্বদা থাকতে বাধ্য হওয়া — কলোনিতে শুধু একমাত্র অস্ত্রমুখভের নয়, শ্‌নাইদের, গ্লেইসের ও ক্লাইনিকেরও এই-ই ছিল বিধিলিপি। এই সবকিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করা ছিল আমাদের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক-রকমের কঠিন ব্যাপার। নির্যাতনকারীরা সবকিছু করত চরম গোপনীয়তা রক্ষা করে, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে, এবং বলা চলে, প্রায় কোনো বিপদের ঝুঁকি না-নিয়ে, কারণ ইহুদি ছেলেরা একেবারে শুরু থেকেই ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে থাকত ও এ-নিয়ে অভিযোগ করতেও শিটিয়ে থাকত। একমাত্র মনমরা ভাব, একটু বেশি চুপচাপ থাকা ও ভিতু-ভিতু আচরণ করা, কিংবা বয়ঃকনিষ্ঠ ছেলেদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বেশি ভাবপ্রবণ তাদের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অন্তরঙ্গ কথাবার্তার ফাঁকে এ-সম্পর্কিত কোনো অস্পষ্ট গুজবের কথা প্রকাশ পেয়ে যাওয়া — এই ধরনের পরোক্ষ ইঙ্গিত ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করেই একটা আন্দাজি ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব ছিল।

অবশ্য কলোনির রক্ষণাধীন পুরো একদল ছেলেকে নিয়মিতভাবে নির্যাতন করে যাওয়ার ব্যাপারটা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে দীর্ঘকাল পুরোপুরি গোপন রাখাও অসম্ভব ছিল। তাই শিগ্‌গিরই এমন একটা সময় এল যখন কলোনির মধ্যে ইহুদি-বিদ্বেষের প্রবল বাতিকের কথা কারো কাছেই চাপা রইল না। এমন কি সবচেয়ে ওঁচা উৎপীড়কদের নামও জেনে যাওয়া সম্ভব হল। তারা সবাই ছিল আমাদের পুরনো দোস্ত — যেমন, বুরুন, মিতিয়াগিন, ভোলখভ, প্রিখোদ্‌কো, ইত্যাদি। কিন্তু এদের মধ্যেও আবার মুখ্য ভূমিকা ছিল দুটো ছেলের — অসাদ্‌চি আর তারানেত্‌সের।

প্রাণবন্ত ভাব, রসবোধ ও সাংগঠনিক ক্ষমতার জন্যে তারানেত্‌স কলোনির ছেলেদের মধ্যে পয়লা সারিতে নিজের স্থান করে নিয়েছিল। কিন্তু আরও বেশি-বয়সের ছেলেপিলেরা কলোনিতে আসায় ওর ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র পরের দিকে কিছুটা সীমিত হয়ে পড়েছিল। ইহুদি ছেলেদের ভয়-দেখানো ও নির্যাতন করার মধ্যে ওর ক্ষমতা-লোলুপতা তখন চরিতার্থতার পথ খুঁজে নিল। অপরদিকে, অসাদ্‌চির বয়স ছিল ষোলো। ছেলেটা ছিল গোমড়া-মুখো, একগুঁয়ে, বলশালী, আর পুরোপুরি দুর্নীতিপরায়ণ। নিজের অতীত জীবন সম্পর্কে ওর অহঙ্কার ছিল খুব। এটা কিন্তু পূর্বস্মৃতির মোহিনী মায়ায় আচ্ছন্নতার জন্যে নয়, একেবারেই নিছক জিদ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। কারণ, ও মনে করত ওর অতীতটা ওরই নিজস্ব, আর ওর জীবন নিয়ে মাথা-ঘামানোও আর কারো ব্যাপার নয়, একেবারে ওরই নিজস্ব, তাই।

কী করে জীবনের আস্বাদ নিতে হয় অসাদ্‌চি তা জানত, এবং কোনো-না-কোনো ধরনের আমোদ ছাড়া দিনগুলো যাতে বৃথা পার হয়ে না-যায় সে-ব্যাপারে সর্বদাই যথেষ্ট তৎপর থাকত। এই আমোদ সম্পর্কে ধারণা নিয়ে ওর মনে অবশ্য কোনো খুঁতখুঁতুনি ছিল না। সাধারণত শহরের এ-প্রান্তের একটা গ্রাম, পিরগোভ্‌কায় মাঝে-মাঝে যেতে পারলেই খুশি থাকত ও। এই গ্রামের অধিবাসীরা ছিল আধা-কুলাক ও আধা গ্রাম্য-পেটিবুর্জোয়া। যে-সময়ের কথা বলছি সে-সময়ে পিরগোভ্‌কা সুন্দরী মেয়ে ও সামগোনের জন্যে পরিচিত ছিল, আর এই সবই ছিল অসাদ্‌চির আমোদের প্রধান উপকরণ। এ-ব্যাপারে ওর অভিন্নহৃদয় সহচর ছিল কলোনির সবচেয়ে কুখ্যাত বখাটে আর পেটুক এক ছোকরা, নাম গালাতেঙ্কো।

কপালের ওপর অসাদ্‌চি সর্বদা জাঁকালো একগোছা চুল ঝুলিয়ে রাখত। এর ফলে পারিপার্শ্বিক দুনিয়াকে দেখায় বাধার সৃষ্টি হোত বটে, কিন্তু পিরগোভ্‌কার তরুণীদের হৃদয়-দুর্গ অবরোধ করার সময় নিঃসন্দেহে তা মস্ত মূলধন হয়ে দেখা দিত। যখনই ওর ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করতে হোত তখন অসাদ্‌চি চূর্ণকুন্তকের নিচ থেকে আমার দিকে বিরক্তি-ভরা চোখে, এমন কি আমার মনে হোত বিরূপভাবেই, তাকিয়ে থাকত। আমি ওকে পিরগোভ্‌কায় যেতে দিতে চাইতুম না, বরং কলোনির নানা ব্যাপারে আরও বেশি করে মনোযোগ দেয়ার জন্যে বারে-বারে দাবি জানাতুম।

ইহুদি ছেলেদের বিচার ও উৎপীড়ন করার কাজে সবচেয়ে বড় মোড়ল হয়ে উঠেছিল অসাদ্‌চি। অবশ্য ওকে ঠিক ইহুদি-বিদ্বেষী বলা চলত কিনা সন্দেহ। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, ইহুদি ছেলেরা নিতান্ত অসহায় ছিল আর শাস্তির ভয় না-রেখে তাদের ওপর অবাধে উৎপীড়ন করা চলত, এই কারণে আদিম ধরনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার ক্ষমতা আর বাহাদুরির জাঁক দেখিয়ে কলোনিতে সকলকে তাক লাগিয়ে দেয়ার মস্ত একটা সুযোগ জুটে গিয়েছিল ওর।

ইহুদি-নির্যাতকদের বিরুদ্ধে সরাসরি এবং খোলাখুলি অভিযান শুরু করবার আগে আমাদের একাধিকবার ভেবে দেখতে হল। কারণ, এই ধরনের অভিযান চালালে তার ফলে ইহুদি ছেলেদের নিজেদেরই সাংঘাতিক বিপদ ঘটার সম্ভাবনা ছিল। সামান্য একটু খোঁচালেই অসাদ্‌চি-জাতীয় ছোকরারা-যে ছুরি ব্যবহারে দ্বিধা করবে না, তা জানতুম। কাজেই, কার্যসিদ্ধি করতে হলে হয় সব রকমের সাবধানতা অবলম্বন করে চোরাগোপ্তাভাবে ক্রমে-ক্রমে এগোতে হোত, আর নয়তো এক ধাক্কায় সবকিছু ধূলিসাৎ করার দরকার ছিল।

প্রথমে আমি পয়লা পদ্ধতিতেই এগোতে চেষ্টা করলুম। আমার উদ্দেশ্য ছিল অসাদ্‌চি ও তারানেত্‌স্‌কে অন্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। কারাবানভ, মিতিয়াগিন, প্রিখোদ্‌কো, বুরুন, এরা ছিল আমার বন্ধুলোক। ওদের সমর্থনের ওপর আমি নির্ভর করছিলুম। কিন্তু এ-ব্যাপারে ওদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় এসে সবচেয়ে বড় রকমের যে-সাফল্য আমি আশা করতে পারতুম তা হল, ইহুদি ছেলেদের আর উত্ত্যক্ত করবে না এই মর্মে ওদের কাছ থেকে কথা নেয়া।

'সারা কলোনির খপ্পর থ্যেকে আদেরে রক্ষা করার আমরা কে?'

আমি বললুম, 'ব্যাপারটা মোটেই তা নয়, সেমিওন। তুমি বেশ ভালোই বুঝেছ আমি কার কথা বলতে চাচ্ছি।'

'আচ্ছা, ধরেন, যদি আমি তা-ই করি তো কী হবে? ধরেন, আমি যদি অদের বিরুদ্ধে যাই তাইলেও অস্ত্রমুখভরে তো আমার সাথে বাঁধ্যে নিয়ি ঘুরতি পারব্য না, পারব্য কি? আমি যতই চেষ্টা করি না ক্যানে, অরে ঠিকই পাকড়াও করবে ওরা, আর আগের থ্যেকে আরও বেশি কর্য়ে প্যাঁদানি দিবে।'

মিতিয়াগিন তো সাফ জবাব দিয়ে দিল:

'এ-ব্যাপারে আমার কিস্সু করার নাই — এ আমার নাইনই না — তবে আমি অদের গায়ি হাত তোলব না। অদের গায়ি হাত তুল্যে আমার কী ফায়দা, বলেন।'

অন্য সকলের চেয়ে জাদোরভই আমার মনোভাবের প্রতি বেশি করে সমর্থন জানাল। তবে অসাদ্চির মতো ছোকরার বিরুদ্ধে খোলাখুলি লড়াইয়ে নামা ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

'কড়া রকমের কিছু একটা ব্যবস্থা নেয়া দরকার,' ও বলল, 'কিন্তু সেটা যে কী হতে পারে তা জানি না। যেমন আপনার কাছ থেকে তেমনই আমার কাছ থেকেও সবকিছু ওরা গোপন রাখে। আমার সামনে কোনো ছেলের গায়ে হাত দেয় না।'

ইতিমধ্যে ইহুদি-ঘটিত পরিস্থিতি দিনের-পর-দিন খারাপ হয়ে উঠতে লাগল। প্রতিদিনই ইহুদি ছেলেদের গায়ে কালশিরা বা কাটাছেঁড়ার ক্ষত দেখা যেতে লাগল, কিন্তু এ-ব্যাপারে হাজার প্রশ্ন করেও ওদের মুখ থেকে উৎপীড়কের নাম বের করা যাচ্ছিল না। এদিকে অসাদ্চি পেখম মেলে গট্গটিয়ে সারা কলোনি ঘুরে বেড়াতে লাগল, আর ওর ঝাঁকালো চুলের ঝুঁটির ফাঁক দিয়ে উদ্ধতভাবে তাকাতে লাগল আমার আর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দিকে।

সাহস করে একেবারে শিঙ্ চেপে ধরেই ষাঁড়ের মোকাবিলা করতে হবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অসাদ্চিকে একদিন অফিসে ডেকে পাঠালুম। কিন্তু ও সরাসরি সব অভিযোগ অস্বীকার করল, যদিও ভাবভঙ্গি দেখে মালুম হচ্ছিল যে অস্বীকারটা নেহাতই করতে হয় বলে করছে মাত্র, আসলে ওর সম্পর্কে আমার কী মনোভাব তাতে ওর বিন্দুমাত্র কিছু যায়-আসে না।

'তুমি ওদের রোজ-রোজ মারধর কর।'

'মোটেই না,' ওর নির্বিকার জবাব।

এরপর, কলোনি থেকে ওকে তাড়িয়ে দেয়ার ভয় দেখালুম।

'ঠিক আছে, দ্যান-না ক্যানে!'

ও ভালোই জানত, কাউকে কলোনি থেকে বের করে দেয়া ছিল কতখানি দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ আর কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এর জন্যে কমিশনের কাছে অসংখ্য দরখাস্ত দিয়ে যেতে হোত, যত রকমের ফর্ম আছে তা পূরণ করে আর রিপোর্ট লিখে পেশ করতে হোত, আর একগারা সাক্ষীসাবুদের কথা তো বাদই দিলুম, স্বয়ং অসাদ্চিকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে বারে-বারে পাঠাতে হোত।

তাছাড়া, কাজ শুরু করে দেখলুম, শুধুমাত্র অসাদ্চির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করলেই চলবে না। সারা কলোনিই ওর কীর্তিকলাপের আগ্রহী দর্শক। অনেকেই ওর কাজ সমর্থন করত, ওকে প্রশংসার চোখে দেখত। কলোনি থেকে ওকে বের করে দেয়ার অর্থ এ-ই দাঁড়াত যে উল্লিখিত ওই মনোভাবকে আরও ভালো করে জীইয়ে রাখা। ছেলেরা তাহলে চিরকাল মনে রাখত তাদের শহীদ বীর অসাদ্চিকে, যে-নাকি কোনো কিছুকে ভয় পেত না, কারও কথা মানত না, ইহুদি দেখলেই ধরে-ধরে পেটাত, আর এরই জন্যে কিনা কলোনি থেকে তাকে বের করে দেয়া হয়েছিল! তাছাড়া অসাদ্চিই যে একমাত্র ইহুদি ছেলেদের নির্যাতন করত তা-ও নয়। তারানেত্স যদিও অসাদ্চির চেয়ে কম হিংস্র ছিল, তবু উদ্ভাবনী বুদ্ধি বাত্লাতে আর নির্যাতনের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম উপায় আবিষ্কারে ও ছিল বেশি পটু। তারানেত্স কখনও ইহুদি ছেলেদের মারত না, এমন কি অন্যদের সামনে ওই ছেলেদের প্রতি যেন খানিকটা স্নেহ-মমতাই দেখাত। কিন্তু রাত্তিরবেলা সবাই যখন ঘুমিয়ে আছে তখন ওদের কারো-না-কারো পায়ের আঙুলের ফাঁকে এক-টুকরো কাগজ গুঁজে দিয়ে ও তাতে অগুন ধরিয়ে দিত, তারপর নিজের বিছানায় ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকার ভান করত। কিংবা, হয়তো একখানা কাঁচি নিয়ে ফেদরেঙ্কো বা ওই ধরনের হাবাগবা, জবুস্থবু কোনো ছেলেকে রাজি করিয়ে ফেলত শ্নাইদেরের মাথার একপাশের চুল মুড়িয়ে কাটতে, তারপর, একপাশের চুল ছাঁটবার পর, এমন ভাব দেখাত যেন কাঁচিখানা হঠাৎই বিকল হয়ে গেছে। আর তখন বেচারা

ছেলেটা বাকি চুলগুলো ছেঁটে দেয়ার জন্যে কাকুতিমিনতি করত আর চোখের জল ফেলতে-ফেলতে ওর পিছু-পিছু ঘুরত। ও তখন আশ মিটিয়ে তাকে নিয়ে হাসি-তামাশা জুড়ত। আর, তারপর, নেহাতই অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ একদিন এই সব যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি মিলল। যদিও সে-ঘটনাটা কলোনির পক্ষে যে গর্ব করার মতো কিছু হয়েছিল তা নয়।

একদিন সন্ধেবেলা আমার অফিস-ঘরের দরজা গেল খুলে। দেখলুম, ইভান ইভানভিচ অস্ত্রমুখভ আর শ্‌নাইদেরকে নিয়ে ঘরে ঢুকছেন। ওরা দু-জনেই রক্তে ভেসে যাচ্ছে, মুখ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে ওদের। কিন্তু অত্যাচারে এত অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল ওরা যে কেউই কাঁদছিল না।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে? অসাদ্‌চি?'

ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তখন জানালেন যে ওই দিন খাবার ঘরে কাজের দায়িত্ব ছিল শ্‌নাইদেরের ওপর, আর রাত্রে খাবার সময় সারাক্ষণ অসাদ্‌চি ছেলেটাকে নানাভাবে জ্বালাতন করছিল — ভরা প্লেটগুলো টেবিলে দেবার সময়ে সেগুলো বারবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আর রুটি বদলে আনতে বাধ্য করছিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি। অবশেষে স্যুপের একখানা প্লেট টেবিলে দিতে গিয়ে আচমকা প্লেটখানা কাত হয়ে যাওয়ায় শ্‌নাইদেরের বুড়ো আঙুলটা দৈবক্রমে প্লেটের স্যুপে ডুবে যায়, এতে অসাদ্‌চি জায়গা ছেড়ে উঠে ওই ঘরে উপস্থিত ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সারা কলোনির সামনেই শ্‌নাইদেরের মুখে ঘুসি মারে। মার খেয়ে শ্‌নাইদের নিজে হয়তো চুপ করেই থাকত, কিন্তু কর্তব্যরত শিক্ষক ভীরু ছিলেন না, তাছাড়া ওর আগে কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকার সামনে ছেলেরা এভাবে মারামারি করে নি, তাই ইভান ইভানভিচ অসাদ্‌চিকে হুকুম করলেন খাবার ঘর ছেড়ে চলে যেতে এবং আমার কাছে এসে রিপোর্ট করতে। অসাদ্‌চি তখন খাবার ঘরের দরজার দিকে এগোল বটে, তবে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল:

'ডিরেক্টরের কাছে আমি যাব বটে, তবে তার আগি ওই ইহুদি-ছ্যানারে নাকে কাঁদায়্যে যাব-নে!'

আর এই সময়ে ছোটখাট একটা ভোজবাজিই ঘটে গেল বলা চলে। ইহুদি ছেলেদের মধ্যে যে-ছিল সর্বদাই সবচেয়ে নিরীহ সেই অস্ত্রমুখভ হঠাৎ টেবিল ছেড়ে লাফিয়ে উঠে অসাদ্‌চির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চিৎকার করে বলল:

'কিছুতেই অরে আমি মারত্যে দিব না!'

এর পরিণতি ঘটল এই যে অসাদ্‌চি ওই খাবার ঘরেই অস্ত্রমুখভকে উত্তমমধ্যম দিল। তারপর বেরিয়ে যাবার সময়ে ঢাকা-বারান্দায় শ্নাইদেরকে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এমন জোরে তাকে একটা ঘুসি মারল যে একটা দাঁতই উপড়ে এল তার। শুনলুম, অসাদ্‌চি নাকি আমার কাছে আসবে না বলেছে।

আমার অফিস-ঘরে দাঁড়িয়ে অস্ত্রমুখভ আর শ্নাইদের জামার ময়লা হাতা দিয়ে ঘষে সারা মুখে রক্ত মাখামাখি করছিল। কিন্তু, স্পষ্টতই, ভবিষ্যৎ অন্ধকার এটা ধরে নিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল বলে তারা কান্নাকাটি করছিল না। আমি নিজেও বুঝছিলুম যে যদি শেষবারের মতো এই অশান্তির অবসান না-ঘটাই তাহলে ইহুদি ছেলেদের হয় প্রাণরক্ষার জন্যে সদলবলে পালাতে হবে আর নয়তো সত্যিসত্যিই শহীদ হবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। প্রধানত যা আমাকে সেই মুহূর্তে পীড়ন করছিল আর রক্ত হিম করে দিচ্ছিল তা হল এই চিন্তা যে খাবার ঘরে এই খুনোখুনির ব্যাপারে অন্য সব ছেলে, এমন কি জাদোরভ পর্যন্ত, নির্বিকার ঔদাসীন্য দেখাচ্ছিল। কলোনির অস্তিত্বের প্রথম দিনগুলিতে নিজেকে আমার যত নিঃসঙ্গ ঠেকেছিল, ওই মুহূর্তে ঠিক ততখানিই নিঃসঙ্গ ঠেকল নিজেকে। তবে ওই প্রথম দিনগুলোয় কারো কাছ থেকেই আমি সমর্থন কিংবা সহানুভূতির প্রত্যাশা করি নি। সেটা ছিল স্বাভাবিক নিঃসঙ্গতা, তাকে অবশ্যম্ভাবী বলেই মেনে নিয়েছিলুম। পরে কিন্তু আমার অভ্যেস খারাপ হয়ে গিয়েছিল, রক্ষণাধীন ছেলেদের কাছ থেকে সর্বদা সহযোগিতা পেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম আমি।

এর মধ্যে নির্যাতিত ছেলেরা সহ আরও কয়েক জন অফিস ঘরে এসে জড় হয়েছিল। ছেলেদের একজনকে বললুম:

'অসাদ্‌চিকে ডাক।'

প্রায় নিশ্চিত ছিলুম যে সবার আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার পর অসাদ্‌চি আসতে নিশ্চয়ই অস্বীকার করবে। আর তা করলে -- মনে-মনে সংকল্প করে ফেলেছিলুম - দরকার পড়লে আমি নিজেই তাকে ধরে নিয়ে আসব, তার জন্যে রিভলবার উ'চিয়ে যদি ভয় দেখাতে হয় তবুও।

কিন্তু শেষপর্যন্ত অসাদ্‌চি এল। কাঁধের ওপর আলগা করে কোটটা

ঝুলিয়ে, ট্রাউজারের দু-পকেটে হাতদুটো পুরে, এক ধাক্কায় একখানা চেয়ার উলটে ফেলে হুড়মুড়িয়ে অফিস-ঘরে এসে ঢুকল। ওর সঙ্গে এল তারানেত্স। তারানেত্স এমন ভাব দেখানোর চেষ্টা করল যেন সমস্ত ব্যাপারটাই দারুণ মজার, যেন মজাদার একটা দৃশ্য দেখবার আশায় ও শুধু এসেছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে তেরছাভাবে আমার দিকে তাকিয়ে অসাদ্চি বলল:

'আমি এস্যেছি... কী বলতেছেন বলেন?'

শুনাইদের আর অস্ত্রমুখভকে দেখিয়ে বললুম:

'এ-সবের মানে কী?'

'এ-ই মাত্তর? কোন চুলায় যাব!.. মাত্তর দুটা ইহুদি-ছ্যানা! আমি ভাবলাম আমারে বুঝি সত্যই নতুন কিছু দেখাবেন।'

হঠাৎ প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণে পায়ের নিচ থেকে শিক্ষাদানের নিয়ম-নীতির শক্ত মাটি ধ্বসে গেল। মনে হল, আমি যেন মানবতাবর্জিত একধরনের শূন্যতার মধ্যে রয়েছি। টেবিলের ওপর রাখা গণনার ভারি আবাকাস যন্ত্রটা অসাদ্চির মাথা লক্ষ্য করে উড়ে গেল হঠাৎ। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ঝন্ঝন-শব্দে পড়ে গেল মাটিতে।

রাগে জ্ঞানহারা হয়ে টেবিলের ওপর আরও কিছু ভারি জিনিসের সন্ধান করতে লাগলুম, কিন্তু পরক্ষণে মত বদলে একখানা চেয়ার তুলে নিয়ে আচমকা অসাদ্চির দিকে ছুটে গেলুম। ভয় পেয়ে হাঁকপাঁক করে দরজার দিকে ছুটল ও, কিন্তু কাঁধ থেকে কোটটা মাটিতে পড়ে পায়ে জড়িয়ে যাওয়ায় এবার হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

হঠাৎ জ্ঞান ফিরে এল আমার -- মনে হল, কে যেন আমার কাঁধ চেপে ধরেছে। ফিরে তাকালুম — দেখলুম মুখে সেই শান্ত হাসি নিয়ে জাদোরভ আমার দিকে তাকিয়ে:

'শোরের বাচ্চাটা এর যোগ্য নয়!'

মেঝের ওপর বসে-বসে গোঙাচ্ছিল অসাদ্চি। আর মড়ার মতো ফ্যাকাশে মুখ আর কাঁপা-কাঁপা ঠোঁট নিয়ে জানলার তাকে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে ছিল তারানেত্স।

বললুম, 'তুমিও এই বাচ্চাদের ওপর মস্তানি করতে, তাই না!'

জানলার তাক থেকে পিছলে নেমে পড়ল তারানেত্স।

'কথা দিত্যেছি, আমি কোনোদিন আর এমন কাজ করব না!'

'বেরিয়ে যাও এখান থেকে!'

পা টিপে-টিপে ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

অবশেষে অসাদ্‌চি উঠে দাঁড়াল। এক হাতে জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে, অপর হাতে স্নায়বিক দুর্বলতার শেষ চিহ্নটুকু, কালিঝুলি-মাখা গাল বেয়ে আস্তে-আস্তে গড়িয়ে-পড়া একফোঁটা চোখের জল, মুছে ফেলতে-ফেলতে। তারপর আমার দিকে শান্ত, গম্ভীরভাবে তাকাল।

'চারদিন শুধু রুটি আর জল খেয়ে তোমাকে জুতো-তৈরির কারখানা-ঘরে থাকতে হবে, বুঝেছ।'

বাঁকা হেসে, না-ভেবেচিন্তে চট্‌পট জবাব দিল অসাদ্‌চি:

'ঠিক আছে — থাকব-নে।'

আটক থাকার দ্বিতীয় দিনে ও আমাকে জুতোর কারখানায় ডেকে পাঠাল। বলল:

'আর আমি অমন কাজ করব না। আমারে ক্ষমা করবেন?'

'আগে শাস্তিভোগ শেষ হোক তোমার, তারপর ক্ষমার কথা বিবেচনা করা যাবে।'

চারদিন কাটলে পর ও কিন্তু আর ক্ষমা চাইল না, শুধু মুখ গোমড়া করে বললে:

'আমি চল্যে যেত্যেছি।'

'যাও, তাহলে।'

'আমার কাগজপত্তর দিয়া দ্যান।'

'কাগজপত্র কিচ্ছু তুমি পাবে না!'

'তাইলে, বিদায় চাই।'

'বিদায়।'

## ১৪

## সু-সম্পর্ক স্থাপনের দূত কালির দোয়াত

অসাদ্‌চি-যে কোথায় গেল আমরা তা জানতুম না। কেউ-কেউ বলল ও নাকি তাশখন্দ যাত্রা করেছে, সেখানে জিনিসপত্র খুব শস্তা আর ফুর্তি করে জীবন কাটানোর অঢেল সুযোগ। অন্যেরা বলল, আমাদের ওই শহরে

অসাদ্‌চির নাকি এক মামা থাকে, আবার কেউ বলল মামা নয়, আছে এক ঠেলাওয়ালা বন্ধু।

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নতুন করে এই ঘা-খাওয়ার পর কী করে যে আবার মানসিক স্থিতিস্থাপকতা ফিরে পাব তা বুঝতে পারলুম না। ছেলেরা তো আমায় প্রশ্ন করে-করে অতিষ্ঠ করে তুলল -- অসাদ্‌চির কোনো খবর পাওয়া গেল কি?

একদিন বললুম, 'অসাদ্‌চি তোমাদের কে? ওর জন্যে এত অস্থির হয়ে উঠেছ কেন?'

'কই, আমরা তো অস্থির হই নাই,' জবাবে কারাবানভ বলল, 'তবে ও এখানে থাকল্যে ভালো হোত আর-কি। আপনের পক্ষেই ভালো হোত...'

'তোমার কথাটা ঠিক বুঝলুম না।'

এবার আমার দিকে শয়তানি দৃষ্টি হেনে কারাবানভ বলল:

'মনে হয় ভিত্‌রি-ভিত্‌রি... আপনের আঁতের মধ্যি... তেমন ভালো বোধ করত্যেছেন না...'

চেঁচিয়ে বললুম, 'তোমার ওই আঁত-টাঁত নিয়ে চুলোয় যাও! ভাবো কী তোমরা, এখন আমার আত্মাও তোমাদের বিলিয়ে দিতে হবে নাকি?..'

আর বাক্যব্যয় না-করে আমার কাছ থেকে আস্তে-আস্তে সরে পড়ল কারাবানভ।

ইতিমধ্যে প্রাণচাঞ্চল্যে মুখর হয়ে ছিল সারা কলোনি। আমার চারপাশে বেজে চলেছিল তার উচ্ছল সুর। আমার ঘরের জানলার ওধার থেকে (কেমন করে জানি না সকলেই আমার জানলার ওধারে এসে জড় হয়ে যেত) প্রতিদিনই শুনতে পেতুম দৈনন্দিন কাজকর্মের মালায় ইতস্তত-গাঁথা হাসিঠাট্টা রঙ্গব্যঙ্গের আওয়াজ। মনে হচ্ছিল, ঝগড়া-বিবাদের আর লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই যেন। আর, অত্যন্ত অসুস্থ রোগীকে নার্স যেভাবে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করে ঠিক সেইভাবে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না এসে একদিন আমাকে বললেন:

'এভাবে আর গুমরে-গুমরে থাকবেন না -- এ দেখতে-দেখতে কেটে যাবে।'

'আরে, না-না, আমি মোটেই গুমরে থাকছি না। এ কেটে যাবে তো বটেই। তারপর, কলোনির ব্যাপার-স্যাপার কেমন?'

'আমি নিজেই এটা ব্যাখ্যা করতে পারব না,' উনি জবাব দিলেন, 'তবে কলোনিতে সবকিছু চমৎকারভাবে চলছে, বুঝলেন, খুবই মানবিক ধাঁচে চলছে। আমাদের ইহুদি ছেলেরা একেবারে সোনার টুকরো ছেলে সব, — যা সব কাণ্ড ঘটে গেল তার ফলে একটু বেশিরকম ঘাবড়ে আছে ওরা, এখনও একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব আছে বটে, তবে চমৎকার কাজ করে চলেছে সবাই। আপনি বিশ্বাস করবেন না বললে, কিন্তু বড় ছেলেরা ওদের একেবারে মাথায় করে রেখেছে। মিতিয়াগিন তো নার্সের মতোই ওদের নিয়ে পড়ে আছে — একদিন ও সত্যিসত্যিই চুল ছেঁটে গ্লেইসেরকে স্নান করিয়ে দিল, এমন কি ওর জামার বোতাম পর্যন্ত সেলাই করে দিল।'

হ্যাঁ, সর্বকিছুই ভালোভাবে চলছিল। কিন্তু আমার — শিক্ষা-বিজ্ঞানীর — আত্মায় কী ব্যাপারটা ঘটছিল? তার আত্মায় তখন চলেছিল বিপর্যয় কাণ্ড, নানা চিন্তা আর অনুভব সেখানে জট পাকিয়ে তুমুল হৈ-হল্লা জুড়ে দিয়েছিল তখন। একটা ভাবনা কিছুতেই মাথা থেকে দূর হচ্ছিল না। সেটা এই - আমি কী কোনোদিনই এর আসল রহস্যভেদে সমর্থ হব না? এর আগে মনে হয়েছিল, সর্বকিছুই বুঝি আমার হাতের মুঠোয় এসে গেছে, শুধু সবটাকে গুছিয়ে তুললেই হল। অনেক ছেলের চোখেই যখন নতুন এক দৃষ্টির সন্ধান পাচ্ছিলুম... আর ঠিক তখনই সর্বকিছু একেবারে ধ্বসে পড়ে গেল। কী লজ্জা, কী লজ্জা! আচ্ছা, এমন কি হতে পারে যে সবকিছু গোড়া থেকে আবার ফিরেফিরতি শুরু করতে হবে?

শিক্ষাদান-পদ্ধতির লজ্জাজনক নিচু মান, এবং বিশেষ করে প্রয়োগবিদ্যায় আমার নিজস্ব দক্ষতার অভাব আমাকে খেপিয়ে তুলেছিল একেবারে। ব্যর্থতাজনিত নিদারুণ বিরক্তি আর ক্রোধ নিয়ে শিক্ষাদান-বিজ্ঞানের ব্যাপারটা আমি তখন মনে-মনে তোলাপাড়া করে দেখছি। ভাবছি:

'আচ্ছা, কত হাজার বছর ধরে এই বিজ্ঞানটার অস্তিত্ব রয়েছে! কত সব মস্ত-মস্ত নাম, কত-না চমৎকার সব ধ্যানধারণা — পিস্তালোত্সি, রুশো, নাতোর্প, ব্লোন্স্কি! কত-না বড়-বড় কেতাব লেখা হয়েছে, খরচ হয়েছে দিস্তে-দিস্তে কাগজ, পণ্ডিতরা পেয়েছেন কতই-না খ্যাতি! অথচ তার ফল কী দাঁড়িয়েছে — না, শূন্য। কিছু না, কিছু না; একটা বাচ্চা গুণ্ডাকে কী করে মানুষ করতে হয় তা আমায় শেখানোর সাধ্য পর্যন্ত ওঁদের কারো নেই!

কোনো বাঁধাধরা পদ্ধতি নেই, উপায় জানা নেই, যুক্তিতর্ক, কিছুই নেই! কেউ কিচ্ছু না, খালি ফাঁকা হাততালি কুড়নোর গোঁসাই!'

অসাদ্‌চিকে নিয়েই বরং আমি মাথা ঘামাচ্ছিলুম সবচেয়ে কম। যে-পাওনা জীবনে আর আদায়ের আশা নেই লোকে তাকে যেভাবে খরচের খাতায় লিখে রাখে, যে-কোনো কাজ করতে গেলে যেভাবে আবশ্যিক ক্ষতির আর বাজে খরচের তালিকা তৈরি করে, ওকেও সেইভাবে আমি বাজে খরচের খাতায় ধরে রেখেছিলুম। ওর নাটকীয় প্রস্থানও আমাকে বিশেষ বিচলিত করে নি।

তাছাড়া, ও ফিরেও এসেছিল অল্প কয়েক দিনের মধ্যে।

কিন্তু, এরপর, দেখতে-না-দেখতে নতুন এক বিপর্যয় এসে পড়ল ঘাড়ে। ঘটনার কথা যখন আমার কানে এল তখন মাথার চুল খাড়া-হয়ে-ওঠা কাকে বলে তা আমি পুরোপুরি উপলব্ধি করলুম।

এক নিবাত নিস্পন্দ শীতের রাত্রে অসাদ্‌চিসহ গোর্কি কলোনির এক-দল ছেলে পিরগোভ্‌কার ছেলেদের সঙ্গে একটা ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ল। ঝগড়া ক্রমশ দাঁড়িয়ে গেল রীতিমতো লড়াইয়ে। লড়াইয়ে আমাদের পক্ষের অস্ত্র ছিল প্রধানত ইস্পাতের ফলা (ছোরা-ছুরি), আর অপরপক্ষের ছিল আগ্নেয়াস্ত্র — করাতে-কাটা বেঁটে রাইফেল। আমাদের দল লড়াইয়ে জিতেছিল। গাঁয়ের ছেলেরা রাস্তার মোড়ে ওদের সামরিক অবস্থান থেকে হটে গিয়ে লজ্জার-মাথা-খেয়ে পালিয়ে গ্রাম-সোভিয়েতের বাড়িটায় ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিলে। রাত তিনটে লাগাদ প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে গ্রাম-সোভিয়েতের পতন ঘটল, অর্থাৎ, বাড়িটার দরজা-জানলা ভেঙে আক্রমণকারীরা ভেতরে ঢুকে পড়ল। এরপর প্রচণ্ড পশ্চাদ্ধাবনের রূপ নিল লড়াই। গাঁয়ের ছেলেরা গ্রাম-সোভিয়েতের বাড়ির ভাঙা দরজা-জানলা দিয়ে পালিয়ে নিজের-নিজের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিল, আর গোর্কি কলোনির ছেলেরা বিজয়-গর্বে ফিরে এল কলোনিতে।

এ-ঘটনার সবচেয়ে জঘন্য দিক ছিল যেটা সেটা হল, গ্রাম-সোভিয়েতের গোটা বাড়ির ভেতরটা একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, পরদিন সেখানে কাজ করাই হয়ে পড়েছিল অসম্ভব। দরজা-জানলা ছাড়াও টেবল-বেঞ্চ সব ভেঙেচুরে অব্যবহার্য হয়ে পড়েছিল, কাগজপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে হয়ে গিয়েছিল একাকার, দোয়াতগুলোও ভেঙে চুরমার হয়ে ছিল।

পরদিন সকালে ডাকাতগুলো ঘুম থেকে উঠে একেবারে নিষ্পাপ শিশুর মতো যে-যার কাজে চলে গেল। অবশেষে দুপুরবেলা পিরগোভ্‌কা গ্রাম-সোভিয়েতের চেয়ারম্যান-সাহেব আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে আগের রাত্রের অমৃত-সমান কাহিনী শোনালেন।

অস্থিচর্মসার, চতুর বৃদ্ধ, সেই খুদে-চেহারার গাঁয়ের মানুষটির দিকে অপার বিস্ময়ে হাঁ-করে তাকিয়ে থাকলুম। আমি মোটে বুঝতেই পারছিলুম না, কেন উনি আমার সঙ্গে আলাপ করে চলেছেন, কেন মিলিত্‌শিয়া ডেকে আমাকে সুদ্ধ আমাদের ডাকাত-দলটাকে উনি গ্রেপ্তার করাচ্ছেন না?

কিন্তু চেয়ারম্যান-সাহেব যেভাবে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল ওঁর যত-না রাগ হয়েছে দুঃখ হয়েছে তার চেয়ে বেশি। মনে হচ্ছিল, ওঁর প্রধান আগ্রহটা হল এই যে কলোনি থেকে গ্রাম-সোভিয়েতের বাড়ির দরজা-জানলাগুলো মেরামত করে আর টেবিলগুলো সারিয়েসুরিয়ে দেয়া হোক। বক্তব্য উনি শেষ করলেন এই বলে যে ওঁকে, পিরগোভ্‌কার চেয়ারম্যানকে, কি কলোনি থেকে গোটা দুই কালির দোয়াত দেয়া যেতে পারে?

শুনে প্রথমটায় আমি তো থ! কর্তৃপক্ষের তরফে এইভাবে আস্কারা-দেয়ার মনোভাব দেখানো হচ্ছে কেন তার কারণ বুঝতে সম্পূর্ণ অপারগ হলুম। পরে ভাবলুম, আমারই মতো চেয়ারম্যান-সাহেবও বোধহয় ব্যাপারটার পুরো ভয়াবহতা ও তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম, আর এর কিছু-একটা প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন দেখানো দরকার এই মনে করে নিছক কথার কথা বলে চলেছেন।

নিজেকে দিয়েই ওঁর বিচার করছিলুম তখন — কারণ আমি নিজেও তখন অসংলগ্ন তুচ্ছ কথা দু-চারটে বলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছিলুম না:

'নিশ্চয়, নিশ্চয়... আমরা সবই মেরামত করে দেব... আর, কালির দোয়াত? এগুলো নিতে পারেন আপনি।'

দুটো কালির দোয়াত তুলে নিলেন চেয়ারম্যান-সাহেব। তারপর সাবধানে বাঁ-হাতে সেগুলোকে নিয়ে নিজের পেটের ওপর চেপে ধরলেন। দোয়াত দুটো ছিল নেহাতই সাদাসিধে-ধরনের।

আবার বললুম, 'আপনার চিন্তা নেই, আমরা সবকিছু মেরামত করে দেব। এখুনি একজন লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। কেবল একটা কাজের জন্যে

আমাদের একটু দেরি করতে হবে, তা হল জানলার শার্সি লাগানো — আগে শহর থেকে কাচ যোগাড় করে আনতে হবে আমাদের।'

চেয়ারম্যান আমার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকালেন।

'আচ্ছা, আচ্ছা, আসচে কাল করল্যেই চলবে — আগি কাচ যোগাড় হয়্যে যাক — তারপর একসাথে সবকিছু করো্য দিলিই হবে-নে...'

'উঁ... ঠিক আছে, তাহলে আসছে কালই হবে'খন।'

ভাবছিলুম, কিন্তু এই আশ্চর্য নিরীহ চেয়ারম্যান-সাহেবটি এখনও উঠছেন-না কেন?

জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি কি সোজা বাড়ি যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

ঘাড় ফিরিয়ে কী-যেন দেখে নিলেন চেয়ারম্যান-সাহেব, পকেট থেকে হলদেটে একখানা রুমাল বের করে ওঁর পরিষ্কার গোঁফজোড়া অনর্থক একবার মুছলেন, তারপর আমার কাছে ঘেঁষে এসে বললেন:

'ব্যাপারখানা হইছিল কী, বোঝলেন, আপনের ছেল্যারা নিয়্যে নিল আর কি... অরা সব বাচ্চা ছেল্যাপিলা, বোঝলেন-না... তা, আমার ছেল্যাডাও অখানে ছেল। হ্যাঁ, যা বলতেছিলাম, অরা সক্কলে একদম বাচ্চা ছেল্যাপিলা, মজা পায়্যেছিল আর-কি, বোঝলেন-না, তবে সাংঘাতিক কিছু নয় -- ঈশ্বর বাঁচায়্যেছেন আর-কি... তা, অর ইয়ার-দোস্তদের কাছে মাল ছেল, তা ও-ও একখান চায়েল্য আর-কি... যেমন বলতেছিলাম আর-কি... বোঝলেন-না, আমাদের আসলে... ও, তা, সক্কলের হাতেই ওইগুলা থাকত আর-কি...'

'কী বলতে চান খোলসা করে বলুন তো? মাপ করবেন, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'ওই করাতে-কাটা বেঁটে বন্দুক আর-কি!' হঠাৎ হড়বড় করে বলে ফেললেন চেয়ারম্যান-সাহেব।

'কী বেঁটে বন্দুক?'

'ও-ই বন্দুক।'

'তা, হলটা কী?'

'ঈশ্বর জানেন --- যা ঘট্যেছিল তাই তো বললাম! ছেল্যারা মিথ্যে-মিথ্যে ইদিক-উদিক ঘুরত্যেছিল... বোঝলেন-না, গতকালের কথা আর-কি। আর

আপনের ছেল্যারা আমার ছেল্যাডার আর অপর একজনির কাছ থ্যেকে দুইডা মাল কাড়্যে নিয়ি গেছে, নাকি অরা এমনে হারায়্যে ফেল্যেছে কেডা জানে — সক্কলেরই প্যাটে বেশ দু-এক ফোঁটা পড়্যেছিল, বোঝলেন-না... কোথা থ্যেকে-যে অরা মদ যোগাড় করে, কে জানে?'

'কার পেটে বেশ দু-এক ফোঁটা পড়েছিল?'

'ঈশ্বরের দোহাই! কার? কার? কার, তা জানা যাবে ক্যামনে? আমি তো অখানে ছেলাম না, তবে সক্কলে কতিছে যে আপনের ছেল্যারা মাতাল হইছিল...'

'আর আপনাদের?'

প্রশ্ন শুনে চেয়ারম্যান-সাহেব একটু ইতস্তত করলেন:

'আমি তো অখানে ছেলাম না... অবশ্য কাল রবিবার ছেল। তবে সেজন্যি আপনের কাছে আসি নাই। অদের বয়স কম, আপনের ছেল্যাদেরও। আমি দোষ দিত্যেছি না... এট্টা মারামারি হইছিল, কিন্তু কেউ মারা পড়ে নাই, এমন কি জখমও হয় নাই। নাকি, আপনের ছেল্যাদের কেউ-কেউ জখম হইছিল?' অল্প-একটু ঘাবড়ে গিয়ে কথা শেষ করলেন উনি।

'আমি এখনও ছেলেদের সঙ্গে এ-নিয়ে কথা বলি নি।'

'ঠিক বলতি পারি না — কে-যেন বলতেছিল, দু-বার না তিনবার গুলির আওয়াজ শোনা গেয়্যেল। হয়তো পলানোর সময়ে অরা গুলি ছুড়্যেছিল -- আপনের ছেল্যারা ভারি জবরদস্ত, বোঝলেন-না, আর আমাদের গেঁয়ো ছেল্যারা অত চট্‌পট গুলি চালাতি পারে না, বোঝলেন-না... হি-হি-হি!..'

চোখদুটো কুঁচকে বৃদ্ধ হাসলেন। সে-চোখে স্নেহ আর বন্ধুত্বের ভাব যেন উথলে পড়ছিল... এই ধরনের বৃদ্ধদেরই সর্বত্র সকলে 'বাবা ঠাকুর' বলে ডাকে। ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে আমিও না-হেসে পারলুম না। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে সবকিছু কেমন গুলিয়ে যেতে লাগল।

বললুম, 'তাহলে, আপনার মতে, তেমন বিশেষ কিছু ঘটে নি — ওরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করেছে, আবার সময়ে সব মিটিয়ে নেবে'খন, এই তো?'

'ঠিক, ঠিক, ঠিক বল্যেছেন — অদের মিটায়্যে নিতিই হবে। আমাদের

বাচ্চা বয়সে মেয়্যাছেলে নিয়ি আমরা রীতিমতো লড়াই করতাম। আমার ভাই ইয়াকভরে তো অন্য ছেল্যারা পিটায়্যে মাইর‍্যেই ফেললে। আপনে শুধু ছেল্যাদেরে ডাক্যে ভালো কর‍্যে দাবড়ানি দিয়ি দ্যান, যাতে অরা আর কখনও এমনডা না-করে।'

বাইরে, গাড়িবারান্দার নিচে, বেরিয়ে এসে বললুম:

'গত রাত্রে যারা পিরগোভ্কায় গিয়েছিল সেই সব ছেলেকে এখানে ডেকে আন।'

'তারা আবার কোথায়?' বিশেষ জরুরি কাজে সেই সময়ে উঠোন পার হতে-হতে একটি চট্পটে বাচ্চা ছেলে আমায় শুধোল।

'গত রাত্রে কারা পিরগোভ্কায় গিয়েছিল তুমি কি তা জান না?'

'আপনে তো বড় চালাক লোক দেখি!.. আমি বরং বুরুনরে আপনের কাছে আসতি কচ্ছি।'

'ঠিক আছে — বুরুনকেই ডাক।'

যথাসময়ে বুরুন এসে হাজির হল গাড়িবারান্দার নিচে।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'অসাদ্চি কি কলোনিতে হাজির আছে?'

'হ্যাঁ। ও ছুতোরশালে কাজ করত্যেছে।'

'ওকে বল গিয়ে — আমাদের ছেলেরা গতকাল পিরগোভ্কায় গিয়ে মাতলামি করেছে, আর ব্যাপারটা খুবই গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'হ্যাঁ, ছেল্যারা এ-নিয়ে কথা বলত্যেছিল বটে।'

'ঠিক আছে, তুমি তাহলে গিয়ে অসাদ্চিকে বল যে ওরা সকলে যেন আমার কাছে আসে — চেয়ারম্যান-সাহেব আমার ঘরেই বসে আছেন। আর বল, বোকার মতো কেউ যেন এ-ব্যাপারে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা না-করে, তাহলে ফলাফল কিন্তু খুবই খারাপ দাঁড়াবে।'

পিরগোভ্কার 'বীরবৃন্দ'-এ আমার অফিস-ঘর একে-একে ভরে উঠতে লাগল — এল অসাদ্চি, প্রিখোদ্কো, চোবত, অপ্রিশ্কো, গালাতেঙ্কো, গোলস, সরোকা, এবং এখন নাম মনে নেই এমন আরও কয়েকজন। অসাদ্চিকে বেশ সহজ, স্বচ্ছন্দ মনে হতে লাগল, এমন ভাব করতে লাগল যেন এর আগে আমাদের মধ্যে আর কোনো গোলমাল হয় নি। আমারও বাইরের লোকের সামনে আর পুরনো ঘা খুঁচিয়ে তোলার ইচ্ছে ছিল না।

বললুম, 'গতকাল তোমরা পিরগোভ্‌কায় গিয়েছিলে, মাতাল হয়েছিলে আর হৈ-হল্লা আর মারামারি করেছিলে। লোকে তোমাদের থামাতে চেষ্টা করেছিল, তাতে তোমরা উলটে গাঁয়ের ছেলেদের মেরেছ আর গ্রাম-সোভিয়েতের বাড়ি ভেঙে তছনছ করেছ। কেমন, তাই তো?'

'আপনে যা বললেন ব্যাপারডা কিন্তু ঠিক তেমন হয় নাই,' নিজে থেকেই অসাদ্‌চি এবার ঘটনাটা বর্ণনা করল। 'ছোঁড়ারা-যে পিরগোভ্‌কায় গেয়্যেল সেডা ঠিক, আর আমি তো তিন দিন ধর‍্যে ওখানেই ছেলাম, আপনে জানেন, আমি... কিন্তু আমরা মাতাল হই নাই, ও-কথাডা ঠিক না। ওয়াদের পানাস আর আমাদের সরোকা অবশ্য সকাল থ্যেকেই মদ গেলত্যেছিল, আর সরোকা এট্টু মাতালও হইছিল... অল্প এট্টুখানি, বোঝলেন। গোলসরেও ওর ইয়ার-দোস্তরা এট্টু খাওয়ায়েছিল, তবে বাকি সক্কলে আমরা একদম কাটখোট্টা শুকনা ছেলাম। আর আমরা কারো সাতে-পাঁচে ছেলাম না, কারো সাথে কোনো ঝামেলাও করি নাই, অন্যদের মতন আমরাও খালি রাস্তায় পায়চারি করত্যেছিলাম। তা, হঠাৎ বলা-নাই-কওয়া-নাই এক ছোঁড়া — ওডার নাম, খার্‌চেঙ্কো — আমার কাছি এস্যে চিৎকার কর‍্যে কয় কি: 'হাত উঠাও!' আর বল্যেই অর বন্দুক আমার দিকি তাক করল। শুন্যে অর থুতনিতে আমি একখান ঘুসো ঝাড়লাম, এডা ঠিক। আর এতেই গন্ডগোল গেল শুরু হয়্যে... মেয়্যারা আমাদের সাথে ঘুরতি চেয়্যেল বল্যে অরা অবশ্য আমাদের উপর চট্যেছিল...'

' 'গন্ডগোল শুরু হয়ে গেল' মানে? কী হয়েছিল?'

'এমন কিছু না। এট্টু মারপিট হল্য আর-কি। অরা যদি গুলি না ছুড়ত, তাইলে কিছুই হোত না। কিন্তু পানাস গুলি চালাল্য, অরে দেখ্যে খার্‌চেঙ্কোও গুলি ছুড়ল, আর তাই আমরা অদের তাড়া করলাম। অদের মারতি চাই নাই আমরা -- কেবল বন্দুক কাড়্যে নিতি চেয়্যেলাম — তা, অরা বাড়ির দরজা বন্ধ কর‍্যে বস্যে রইল। ইদিকে প্রিখোদ্‌কো — অরে তো আপনে জানেনই! — ও উঠ্যে...'

'ঠিক আছে, আর দরকার নেই! তা, বন্দুকগুলো কোথায়? কতগুলো বন্দুক পেয়েছিলে তোমরা?'

'দুইডা!'

অসাদ্‌চি সরোকার দিকে তাকাল:

'ও-দুডা এখানে নিয়ি আয়।'

বন্দুক দুটো এল। ছেলেদের কারখানা-ঘরে ফেরত পাঠিয়ে দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক দুটোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন চেয়ারম্যান-সাহেব:

'তাইলে, এ-দুডারে আমি নিতি পারি?'

'মোটেই না! আপনার ছেলের বন্দুক নিয়ে বেড়ানোর কোনো অধিকার নেই। খারচেঙ্কোরও সে-অধিকার নেই। এবং আমারও কোনো অধিকার নেই ও-দুটো আপনাকে ফেরত দেয়ার।'

'ওয়া নিয়ি আমিই-বা কী করব? ও আপনেরে দিতি লাগবে না, ওগুলা এখানেই থাকুক-না ক্যানে। হয়তো বনে-জঙ্গলে চোর খেদানোর জন্যি কাজি লাগ্যে যাবে-নে... আমি শুধু আপনেরে বলতি চেয়েলাম যে ব্যাপারডা নিয়ি আপনে যেন বেশি হৈ-হল্লা না-করেন... ছেল্যাপিলারা চেরকাল ছেল্যাপিলাই থাকব্যে, বোঝলেন-না।'

'মানে... আপনি বলতে চান, আমি যেন ব্যাপারটা রিপোর্ট না-করি, এই তো?'

'আরে, ঠিক তাই, বোঝলেন-না...'

হাসলুম:

'রিপোর্ট কেন করতে যাব? আমরা তো প্রতিবেশী, তাই না?'

'ঠিক তাই!' খুশি হয়ে বৃদ্ধ বলে উঠলেন। 'আমরা পড়শি... এমনধারা কাণ্ডমাণ্ড হত্যেই পারে! আর পেত্যেক খুঁটিনাটি কথা যদি কর্তৃপক্ষরে রিপোর্ট করতি হয়, তাইলে...'

চেয়ারম্যান চলে গেলেন। আমিও নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

এই ব্যাপারটাকে শিক্ষাদানের উপলক্ষ হিসেবে আরও একবার ব্যবহার করা উচিত ছিল আমার। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার সন্তোষজনক পরিসমাপ্তিতে ছেলেরা আর আমি উভয়পক্ষই এত স্বস্তিবোধ করলুম যে অন্তত সেবার শিক্ষাদান থেকে বিরত থাকলুম। কাউকে শাস্তি দিলুম না, কেবল ওদের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলুম যে এরপর আমার বিনা অনুমতিতে ওরা কেউ আর পিরগোভ্‌কায় যাবে না এবং ওই গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের ছেলেরা বন্ধু-সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে।

## ১৫

## ‘আমাদের বাচ্চাডা তো রীতিমতো সোন্দর!’

১৯২২ সালের শীতকাল লাগাদ আমাদের রক্ষণাধীন মেয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ছয়ে। ওলিয়া ভোরনভা তার বৈশিষ্ট্যহীন সাদাসিধে চেহারা থেকে রীতিমতো সুন্দরী তরুণী হয়ে বেড়ে উঠল। ছেলেরাও অমনি ওর দিকে নজর দিতে শুরু করল, কিন্তু ওলিয়া সকলের সঙ্গে একই রকম ভালো ব্যবহার বজায় রেখেও সবার থেকে একটু দূরে-দূরে থাকতে লাগল। ছেলেদের মধ্যে ওর একমাত্র বন্ধু ছিল বুরুন। বুরুনের হার্‌কিউলিস-সদৃশ চেহারার আড়ালে সুরক্ষিত থাকায় ওলিয়া কলোনির আর কাউকেই ভয় পেত না, এমন কি কলোনির সবচেয়ে বলশালী, সবচেয়ে বোকা আর সবচেয়ে নিস্তেজ ছেলে প্রিখোদ্‌কোর অন্ধ অনুরক্তিকে পর্যন্ত উপেক্ষা করার সাহস রাখত। বুরুন মেয়েটার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিল না; ওর এবং ওলিয়ার মধ্যে একটা সুস্থ, তারুণ্যে-ভরা সখ্য গড়ে উঠেছিল মাত্র। আর এর ফলে কলোনিতে ওদের দু-জনের মর্যাদা বেড়ে গিয়েছিল খুবই। সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও ওলিয়া নিজেকে কখনও কোনোভাবে জাহির করত না। মেয়েটা জমিকে ভালোবাসত — খেতের কাজ যতই কঠিন হোক-না-কেন তা ওকে টানত সঙ্গীতের মতোই। নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ও প্রায়ই বলত:

‘যখন আমি বড় হব, তখন এক মুজিকরে নিশ্চয় বিয়া করব।’

মেয়েদের মধ্যে নাস্তিয়া নচেভ্‌নায়া ছিল সর্দার-স্থানীয়া। এই মেয়েটি যখন কলোনিতে আসে তখন ওর সঙ্গে আসে বড় এক-বাণ্ডিল কাগজও। সেই সব কাগজে হেন জিনিস ছিল না যা ওর সম্পর্কে লেখা ছিল না — যেমন, ও আগে নাকি চোর ছিল, চোরাই মাল গচ্ছিত রাখত, চোরেদের একটা আড্ডা চালাত, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমরা অবশ্য নাস্তিয়াকে বিস্ময়কর একটা-কিছু হিসেবে গণ্য করতুম, কেননা মেয়েটা ছিল অসামান্য আকর্ষণী-শক্তি ও সততার অধিকারী। সবেমাত্র পনেরোয় পা দেয়া সত্ত্বেও মর্যাদাপূর্ণ ভারিক্কি চাল, ফরশা রঙ, মাথা উঁচু করে সগর্বে চলাফেরা আর চারিত্র্যে দৃঢ়তার জন্যে ও সকলের নজর কাড়ত। দরকার পড়লে অন্য মেয়েদের কী

করে ধমক দিতে হয় — রুক্ষতা না-দেখিয়ে এবং চিল-চিৎকার না-করেও — তা ও জানত, আর জানত একবারমাত্র তাকিয়ে আর সংক্ষেপে লাগসই ভর্ৎসনা করে যে-কোনো ছেলেকে দমিয়ে দিতে:

'রুটিখান গুঁড়া-গুঁড়া করত্যেছ আর তারপর যে ফেল্যে দিত্যেছ বড়, এয়ার মানে কী? খুব পয়সা হয়্যেছে তোমার, না? নাকি শুয়ারের কাছ থ্যেকে শিখত্যেছ? এক্ষুনি উঠায়্যে লও রুটিখান!..'

ওর গলা ছিল গভীর, গমগমে, কণ্ঠস্বরে ঘটত সংহত শক্তির চাপা অভিব্যক্তি।

নাস্তিয়া সখিত্ব পাতিয়েছিল আমাদের শিক্ষিকাদের সঙ্গে, পড়াশুনোও করে যাচ্ছিল প্রচুর পরিমাণে, আর অবিচলিতভাবে এগিয়ে চলেছিল ওর স্বনির্দিষ্ট লক্ষ্য 'রাব্‌ফাক'-এ ঢোকার অভিমুখে। তবু কি নাস্তিয়া, কি ওর সম-আদর্শের অংশভাক অন্য কিছু-কিছু ছেলে --- যেমন, কারাবানভ, ভের্‌শ্‌নেভ, জাদোরভ, ভেত্‌কোভ্‌স্কি — এদের সকলের কাছেই তখনও পর্যন্ত 'রাব্‌ফাক' ছিল দূর-অস্ত্। সদ্য-উদ্ভিন্নপক্ষ আমাদের এই পাখিরা ছিল তখনও পর্যন্ত অত্যন্ত পশ্চাৎপদ, পাটিগণিত আর 'পলিত্‌গ্রামতা'*-র জটিলতা আয়ত্ত করতে তখনও ওদের অত্যন্ত বেগ পেতে হচ্ছিল। এদের মধ্যে ছাত্রী হিসেবে সবচেয়ে অগ্রসর ছিল রাইসা সকলোভা। ১৯২১ সালের হেমন্তেই তাকে আমরা কিয়েভের 'রাব্‌ফাক'-এ পাঠিয়ে দিয়েছিলুম।

মনে-মনে আমরা অবশ্য জানতুম যে এটা একটা ব্যর্থ প্রয়াস, তবু এ-কাজ আমাদের করতে হয়েছিল। কারণ আমাদের শিক্ষিকারা 'রাব্‌ফাক'-এর ভবিষ্যৎ একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে কলোনিতে গড়ে-পিটে দেয়ার জন্যে বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ছিল, কিন্তু এমন একটা পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বিশেষ করে রাইসা তেমন উপযোগী উপাদান ছিল না। প্রায় পুরো গ্রীষ্মকালটা ধরে মেয়েটা 'রাব্‌ফাক'-এর প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে তৈরি হল বটে, তবে সে-সময়েও জোর জবরদস্তি করে ওকে বই নিয়ে বসাতে হোত, কেননা নিজে থেকে কোনো ধরনের শিক্ষা আয়ত্ত করার বিন্দুমাত্র বাসনা রাইসার ছিল না।

* পলিত্‌গ্রামতা — প্রাথমিক রাজনীতি-সংক্রান্ত পাঠ। — অনুঃ

জাদোরভ, ভের্শ্নেভ, কারাবানভ — এদের সকলেরই পড়াশুনো করার দিকে বেশ-একটা আগ্রহ ছিল। কিন্তু রাইসা রীতিমতো ছাত্রীর পদে উন্নীত হতে যাচ্ছে দেখে ওরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। দিনরাত্রি একনাগাড়ে পড়াশুনো করা, এমন কি কামারশালে হাপর-ঠেলার কাজ করতে-করতেও বই পড়ার জন্যে এই ছেলেদের মধ্যে ভের্শ্নেভ ছিল প্রসিদ্ধ। তদুপরি, ও ছিল আবার ন্যায়পরায়ণতার ভক্ত এবং সত্যের সন্ধানী। রাইসার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা উঠলে ও তাই রাগ না-দেখিয়ে পারত না।

তুত্লে-তুত্লে বলত, 'বো-বো-বোঝতি পারত্যেছেন-না, যে-যে-ভাবেই হোক রাইসা শে-শেষপর্যন্ত জে-জেলে যাবেই?'

কারাবানভ অবশ্য আরও সুনির্দিষ্টভাবে এ-ব্যাপারে নিজের মনোভাব প্রকাশ করত। বলত:

'আমি কখনও ভাবতি পারি নাই যে আপনেরা এমনধারা বোকামি করবেন!'

এমন কি জাদোরভও, রাইসার উপস্থিতি সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র দৃক্পাত না-করে, তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে আর অবজ্ঞার ভঙ্গি করে বলত:

'অ্যাঃ, কী আমার 'রাব্‌ফাকে'র ছাত্রী রে! এর চেয়ে আপনারা বরং কুঁজো লোককে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে সোজা বানাবার চেষ্টা করলে পারতেন।'

আর এই সবরকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জবাব দিত রাইসা তার নিরুত্তাপ বোকা-বোকা হাসি দিয়ে। 'রাব্‌ফাক'-এ ঢোকার ওর যে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল তা নয়, কিন্তু এই বন্দোবস্তে ও সন্তুষ্টই হয়েছিল, কেননা এতে কিয়েভে যাওয়ার সুযোগ মিলবে ভেবে ও খুশি ছিল।

আমিও অবশ্য ছেলেদের সঙ্গে একমত ছিলুম। আমার মনে হচ্ছিল, সত্যি, রাইসা আবার কেমন ছাত্রী হবে? এমন কি, যে-সময়ের কথা বলছি তখনও, 'রাব্‌ফাক'-এর জন্যে পড়া তৈরি করার সময়েও ও শহর থেকে রহস্যময় নানা চিঠিপত্র পেত, এবং থেকে-থেকেই লুকিয়ে কলোনি ছেড়ে বাইরে রোঁদে বেরুত। একই রকম লুকিয়ে কর্নেয়েভ নামে একটা ছেলে ওর কাছে কলোনিতে আসত। এই কর্নেয়েভ ছেলেটা একসময়ে কলোনির বাসিন্দা হিসেবে তিন সপ্তাহখানেক ওখানে ছিল। আর ওই সময়ে ও স্বেচ্ছায়, নিয়মিতভাবে আমাদের জিনিসপত্র চুরি করে গিয়েছিল। তারপর

শহরে একটা ডাকাতির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ায় এক অপরাধ-তদন্ত দপ্তর থেকে আরেক দপ্তরে ওকে নিয়ে টানাহেঁচড়া চলে। ছেলেটা ছিল পুরোপুরি নষ্টচরিত্রের এক ঘৃণ্য জীব, এবং সেই স্বল্প-সংখ্যক লোকের একজন যাকে প্রথম দর্শনেই আমি সংশোধনের অযোগ্য বলে চিনতে পেরেছিলুম।

'রাব্‌ফাক'-এর প্রবেশিকা পরীক্ষায় রাইসা উত্তীর্ণ হল। কিন্তু এই উৎসাহজনক খবরটা পাবার এক সপ্তাহ পরে আমরা কোনো-একটা সূত্র থেকে জানতে পারলুম যে কর্‌নেয়েভও কিয়েভমুখো যাত্রা করেছে।

খবরটা শুনে জাদোরভ মন্তব্য করল, 'হুঁ, এইবার ও সত্যিই কিছু শিখবে বটে!'

দেখতে-দেখতে শীত চলে গেল। রাইসা মাঝে-মাঝে আমাদের চিঠি লিখত বটে, কিন্তু তা থেকে বিশেষ কিছুই ধরা-ছোঁয়া যেত না। ওর চিঠি পড়ে কখনও মনে হোত সবকিছু বুঝি চমৎকারভাবে চলছে, আবার কখনও মনে হোত পড়াশুনোটা ওর কাছে বিষম কঠিন লাগছে। এছাড়া, সরকারি বৃত্তি পাওয়া সত্ত্বেও সব সময়ে ওর টাকার দরকার পড়ত। প্রতিমাসে আমরা ওর নামে বিশ থেকে তিরিশ রুব্‌ল পাঠাতুম। জাদোরভ বলত, ওই টাকায় কর্‌নেয়েভ নাকি রাজার হালে দিন কাটাচ্ছে। সম্ভবত কথাটা খুব মিথ্যেও ছিল না। এই কিয়েভ-পরিকল্পনার উদ্যোক্তা আমাদের মহিলা শিক্ষিকাদের এজন্যে প্রায়ই নির্মম ভর্ৎসনার সম্মুখীন হতে হোত:

'যে-কেউ বুঝতি পারত এয়াতে কোনো ফায়দা নাই — কেবল আপনেরাই বুঝতি পারেন নাই। আচ্ছা, এডা কী কর্‍্যে হল যে আমরা বুঝতি পারল্যাম, আর আপনেরা পারল্যেন না?'

জানুয়ারি মাসে অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ একদিন পোঁটলাপুঁটলি-সমেত রাইসা কলোনিতে এসে হাজির। বলল, ছুটি-উপলক্ষে ওকে নাকি বাড়ি আসতে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ-কথার সমর্থনে ওর কাছে কোনো কাগজপত্র ছিল না, তাছাড়া ওর আচরণ থেকেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে কিয়েভে ফিরে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওর। এদিকে আমার খোঁজখবরের জবাবে কিয়েভের 'রাব্‌ফাক' জানাল যে রাইসা সকলোভা ইন্‌স্টিট্যুটে ক্লাস করা আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল আর তারপর ছাত্রীদের হস্টেল ছেড়ে কোনো এক অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশে চলে গেছে।

অতএব, সবকিছু জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। ছেলেদের প্রতি

ন্যায়বিচার করতে হলে বলতে হয়, ব্যর্থতার জন্যে রাইসাকে তারা জ্বালাতন করা কিংবা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এ-সব কিছুই করে নি। বরং মনে হল, হঠকারিতার এই পুরো ঘটনাটাকে তারা মনে আর স্থান দিচ্ছে না। রাইসা কলোনিতে ফিরে আসার পর প্রথম দিনকয়েক অবশ্য তারা একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নাকে নিয়ে বেশ কিছু হাসিঠাট্টা করেছিল। তবে হাসি-তামাশার প্রয়োজন ছিল না, কারণ একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না তখন এমনিতেই মরমে মরে ছিলেন। মোটের ওপর, মনে হচ্ছিল ওরা ভাবছে যা ঘটেছে তা মোটেই অসাধারণ ঘটনা নয়, বরং কী ঘটতে চলেছে তা যেন ওরা আগাগোড়াই আঁচ করতে পেরেছিল।

মার্চ মাসে নাতালিয়া মার্‌কভ্‌না ওসিপভা আমাকে তাঁর এই সন্দেহের কথা জানিয়ে বিচলিত করে তুললেন যে রাইসার গর্ভবতী হওয়ার কিছু-কিছু লক্ষণ নাকি প্রকাশ পেয়েছে।

শুনে তো রক্ত হিম হয়ে যাবার যোগাড়। কিশোর-কিশোরীদের কলোনির একটি মেয়ে গর্ভবতী বলে ধরা পড়েছে! এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার! আমি ভালোই জানতুম যে আমাদের কলোনির কাছেপিঠে —শহরে এবং জনশিক্ষা-দপ্তরে — এমন বেশ কিছু শালীনতার ভানে-ভরা ধর্মিষ্ঠি মানুষ আছে যারা সব সময়েই কিশোর-কিশোরীদের কলোনিতে ভ্রষ্ট যৌনাচার নিয়ে সোরগোল বাধানোর জন্যে ওত্‌ পেতে আছে! তারা বলে, কী কাণ্ড, ছেলেরা কিনা মেয়েদের সঙ্গে বাস করছে! কলোনির আবহাওয়া এবং আমার অন্যতম রক্ষণাধীন মেয়ে হিসেবে রাইসার অবস্থা, এই দুটো ব্যাপার নিয়েই আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলুম। নাতালিয়া মার্‌কভ্‌নাকে বললুম, ব্যাপারটা নিয়ে রাইসার সঙ্গে একটু 'মনখোলা আলোচনা' করার জন্যে।

রাইসা কিন্তু সরাসরি অস্বীকার করল যে সে গর্ভবতী, এমন কি এ-কথা বলার জন্যে মেজাজ দেখাল পর্যন্ত:

'মোটেই না! এমন জঘন্য নোংরা কথা ভাবতি পারল্যেন কী করে্য? শিক্ষিকারাই-বা কবে থ্যেকে গুজব ছড়াতি শুরু করে্যছেন?'

বেচারা নাতালিয়া মার্‌কভ্‌না সত্যিসত্যি মনে করলেন যে তিনি অন্যায় করেছেন। রাইসা এমনিতেই খুব মোটা ছিল, পেটে অস্বাস্থ্যকর চর্বি জমার দোহাই দিয়ে তার গর্ভসঞ্চারের ব্যাপারটাকে তাই চাপা দেয়া সম্ভব হল। এবং যেহেতু তখনও পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট বাহ্য গর্ভলক্ষণ প্রকাশ

পায় নি, তাই ব্যাপারটাকে আরও ভালো করে ধামাচাপা দিতে পারল রাইসা। আমরাও রাইসাকে বিশ্বাস করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলুম।

কিন্তু এর এক সপ্তাহ পরে একদিন সন্ধেবেলা কিছু ব্যক্তিগত কথা বলার অছিলায় জাদোরভ আমাকে উঠোনে ডেকে নিল। বলল:

'আপনি কি জানেন যে রাইসার পেটে বাচ্চা এসেছে?'

'তুমি এ-কথা কী করে জানলে?'

'আপনি তো ভারি মজার লোক দেখছি! বলতে চান, নিজে আপনি এটা দেখতে পাচ্ছেন না? এ তো সকলেই জানে, আমার ধারণা আপনিও জানেন।'

'আচ্ছা বেশ, ধর, ও না-হয় গর্ভবতীই হয়েছে। তাতে হলটা কী?'

'কিছুই না... কিন্তু ও ভান করছে কেন যে কিছুই হয় নি? পেটে যখন ওর বাচ্চাই এসেছে তখন যেন কিছুই হয় নি এমন ভাব করে ও ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? দেখুন-না, এই তো কর্নেয়েভের চিঠি আমার হাতে। দেখেছেন... ও লিখছে -- 'আমার প্রিয়তমা পত্নী'? আমরা অনেক আগেই এটা জানতাম।'

শিক্ষক-শিক্ষিকারাও ক্রমশ বেশি-বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করতে লাগলেন। আর, সমস্ত ব্যাপারটায় আমি হয়ে উঠতে লাগলুম বিরক্ত।

'এত হৈ-চৈ কী নিয়ে? মেয়েটা যদি গর্ভবতী হয়েই থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই সে বাচ্চা প্রসব করবে। গর্ভলক্ষণ লুকনো যায়, কিন্তু বাচ্চা প্রসব করা লুকোবে কী করে? এটা এমন একটা-কিছু বিপর্যয়কর ঘটনা ঘটে নি -- কেবল একটা শিশুর জন্ম হবে, এই তো!'

রাইসাকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম:

'রাইসা, আমার কাছে সত্যি কথা বল, তুমি গর্ভবতী হয়েছ?'

'কেন-যে সবাই মিলিয়া আমারে জ্বালাতন করত্যোছেন? ছি-ছি, কী লজ্জা -- গায়ে এঁটুলির মতন সেঁট্যে আছে সবাই! গভ্ভবতী! গভ্ভবতী! বারবার শেষবার এই আপনেরে কচ্ছি, আমার প্যাটে বাচ্চা আসে নাই!'

বলে হু-হু করে কেঁদে ফেলল রাইসা।

বললুম, 'শোন, রাইসা, যদি গর্ভবতী হয়েই থাক তবে তা লুকোবার দরকার নেই। আমরা তোমায় উপযুক্ত কাজ খুঁজে পেতে সাহায্য করব চাই কি এখানেই, এই কলোনিতেই। তাছাড়া টাকা দিয়েও সাহায্য করব

আমরা। বাচ্চার জন্যে সবকিছু আগে থেকে তৈরি করে রাখতে হবে তো, ধর, বাচ্চার জামাকাপড় বানাতে হবে, আরও অনেক কিছু...'

'কিছু হয় নাই আমার! আমি কোনো কাজ চাই না — আমারে ছাড়ান দ্যান তো দেখি!'

'ঠিক আছে — তুমি যেতে পার।'

অতএব, কলোনিতে আমরা কেউই নিশ্চিত করে কিছু জানতে পারলুম না। মেয়েটাকে অবশ্য পরীক্ষার জন্যে ডাক্তারের কাছে পাঠানো যেতে পারত, কিন্তু এ-ব্যাপারে কলোনির পরিচালক কর্মীদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা দিল। একদিকে কেউ-কেউ বললেন অবিলম্বে সমস্ত ব্যাপারটার ফয়সলা করে ফেলা হোক, অপরদিকে অন্যেরা আমার কথায় একমত হলেন যে এ-ধরনের ডাক্তারি পরীক্ষা এ-রকম অল্পবয়সী মেয়ের পক্ষে রীতিমতো অপ্রীতিকর ও আপত্তিকর মনে হতে পারে, আর তাছাড়া শেষপর্যন্ত এর কোনো দরকারও পড়ছে না, কেননা একদিন-না-একদিন আসল সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বেই যখন তখন অযথা তাড়াহুড়ো করে লাভ কী। আমরা বললুম, রাইসা যদি গর্ভবতী হয়েই থাকে, তাহলেও ওর গর্ভসঞ্চারের সময় পাঁচ মাসের চেয়ে খুব বেশি হবে না। অতএব, ও একটু থিতিয়ে যাক এবং ব্যাপারটায় একটু অভ্যস্তও হয়ে উঠুক, ইতিমধ্যে ওর পক্ষে গর্ভ লুকনোও কঠিন হয়ে উঠবে।

অগত্যা, রাইসাকে নিজ মনে থাকতে দেয়া হল।

এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখ শহরের থিয়েটর-হলে শিক্ষকদের মস্ত বড় একটা কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। অধিবেশনের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলা-বিষয়ে আমি বক্তৃতা দিলুম। বক্তৃতা প্রথম অধিবেশনেই শেষ হল বটে, কিন্তু আমার কিছু-কিছু বক্তব্য নিয়ে এমন তীব্র বিতর্কের ঝড় উঠল যে বক্তৃতা-সম্পর্কিত আলোচনা পরের দিনের অধিবেশনের জন্যে স্থগিত রাখতে হল। আমাদের শিক্ষক-কর্মীদের মধ্যে প্রায় সকলে এবং বয়স্ক ছাত্রদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। আমাদের সকলকেই সেদিন রাতটা শহরে কাটাতে হল।

যে-সময়ের কথা বলছি তার মধ্যে আমাদের কলোনি সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল এতটা ব্যাপক হয়ে উঠেছিল যে তা আমাদের জেলার সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাই পরের দিন দেখা গেল, থিয়েটর-হল লোকে-

লোকারণ্য হয়ে গেছে। বিতর্কে যে-সমস্ত প্রশ্ন উঠেছিল, তার মধ্যে একটা ছিল ছেলেমেয়েদের সহশিক্ষা-সম্পর্কিত। ওই সময়ে কিশোর-অপরাধীদের জন্যে নির্দিষ্ট কলোনিগুলোতে ছেলেমেয়েদের সহশিক্ষা-দানের ব্যাপারটা আইনত নিষিদ্ধ ছিল, সারা দেশে আমাদের কলোনিই ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম যেখানে ওই ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে দেয়া হয়েছিল।

বিতর্কে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার সময়ে রাইসার চিন্তাটা একবার আমার মনের মধ্যে চমকে উঠল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হল যে রাইসা গর্ভবতী কিনা তার সঙ্গে সহশিক্ষা-সম্পর্কিত সমস্যার কোনো সম্পর্ক নেই। সভায় সমবেত সুধীবৃন্দকে আমি এই বলে আশ্বস্ত করলুম যে আলোচ্য ব্যাপারে আমাদের কলোনিতে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে।

বিরতির সময়ে কে-যেন আমাকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গেল। সেখানে যেতেই একেবারে ব্রাত্চেঙ্কোর মুখোমুখি পড়ে গেলুম। হাঁপাতে-হাঁপাতে ও জানাল যে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে ও শহরে এসেছে। শুনলুম, ব্যাপারটা-যে কী ঘটেছে তা অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে পর্যন্ত ও বলতে চায় নি।

ব্রাত্চেঙ্কো জানাল, 'কলোনিতে ঝামেলা হয়েছে, আন্তন সেমিওনভিচ। মেয়েদের এজমালি শোবার ঘরে এট্টা মরা বাচ্চা পাওয়া গেছে।'

'মরা বাচ্চা!'

'হ্যাঁ। একদম মরা। রাইসার পোঁটলার মধ্যে। লেন্কা ঘরের মেঝে ধুচ্ছিল। তা, যেই সে পোঁটলাটা খুলে দেখতে গেছে — বোধহয় কিছু হাতানোর মতলব ছিল আর-কি — আর দেখে কী, পোঁটলার মধ্যে এট্টা মরা বাচ্চা।'

'কী বলছ তুমি?'

আমাদের তখনকার মনোভাব অবর্ণনীয়। জীবনে এমন আতঙ্ক, এমন অবিমিশ্র ঘৃণা এর আগে আর কখনও অনুভব করি নি। আমাদের শিক্ষিকারা ফ্যাকাশে মেরে গিয়ে, চোখের জল ফেলতে-ফেলতে কোনোরকমে থিয়েটর-হল থেকে বেরিয়ে এসে দ্রোশ্কি চেপে কলোনির দিকে রওনা হয়ে গেলেন। তবে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হল না। আমার বক্তৃতার ফলে যে-সব আক্রমণের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল তা ঠেকানোর জন্যে আমাকে থেকে যেতে হল।

আন্তনকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'বাচ্চাটা এখন কোথায়?'

'ইভান ইভানভিচ ওটারে এজমালি শোবার ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছেন। এজমালি ঘরেই আছে ওটা।'

'আর রাইসা?'

'রাইসা অফিস-ঘরে বসে আছে, ছোঁড়ারা ওরে পাহারা দিচ্ছে।'

মরা বাচ্চা পাওয়া সম্বন্ধে একটা এজাহার লিখে আন্তনকে পাঠিয়ে দিলুম মিলিত্‌শিয়ার কাছে। আর শৃঙ্খলা-সম্পর্কিত অসমাপ্ত আলোচনার জের টানার জন্যে আমি রয়ে গেলুম।

অবশেষে সন্ধেবেলায় আমার পক্ষে কলোনিতে ফেরা সম্ভব হল। আমার অফিস-ঘরে কাঠের বেঞ্চিটায় বসে ছিল রাইসা, উস্কোখুস্কো চেহারা নিয়ে। ধোপাখানায় কাজ করার সময়ে যে-এপ্রনখানা গায়ে চড়িয়েছিল তখনও সেটা পরে ছিল ও। যখন ঘরে ঢুকলুম ও আমার দিকে তাকাল না, কেবল মাথাটা আরও একটু হেঁট হয়ে গেল। ওর পাশে আরেকটা বেঞ্চিতে বসে ছিল ভের্‌শ্‌নেভ, বইয়ের স্তূপের মধ্যে ডুবে — মনে হল, ও কোনো-একটা প্রাসঙ্গিক উল্লেখ খুঁজছে, কারণ কারো দিকে দৃক্‌পাত না-করে বইয়ের-পর-বইয়ের পাতা উলটে যাচ্ছিল ও।

এজমালি ঘরের দরজার তালা খোলার নির্দেশ দিলুম। বললুম, মরা-বাচ্চাসহ পোঁটলাটা কাপড়কাচার ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখতে। তারপর অনেক রাত্রে, যখন সকলে শুতে চলে গেছে তখন রাইসাকে শুধোলুম:

'এমন কাজ করলে কেন?'

রাইসা মাথা তুলল, আমার দিকে শূন্য চোখে, প্রায়-অমানুষিক দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর হাঁটুর ওপরে এপ্রনটা টেনে সোজা করতে-করতে বলল:

'করেছি তো করেছি, ব্যস, ফুইরে গেল।'

'আমি যা বলেছিলুম তা করলে না কেন?'

হঠাৎ ও নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করল।

'আমি কিছু জানি না!'

ভের্‌শ্‌নেভের পাহারায় অফিস-ঘরে ওকে রাত কাটাতে দিয়ে আমি চলে এলুম। জানতুম, পড়াশুনোয় ভের্‌শ্‌নেভের প্রবল আগ্রহ রাত্রে পাহারায় জেগে থাকার পক্ষে সবচেয়ে ভালো গ্যারান্টি। কারণ, আমাদের সকলেরই ভয় ছিল যে রাইসা হয়তো আত্মহত্যা করার চেষ্টা করবে।

পরদিন সকালে একজন তদন্তকারী অফিসর এলেন। তদন্ত করতে কিন্তু বেশি সময় লাগল না - জেরা করার মতো বিশেষ কেউ ছিল না। চাঁচাছোলা নিখুঁতভাবে নিজের অপরাধের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিল রাইসা। রাত্রে এজমালি শোবার ঘরেই ও নাকি বাচ্চা প্রসব করেছিল। ওই ঘরেই তখন আরও পাঁচ-পাঁচটি মেয়ে ঘুমোচ্ছিল, কিন্তু ওদের কারো ঘুম ভাঙে নি। কেন — সে-রহস্যেরও ব্যাখ্যা দিল রাইসা, একেবারে সরলতম সে-ব্যাখ্যা: 'আমি চেষ্টা করত্যেছিলাম যাতে না-কাত্‌রাই।'

জন্মের পরমুহূর্তেই গায়ের শাল চাপা দিয়ে দম বন্ধ করে বাচ্চাটাকে মেরে ফেলেছিল ও। আগে থেকে ভেবেচিন্তে খুন করার কথা কিন্তু ও অস্বীকার করল।

'আমি মারতি চাই নাই, কিন্তু ওটা-যে কাঁদতি লেগ্যেছিল।'

তারপর, যে-পোঁটলাটা নিয়ে রাইসা 'রাব্‌ফাক'-এ গিয়েছিল বাচ্চার শবদেহটা লুকিয়ে ফেলল তার মধ্যে। ভেবেছিল, পরের দিন রাত্রে এক সময়ে ওটাকে বের করে নিয়ে গিয়ে বনের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসবে। তাহলে শেয়ালরা ওটা খেয়ে ফেলবে, আর কেউই ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরে টের পাবে না। পরদিন সকালে ও ধোপাখানায় কাজ করতে গিয়েছিল, অন্য মেয়েরাও সেখানে তাদের কাপড়জামা ধুচ্ছিল। সকলের সঙ্গে যথারীতি ও প্রাতরাশ আর দুপুরের খাবারও খেয়েছিল — কেউই কিছু বুঝতে পারে নি, কেবল কোনো-কোনো ছেলে নাকি লক্ষ্য করেছিল যে ও একটু বেশি 'মুহ্যমান' হয়ে আছে।

তদন্তকারী অফিসর রাইসাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। আর নির্দেশ দিয়ে গেলেন, ময়না-তদন্তের জন্যে কোনো-একটা হাসপাতালের লাশকাটা-ঘরে যেন বাচ্চার শবদেহটা পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ব্যাপারটা ঘটায় আমাদের শিক্ষক-কর্মীরা একেবারেই ভেঙে পড়লেন। ভাবলেন, কলোনির শেষদিন বুঝি উপস্থিত হয়েছে।

ছেলেরাও কিছুটা উত্তেজিত অবস্থায় ছিল। মেয়েরা অন্ধকারে যেতে, এমন কি তাদের এজমালি ঘরখানায়ও ঢুকতে ভয় পাচ্ছিল, ছেলেরা সঙ্গে না-থাকলে সারা দুনিয়ার বিনিময়েও সে-ঘরে থাকতে তারা রাজি হচ্ছিল না। জাদোরভ আর কারাবানভ কয়েক রাত্তির এজমালি শোবার ঘরখানায় ঘোরাঘুরি করে কাটাল। ফলে কি মেয়েরা, কি ছেলেরা কেউই সে-ক'দিন

ঘুমোল না, এমন কি জামাকাপড় ছাড়ল না পর্যন্ত। ওই সময়ে ছেলেদের একটা বেশ মজার খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মেয়েদের ভয়-দেখানো — যেমন, আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে মেয়েদের জানলার বাইরে আবির্ভূত হওয়া, ঘর-গরম-করার চুল্লীর চিমনির মধ্যে দিয়ে ভয়ঙ্কর ঐকতান সঙ্গীত জুড়ে দেয়া, কিংবা রাইসার বিছানার নিচে লুকিয়ে থেকে রাত্তিরবেলা বাচ্চাছেলের কান্না নকল করে তারস্বরে চেঁচানো, ইত্যাদি।

খুনটাকে ছেলেরা খুবই সহজ ব্যাপার হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তবে রাইসার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তারা কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে একমত ছিল না। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এ-বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে বাচ্চাকে দম বন্ধ করে মারার পেছনে রাইসার কুমারীসুলভ লজ্জাই ছিল একমাত্র কারণ — অর্থাৎ, তার নিজের অতিমাত্রায় উত্তেজিত অবস্থা, ঘুমন্ত মেয়েরা, নবজাত বাচ্চাটার হঠাৎ-কান্না... চিৎকারে সঙ্গিনীদের পাছে ঘুম ভেঙে যায় ওর এই আতঙ্ক, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অতিরিক্ত-রকমের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাপ্রিয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এহেন ব্যাখ্যান শুনে জাদোরভের তো হাসতে-হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার যোগাড়।

'আজগবি আষাঢ়ে গপ্পো বন্ধ করুন দেখি!' ও বলল। 'কুমারীসুলভ লজ্জা, তা-ই বটে! সবকিছু মতলব ও আগে থেকে ছকে রেখেছিল, ওর-যে শিগ্‌গিরই বাচ্চা হতে যাচ্ছে সেইজন্যেই তা ও কিছুতে স্বীকার করে নি। কর্‌নেয়েভের সঙ্গে যুক্তি করে আগে থেকেই সব মতলব ভাঁজা ছিল ওর... মরা বাচ্চাটাকে পোঁটলায় লুকিয়ে রাখবে, তারপর বনে ফেলে দিতে নিয়ে যাবে, সব, সব। নিছক লজ্জা পেয়েই যদি ও কাজটা করে থাকত তাহলে কি অত মাথা ঠান্ডা রেখে পরদিন সকালে কাজ করতে যেতে পারত? আমার যদি ইচ্ছেমতো চলার অধিকার থাকত তাহলে কবেই আমি রাইসাটাকে গুলি করে মারতুম! ওটা একটা নরকের কীট, চিরকাল ওটা কীটই থেকে যাবে! আর আপনারা কিনা কুমারীসুলভ লজ্জার কথা গাবিয়ে বেড়াচ্ছেন — কোনোকালে ওর ও-সব লজ্জাটজ্জা বলে বস্তু ছিল নাকি?'

'ঠিক আছে, তা-ই যেন হল। কিন্তু তাহলে ওর সেই মতলবখানা কী ছিল শুনি? এমন কাজ ও করল কেন?' মরিয়া হয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রশ্ন করলেন।

‘ওর মতলব তো খুবই স্পষ্ট! বাচ্চা নিয়ে ও করতটা কী? বাচ্চাকে দেখাশুনো করতে হয়, দফে-দফে খাওয়াতে হয়, কত কিছু করতে হয় তার জন্যে! বাচ্চা-বাচ্চা করে ওদের, বিশেষ করে কর্‌নেয়েভের, প্রাণ একেবারে আকুলিবিকুলি করছিল কিনা!’

‘না, এ হতেই পারে না!’

‘হতে পারে না, তাই না? আ, কী আমার সব দুগ্ধপোষ্য শিশু রে! রাইসা অবিশ্যি কিছুই স্বীকার করতে চাইবে না, কিন্তু ওকে যদি ঠিকমতো বাগ মানানো যায় তাহলে আমি হলফ করে বলতে পারি অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে...’

অন্য ছেলেরাও এ-ব্যাপারে জাদোরভের সঙ্গে পুরোপুরি একমত ছিল। কারাবানভ তো বলেই ফেলল, ও এ-বিষয়ে নিশ্চিত যে রাইসা ‘এই নোংরা কায়দাটা’-যে এই প্রথম করল তা মোটেই নয়, কলোনিতে ঢোকার আগে এ-ধরনের কাজ ও নিশ্চয়ই আরও করেছে।

খুনের পর তৃতীয় দিনের দিন কারাবানভ বাচ্চার শবদেহটা হাসপাতালে নিয়ে গেল। ও ফিরে এল খুবই উৎসাহিত হয়ে:

‘ওহ্‌, কী দৃশ্যই দ্যাখলাম জেবনে! বোতলে-ভরা কত ধরনেরই-যে বাচ্চা আছে ওখানে -- তা, পেরায় বিশ... তিরিশটা... কয়েকডা তো ভয়ংকর দ্যাখতে লাগল — কেমনধারা সব মাথা! আর একডার ঠ্যাঙ্‌-দুডা তো শরীলের নিচি ভাঁজ-করা — মানুষ না ব্যাঙ, বোঝা মুশকিল। তবে আমাদেরডা অমন না! ওগুলার পাশে আমাদের বাচ্চাডা তো রীতিমতো সোন্দর!’

কথাটা শুনে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন, কিন্তু তিনিও ঠোঁটের কোণে এক-টুকরো হাসি চাপতে পারলেন না:

‘কথাটা বলছ কী করে, সেমিওন! তোমার লজ্জা হওয়া উচিত!’

ছেলেরা ঘিরে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিরানন্দ, গোমড়া-মুখ দেখে-দেখে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

তিন মাস বাদে বিচারের জন্যে রাইসাকে হাজির করা হল। আদালতে হাজির হওয়ার জন্যে গোর্কি কলোনির সমগ্র শিক্ষক-পরিষদের নামে সাক্ষীর সপিনা বেরিয়ে গেল। ‘মনস্তত্ত্ব’ আর কুমারীসুলভ লজ্জার তত্ত্বটা

নিয়ে ক' দিন আদালত-ঘরে খুব নাড়াচাড়া চলল। যথাযথ পরিবেশ ও যথোপযুক্ত মনোভঙ্গি সৃষ্টিতে ব্যর্থতার জন্যে জজ-সাহেব আমাদের একহাত নিলেন। বলা বাহুল্য, আত্মপক্ষ-সমর্থনে কিছুই বলার ছিল না আমাদের। পরে আদালতের অধিবেশনে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করা হল, রাইসাকে আমরা কলোনিতে ফিরিয়ে নিতে রাজি আছি কিনা। জানালুম, রাজি আছি।

আট বছর রক্ষণাধীন থাকার সাজা পেল রাইসা। সঙ্গে সঙ্গে কলোনির তত্ত্বাবধানে রাখার জন্যে ওকে আমাদের হাতে তুলে দেয়া হল।

যেন কিছুই হয় নি এমন একখানা ভাব করে ও আমাদের মধ্যে ফিরে এল। সঙ্গে করে নিয়ে এল একজোড়া ভারি চমৎকার বাদামিরঙের বুটজুতো। ওই বুটজোড়া পায়ে দিয়ে ও যখন আমাদের সন্ধেবেলার উৎসব-আসরে ঘুরে-ঘুরে ওয়াল্‌ত্‌স নাচত তখন ওর দেমাক দেখে কে! আমাদের ধোপাখানার মেয়ে-কর্মীদের আর পিরগোভ্‌কার মেয়েদের বুক তখন ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে যেত।

নাস্তিয়া নচেভ্‌নায়া আমাকে পরামর্শ দিল:

'রাইসারে আপনে কলোনির বাইরি আর-কোথাও পাঠায়্যে দ্যান। নইলে আমরাই কোন্‌দিন অরে খেদায়্যে দিব। অর সাথে এক ঘরে থাকতি ঘেন্না লাগে।'

সেলাই-কারখানায় একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি রাইসাকে অন্যত্র সরিয়ে দিলুম।

এরপর শহরে গেলে মাঝে-মাঝে ওর দেখা পেতুম। এর অনেক পরে — ১৯২৮ সালে — একবার কোনো একটা কাজে শহরে গিয়ে একটা ভোজনালয়ের কাউন্টারের ওধারে রাইসাকে দেখতে পেয়ে আমি অবাক হয়ে গেলুম। দেখলুম, ও আগের চেয়ে অনেক মোটা হয়েছে, তবে সেই সঙ্গে দেহের মাংসপেশীরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে আর দেহ-সৌষ্ঠবেরও উন্নতি হয়েছে অনেক।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেমন আছ?'

'বেশ ভালো। এখানে এই কাউন্টারে কাজ করি। দুডা বাচ্চা আছে, বরও খুব ভালো লোক।'

'কে, কর্‌নেয়েভ?'

'না-না!' বলে ও হাসল। 'ওসব পালা কবেই খতম হয়ে গ্যাছে! বহুত্ আগেই রাস্তার লড়াইয়ে ছুরি খায়ে মরেছে সে... আর জানেন, আন্তন সেমিওনভিচ?'

'কী, কিছু বলবে?'

'আমারে ভরাডুবি থ্যেকে বাঁচায়েছেন, সে-জন্যি ধন্যবাদ। কারখানায় যেদিন হতি কাজ শুরু করেলাম সেদিন হতিই আমার অতীত মন থ্যেকে খসি গ্যাছে।'

## ১৬

## গাবের-স্যুপ

বসন্তকালে নতুন এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলুম আমরা — তা হল, লালচে ছিটে-দেয়া টাইফাস-জ্বর। প্রথমেই অসুস্থ হয়ে পড়ল কোস্তিয়া ভেত্‌কোভ্‌স্কি।

কলোনিতে আমাদের ডাক্তার ছিল না। একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না একসময়ে একটা মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে কিছুদিন পড়াশুনো করেছিলেন। তাই, কালেভদ্রে যখন আমরা এমন এক-একটা অবস্থায় পড়তুম যে ডাক্তার না-ডেকে পারা যাচ্ছে না অথচ ডাক্তার ডাকব কিনা সে-ব্যাপারে পুরোপুরি মনস্থির করে উঠতেও পারছি না তখন তিনিই আমাদের দেখাশোনা করতেন। চুলকনা-চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি ছিলেন আমাদের কলোনির বিশেষজ্ঞ, তাছাড়া কাটাছেঁড়া, পোড়া-ঘা, থ্যাঁত্‌লানো এ-সবের প্রাথমিক চিকিৎসাতেও হাত পাকিয়েছিলেন, এমন কি শীতকালে আমাদের পরনের জুতোর দারিদ্র্যের ফলে পায়ের আঙুলে যে-তুষারক্ষত হোত তার চিকিৎসাও জানতেন। এ-পর্যন্ত মনে হচ্ছিল যে ওইগুলোই একমাত্র শারীরিক অসুস্থতা যেগুলোকে হেলায়-ফেলায় প্রশ্রয় দিতে আমাদের কলোনি-বাসিন্দারা রাজি — ডাক্তার-বদ্যি আর তাদের চিকিৎসার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে ওরা ছিল ঠিক অতখানিই নারাজ।

ওষুধবিষুধ ব্যবহার করার ব্যাপারে ওদের এই বিরূপতা দেখেই রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে আমার সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা জন্মেছিল,

আর এই ব্যাপারে ওদের কাছ থেকে আমি নিজেই অনেক কিছু শিখেছিলুম। দেহের ১০০° ফারেনহাইট উত্তাপকে গ্রাহ্যের মধ্যে না-আনা আমাদের মধ্যে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল; পরস্পরের কাছে এইভাবে আমাদের সহনশক্তির বহর জাহির করে বেড়াতুম। সত্যি কথা বলতে কী, এই মনোভাব গ্রহণ করতে আমরা কমবেশি বাধ্যই হয়েছিলুম, কারণ ডাক্তাররা অত্যন্ত অনিচ্ছায় আমাদের কলোনিতে পদার্পণ করতেন।

অতএব কোস্তিয়া যখন জ্বরে পড়ল আর তার গায়ের উত্তাপ প্রায় ১০২° ফারেনহাইটে চড়ল, তখন আমাদের কলোনি-জীবনের অভিজ্ঞতায় সেটাকে একটা নতুন ব্যাপার বলেই ঠাহর হল। কোস্তিয়াকে বিছানায় পেড়ে ফেলা হল। তার জন্যে যা-কিছু করা সম্ভব ছিল সবই করলুম আমরা। প্রতি সন্ধেয় বন্ধুরা তার বিছানার চারধার ঘিরে বসত। ছেলেটা ভারি জনপ্রিয় ছিল, তাই প্রতি সন্ধেয় তার চারধারে রীতিমতো একটা ভিড় জমে যেত। কোস্তিয়াকে সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করতে চাইতুম না বলে, কিংবা অন্য ছেলেরা যাতে ঘাবড়ে না-যায় সেজন্যে আমরাও সন্ধেগুলো রোগীর বিছানার পাশে কাটাতে লাগলুম।

দিন তিনেক পরে সাংঘাতিক শঙ্কিত হয়ে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না তাঁর সন্দেহের কথা আমাদের জানালেন — বললেন, অসুখটা খুবই লালচে ছিটে-দেয়া টাইফাস-জ্বরের মতো লাগছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য ছেলেদের কোস্তিয়ার বিছানার কাছে যেতে বারণ করে দিলুম। কিন্তু কার্যকরভাবে ওকে অন্যদের থেকে পৃথক করে রাখা নিতান্তই অসম্ভব ছিল, কারণ সন্ধেবেলাগুলোয় ওই এজমালি ঘরগুলো ছাড়া আমাদের কাজ করার বা বসার অন্য কোনো জায়গা ছিল না।

আরও দু-এক দিন কাটল। কোস্তিয়ার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে ওঠায় একদিন তুলোভরা পুরু লেপ যাতে কম্বলের কাজ করে সেইভাবে তাতে ওকে পাকিয়ে-জুকিয়ে ফিটনগাড়িতে তোলা হল। ওকে নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চললুম শহরে।

হাসপাতালের বসবার ঘরে ঢুকে দেখি প্রায় জনাচল্লিশেক লোক। কেউ পায়চারি করছে, কেউ শুয়ে আছে, কেউ আবার কাতরাচ্ছেও। ডাক্তার আসতে অনেক দেরি করতে লাগলেন। স্পষ্ট বোঝা গেল, হাসপাতালের

কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে নিদারুণ শ্রান্তিতে ভুগছেন এবং রোগীকে হাসপাতালে রেখে ভালো কিছু লাভের প্রত্যাশা বড়-একটা করা চলবে না। অবশেষে ডাক্তার এলেন। আমাদের কোস্তিয়ার কামিজটা ক্লান্ত ভঙ্গিতে তুলে ধরে বৃদ্ধজনসুলভ নানারকম ঘোঁত্‌ঘোঁত আওয়াজ করতে-করতে পাশেই পেন্সিল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা ফেল্‌ড্‌শারের উদ্দেশে পরিশ্রান্তভাবে বললেন:

'ছিটে-দেয়া জ্বর। জ্বরের কুঁড়েয় পাঠিয়ে দাও।'

শহরের ঠিক বাইরেই একটা মাঠে যুদ্ধের-সময়ে-তৈরি খান-বিশেক কাঠের কুঁড়েঘর তখনও খাড়া হয়ে ছিল। সেখানে পৌঁছনোর পর নার্স, রোগী আর চাদর-বিছানো স্ট্রেচার বয়ে বেড়াচ্ছিল যে-সব অ্যাটেন্ডান্ট তাদের মধ্যে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালুম। ভারপ্রাপ্ত ফেল্‌ড্‌শারের রোগীর দায়িত্ব নেয়ার কথা, কিন্তু দেখলুম সে যে কোথায় তা কেউ জানে না, তাকে খুঁজে আনতেও কেউ রাজি নয়। অবশেষে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, হাতের কাছে যে-নার্সকে পেলুম তাকেই চেপে ধরে 'লজ্জার কথা!', 'অমানুষিক ব্যাপার!', 'কলঙ্কজনক!' ইত্যাকার কথার তুবড়ি দিলুম ছুটিয়ে। রাগ দেখানোয় ফল ফলল, কোস্তিয়ার জামাকাপড় খুলে ওকে ওরা ভেতরে নিয়ে গেল।

কলোনিতে ফিরে এসে শুনলুম জাদোরভ, অসাদ্‌চি, বেলুখিন — সকলেরই খুব জ্বর। জাদোরভ অবশ্য তখনও শয্যা নেয় নি, ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। ওর সঙ্গে যখন আমার দেখা হল তখন ও একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার সঙ্গে তর্ক করতে ব্যস্ত। একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না ওকে বিছানায় শোওয়ানোর চেষ্টা করছেন।

শুনলুম জাদোরভ বলছে, 'আচ্ছা তামাশা পেয়েছেন তো আপনি! আমি বিছানায় শোব কেন? আমি এখখুনি কামারশালে যাচ্ছি — এক মিনিটে সফ্রোন আমাকে ভালো করে দেবে...'

'সফ্রোন আবার তোমাকে কী করে ভালো করবে? এসব আজেবাজে কথা বলছ কেন?..'

'কেমন করে আবার, নিজেকে ও যেভাবে চাঙ্গা করে তোলে — ভোদ্‌কার সঙ্গে মরিচ, নুন, ন্যাপ্‌থা-তেল আর একছিটে গাড়ির চাকার গ্রিজ মিশিয়ে খেয়ে ফেলা!' বলতে-বলতে ওর স্বাভাবিক খোলামেলা দরাজ হাসি হেসে উঠল জাদোরভ।

'দেখছেন, কীভাবে আপনি ওর মাথাটি খেয়েছেন, আন্তন সেমিওনভিচ!'

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না নালিশ জানালেন আমার কাছে। 'ওকে নাকি সফ্রোন চাঙ্গা করে তুলবে! যাও, যাও বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড় দেখি!'

জাদোরভের গা থেকে বেশ তাত বেরুচ্ছিল, বোঝা যাচ্ছিল ও আর দাঁড়াতে পারছে না। আমি আর কথাটি না-বলে কনুই চেপে ধরে নিঃশব্দে ওকে এজমালি শোবার ঘরে নিয়ে এলুম। এজমালি শোবার ঘরে অসাদ্‌চি আর বেলুখিন তখনই বিছানা আশ্রয় করে পড়ে ছিল। অসাদ্‌চির কষ্ট হচ্ছিল, আর নিজেকে নিয়ে আদিখ্যেতাও করছিল প্রচুর। অনেকদিন থেকেই একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করে আসছি যে এই ধরনের তথাকথিত 'ডানপিটে' ছেলেরাই সব সময়ে অসুখ-বিসুখে কাতর হয়ে পড়ে। অপর দিকে বেলুখিন কিন্তু তার স্বাভাবিক খোশ-মেজাজেই ছিল।

সারা কলোনিতে বেলুখিনই ছিল সবচেয়ে আমুদে, সবচেয়ে অল্পে-সন্তুষ্ট ছেলে। নিজ্‌নি তাগিলে দীর্ঘদিনের শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত পূর্বপুরুষদের বংশে ওর জন্ম হয়েছিল। দুর্ভিক্ষের সময় ময়দার সন্ধানে ও ঘর ছাড়ে, মিলিত্‌শিয়ার এক তল্লাসির পর মস্কো শহরে ওকে আটকে রাখা হয় — ভরতি করে নেয়া হয় এক শিশু-সদনে। সেখান থেকে পালিয়ে রাস্তায় আস্তানা গাড়ে ও। আবার ধরা পড়ে, ফের হেফাজত থেকে পালায়। বেশ উদ্যমী ছেলে, চুরির চেয়ে জুয়াখেলাই একসময়ে পছন্দ ছিল ওর। পরে যারা নিজেদের পূর্ব-কীর্তিকাহিনীর গল্প করত তাদের মধ্যে ও ছিল প্রথম একজন যে হো-হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে নিজের দুঃসাহসিক, অভিনব আর প্রায়শই-বিফল অভিযানের গল্প বলতে কুণ্ঠিত হোত না। অবশেষে বেলুখিনের চৈতন্য হয়েছিল যে ও কোনোদিনই জুয়াড়ি হতে পারবে না, আর তখনই ও ইউক্রেনে আসা স্থির করে।

কোনো-একটা সময়ে বুদ্ধিমান, বুঝদার ছেলে বেলুখিন স্কুলেও পড়েছিল। সবকিছুই ও এক-আধটুকু জানত, তবু সব সত্ত্বেও ছেলেটা ছিল অসম্ভব-রকমের নিরেট অজ্ঞ। এ-রকম ছেলে আরও কিছু-কিছু দেখতে পাওয়া যায়: মনে হয় এরা ব্যাকরণ পড়েছে, গণিতের ভগ্নাংশের আঁক জানে, এমন কি শতকরার হিসাব কষে বের করা সম্বন্ধেও আবছা একটা ধারণা আছে, কিন্তু এই সবকিছুর জ্ঞানই কাজের সময় এমন গুলিয়ে ফেলে ব্যবহার করার চেষ্টা করে যে ফলাফল হাস্যকর হয়ে ওঠে। বেলুখিনের কথাবলার ধরনটাই ছিল এলোপাতাড়ি অথচ একই সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত আর প্রাণবন্ত।

টাইফাস-জ্বরে মুহ্যমান হয়ে থাকলেও বেলুখিন কথা বলে চলেছিল অক্লান্তভাবে, আর অন্যান্য সময়ের মতোই শব্দমালার সম্পূর্ণ আকস্মিক সংযোগে ঝল্সে-ওঠা ওর রসিকতায় সবাইকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছিল। ও তখন বলে চলেছিল:

'টাইফাস হল্যা গে চিকিচ্ছে-বিজ্ঞানের বোধশক্তি — রঙ্পাকা মজুররে তা পেড়্যে ফ্যালবে ক্যানে? সমাজতন্ত্র জন্ম নেবে যখন তখন এই রোগ-বীজাণুডারে আমরা দরজা মাড়াতি দেব না। তবে যদি ওডা খুবই জরুরি কোনো কাজে আসে — যেমন র‍্যাশনের টিকিটের জন্যি, কিংবা অন্য কোনো দরকারে, কেননা ওডারেও তো বাঁচতি হবে — তখন ওডারে আমার লেখক-সেক্রেটারির কাছে পাঠায়্যে দেব-নে। আর কোলিয়া ভেরশ্নেভরে আমরা সেক্রেটারি বানাব, কেননা কুত্তার গায়ে যেমনি এঁটুলি সেঁট্যে থাকে ও-ও তেমনি সেঁট্যে থাকে বইয়ের পাতায়। কোলিয়া তখন চিকিচ্ছে-বিজ্ঞানের এই বুদ্ধিজীবীর মোকাবিলা করবে-নে, অর কাছে যাঁহা এঁটুলি তাঁহা বীজাণু সবই এক, আর গণতন্ত্রে তো সবই সমান।'

'স-স-সমাজতন্ত্রের আমলে আ-আমি না-হয় সে-সে-সেক্রেটারি হলাম, কিন্তু তু-তুই হবি কী?' তোত্লা কোলিয়া ভেরশ্নেভ বলে উঠল।

বেলুখিনের পায়ের কাছে বিছানায় বসে ছিল কোলিয়া। ওর হাতে ছিল নিয়মমাফিক একখানা বই, আর পরনে ছিল যথারীতি আলুথালু, ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক।

'আমি তখন আইন বানাব, যাতে তুই ভবঘুরেডার মতন জামা না-পর্যে মানুষির মতন জামাকাপড় পরিস। তর ওই বেশভূষা দেখি তোস্কা সলভিওভ পের্যন্ত সহ্য করতি পারে না। তুই এমনধারা পড়ুয়া হলি কী কর্যে রে, অথচ দ্যাখতে হলি বানরের মতন? আমার মনে নেয় কী, রাস্তার অর্গ্যান-বাজিয়েও এমনধারা কালকুট্যে বানর নিয়ি ঘুরতি রাজি হবে না। রাজি হবে কী, কি বলিস। তোস্কা?'

ভেরশনেভের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল ছেলেরা। ভেরশ্নেভ কিন্তু এতে দোষ নিল না, বরং শান্ত ধূসর চোখ মেলে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বেলুখিনের দিকে। ওরা দু-জনে ছিল প্রাণের বন্ধু, কলোনিতে এসেও ছিল একসময়ে, পাশাপাশি কাজ করত কামারশালে। তবে বেলুখিন ইতিমধ্যেই নেহাইয়ে লোহাপেটার কাজ শুরু করেছিল, আর হাপর-ঠেলার

কাজ বেশি পছন্দ ছিল বলে কোলিয়া ওই কাজেই রয়ে গিয়েছিল। এতে এক হাতে বই-ধরে থাকার সুবিধে ছিল, তাই কাজটা ছিল ওর পছন্দসই।

তোস্‌কা সলভিওভের বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। বেশির ভাগ সময় ছেলেরা ওকে আন্তন সেমিওনভিচ বলে ডাকত (ওর আর আমার নাম আর পিতৃনাম ছিল এক)। চরম ক্ষুধার্ত ও অচৈতন্য অবস্থায় আমাদের কাছের জঙ্গলে ওকে কুড়িয়ে পায় বেলুখিন। বাপ-মায়ের সঙ্গে সামারা-অঞ্চল থেকে ইউক্রেনে এসেছিল ও। কিন্তু পথেই মাকে হারায়, আর তারপর ওর আর কিছু মনে ছিল না। তোস্‌কার ছিল খোলামেলা, ঢলঢলে, বাচ্চার মতো মুখ। বেলুখিনের মুখের দিকে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকত ছেলেটা। স্পষ্টতই, তোস্‌কা তার অল্প ক-দিনের জীবনে দুনিয়ার খুব সামান্যই দেখেছিল, তাই তার মন কেড়েছিল আমুদে, ঠাট্টা-বিদ্রূপে জবরদস্ত বেলুখিন, যে নাকি ভয় শব্দের অর্থ কী জানত না এবং ছিল পাকাপোক্ত সংসারী লোক। তোস্‌কা তাই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল বেলুখিনের সঙ্গে।

বেলুখিনের শিয়রে বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তোস্‌কা, ভালোবাসায় ভক্তিতে ওর চোখদুটো জ্বলছিল যেন। হাসির দমকে-দমকে ওর শিশুকণ্ঠের রিন্‌রিনে স্বর বেজে উঠছিল:

'কালকুট্যে বানর!'

হাত বাড়িয়ে বিছানার মাথার দিকে রেলিঙের ওপর দিয়ে ছেলেটাকে নিজের দিকে ঝুঁকিয়ে এনে বেলুখিন বলল, 'আমাদের এই তোস্‌কা একদিন সোন্দর জোয়ান হয়্যে ওঠবে-নে।'

লজ্জা পেয়ে বেলুখিনের তুলোভরা লেপে মুখ গুঁজল তোস্‌কা।

'শোন্‌, তোস্‌কা, কোলিয়ার মতন তুই বই পড়বি নে কিন্তু -- অরে দেখত্যেছিস তো, অর দফারফা হয়্যে গেছে, বুদ্ধিসাধ্যি খিচুড়ি পাকায়্যে ফেল্যেছে!'

'ও বই পড়ে না — বই ওকে পড়ে,' পাশের বিছানা থেকে ফোড়ন কাটল জাদোরভ।

ওদের কাছাকাছিই বসে ছিলুম আমি। কারাবানভের সঙ্গে দাবা খেলতে-খেলতে নিজের মনে ভাবছিলুম: 'ওদের-যে টাইফাস হয়েছে তা যেন ওরা ভুলেই গেছে।'

বললুম, 'এই, কেউ একজন গিয়ে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নাকে ডেকে আন দেখি।'

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না ঘরে ঢুকলেন যেন ক্রোধের প্রতিমূর্তি হয়ে।

'এ-সব ন্যাকা আদিখ্যেতার মানে কী, শুনি? তোস্‌কা কেন ওখানে ঘুরঘুর করছে? কী ভেবেছ তোমরা? একেবারে অসম্ভব ব্যাপার করে তুলেছ দেখছি!'

ঘাবড়ে গিয়ে বিছানার কাছ থেকে লাফিয়ে দূরে সরে গেল তোস্‌কা। অমনি কারাবানভও ওর হাতখানা ধরে কুঁজো হয়ে ঘরের কোণের দিকে পিছু হটে যেতে শুরু করল। ভান করল, যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে।

বলল, 'আমারও বড্ড ভয় লেগ্যেছে...'

'তোস্‌কা!' ঘড়ঘড়ে গলায় জাদোরভ বলে উঠল, 'শিগ্‌গির, শিগ্‌গির, আন্তন সেমিওনভিচেরও হাত ধর্‌। ওঁকে ফেলে পালাচ্ছিস-যে বড়?'

হাসিখুশিতে ঝলমলে ছেলেদের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না।

তারপর বলে উঠলেন, 'ঠিক যেন সব জুলু।'

'জুলু — বোঝলা কিনা, ওই যারা ট্রাউজার্স পরে না, আর সাঙাত্‌দের হাড়মাংস দিয়ি ভোজ সারে আর-কি,' গম্ভীরভাবে ব্যাখ্যা শুরু করল বেলুখিন। 'অদের একজনা এক অল্পবয়সী মেয়্যার কাছে গিয়ি কয় কি: 'আমারে তোমার সাথে যাতি দাও!' তা, সে মেয়্যা যে কত খুশি হল্য সে আর বলাতি। সে বলল, 'না-না, আপনেরে আর কষ্ট করতি লাগব্যে না! আমি নিজি-নিজিই যাতি পারব-নে।' আর তখন পুরুষলোকটা করল কী, মেয়্যারে এক কোণে নিয়ে গিয়ি সোজা গিইল্যে ফেলল, শর্ষের ঝাল পের্‌যন্ত দরকার পড়ল না তার।'

ঘরের ও-কোণ থেকে তোস্‌কার রিন্‌রিনে হাসির আওয়াজ ভেসে এল। এমন কি একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না পর্যন্ত মুখ টিপে না-হেসে পারলেন না।

'জুলুরা অল্পবয়সী মেয়েদের খেয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু তোমরাও বাচ্চা ছেলেদের টাইফাসের রুগীর কাছে যেতে দাও। এটা একই রকম খারাপ জিনিস।'

এবার বেলুখিনের ওপর শোধ তোলার একটা সুযোগ জুটে গেল ভের্‌শ্‌নেভের।

তুত্‌লে-তুত্‌লে বলল, 'জুলুরা মো-মোটেই অল্পবয়সী মে-মেয়্যাদের খা-খা-খায় না। তা-তাছাড়া অরা তো-তোর থ্যেকে ঢের-ঢের বে-বেশি স-স-সভ্য, বু-বুঝলি! তোস্‌কারে তু-তুই রোগডা চা-চালান করবি দে-দেখত্যেছি!'

'তা, তুমি ভের্‌শ্‌নেভ,' একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না বলে উঠলেন, 'তুমিই-বা কী বলে ওই বিছানায় বসে আছ শুনি? এখখুনি উঠে এস!'

কিছুটা লজ্জিত হয়ে পড়ে বেলুখিনের বিছানার ওপর চতুর্দিকে-ছড়িয়ে-রাখা বইগুলো একে-একে তুলতে শুরু করল ভের্‌শ্‌নেভ।

জাদোরভ ভের্‌শ্‌নেভের পক্ষ-সমর্থনে এগিয়ে এল।

'আরে, ও তো অল্পবয়সী মেয়ে নয়! বেলুখিন মোটেই ওকে খেয়ে ফেলবে না।'

তোস্‌কা ইতিমধ্যে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে এবার বেশ ভেবেচিন্তে বলল:

'কালকুট্যে বানররে মাত্‌ভেই খাবে না।'

এক বগলে বেশ এক বাণ্ডিল বই চেপে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল ভের্‌শ্‌নেভ, হঠাৎ অন্য বগলের নিচে পা ছুড়তে-ছুড়তে আর হাসতে-হাসতে আবির্ভূত হল তোস্‌কা। তারপর ওদের পুরো দলটাই ঘরের ওদিককার কোণে ভের্‌শ্‌নেভের বিছানায় গিয়ে আছড়ে পড়ল।

কালিনা ইভানভিচের পরিকল্পনা-অনুযায়ী বানানো গভীর খোঁদলওয়ালা শববাহী যানের মতো দেখতে খামারবাড়ির গাড়িখানা পরদিন সকালে সওয়ারির ভিড়ে উপচে উঠল। গাড়ির মধ্যে মেঝের ওপর কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিয়ে আমাদের টাইফাসের রোগীরা বসল। আর গাড়ির সামনের দিকে খোঁদলের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে একখানা তক্তা পেতে তার ওপর আসীন হলুম ব্রাত্‌চেঙ্কো আর আমি। আমার মনটা বিষণ্ণ হয়ে ছিল, ভেত্‌কোভ্‌স্কিকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে যে-ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল আবার তার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে এ-কথা ভেবে। তাছাড়া, এ-ব্যাপারেও আমি মোটেই নিশ্চিত ছিলুম না যে ছেলেরা সত্যিসত্যিই সেরে ওঠার জন্যে ওখানে চলেছে।

গাড়ির মেঝেয় শুয়ে পড়েছিল অসাদ্‌চি, জ্বরের ঘোরে কাঁধ পর্যন্ত

লেপ দিয়ে ঢেকে। নোংরা, পাঁশুটেরঙের তুলোর গোল্লাগুলো ওর ফেঁসে-যাওয়া লেপের মধ্যে থেকে মাথা জাগিয়ে ছিল, আমার পায়ের কাছে দেখতে পাচ্ছিলুম অসাদ্‌চির পায়ের এবড়োখেবড়ো, পুরনো বুটজোড়া। বেলুখিন বসে ছিল মাথা পর্যন্ত লেপ মুড়ি দিয়ে, আর লেপখানাকে মুখের সামনে নলের মতো পাকিয়ে নিয়ে।

হঠাৎ ও কথা বলল:

'লোকে নিঘ্‌ঘাত ভাবব্যে আমরা একদল পাদ্রি চল্যেছি। এক গণ্ডা পাদ্রি খামারবাড়ির গাড়িতি চাপ্যে যে কোন্‌ চুলায় চল্যেছে, ভাব্যে-ভাব্যে অরা কূলকিনারা পাব্যে না!'

জবাবে জাদোরভ ক্ষীণভাবে একটু হাসল। হাসি দেখেই বোঝা গেল কতখানি অসুস্থ ও।

জ্বরের কুঁড়েগুলোয় পৌঁছে দেখলুম অবস্থা পূর্ববৎ। কোস্তিয়া যে-ওয়ার্ডে ভরতি হয়েছিল সেখানে কর্মরত একজন নার্সকে খুঁজে পেলুম। মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে করিডর-বরাবর দ্রুত দৌড়তে-দৌড়তে অনেক কষ্টে মেয়েটি নিজের গতিরোধে সক্ষম হল।

'ভেত্‌কোভ্‌স্কি? মনে হয়, এ-ওয়ার্ডেই আছে...'

'কেমন আছে সে?'

'এখনও কিছুই জানা যায় নাই।'

ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আন্তন সজোরে চাবুক হাঁকড়ানোর একটা ভঙ্গি করল:

'কিছুই জানা যায় নাই! আ মরি, কী কথার ছিরি! এয়ার মানে কী — কিছুই জানা যায় নাই?'

'ছেল্যাটা কি আপনের সাথে এস্যেছে?' আপাদমস্তক ভিজে, আস্তাবলের গন্ধে ম-ম করা, ট্রাউজার্সের এখানে-ওখানে খড়ের টুকরোয় মাখামাখি আন্তনের দিকে অপছন্দের চোখে তাকিয়ে নার্স জিজ্ঞাসা করল।

'আমরা গোর্কি কলোনি থেকে আসছি,' আমি এবার সংযতভাবে শুরু করলুম, 'আমাদের একটি ছেলে, ভেত্‌কোভ্‌স্কি এখানে আছে। এছাড়া আমি আরও তিনজনকে সঙ্গে করে এনেছি — মনে হয় তারাও টাইফাসের রুগী।'

'আপনেদের বসবার ঘরে গিয়ি অপেক্ষা করতি লাগবে।'

'কিন্তু ওখানে যা ভিড়। তাছাড়া, আমি চাই আমাদের ছেলেরা একসঙ্গে থাকুক।'

'পেত্যেকের মর্জিমাফিক চলা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষি!'

বলেই হাঁটা শুরু করল মেয়েটি।

কিন্তু আন্তন গিয়ে ওর পথ আটকে দাঁড়াল।

'কী ব্যাপার আপনের, বলেন তো? মানুষির সাথে এক-আধটুক কথা বলবেন তো, নাকি?'

'বসবার ঘরে চল্যে যান কমরেডরা, এখানে দাঁড়ায়্যে কথা কয়্যে লাভ নাই।'

দেখা গেল নার্সটি আন্তনের ওপর চটে গেছে। আমিও চটেছিলুম। ধমক দিয়ে বললুম, 'তুমি বাইরে যাও দিকি! কে তোমাকে এর মধ্যে নাক গলাতে বলেছে?'

আন্তন অবশ্য যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেল। কেবল অবাক-চোখে একবার আমার দিকে আর একবার নার্সটির দিকে তাকাতে লাগল। এদিকে আমি একই রকম খিটখিটে মেজাজে নার্সকে বলতে লাগলুম:

'দয়া করে কথাটা বলতে দিন আমায়। আমি চাই আমার ছেলেরা সেরে উঠুক। যারা-যারা সেরে উঠবে তাদের প্রত্যেকের মাথাপিছু হিসেব করে দু-পুদ করে গমের ময়দা আপনাকে দিতে রাজি আছি। কিন্তু আমি একজনের সঙ্গেই কথা বলার পক্ষপাতী। ভেত্‌কোভ্‌স্কি আপনার ওয়ার্ডেই আছে। অন্যেরাও যাতে ওই ওয়ার্ডে জায়গা পায় সেটা একটু দেখুন।'

নার্সটি কেমন হকচকিয়ে গেল। নিঃসন্দেহে নিজেকে অপমানিত বোধ করল বলে মনে হল।

বলল, ' 'গমের ময়দা' দিবেন মানে, কী কইতি চান? আমারে ঘুস দিতি চান, নাকি? আপনের কথাডা ঠিক বোঝলাম না!'

'ঘুস নয় -- বোনাস, বুঝেছেন? যদি না-বুঝে থাকেন তাহলে আমাকে অন্য কোনো নার্সের শরণাপন্ন হতে হবে। এটা ঘুস নয়: আমাদের রুগীদের প্রতি একটু বেশি যত্ন নেয়ার কথা বলা হচ্ছে, হয়তো এর জন্যে একটু অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে, এইমাত্র। কথাটা হল, ওরা পেটপুরে খেতে পায় না, আর ওদের কোনো আত্মীয়স্বজনও নেই। বুঝলেন কথাটা?'

'গমের ময়দা দিতি লাগবে না, আমি এমনেই অদেরে আমার ওয়ার্ডে ভরতি কর্য়ে নেব-নে। অরা আর কয়জনা আছে?'

'এখন তিনজনকে এনেছি, তবে মনে হচ্ছে, অল্প দু-এক দিনের মধ্যে হয়তো আরও কয়েক জনকে আনতে হবে।'

'ঠিক আছে — আসেন আমার সাথে।'

আন্তন আর আমি নার্সের পিছু-পিছু গেলুম। ইঙ্গিতে নার্সের দিকে দেখিয়ে আন্তন বেশ বুঝদারের ভঙ্গিতে চোখ টিপল। তবে আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম যে ঘটনার এই আকস্মিক গতি-পরিবর্তনে ও-ও তাজ্জব বনে গেছে। ওর মুখভঙ্গির দিকে-যে আমি মনোযোগ দিচ্ছি না এটা ও ভালোমানুষের মতোই চুপচাপ মেনে নিল।

হাসপাতালের একেবারে শেষপ্রান্তে একখানা ঘরে নার্স আমাদের নিয়ে গেল। আন্তন গিয়ে নিয়ে এল আমাদের রোগীদের।

ওদের-যে টাইফাস হয়েছে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইল না। কর্তব্যরত ফেল্ড্শার রোগীদের গায়ে-জড়ানো আমাদের লেপগুলোর দিকে কিছুটা অবাক হয়েই যেন তাকিয়ে রইল, কিন্তু নার্সটি দৃঢ়ভাবে বলল:

'অরা গোর্কি কলোনি থ্যেকে আসত্যেছে। আমার ওয়ার্ডে অদেরে পাঠায়্যে দ্যান।'

'কিন্তু আপনের ওয়ার্ডে আর জায়গা আছে কি?'

'সে আমরা বেবস্তা কর্যে নেব-নে। জনা দুই আজ চল্যে যেত্যেছে, আর একখান বেড কোথাও এক জায়গায় ঢুকায়্যে নেব-নে।'

রোগীদের ভরতি করে দিয়ে চলে আসার সময় বেলুখিন বেশ খুশির সুরেই বলল:

'আরও কয়েক জনারে আনেন ক্যানে। তাইলে আরও বেশ জম্যে ওঠবে।'

দিন দুয়েকের মধ্যেই বেলুখিনের অনুরোধ রক্ষা করতে সমর্থ হলুম আমরা। এবার গোলস আর শ্নাইদেরকে নিয়ে এলুম ভরতি করাতে। এর এক সপ্তাহ বাদে আনতে হল আরও তিনজনকে।

তবে ভাগ্যক্রমে রোগীর সংখ্যা মোটমাট ওই পর্যন্তই দাঁড়াল।

রোগীরা কেমন আছে তার খোঁজখবর নিতে আন্তনকে আরও কয়েকবার হাসপাতালে যেতে হল। তবে দেখা গেল, টাইফাসে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ছেলেদের খুব বেশি ক্ষতি হয় নি।

যখন আমরা ভাবতে শুরু করেছি যে এবার একদিন শহরে গিয়ে ছেলেদের কয়েক জনকে ফিরিয়ে আনতে হবে, সেই সময়ে, বসন্তের প্রথম

দিনগুলির একটিতে, একদিন হঠাৎ তুলোভরা লেপ মুড়ি-দেয়া এক প্রেতমূর্তি দিনদুপুরের রোদ্রে জঙ্গল থেকে গুটিগুটি বেরিয়ে এল। কামারশালের কাছে এসে প্রেতমূর্তিটি চাঁচাছোলা খোনা গলায় চেঁচিয়ে বলল:

'তাঁরপ'র, ব'ীর কাঁমারভাঁইরা, খ'বর ক'ী, ভাঁলো তোঁ স'ব? ক'ী, এ'খনও প'ড়া চ'লত্যেছে? হুঁশিয়ার, মাঁথার ঘি'লু না শুঁকায়্যে যাঁয় দে'খিস!..'

মূর্তিটি আর কেউ নয়, আমাদের বেলুখিন! ছেলেরা ওকে দেখে তো ভারি খুশি। শরীরটা শুকিয়ে এবং মুখটা ফ্যাকাশে রক্তহীন হয়ে গেলেও আগের মতো হাসিখুশি আর বেপরোয়া ভাবটা বেলুখিনের ঠিকই বজায় ছিল।

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না এবার ওকে নিয়ে পড়লেন -- পায়ে হেঁটে আসার মানে কী? হাসপাতাল থেকে পাঠিয়ে দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না ও?

জবাবে বেলুখিন ওর চিরাচরিত ব্যাখ্যা শুরু করল, 'বোঝলেন, একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না, আমি অবশ্য অপিক্ষে করতি পারতাম। তবে কী জানেন, পেট ভরে্য খাবার জন্যি পেরানডা এমন ছটফট করতি লাগল যে কী বলি! যখনই মনে হোত এখানে সক্কলে আমাদের বাজরার রুটি খাতিছে জোয়ারের লপ্‌সি আর জামবাটি-ভরতি পরিজ খাতিছে তখন আমার মনডায় এমন এট্টা খাই-খাই ভাব জ্যেগে ওঠত-না... আমার তখন অদের গাবের-সু্যপের দিকি তাকাত্যে পের্‌যন্ত ইচ্ছে যেত না। অ মা, আমার কী গতি হবে গো!..'

হাসতে-হাসতে ওর তখন নাড়ি ছিঁড়ে যাবার যোগাড়। ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতে পারছিল না।

'গাবের-সু্যপ! সে আবার কী?'

'জানেন না -- গোগোল ওই সু্যপের কথা লেখ্যেছিলেন। ওঁয়ার লেখায় শব্দডারে ভারি সোন্দর শুনাতি লেগ্যেছিল। তা, হাসপাতালি অরা ওই গাবের-সু্যপ খালি-খালি খাতি দিত, কিন্তু পেত্যেক বার সু্যপডার দিকি তাকালি আমি না-হেস্যে পারতাম না। কিছুতেই নিজিরে মানায়্যে নিতি পারলাম না। অ মা, আমি কনে যাব! সু্যপ দ্যাখলেই খালি হাসতাম!

নার্স আমারে এজন্যি ধমকাধমকি করত, আর তাইতে আমার আরো বেশি হাসি পায়্যে যেত, আর খালি হাসতাম আর হাসতাম। যখনই ওই 'গাবের-স্যুপ' কথাগুলান মনে পড়ত তখনই আমার খাওয়া মাথায় ওঠত। হাতে একবার চামচখান ধরল্যেই হল, অমনি হাসতি-হাসতি প্যাট একবারে ফাটি যাবার যোগাড় হোত। কী করি, তাই চল্যে আলাম। তা, দুপরের খাওয়ার পাট চুকি গ্যাছে নাকি? মনে নিচ্ছে, আজ তো পরিজ খাওয়ার দিন ছেল, তাই না?'

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না কোত্থেকে যেন ওর জন্যে খানিকটা দুধ যোগাড় করে আনলেন। ওঁর মতে, আসার সঙ্গে সঙ্গেই অসুস্থ লোকের পক্ষে পরিজ খাওয়া অসম্ভব কথা!

বেলুখিন খুশি মনেই ওঁকে ধন্যবাদ জানাল:

'ধন্যবাদ! মরার আগি আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করল্যেন বলি অনেক ধন্যবাদ আপনারে!'

বলল বটে, তবু সবটুকু দুধ ও পরিজের মণ্ডের ওপর ঢেলে নিল। ওর রকমসকম দেখে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না অবশেষে হাল ছেড়ে দিলেন।

এর অল্প কিছুদিনের মধ্যে অপরাপর রোগীরাও স্বস্থানে ফিরে এল।

আর আন্তনও একবস্তা গমের ময়দা পেশছে দিয়ে এল নার্সের বাড়িতে।

## ১৭

## যুদ্ধোদ্যত শারিন

রাইসার বাচ্চা হওয়া, টাইফাস মহামারী, জমে-যাওয়া পায়ের আঙুলসহ শীত, শীতকালের গাছকাটা ও অন্যান্য কষ্টসাধ্য কাজ — সবকিছুই ক্রমে-ক্রমে ভুলে যাওয়া গেল, কিন্তু জনশিক্ষা-দপ্তরে সবাই যাকে আমার সেনানিবাসের শৃঙ্খলাবিধান নাম দিয়েছিল তার জন্যে আমায় ওরা ক্ষমা করে উঠতে পারছিল না।

ওরা বলত, ‘আপনার ওই পুলিশী শাসনতন্ত্র আমরা খতম করবই। সামাজিক শিক্ষা গড়ে তোলা দরকার আমাদের, নির্যাতনের শিবির গড়ে তোলা নয়।’

শৃঙ্খলা-বিষয়ে আমার যে-বক্তৃতার কথা আগে বলেছি তাতে আমি তখনকার দিনে সাধারণভাবে স্বীকৃত একটি তত্ত্বের সঠিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলুম। তত্ত্বটি এই, যে-কোনো ধরনের শাস্তিবিধানই মানহানিকর, শিশুর পবিত্র সৃষ্টিশীল প্রেরণা বা আবেগকে বিকশিত হয়ে ওঠার পূর্ণতম সুযোগ-সুবিধাদান অত্যাবশ্যক, এবং এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হল শিশুদের আপনা থেকে সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা। আমি এর পালটা এবং আমার কাছে যা অকাট্য সেই তত্ত্বটি উপস্থাপিত করে বলতে চাইলুম যে যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার যৌথ-মনোবৃত্তি এবং ওই যৌথ-মনোবৃত্তি বিকাশের উপযোগী সংস্থাগুলি গড়ে না-উঠছে, যতক্ষণ-না এ-ব্যাপারে উল্লেখ্য পূর্ব-ঐতিহ্য সৃষ্টি হচ্ছে এবং শ্রম ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রাথমিক অভ্যাসগুলি গড়ে উঠছে, ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষকের অধিকার আছে (না, শুধু অধিকার নয়, এটা শিক্ষকের কর্তব্যও!) শাসনের ভয় দেখিয়ে শিশুদের বাধ্য করা। আমি আরও বললুম যে সমগ্র শিক্ষাকে শিশুর আগ্রহের ওপর নির্ভরশীল করে গড়ে তোলা অসম্ভব। বললুম, কর্তব্যবোধের চর্চা প্রায়শই শিশুর আগ্রহের পরিপন্থী, বিশেষ করে শিশুরা এই ধরনের কর্তব্যবোধকে যে-চোখে দেখে থাকে সেদিক থেকে বিচার করলে তো বটেই। পরিশেষে আমি জানালুম, শক্তিশালী ও পোড়-খাওয়া পাকাপোক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার উপযোগী শিক্ষাই শিশুদের দিতে হবে, যাতে অপ্রিয় ও ক্লান্তিকর ঠেকলেও যৌথ-সংস্থার স্বার্থে প্রয়োজন হলে সব ধরনের কাজ করার যোগ্যতা তারা অর্জন করতে পারে।

সেদিন আমার বক্তৃতার মোদ্দা কথা ছিল এই দাবি যে একটা শক্তিশালী, উৎসাহ-উদ্দীপনায় পূর্ণ - এবং দরকার হলে কঠোর জীবনচর্যায় ব্রতী — যৌথ-সংস্থা গড়ে তোলা একান্তই প্রয়োজন, আর তাই সব আশা-ভরসা আমরা একমাত্র ওই যৌথ-সংস্থার ওপরই অর্পণ করেছি। এর জবাবে আমার বিরোধীরা ফিরে-ফিরে বারবার কেবল ‘শিশু’ শব্দটির ইন্দ্রজাল বিস্তার করে শিক্ষাদানগত তাদের স্বতঃসিদ্ধ সূত্রগুলি আমার মুখে ছুড়ে মারতে সক্ষম হয়েছিল।

আমাদের কলোনিকে যে 'খতম করে' দেয়া হবে সে-ব্যাপারে আমি রীতিমতো তৈরি হয়েই ছিলুম, তবু আমাদের জরুরি দৈনন্দিন সমস্যাগুলো — যেমন, জমিতে বীজবোনার অভিযান এবং নতুন কলোনিতে অসংখ্য মেরামতির কাজ — আমাকে এতখানি ব্যস্ত করে রেখেছিল যে জনশিক্ষা-দপ্তরের সম্ভাব্য নির্যাতন সম্পর্কে সমস্ত ভয়ভাবনা বেমালুম ভুলে রইলুম। অবশ্য, ওই দপ্তরে কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই আমার পক্ষে ছিল, তা না হলে 'খতম হয়ে' যেতে আমার অত দেরি লাগছিল কেন? নইলে আমার পদ থেকে আমাকে সরিয়ে দেয়ার চেয়ে সহজ কাজ আর কী ছিল?

অতঃপর দপ্তরে যাওয়া এড়িয়ে চলতে লাগলুম। কেননা ওখানে আমার সঙ্গে ওরা এমন ভঙ্গিতে কথা বলত যাকে মোটেই সহৃদয় বলা চলে না, বরং কার্যত তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করাই বলা চলতে পারে। ওখানে আমাকে যারা উত্যক্ত করত তাদের মধ্যে প্রধান ছিল শারিন নামে জনেক ব্যক্তি। সুদর্শন, ফ্যাশনদুরস্ত শারিন ছিল শ্যামবর্ণ, কোঁকড়া-চুলওয়ালা, যাকে বলে মফস্বলের মেয়ে-মজানো পুরুষ আর-কি। ওর ছিল পুরু-পুরু লালচে ভিজে ঠোঁট আর সুস্পষ্ট বাঁকানো ভুরু। ১৯১৭ সালের আগে শারিন-যে কী ছিল তা কে জানে, কিন্তু যখনকার কথা বলছি ও তখন আর কিছুতে নয় একেবারে সামাজিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক মস্ত বিশেষজ্ঞ বনে গেছে! অনায়াসে তখন ও কেতাদুরস্ত বুকনি রপ্ত করে ফেলেছে। তাছাড়া ওর ছিল গলা কাঁপিয়ে ভাষার আড়ম্বর বিস্তারের ক্ষমতা। শারিনের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, ওর কথা শিক্ষাবিজ্ঞানগত ও বৈপ্লবিক তাৎপর্যে পরিপূর্ণ।

একবার কোনো একটা ব্যাপারে অদম্য হাসির বেগ আমি বন্ধ করতে না-পারায় তার পর থেকে ও আমার সম্পর্কে একটা উন্নাসিক শত্রুতার মনোভাব পোষণ করে আসছিল।

ব্যাপারটা হল এই। একদিন কলোনিতে আমার অফিস-ঘরে আসার পর ওর চোখ পড়ে যায় আমার টেবিলে-বসানো একটা ব্যারোমিটরের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন: 'বস্তুটা কী?'

'ব্যারোমিটর।'

'ব্যারোমিটর -- তার মানে?'

অবাক হয়ে জবাব দিই, 'ব্যারোমিটর — ব্যারোমিটর। আবহাওয়া কেমন থাকবে ও থেকে তা জানা যায়।'

'আবহাওয়া কেমন থাকবে ও থেকে তা জানা যাবে?' আমার কথার পুনরাবৃত্তি করে ও বলে। 'তা কী করে হবে, ওটা তো আপনার টেবিলের ওপর রয়েছে? আবহাওয়া তো এখানে নেই, সে তো ঘরের বাইরে।'

এই শুনেই আমি সেদিন সেই মারাত্মক, অদম্য হাসিতে ফেটে পড়ি। হয়তো সেদিন আমি নিজেকে সংযত করতে পারতুম যদি শারিন অত বিজ্ঞ-বিজ্ঞ ভাব না-করত, যদি ওর মাথা-ভরতি অমন তাক-লাগানো চুলের চুড়ো আর অমন সবজান্তাসুলভ মাতব্বরি চালচলন না-থাকত!

আর এর ফলে ও গেল সাংঘাতিক চটে।

বলল, 'হাসছেন কেন? এতে হাসির কী হল? আপনি আবার নিজেকে একজন শিক্ষাবিজ্ঞানী বলেন। এইভাবেই আপনি আপনার রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলছেন বুঝি? আমি না-বুঝতে পারলে আপনি তো বুঝিয়ে দেবেন, হাসবেন কেন?'

কিন্তু ওর কথামতো মহানুভবতা দেখাতে অপারগ হয়ে আমি খালি হেসেই যেতে লাগলুম। একবার আমি একটা গল্প শুনেছিলুম যেটা ছিল ব্যারোমিটর সম্পর্কে আমার আর শারিনের কথাবার্তার প্রায় হুবহু প্রতিরূপ। এবং এটা ভেবে আমার অসম্ভব মজা লাগছিল যে বাস্তব জীবনে এ-ধরনের বোকামির গল্পের এমন নিখুঁত নমুনাও মিলতে পারে, তাও আবার জেলা জনশিক্ষা-দপ্তরের জনেক ইন্‌স্‌পেক্টর কিনা সেই বোকারামের নমুনা। ভীষণ চটেমটে সেদিন চলে যায় শারিন।

শৃঙ্খলা-সম্পর্কিত আমার পূর্বোক্ত বক্তৃতা নিয়ে সম্মেলনে বিতর্কের সময়ে শারিন আমার সমালোচনা করল নির্মমভাবে।

বাণী দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'শিশুর ব্যক্তিত্বের ওপর স্থানিকভাবে সীমাবদ্ধ চিকিৎসা-ও-শিক্ষাবিজ্ঞান-সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রভাবকে — সামাজিক শিক্ষার সংগঠনে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হওয়ার কারণে — ততখানি পর্যন্তই অস্তিত্ব রক্ষা করতে দেয়া উচিত শিশুর স্বাভাবিক চাহিদার সঙ্গে তা যতখানি খাপ খায়, এবং নির্দিষ্ট জৈব, সামাজিক, কিংবা অর্থনৈতিক কাঠামোর বিকাশে যতখানি তা সৃষ্টিশীল সম্ভাবনাগুলির পথ উন্মুক্ত করে দেয়। উপরোক্ত কথাগুলির ফলস্বরূপই বলা যায়...'

একবারও দম নেয়ার জন্যে না-থেমে, আধবোজা-চোখে তাকিয়ে পুরো দুটি ঘণ্টা শারিন তার পাণ্ডিত্যের ঘন আঠালো স্রোতে শ্রোতাদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে বক্তৃতা শেষ করল এই মর্মস্পর্শী মনোভাবটি ব্যক্ত করে:

'জীবনই হল আনন্দ।'

১৯২২ সালের বসন্তকালে এহেন শারিন একদিন মেরে আমাকে ধরাশায়ী করে দিল।

ওই সময়ে প্রথম সংরক্ষিত সেনাবাহিনীর বিশেষ দপ্তর এই সুস্পষ্ট নির্দেশসহ একটি ছেলেকে কলোনিতে পাঠায় যে ছেলেটিকে কলোনিতে ভরতি করে নিতে হবে। বিশেষ দপ্তর এবং 'চেকা' তার আগেও ছেলেদের আমাদের কাছে পাঠিয়েছিল। ফলে ছেলেটিকে আমরা ভরতি করে নিই। এর দু-দিন পরে শারিন আমাকে ডেকে পাঠাল।

'এভ্গেনিয়েভ্কে ভরতি করে নিয়েছেন আপনি?'

'হ্যাঁ, নিয়েছি।'

'আমাদের হুকুম ছাড়া কাউকে ভরতি করে নেয়ার কী অধিকার আছে আপনার?'

'প্রথম সংরক্ষিত সেনাবাহিনীর বিশেষ দপ্তর ছেলেটিকে পাঠিয়েছিল, তাই।'

'আমার সঙ্গে বিশেষ দপ্তরের সম্পর্কটা কী? আমাদের হুকুম ছাড়া কাউকে ভরতি করার কোনো অধিকার নেই আপনার।'

'বিশেষ দপ্তরের কথা অমান্য করতে পারি না আমি। আর যদি আপনি মনে করেন আমার কাছে ছেলে পাঠানোর কোনো অধিকার নেই তাদের, তাহলে সে-ব্যাপারটা আপনি তাদের সঙ্গে ফয়সলা করুন। আপনার এবং বিশেষ দপ্তরের মধ্যে বিরোধের শালিসি করা তো আমার কাজ নয়।'

'এভ্গেনিয়েভ্কে এখুনি ফেরত পাঠিয়ে দিন।'

'ফেরত পাঠাব — একমাত্র আপনার লিখিত নির্দেশ হাতে পেলে।'

'আমার মৌখিক নির্দেশই আপনার পক্ষে যথেষ্ট হওয়া উচিত।'

'সে-নির্দেশটা লিখিতভাবেই দিন-না।'

'আমি আপনার ওপরওয়ালা। আমার মৌখিক নির্দেশ প্রতিপালন না-করার জন্যে আমি এখুনি আপনাকে গ্রেপ্তার করে এক সপ্তার মেয়াদ দিতে পারি, তা জানেন?'

'ঠিক আছে — তা-ই কর্‌ন তাহলে।'

দেখল্‌ম, লোকটি ওর অধিকার খাটিয়ে আমাকে এক সপ্তাহ জেলে আটক রাখার জন্যে লালায়িত। অতএব, হাতের কাছেই যখন এমন একটা ছ্‌তো পাওয়া গেছে তখন আর অন্য অছিলা খোঁজার দরকার কী?

'তাহলে আপনি ছেলেটাকে ফেরত পাঠাতে চান না?' ও আবার বলল।

'লিখিত নির্দেশ ছাড়া আমি ওকে ফেরত পাঠাব না। বিশেষ দপ্তরের চেয়ে কমরেড শারিনের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া আমি অনেক বেশি কাম্য বলে মনে করি, ব্‌ঝলেন?'

'শারিনের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া কাম্য বলে মনে করছেন কেন?' স্পষ্টতই কৌত্‌হলী হয়ে উঠে ইন্‌স্‌পেক্টর এবার শ্‌ধোল।

'যতই হোক-না-কেন এতে ব্যাপারটা একটু দেখায় ভালো। তাহলে ব্যাপারটা ঘটে নিছক শিক্ষা-বিজ্ঞানের চৌহদ্দির মধ্যে, এই আর-কি।'

'তাহলে, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।'

টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল শারিন।

'মিলিত্‌শিয়া-দপ্তর? একজন মিলিত্‌শিয়াম্যানকে গোর্কি কলোনির ডিরেক্টরের জন্যে এখ্‌নি পাঠিয়ে দিন তো — আমি তাঁকে এক সপ্তাহের জন্যে কয়েদ করেছি... শারিন বলছি।'

'তা, আমি এখন কী করব? আপনার অফিস-ঘরে অপেক্ষা করব?'

'হ্যাঁ, আপনি এখানেই থাকবেন।'

'আপনি বোধহয় কিছ্‌ক্ষণের জন্যে আমাকে শর্তাধীনে ম্‌ক্তি দিতে পারেন, তাই না? মিলিত্‌শিয়াম্যান এখানে এসে পেঁছতে-পেঁছতে আমি গ্‌দামঘর থেকে কিছ্‌-কিছ্‌ জিনিস নিয়ে সঙ্গের ছেলেটিকে কলোনিতে ফেরত পাঠাতে পারি।'

'যেখানে আছেন আপনি সেখানেই থাকবেন।'

হ্যাট্‌স্ট্যান্ড থেকে ওর সব্‌জ রঙের ভেল্‌র-কাপড়ের টুপিটা তুলে নিল শারিন — টুপিটা ওর কালো চুলের ওপর ভারি চমৎকার মানাত। তারপর অফিস থেকে দ্র্‌ত বেরিয়ে গেল। অতঃপর টেলিফোনের রিসিভার তুলে আমি জেলা কার্যকরী কমিটির চেয়ারম্যানকে ডাকল্‌ম। ধৈর্য ধরে তিনি আমার বক্তব্য শ্‌নলেন।

পরে বললেন, 'শোনেন, দোস্ত, ঘাবড়ানোর কোনো দরকার নাই। সরাসরি

চুপচাপ বাড়ি চল্যে যান-না ক্যানে। নাকি, মিলিত্‌শিয়াম্যানের জন্যি অপিক্ষে করল্যে বোধকরি ভালো করবেন। ও আলে কবেন আমারে যেন টেলিফোন করে।'

মিলিত্‌শিয়াম্যান এসে গেল।

'আপনেই কি কলোনির ডিরেক্টর?'

'হ্যাঁ।'

'তাইলে, আমার সাথে চলেন।'

'জেলা কার্যকরী কমিটির চেয়ারম্যান আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন বাড়ি চলে যেতে। তিনি আপনাকে বলেছেন তাঁকে একবার টেলিফোন করতে।'

'আমি কাউরেই টেলিফোন করতি যাব না। বড়কত্তা ইচ্ছে করলি সদর দপ্তর থ্যেকে টেলিফোন করবেন-নে। চল্যে আসেন দেখি।'

রাস্তায় বেরোতে আমাকে মিলিত্‌শিয়াম্যানের হেফাজতে দেখে আন্তন অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

বললুম, 'আমার জন্যে এখানেই অপেক্ষা কোরো।'

'ওরা আপনারে শিগ্‌গির ছাড়বে তো?'

'তুমি আবার এ-ব্যাপারে কী জেনেছ?'

'ওই-যে কালোপানা লোকটা এই মাত্তর এদিক দিয়ে যাচ্ছিল। তা, লোকটা আমারে বলে গেল: 'তুমি বাড়ি যেতে পার। তোমাদের ডিরেক্টর ফিরবে না।' তারপর টুপিপরা কটা মেয়েছেলে আপিস থেকে বেরিয়ে এসে আমারে বলল: 'তোমাদের ডিরেক্টররে গ্রেপ্তার করা হয়েচে'।'

'একটু অপেক্ষা কর। আমি শিগ্‌গিরই ফিরব।'

মিলিত্‌শিয়ার সদর দপ্তরে আমাকে বড়কর্তার জন্যে অপেক্ষা করতে হল। বিকেল চারটে বাজলে পর তবে ছাড়া পেলুম।

আমাদের ঘোড়ার গাড়িখানা পাহাড়প্রমাণ বস্তা আর বাক্সে বোঝাই হয়ে ছিল। খার্‌কভের বড় শড়ক ধরে শান্তিতে ঝাঁকানি খেতে-খেতে চলেছিলুম আন্তন আর আমি। দু-জনেই আমরা ডুবে ছিলুম নিজের-নিজের ভাবনায় — আন্তন সম্ভবত ভাবছিল ঘোড়ার খড়বিচালি আর ঘোড়া-চরানোর ঘাসের জমির কথা, আর আমি ভাবছিলুম আমার ভাগ্যের কত-না রকমফেরের কাহিনী। মনে হচ্ছিল, ভাগ্যের এই হরেক রকমফের বুঝি কলোনির ডিরেক্টরদের জন্যেই বিশেষ করে তৈরি হয়েছিল। মাঝে-মাঝেই থামতে হচ্ছিল আমাদের চলন্ত গাড়ি থেকে পিছলে গড়িয়ে-পড়া বস্তাগুলোকে

ফিরেফিরতি সাজিয়ে রাখার জন্যে, তারপর আবার সেই বস্তার স্তূপের ওপর চেপে বসে গন্তব্যের পথে রওনা দিচ্ছিলুম।

কলোনির রাস্তায় মোড় ফেরার মুখে আন্তন সবেমাত্র বাঁ-হাতের লাগামে টান দিচ্ছে এমন সময় হঠাৎ 'খোকাবাবু' ভয় পেয়ে পাশে হটতে লাগল, তারপর ঝাঁকি দিয়ে মাথা উঁচু করে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। দেখা গেল, কলোনির দিক থেকে একখানা মোটরগাড়ি দ্রুত আমাদের দিকে আসছে, আর প্রচণ্ড হল্লা করে ভেঁপু বাজিয়ে ঝরঝর-ফোঁসফোঁস আওয়াজ তুলে ছুটেছে শহরমুখো। গাড়িতে করে সবুজ রঙের ভেলুর টুপি একখানা ছিটকে বেরিয়ে গেল, ভিতু চোখে শারিন এক-নজর আমার দিকে তাকিয়ে গেল, তাও দেখলুম। গাড়িতে ওর পাশে কোটের কলার তুলে দিয়ে বসে ছিলেন শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন-দপ্তরের প্রধান গ্যঁফো চের্নেঙ্কো।

আন্তনের অবশ্য মোটরগাড়ির অপ্রত্যাশিত এই দৌড় নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ ছিল না, কারণ 'খোকাবাবু' ইতিমধ্যে তার সাজ-সরঞ্জামের জটিল ও অ-নির্ভরযোগ্য জালের মধ্যে কোথায় কিসে যেন জট পাকিয়ে ফেলেছিল। আমারও তখন ওদিকে নজর দেবার সময় ছিল না, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছিলুম ঝরঝরে একখানা খামারবাড়ির গাড়িতে কলোনির একজোড়া ঘোড়া জুতে আর একদল ছেলে ঠেসেঠুসে গাড়িতে উঠে পুরোদমে ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের দিকে আসছে। দেখলুম, গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ঘোড়া দুটোকে ছোটাচ্ছে কারাবানভ, আর মাথাটা অল্প নামিয়ে জ্বলজ্বলে বেদের চোখে দূরে-মিলিয়ে-যাওয়া মোটরখানাকে লক্ষ্য করছে তীব্রদৃষ্টিতে। এত জোরে যাচ্ছিল গাড়িখানা যে আমাদের কাছে এসে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি রোখা সম্ভব হল না। চিৎকার করে কী যেন বলে ছেলেরা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল তারপর হাসতে-হাসতে কারাবানভকে থামাতে চেষ্টা করল। অবশেষে কারাবানভের সম্বিৎ ফিরে এল, কী ঘটছে বুঝল ও। দুই রাস্তার মোড়ে সে যেন একটা মেলা বসে গেল।

ছেলেরা ঘিরে ধরল আমাকে। সমস্ত ব্যাপারটা এমন গদ্যময়ভাবে শেষ হওয়ায় কারাবানভ স্পষ্টতই অখুশি হয়েছে বোঝা গেল। ও এমন কি গাড়ি থেকে নামল না পর্যন্ত, চটেমটে ঘোড়া দুটোর মাথা ঘোরাতে-ঘোরাতে তাদের গাল দিতে লাগল:

'মাথা ঘ্ৰ্যা দেখি, শয়তান কোথাকার! তদেরে ঘ্ৰ্যাতি সাক্ষাৎ শয়তানরে আসতি লাগবে দেখত্যেছি!..'

অবশেষে আরও একবার তর্জনগর্জন করে ডানহাতি ঘোড়াটাকে চাবকিয়ে ঘোরাতে সমর্থ হল ও। তারপর একই ভাবে গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে বেগে রওনা দিল কলোনিমুখো। উঁচুনিচু রাস্তায় অনেক দূর পর্যন্ত ওর ঝিমিয়ে-পড়া মাথাটাকে একেকবার লাফিয়ে উঠতে আর পরক্ষণে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখা গেল।

'তোমাদের ব্যাপারটা কী বল তো? দমকলের গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়েছিলে কেন?' জিজ্ঞাসা করলুম।

'সব কয়টার মাথা বিগড়ে গেছিল নাকি?' আন্তন শুধোল।

পরস্পর ধাক্কাধাক্কি করতে-করতে, একজন আরেকজনকে থামিয়ে দিয়ে ব্যাপারটা কী ঘটেছিল তার বর্ণনা দিল ছেলেরা। যদিও সবাই ওরা ঘটনাটা সচক্ষে দেখেছিল, তবু দেখলুম সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কে ওদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। জুড়ি ঘোড়ার গাড়িতে চেপে ওরা-যে কোথায় চলেছিল, শহরে গিয়েই-বা কী করত ওরা সে-সম্বন্ধে সকলেরই ধারণা দেখলুম নিতান্ত আবছা। বরং এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতেই ওরা যেন অবাক হয়ে গেল।

'তা আমরা জানি নাকি? শহরে পেঁাছি দেখা যেত কী করা যায়।'

কী ঘটেছে একমাত্র জাদোরভই তার একটা পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণ বর্ণনা দিতে সক্ষম হল।

বলল, 'ব্যাপারটা একেবারেই আচমকা ঘটে গেল, বুঝলেন। যেন বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো। ওরা যখন মোটরে করে এল তখন আমরা কেউই প্রায় লক্ষ্য করি নি। সবাই তখন কাজে ব্যস্ত। ওরা আপনার অফিস-ঘরে গিয়ে ঢুকল, তারপর কী যেন করতে লাগল সেখানে... আমাদের একটা বাচ্চা ছেলে কিন্তু ওদের ব্যাপারটা দেখে ফেলেছিল। সে এসে বলল, ওরা নাকি আপনার ড্রয়ার হাঁটকাচ্ছে। হঠাৎ সবার হুঁশ হল, ব্যাপারটা কী? বাচ্চারা সবাই যখন আপনার গাড়িবারান্দায় ছুটে গেছে ওরা তখন অফিস-ঘর থেকে বেরোচ্ছে। আমরা শুনতে পেলুম ওরা ইভান ইভানভিচকে বলছে: 'আপনিই ডিরেক্টরের পদ নিন।' ব্যস, এরপরই ঝঞ্ঝাট বেধে গেল। তখন যে কী ঘটছে আর কী ঘটছে না তা বোঝা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কেউ স্রেফ চ্যাঁচাতে লাগল, কেউ ওই লোকগুলোর কোটের

কলার চেপে ধরল, বুরুন এই বলে সারা কলোনি দাপিয়ে বেড়াতে লাগল: 'আন্তনরে কী করেছ তোমরা?' রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেল একটা। আমি আর ইভান ইভানভিচ না-থাকলে নির্ঘাত ঘুসোঘুসি শুরু হয়ে যেত। আমার জামার বোতামগুলোই গেল ছিঁড়ে। কালোমতো লোকটা তো ভয়ে হতভম্ব হয়ে গেল, তারপর মোটরগাড়ির দিকে দৌড় লাগাল। গাড়িখানা ওদের জন্যে চালু অবস্থায় অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছুটিয়ে কেটে পড়ল ওরা, আর ছেলেরা চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে, ঘুসি দেখাতে-দেখাতে ছুটল পিছু-পিছু। শয়তান জানে কী যে কাণ্ডটা বেধে গেল! আর ঠিক ওই সময়ে খালি-গাড়ি নিয়ে নতুন কলোনি থেকে ফিরল সেমিওন।'

কলোনির আঙিনায় এসে সদলবলে ঢুকলুম। কারাবানভ এতক্ষণে শান্ত হয়েছিল। আস্তাবলে ঘোড়াগুলোর সাজসজ্জা খুলতে-খুলতে আন্তনের বকাবকির জবাবে এবার কৈফিয়ত দিতে লাগল।

আন্তন বলছিল, 'তুই ঘোড়াগুলোরে দেখি মোটরগাড়ির মতন ব্যবহার করিস। দেখছিস, এমন দৌড় করিয়েছিস যে ঘোড়াগুলো ঘেমে গেছে।'

'বুঝছিস-না, আন্তন, এ-সময়ে কি ঘোড়াগুলার কথা মাথায় থাকে! ব্যাপারডা বুঝছিস-না তুই?' চোখ আর দাঁতে ঝিলিক তুলে জবাব দিল কারাবানভ।

'তোর বোঝার ঢের আগে বুঝে গেছি আমি — শহরে থাকতেই,' আন্তন বলল। 'তোরা তো দিব্যি দুপুরের খানা খেয়েছিস, আর ভাব্ দেখি, আমাদের নিয়ে মিলিত্শিয়ায় টানা-হেঁচড়া করেছে।'

সহকর্মীরা দেখলুম মারাত্মক ভয়ে শিটিয়ে আছেন সবাই। ইভান ইভানভিচের তো শয্যাশায়ী হয়ে পড়ার মতো হাল।

প্রায় খাবি খেতে-খেতে তিনি বললেন, 'ভাবুন একবার, আন্তন সেমিওনভিচ, ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারত? ছেলেদের মুখগুলো এমন হিংস্র হয়ে উঠেছিল — আমি তো ভাবলুম, এই বুঝি ছুরি-মারামারি শুরু হয়ে যায়। জাদোরভ শেষপর্যন্ত অবস্থা আয়ত্তে আনল — ও-ই একমাত্র মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছিল। ও-ই ওদের ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ওরা একেবারে শিকারী কুকুরের মতো হয়ে উঠেছিল, যা খেপে উঠেছিল আর যা চেঁচাচ্ছিল-না... উঃ!..'

ছেলেদের এ-নিয়ে আর ঘাঁটালুম না আমি। এমন ভাব দেখাতে চেষ্টা

করলুম যেন বিশেষ কিছুই ঘটে নি। ওরাও আর বিশেষ কোনো ঔৎসুক্য দেখাল না। সম্ভবত, ব্যাপারটাতে ওদের আর আগ্রহ ছিল না — গোর্কি কলোনির সদস্যরা প্রথমত এবং প্রধানত ছিল বাস্তববাদী, এবং ওদের আকর্ষণ করতে পারত একমাত্র সেই ব্যাপারই বাস্তবে যার প্রয়োগ সম্ভব ছিল।

জনশিক্ষা-দপ্তর থেকে আমাকে ডাকা হল না, নিজে উদ্যোগ নিয়েও সেখানে গেলুম না। তবে এ ঘটনার এক সপ্তাহ পরে শ্রমিক ও কৃষকদের জেলা পরিদর্শন-দপ্তরে কী-একটা কাজ পড়ল আমার। সেখানে যেতে চেয়ারম্যান তাঁর অফিসে ডেকে পাঠালেন। চের্নেঙ্কো ভাইয়ের মতো সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন আমায়।

হাত ধরে, হাতে চাপ দিতে-দিতে আর খুশিভরা চোখে আমায় দেখতে-দেখতে তিনি বলতে লাগলেন, 'আরে, বসো, দোস্ত, বসো! তোমার ওই ছেল্যারা তো দারুণ চিজ দেখি! জানো, শারিন আমারে যা বুঝায়্যেছিল তাতে আমি আশা কর্যেছিলাম গিয়ি দ্যাখব হতভাগা, দীনদুঃখী, কয়েক গণ্ডা বেচারারে, বোঝলে... তা, ওই কুত্তির বাচ্চাগুলান এমনভাবে আমাদেরে ঘির্যে ধরল-না — শয়তান, সাক্ষাৎ শয়তান একবারে! আর যেভাবে অরা তাড়া করল্য আমাদের — মাইরি, কী কব! শারিন খালি বস্যে-বস্যে বিড়বিড় করত্যেছিল: 'অরা আমাদেরে ধরতি পারবে মনে হয় না।' তা, আমি কলাম: 'গাড়ি যদি-না বিকল হয়, তাইলে।' ওঃ, একখান দেখার মতন জিনিস বটে! কতদিন এমন জবর মজা মেলে নাই। লোকেরে যখন আমি এই গপ্পো শোনালাম, হাসতি-হাসতি তাদের তো প্যাট ফাটি যাবার যোগাড় হল্য, অনেকে তো চেয়ার উলটিয়ে পড়্যেই গেল পেরায়...'

ওই মুহূর্তটি থেকে চের্নেঙ্কোর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব পাকা হয়ে গেল।

## ১৮

## গ্রামের সঙ্গে 'সংযোগসাধন'

ত্রেপ্‌কে তালুকের মেরামতির কাজ — দেখা গেল — অত্যন্ত জটিল আর কঠিন একটা ব্যাপার। তালুকটায় দালান ছিল অনেকগুলো, আর সেই সবগুলোকেই যত-না মেরামত করার দরকার ছিল তার চেয়ে বেশি দরকার

ছিল কার্যত ফিরেফিরতি নতুন করে তৈরি করার। অথচ অর্থের আমদানি আগাগোড়াই ছিল অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণ। জেলার সরকারি দপ্তরগুলির কাছ থেকে যে-সাহায্য পাওয়া যাচ্ছিল তা ছিল প্রধানত বাড়ি-তৈরির মালমশলা সরবরাহের নানা ধরনের হুকুমনামা। সেই সব হুকুমনামা আবার কিয়েভ, খার্কভ, ইত্যাদি বিভিন্ন শহরে নিয়ে যেতে হচ্ছিল আমাদের... আর উদ্দিষ্ট জায়গায় ওই হুকুমনামাগুলোকে গ্রহণ করা হচ্ছিল তাচ্ছিল্যভরে — কখনও প্রাপ্যের শতকরা দশভাগ মাত্র মালমশলা দেয়া হচ্ছিল আমাদের, কখনও একেবারে কিছুই সরবরাহ করা হচ্ছিল না। এমন কি খার্কভে বারকয়েক হাঁটাহাঁটি করার পর আধ-ট্রাকভরতি যে-কাচের সরবরাহ আদায় করতে সক্ষম হলুম তা-ও আমাদের শহরে পেঁছিতে-না-পেঁছিতে, রেলওয়ে থেকে মাল খালাস করার আগেই, আমাদের কলোনির চেয়ে বহুগুণ প্রভাবশালী অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বেমালুম হাতিয়ে নিলে।

টাকার টানাটানির জন্যে আমাদের পক্ষে জনমজুর নিয়োগ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ফলে প্রায় সব কাজই নিজেদের করতে হচ্ছিল। তবে এক যৌথ ছুতোরমিস্ত্রি-সংস্থার সাহায্যে কিছুটা কাঠের কাজ আমরা করিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছিলুম।

অবশ্য আর্থিক সম্বলের সন্ধান পেতে আমাদের খুব বেশি দেরি হল না। নতুন কলোনিতে প্রাচীন, ভাঙাচোরা গুদামঘর আর আস্তাবলের অভাব ছিল না। ত্রেপ্‌কে-ভাইরা একটা অশ্ব-প্রজনন প্রতিষ্ঠানও চালাত। এদিকে আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে তখনও পর্যন্ত ভালো জাতের ঘোড়ার প্রজননের ব্যাপারটা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাছাড়া, এমনিতেই ওই আস্তাবলগুলোর মেরামতি আমাদের আর্থিক সামর্থ্যে কুলোত না। কালিনা ইভানভিচের ভাষায়, 'ওয়া আমাগোর মতন মানুষির লেগ্যে নয়'।

ফলত, আমরা ওই দালানগুলো ভাঙতে আর ইটগুলো গাঁয়ের লোকেদের কাছে বিক্রি করতে শুরু করে দিলুম। ইট কেনার লোকের অভাব ঘটল না — কারণ, প্রতিটি আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন গৃহস্থের চুল্লী কিংবা মাটির নিচের ভাঁড়ার বানানোর দরকার পড়েই থাকে। তাছাড়া কুলাক-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরাও তাদের স্বভাবসিদ্ধ লোভবশত ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে নিছক এই আশায় ইট কিনে জমাতে লাগল।

আস্তাবলগুলো ভাঙার কাজ আমাদের ছেলেরাই করতে লাগল। যাবতীয়

পুরনো লোহালক্কড় কামারশালে গলিয়ে কোনোরকমে কাজ-চালানোগোছের গাঁইতি তৈরি হয়ে গেল। তারপর কাজ চলল পুরোদমে।

যেহেতু ছেলেরা অর্ধেক দিন বাইরে কাজ করত আর বাকি অর্ধেক সময় পড়াশুনো করে কাটাত, তাই নতুন কলোনিতে কাজ করতে যেত তারা দুই শিফ্‌টে। এই দুটো দল দুই কলোনির মধ্যে সত্যিকার কাজের লোকের মতোই চট্‌পট যাতায়াত করত বটে, তবে নিজস্ব খামার-বাড়ির উঠোন ছেড়ে হাওয়া খেতে হঠকারীর মতো বেরিয়ে আসা এক-আধটা মুরগির পেছনে ধাওয়া করে মধ্যে-মধ্যে এদিক-ওদিক যেতে তাদের কোনো বাধাও হোত না। এই ধরনের মুরগি ধরা, আরও বিশেষ করে ওই সব প্রাণীর মধ্যে উপ্ত খাদ্যজাত সবটুকু উত্তাপ পুরোপুরি আত্তীকরণের ব্যাপার এমন একটা জটিল প্রক্রিয়া যা নিষ্পন্ন করতে হলে দরকার পড়ে কর্মশক্তি, বিচক্ষণতা, ধীরস্থিরভাব আর উৎসাহ-উদ্দীপনার। আর, যেহেতু কলোনির ওই বাল-সদস্যবৃন্দ সবকিছু সত্ত্বেও সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে কিছু পরিমাণে জড়িত ছিল তাই আগুন ছাড়া তারা কাজ চালাতে পারত না বলে উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলি আরও জটিল রূপ ধারণ করত।

মোটের ওপর, নতুন কলোনিতে কাজ করতে যেতে হোত বলে প্রাক্তন কলোনির বাল-সদস্যবৃন্দ কৃষক-জগতের আরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেল। আর, ওই সময়েই, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বগুলির সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে আমাদের ছেলেরা কৃষক জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কেই, প্রথমত এবং প্রধানত, আগ্রহী হয়ে উঠল। আলোচ্য সময়ে তারা উপরোক্ত ভিত্তির সবচেয়ে নিকটবর্তীও হল বটে। বহুবিধ উপরিতলের আলোচনায় খুব গভীরভাবে প্রবেশ না-করেও বলা চলে, আমার রক্ষণাধীন ছেলেরা গিয়ে সরাসরি ভাঁড়ারঘর আর মাটির নিচের ঠাণ্ডা ভাঁড়ারে হানা দিতে লাগল এবং ওই সব ঘরে সংরক্ষিত সম্পদ তাদের সাধ্য অনুযায়ী যথাযোগ্য বিলি-ব্যবস্থায় মন দিল। তুচ্ছ মালিকানার মনোবৃত্তিতে আচ্ছন্ন জনসাধারণ তাদের এই সব ক্রিয়াকলাপে বাধা দেবে এই সম্ভাবনার কথা আগে থেকেই যথাযথভাবে অনুমান করে ছেলেরা দিনের সেই সব প্রহরে যখন এহেন প্রবৃত্তিনিচয় ঘুমিয়ে থাকে তখন - অর্থাৎ রাত্রিকালে - সংস্কৃতির ইতিহাস অনুধাবনে মনোনিবেশ করত। এবং, বৈজ্ঞানিক নীতিসমূহের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করে, একটা বিশেষ কালপর্যায়ে

ছেলেরা পুরোপুরি নিযুক্ত রইল মানবজাতির একটা একেবারে প্রাথমিক চাহিদা, অর্থাৎ খাদ্যের দাবি, পূরণে। অতএব, গ্রামের সঙ্গে সংযোগরক্ষার উদ্দেশ্যে গোর্কি কলোনি তার সংযোগ-বিন্দুগুলির সংক্ষিপ্ত পরিভাষার তালিকায় দুধ, টক ননি, চর্বি, মাংসর পিঠে, ইত্যাকার শব্দসমূহ যুক্ত করে নিল।

এমন বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্থিরীকৃত এই ব্যাপারটা যতক্ষণ পর্যন্ত কারাবানভ, তারানেত্স, ভোলখভ, অসাদ্চি এবং মিতিয়াগিনের মতো ছেলেদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, ততক্ষণ আমি অন্তত নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিতে পারছিলুম। কারণ, ওই ছেলেরা সবাই ওদের নিজ-নিজ কর্মক্ষেত্রে সিদ্ধহস্ত বলে এবং আদ্যন্ত নিপুণতার জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল। হয়তো কোনো এক সকালে গ্রামবাসীরা তাদের নিজ-নিজ সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত তত্ত্বতল্লাস সেরে অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পেঁছিত যে দু-জগ দুধ খোওয়া গেছে; শূন্য দুটো জগ বাইরে পড়ে থাকতে দেখে তাদের তল্লাসিজনিত সিদ্ধান্তের প্রমাণও হয়তো হাতেনাতে মিলে যেত। অথচ, মাটির নিচের ঠাণ্ডা ভাঁড়ারের তালা সব সময়েই দেখা যেত অটুট অবস্থায় রয়েছে, দরজা দুটোও যথারীতি বন্ধ, ছাদ অভগ্ন, বাড়ির কুকুরটা রাতে একবারের তরেও ডাকে নি, এবং চেতন-অচেতন সকল বস্তুই নিপট সরল বিশ্বাসের চোখ মেলে তাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ জগতকে সারা রাত নিরীক্ষণ করে গেছে।

কিন্তু যখন তরুণতররা বিশ্বের আদিতম সংস্কৃতির এই পাঠ গ্রহণ করতে শুরু করল ব্যাপারটা তখন দাঁড়িয়ে গেল সম্পূর্ণ অন্যরকম। তখন দেখা গেল দরজার তালাটা মালিকের চোখের সম্মুখীন হচ্ছে আতঙ্কে অসাড় হয়ে যাওয়ার লক্ষণ শরীরে বহন করে। সত্যি বলতে কী, প্রাক্তন ব্রেপ্কে তালুক পুনরুদ্ধারের কাজের জন্যে গোড়ায় উদ্দিষ্ট একখানা শাবলের চাড় খেয়ে যদি না-হয় তবে অন্তত একটা সব-খোল চাবির এলোপাতাড়ি হ্যাঁচকাহেঁচকির ফলে হয়তো দেখা গেল তালা-বেচারির খোদ জীবনটাই গেছে বরবাদ হয়ে। আর তখন গৃহস্থ-প্রভুর মনে পড়ে যায় যে তার কুকুরটা আগের রাত্রে শুধু-যে এক-আধটুকু ডেকেছিল তা-ই নয় ডাকতে-ডাকতে পাড়া একেবারে মাথায় করেছিল, আর অন্য কিছু নয় কেবল বিছানা ছাড়তে গৃহস্থের অনিচ্ছার কারণেই কুকুরটা তাৎক্ষণিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। ফলে তরুণতর সদস্যদের অ-দক্ষ ও শাদামাটা-ধরনের হস্তচালনা-

শিল্পের পরিণতি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই যা দাঁড়াল তা হল এই যে পূর্বোল্লিখিত কুকুরের ডাকে বিছানা-ছেড়ে-ওঠা কিংবা রাতের অনিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্যে সন্ধেবেলা থেকে আড়ালে-আবডালে ওত্-পেতে-থাকা ক্ষিপ্ত গৃহস্থের তাড়া খাওয়ার ফলে আতঙ্কজনিত কম্পনের অনুভূতি ব্যক্তিগতভাবে ওই ছেলেদের প্রত্যেককেই ভোগ করতে হল। আর এই শেষোক্ত ব্যাপারটাই আমার উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল। কেননা, বিফলমনোরথ তরুণতর সদস্যরা পড়ি-কি-মরি করে ছুট লাগাত কলোনির অভিমুখে (যে-ভুল তাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা কোনোদিনই করত না!), আর তাদের পশ্চাদ্ধাবনরত গৃহস্থও তাই করত। তারপর আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে অপরাধীকে তার হাতে তুলে দেয়ার দাবি জানাত লোকটি। কিন্তু অপরাধী ব্যক্তিটি ততক্ষণে শয্যা আশ্রয় করে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত, ফলে আমিও ছলাকলাশূন্য এই অতি নিরীহ প্রশ্নটি করার মতো সাহস সঞ্চয় করে ফেলতুম:

'আপনি কি ছেলেটিকে সনাক্ত করতে পারবেন?'

'আমি কী কর‍্যে সনাক্ত করব? আমি তো অরে শুধু এখানে দৌড়ায়্যে আসতি দেখ্যেছি।'

ক্রমশ আরও বেশি-বেশি ভালোমানুষ বনে গিয়ে এবার আমি হয়তো লোকটির মনে সন্দেহ জাগানোর চেষ্টায় বলতুম, 'চোর হয়তো আমাদের ছেলেদের কেউ নয়।'

'আপনেদের কেউ নয়? আপনেরা এখানে আস্তানা গাড়ার আগি এ-তল্লাটে এমনধারা কাণ্ডমাণ্ড আর কখনও ঘট্যেছে নাকি?'

লোকটি এরপর আঙুলের কড় গুনে-গুনে তার জানা এ-ধরনের ঘটনার তালিকা পেশ করা শুরু করত:

'গত রাতে মিরশ্‌নিচেঙ্কোর দুধ চুরি গ্যাচে; তার আগির রাত্তিরে স্তেপান ভের্‌খোলার তালা ভাঙা-অবস্তায় পাওয়া যায়; গত শনিবারি পিওত্‌র গ্রেচানির উঠান থ্যেকে দু-দুটা মুরগি উধাও হয়ি যায়; আর, এর আগের দিনি স্তোভ্‌বিনের বেধবা -- কার কথা কচ্চি বোঝত্যেছেন নিচ্চয়ই? -- বাজারে নিয়ি যাবার জন্যি দুই টব-ভরতি টক ননি তৈয়ের কর‍্যে রেখ্যেছিল, তা সে দুঃখী মেয়্যাছেলেটা তার মাটির নিচির ঠাণ্ডা ভাঁড়ারে গিয়ি দ্যাখে কী, সব বাসন-পত্তর বিলকুল উপুড় কর‍্যে রাখা আর পুরা টক ননিডাই উধাও।

এছাড়া, ভাসিলি মোশ্‌চেঙ্কো, ইয়াকভ ভের্‌খোলা, আর ওই কুঁজো-লোকডা... কী যেন অর নাম?.. হ্যাঁ, নেচিপর মোশ্‌চেঙ্কো, অদের সকলেরই...'

'কিন্তু এসব-যে আমাদের ছেলেরা চুরি করেছে তার প্রমাণ?'

'পের্‌মানের কথা কচ্চেন? বাইরি বেরায়্যে আমি নিজির চক্ষি দেখলাম, ছেল্যাগুলান ছুট্যে এখানে পলায়্যে এয়্যেল, বোঝলেন তো! তাছাড়া, অরা বাদে আর কে এ কম্মো করতি পারে? আপনের ছেল্যারা ত্রেপ্‌কে যাওয়ার পথে সবকিছু ঢুঁড়্যে বের করতি-করতি যায়...'

ওই সময়ের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা সম্পর্কে আমার আগেকার প্রশ্রয়ের মনোভাব আর অতটা ছিল না। গাঁয়ের লোকেদের এহেন বিপাকে পড়তে দেখে মায়া হচ্ছিল, তাছাড়া এ-ব্যাপারে আমার সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থার কথা নিজের কাছেই স্বীকার করতে অসম্ভব রাগ ধরছিল, মনে-মনে ভয়ও পাচ্ছিলুম যথেষ্ট। আমার পক্ষে বিশেষ করে এটা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে কলোনিতে কী-যে ঘটছিল তার সবকিছুর খবর পর্যন্ত আমার গোচরে ছিল না; আর এর ফলে প্রতিটি ব্যাপারে আমার সন্দেহের সীমা-পরিসীমাও ছিল না। তাছাড়া তার আগের শীতকালের নানা ঘটনার কারণে আমার স্নায়ুমণ্ডলীও তখন কিছুটা বিপর্যস্ত অবস্থায়।

আপাতদৃষ্টিতে কলোনিতে সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল বলে মনে হচ্ছিল। দিনের বেলায় ছেলেরা সবাই কাজ আর পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকছিল, সন্ধেবেলায় যোগ দিচ্ছিল হাসিঠাট্টা আর আমোদপ্রমোদে, রাত্রে সবাই যথারীতি শুতে যাচ্ছিল, আর পরদিন ভোরবেলায় জেগে উঠছিল খুশিমনে, সন্তুষ্টচিত্তে। অথচ গভীর রাত্রে অভিযানও চলছিল গাঁয়ে। বড় ছেলেরা আমার ক্রুদ্ধ ধমকানি শুনে যাচ্ছিল বিনম্রভাবে, চুপচাপ করে। এরপর কয়েক দিনের জন্যে কৃষকদের অভিযোগ-অনুযোগ একটু হয়তো কমত, আর তারপরই অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ফের তাদের বিরুদ্ধাচরণ শুরু হয়ে যেত নতুন করে।

বড় শড়কে রাহাজানি তখনও পর্যন্ত চলতে থাকায় আমাদের অবস্থা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ওই রাহাজানির ধরনটা অবশ্য সে-সময়ে কিছুটা পালটে গিয়েছিল। ডাকাতরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে টাকাকড়ি যত-না কেড়ে নিত তার চেয়ে বেশি করে নিত খাদ্যসামগ্রী, তা সে যত সামান্য পরিমাণেই

পাওয়া যাক-না কেন। প্রথম-প্রথম আমি ভাবতুম, এটা বোধহয় আমাদের ছেলেদের কাজ নয়, কিন্তু গ্রামবাসীরা ব্যক্তিগত আলাপের সময় বেশ জোর দিয়েই বলত:

'আরে না, মশয়। এয়া নিচ্চয়ই আপনের ছেল্যাদের কম্মো। একবার ওয়াদের ধরতি পারল্যে হয়, আচ্ছা কর্য়ে উত্তম-মধ্যম দিলি পরে তখন পেত্যয় যাবেন, হাঁ।'

ছেলেরা কিন্তু প্রাণপণে আমাকে আশ্বস্ত করার প্রয়াস পেত।

'অরা মিথ্যা কথা কচ্চে — ওই কুলাক-ব্যাটারা! হতি পারে আমাদের এক-আধডা ছোঁড়া কখনও-সখনও ওয়াদের ভাঁড়ারে গিয়ি হানা দেয়... এমনডা খুবই হতি পারে। কিন্তু সদর রাস্তায় রাহাজানি - রামোঃ, কখ্খনো-না!'

বুঝতে পারছিলুম, ছেলেরা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করে যে তাদের মধ্যে কেউ বড় রাস্তায় রাহাজানির ব্যাপারে জড়িত থাকতে পারে না। এও বুঝতে পারছিলুম যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছেলেদের কাছে এ-ধরনের রাহাজানি অ-সমর্থনীয় বলে গণ্য। এটা জেনে আমার স্নায়বিক উত্তেজনা তখনকার মতো কিছু পরিমাণে কমল বটে, কিন্তু তার পরেই আবার নতুন গুজব কানে আসায় এবং গাঁয়ের মুখপাত্রদের সঙ্গে পরের বার মোলাকাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা আবার চাগিয়ে উঠল।

আর তারপর এক সন্ধেবেলা একেবারেই আচমকা এক প্ল্যাটুন অশ্বারোহী মিলিত্‌শিয়া এসে হাজির হয়ে গেল কলোনিতে। আমাদের এজমালি শোবার ঘরগুলোর দরজায়-দরজায় সান্ত্রী বসে গেল পাহারায়। ব্যাপক খানাতল্লাসি শুরু হয়ে গেল। আমার নিজের অফিস-ঘরে আমাকেও অন্তরীণ করে রাখা হল, আর মিলিত্‌শিয়ার পক্ষে এইটেই হয়ে দাঁড়াল কাল। আমাদের ছেলেরা মিলিত্‌শিয়ার লোকেদের সঙ্গে ঘুসোঘুসি শুরু করে দিল; তারপর ঘরগুলো থেকে জানলা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে চলে এল। ইতিমধ্যেই অন্ধকারে ঢিল-ছোড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল, এবং উঠোনের কোণে কোণে হাতাহাতি লড়াই চলছিল। আস্তাবলের সামনে সারি-দিয়ে-দাঁড়-করানো ঘোড়াগুলোর ওপর রীতিমতো একটা দল ঝাঁপিয়ে পড়ল, ফলে ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি করে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। চেঁচামেচি, ঝগড়াঝাঁটি আর প্রচণ্ড

ধাক্কাধাক্কির পর কারাবানভ হুড়মুড় করে আমার অফিস-ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে বলল:

'যত শিগ্‌গিরি পারেন বেরায়্যে আসেন — নাইলে সাংঘাতিক সব্বোনাশ হয়্যে যাবে-নে!'

ছুটে উঠোনে বেরনোমাত্র রাগে ক্ষিপ্তপ্রায় একদল ছেলে আমাকে ঘিরে ধরল। অসম্ভব রাগে ওরা যেন টগবগ করে ফুটছিল। জাদোরভ তো হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতোই ছট্‌ফট করছিল।

ও চেঁচিয়ে বলল, 'এ কি শেষ হবে না, নাকি? ওরা আমায় জেলে পাঠাতে চায় তো পাঠাক, দেখে-শুনে আমার ঘেন্না ধরে গেল!.. আমি কি গ্রেপ্তার হয়েছি, না, না? গ্রেপ্তার যদি হয়ে থাকি তো, কেন? এই তল্লাসি কিসের জন্যে? সবকিছুতে-যে ওরা নাক গলাচ্ছে, ব্যাপারটা কী?..'

সন্ত্রস্ত প্ল্যাটুন-কম্যান্ডার তা সত্ত্বেও কর্তৃত্ব ফলানোর চেষ্টা ছাড়ল না।

'আপনার ছাত্রদের বলুন, এই মুহূর্তে এজমালি শোবার ঘরগুলোয় চলে গিয়ে যার-যার বিছানার ধারে দাঁড়াতে।'

'কিসের ভিত্তিতে আপনি এই খানাতল্লাসি করছেন?' আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলুম।

'সে আপনার জানার কথা নয়। আমার ওপর নির্দেশ আছে।'

'এখুনি কলোনি ছেড়ে চলে যান বলছি।'

'আপনার এ-কথার মানে?'

'জেলা জনশিক্ষা-দপ্তর-প্রধানের অনুমতি ছাড়া আমি আপনাকে কিছুতেই এখানে খানাতল্লাসি করতে দেব না। বুঝেছেন — কিছুতেই দেব না! দরকার হলে তল্লাসি বন্ধ করার জন্যে আমি শক্তিপ্রয়োগ পর্যন্ত করব!'

এই সময়ে একটি ছেলে চেঁচিয়ে বলল, 'সাবধান, দ্যাখবেন শেষে আমরা-না আপনেদের খানাতল্লাসি করি!' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাজখাঁই গলায় আমি তাকে ধমক লাগালুম:

'চোপরও!'

অবশেষে প্ল্যাটুন-কম্যান্ডার শাসিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, দেখা যাক, আপনার চাল বদলানো যায় কিনা...'

চারপাশে নিজের লোকজনকে জড় করে ফেলল কম্যান্ডার। তারপর ছেলেদের সাহায্যে (ছেলেরা ইতিমধ্যেই তাদের স্বাভাবিক হাসিখুশিভাব

ফিরে পেতে শুরু করেছিল) ঘোড়া খুঁজে পেয়ে ওরা চলে গেল। ছেলেদের হাসি-টিটকিরির ফুলঝুরি ঝরতে লাগল ওদের পেছনে।

শহরে গিয়ে মিলিত্শিয়ার কে যেন একজনের নামে একখানা তিরস্কারনামা সংগ্রহ করে ফেললুম। কিন্তু এই খানাতল্লাসির পর অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে ঘটনার-পর-ঘটনা ঘটতে শুরু করল। গ্রামবাসীরা একদিন অত্যন্ত চটেমটে আমার কাছে এসে শাসাতে লাগল। চেঁচিয়ে বলল:

'গতকাল সদর রাস্তায় আপনের ছেল্যারা ইয়াভ্তুকের ইস্তিরির কাছ থ্যেকে মাখম আর চর্বি কাড়্যে নিয়ি গেছে।'

'মিথ্যা কথা!'

'হ্যাঁ, নিচ্চয় কর্যেছে! কেবল চক্ষের উপর ও টুপি টান্যে দিছিল, যাতে কেউ অরে চিনতি না-পারে।'

জিজ্ঞাসা করলুম, 'ছেলেদের কতজন ছিল ওখানে?'

'মেয়্যাছেলেডা তো বলত্যেছে, একজনাই ছেল। আপনের ছেল্যাদেরই একজনা। অরা যেমনধারা কোট গায়ি দেয়, ছেল্যাডার পরনে অমনি কোট ছেল।'

'বিলকুল মিথ্যা কথা! আমাদের ছোঁড়ারা অমনধারা কাজকম্মে মাথাই গলায় না।'

গ্রামবাসীরা ফিরে গেল। একান্ত মনমরা হয়ে আমরা চুপ করে রইলুম। হঠাৎ কারাবানভ ফুঁসে উঠে বলল:

'মিথ্যা কথা, আমি আপনেরে বলত্যেছি — বিলকুল মিথ্যা কথা! কেউ এ-কাজ করলি আমরা নিচ্চয়ই জানতি পারতাম...'

অনেক আগে থেকেই ছেলেরা আমার উদ্বেগের অংশীদার হয়েছিল। এমন কি মাটির নিচের ভাঁড়ারে হানা দেয়ার ব্যাপারটাও যেন কমে এসেছে মনে হচ্ছিল। গোধূলি ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্টপূর্ব, অভিনব, শোকাবহ ও অপমানজনক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এই আশঙ্কায় সমস্ত কলোনি যেন পঙ্গু হয়ে পড়েছে বলে মনে হোত তখন। কারাবানভ, জাদোরভ, বুরুন এজমালি শোবার ঘরগুলোয় ঘুরে-ঘুরে বেড়াত, উঠোনের সবচেয়ে অন্ধকার কোণগুলোয় আতিপাতি করে খুঁজত কী-যেন, জঙ্গলগুলো তোলপাড় করে তুলত। ওই সময়টায় আমার স্নায়ুতন্ত্র যতখানি খারাপ অবস্থায় ছিল এমন আর জীবনে কখনও থাকে নি।

আর তারপরই...

এক সন্ধেবেলা আমার অফিস-ঘরের দরজা দড়াম করে খুলে গেল। একদল ছেলে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিল প্রিখোদ্‌কোকে। ছেলেটার জামার কলার চেপে ধরে কারাবানভ সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে তাকে আমার টেবিলের দিকে ঠেলে দিল:

'এ-ই সেই!'

শ্রান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী, আবার ছুরি ধরেছে বুঝি?'

'ছুরি? মোটেই নয়! সদর রাস্তায় ও-ই ডাকাতি করত্যেছে!'

হঠাৎ মনে হল বিশ্ব-সংসার যেন হুড়মুড়িয়ে আমার ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়ল। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁপছিল প্রিখোদ্‌কো। যান্ত্রিকভাবে ওকে শুধোলুম:

'কথাটা সত্যি?'

মাটির দিকে চোখ রেখে, প্রায় শোনা-যায়-না এমন গলায় ফিস্‌ফিসিয়ে বললে প্রিখোদ্‌কো, 'হ্যাঁ।'

এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে একটা যেন বিপর্যয় ঘটে গেল। হঠাৎ আমার মুঠোয় একটা রিভলবার চলে এল।

বলে উঠলুম, 'চুলোয় যাক সব!.. তোমাদের নিয়ে আর আমার কিছু করার নেই!..'

কিন্তু রিভলবারটা রগের দিকে তাক করে তোলার আগেই একদল ছেলে মহা সোরগোল তুলে, কাঁদতে-কাঁদতে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

যখন জ্ঞান ফিরল দেখি আমার ওপর ঝুঁকে আছেন একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না এবং জাদোরভ ও বুরুন। অফিস-ঘরের টেবিল আর দেয়ালের মাঝখানটাতে মেঝের ওপর শুয়ে আছি আমি, সারা-গা জলে ভেসে যাচ্ছে। আমার মাথাটা ধরে ছিল জাদোরভ। একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার দিকে চোখ তুলে ও হঠাৎ বলল:

'একটু ওদিকে যান -- ছেলেরা... ওরা হয়তো প্রিখোদ্‌কোকে মেরে ফেলবে...'

শুনে মুহূর্তের মধ্যে লাফ দিয়ে উঠে আমি উঠোনে বেরিয়ে এলুম। অচৈতন্য, রক্তাক্ত অবস্থায় অবশেষে প্রিখোদ্‌কোকে খুঁজে পাওয়া গেল।

# ১৯

## জরিমানা-জরিমানা খেলা

সময়টা ছিল ১৯২২ সালের গ্রীষ্মের প্রারম্ভ। কলোনিতে কেউ আর প্রিখোদ্‌কোর অপরাধের উল্লেখ পর্যন্ত করল না। অন্য ছেলেরা ওকে প্রচণ্ড মার দিয়েছিল, ফলে দীর্ঘদিন ওকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল, আর আমরাও ওকে কোনো প্রশ্ন করে আর জ্বালাতন করি নি। পরে আমি জেনেছিলুম, ও যা করছিল তার মধ্যে এমন কিছু অভিনবত্ব বা বৈশিষ্ট্য ছিল না। প্রিখোদ্‌কোর কাছে কোনো অস্ত্রও পাওয়া যায় নি।

কিন্তু সব সত্ত্বেও প্রিখোদ্‌কো-যে সত্যিকার ডাকাত ছিল এতে কোনো ভুল নেই। আমার অফিস-ঘরের সেই প্রায়-বিপর্যয় কাণ্ড এবং ওর নিজের বিড়ম্বনা সইতে হওয়া, কোনো কিছুই ওর মনে রেখাপাত করে নি। এর পরেও কলোনিতে বহু অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটিয়েছিল। আবার ওই একই সঙ্গে প্রিখোদ্‌কো ওর নিজের ধরনে কলোনির প্রতি অনুগত ছিল, শাবল কিংবা কুড়ুলের ঘায়ে কলোনির যে-কোনো শত্রুর মাথা ভাঙতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না ওর। ও ছিল অসম্ভব সীমিত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, সব সময়েই সর্বশেষ ধারণার প্রভাবে আচ্ছন্ন, ভোঁতা মস্তিষ্কে যখন যা ঢুকত তারই প্রভাবে চলত। অথচ, প্রিখোদ্‌কোর চেয়ে ভালো কাজের ছেলেও আর কেউ ছিল না। কঠিনতম কাজও ওকে দমাতে পারত না। তাছাড়া প্রবল বেগে কুড়ুল কিংবা হাতুড়ি চালাতে ও ছিল ওস্তাদ — তা সে প্রতিবেশীর মাথা ভাঙা ছাড়া অন্য কাজে দরকার হলেও।

পূর্বোক্ত দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর কলোনির সদস্যারা কৃষকদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করল। আমাদের নানা ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার কারণ হওয়ার ফলে ছেলেরা ওদের ক্ষমা করতে পারছিল না। আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম, একমাত্র আমার প্রতি মায়াবশতই ওরা কৃষকদের ওপর দারুণ দৌরাত্ম্য করা থেকে নিবৃত্ত থাকছিল।

কৃষক-সমাজ ও তাদের পেশা এবং এই পেশাকে মর্যাদাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমার এবং আমার সহকর্মীদের আলাপ-আলোচনা ছেলেরা কখনই তাদের চেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল বা বেশি অভিজ্ঞ মানুষের কথা হিসেবে

গ্রহণ করে নি। ওরা মনে করত এ-সব ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান যৎসামান্য — ওদের চোখে আমরা ছিল্ম নিতান্তই শহ্রে ব্দ্ধিজীবী, যারা নাকি ব্ঝতে অপারগ যে কৃষকরা কতখানি অপ্রীতির কারণ হতে পারে।

'আপনেরা অদের চিনেন না। অরা-যে কী চিজ তা আমরাই জানি, এর জন্যি আমাদেরে অনেক ম্ল্য দিতি হয়েছে। আধা-পাউন্ড র্টির জন্যি অরা মান্ষির গলা পের্যন্ত কাটতি রাজি আছে। অদের কাছ থ্যেকে কোনো কিছ্ একবার আদায়ির চেষ্টা করেন তো দেখি... গোলায়-জমা ফসল পচাব্যে তব্ ভুখা মান্ষিরে র্টির এট্টা টুকরা দিবে না পের্যন্ত।'

'আমরা না-হয় ডাকাত আছি — ঠিক আছে, আমরা ডাকাতই! তব্ অন্যায় কাজ করলি আমরা ব্ঝি যে অন্যায় কর্যেছি, আর তার জন্যি আমরা — কী বলে — ক্ষমাও পায়্যে থাকি। আমরা সবই ব্ঝি। কিন্তু অরা — কারো তোয়াক্কা করে নাকি অরা! অদের মতে, জারও খারাপ ছেল, সোভিয়েত সরকারও খারাপ। সেই লোকজনারেই ওরা ভালো বিবেচনা করে যারা নাকি অদের কাছে কিছ্ই চায় না উলটা অদেরই সবকিছ্ মাগনা দিয়া দ্যায়। অরা ম্জিক — বোঝলেন তো, হ্ঃ-হ্ঃ বাবা, আর কিছ্ নয়!'

চিরকালের শহ্রে লোক ব্র্ন বলত, 'ওহ্, ওই ম্জিকগ্লারে দ্টি চক্ষে দেখতি পারি না! অদের দেখলি চোখ টাটায় আমার — সব কয়ডারে গ্লি কর্যে যদি মারতি পারতাম!'

বাজারে গিয়ে ব্র্নের একটা প্রিয় খেলা ছিল এই রকম। গাড়ির কাছে দাঁড়ানো, চারপাশে ঘ্রে-বেড়ানো শহ্রে দ্বৃর্ত্তদের দিকে অপ্রসন্ন চোখে তাকিয়ে-থাকা কোনো গ্রামবাসীর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করা:

'আপনে কি ডাকাত?'

ফলে সতর্ক পাহারার কথা ভুলে গ্রামবাসীটি হয়তো চটেমটে বলত:

'অ্যাঁ? কী?'

'অ, আপনে তো ম্জিক!' বলেই ব্র্ন হাসতে-হাসতে গাড়ির-ওপর-বসানো বস্তাটার দিকে হয়তো অপ্রত্যাশিতভাবে বিদ্যুদ্‌বেগে এগিয়ে যেত। 'আরে, দ্যাখেন, দ্যাখেন, খ্ড়ামশায়!'

সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীটির ম্খে হয়তো গালাগালির খৈ ফুটত। আর ঠিক এইটিই চাইত ব্র্ন — ঐকতান বাজনার আসরে সমঝদার শ্রোতা যেভাবে স্র উপভোগ করে সেইভাবে ও গালাগালি উপভোগ করত।

কোনো সংকোচ না-করেই বুরুন আমাকে বলত:

'আপনে এখানে না-থাকলি অরা ঠেলাখান টের প্যেত-নে।'

কৃষকদের সঙ্গে আমাদের অ-বন্ধুসুলভ সম্পর্কের একটি প্রধান কারণ ছিল এই যে আমাদের কলোনিটা ছিল পুরোপুরি কুলাকদের খামারগুলো দিয়ে ঘেরা। অন্যপক্ষে গন্‌চারোভ্‌কা গ্রামের প্রায় সব বাসিন্দাই ছিল সত্যিকার শ্রমজীবী কৃষক। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে তখনও পর্যন্ত গন্‌চারোভ্‌কা ছিল অনেক দূরে। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীরা — মুসি কার্‌পভিচ আর ইয়েফ্রেম সিদরভিচের মতো লোকজনেরা — সবাই বাস করত নিরাপদে, আরামে, পরিচ্ছন্ন ছাউনির নিচে, চুনকাম-করা কুঁড়েঘরে। আর ওদের বাড়িগুলো ঘেরা থাকত ডালপালার বেড়ায় নয়, সত্যিকার বেড়ায়, আর কেউ যাতে বেড়া টপকে ভেতরে ঢুকে না-পড়ে সে-বিষয়ে সদা-সতর্ক থাকত ওরা। যখনই ওরা কলোনিতে আসত, খাজনা সম্পর্কে অনবরত অভিযোগ-অনুযোগ করে তখনই আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলত। ওরা প্রায়ই ভবিষ্যদ্বাণী করত যে এই ধরনের নীতি নিয়ে সোভিয়েত সরকার নাকি কখনই টিঁকতে পারে না। অথচ, একই সঙ্গে চমৎকার সব মন্দা ঘোড়ায়-টানা গাড়ি হাঁকাত ওরা, ছুটির দিনগুলোয় সামগোনের বন্যা দিত বইয়ে, ওদের স্ত্রীরা নতুন ছাপা-কাপড়ের পোশাকের গন্ধ আর টক ননি আর পনিরের পিঠের সৌরভ গায়ে মেখে ম-ম করে ঘুরে বেড়াত। আর ওদের ছেলেরা ছিল বিয়ের পাত্র হিসেবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ঝলমলে প্রেমিক হিসেবে তুলনারহিত। তাদের মতো অমন নিখুঁত কাটছাঁটওয়ালা কোট, অমন নতুন-নতুন কালচে-সবুজ রঙের চুড়োওয়ালা টুপি, শীত-গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই চমৎকার চকচকে সব গালশের আবরণ-দেয়া অমন আয়নার মতো ঝকঝকে বুটজুতো আর কারো চোখে দেখারও সৌভাগ্য হয়ে উঠত না।

কলোনির বাচ্চা বাসিন্দারা আমাদের প্রতিটি পড়শির আর্থিক অবস্থার কথা ভালোভাবেই জানত। এমন কি ওই সব পড়শির প্রতিটি বীজবোনা আর ফসল-কাটা যন্ত্রের অবস্থাও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানত তারা। কারণ, ওই সব যন্ত্রের অংশ বদলানো বা যন্ত্র মেরামত করার কাজ সর্বদা আমাদের কামারশালে বসে ওই ছেলেরাই করত। তাছাড়া, কুলাকরা যাদের ঘনঘন, এমন কি প্রাপ্য বেতন পর্যন্ত না-দিয়েও, নির্মমভাবে বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিত সেই অসংখ্য রাখাল ও জনমজুরদের দুর্ভাগ্যের কথাও আমাদের ছেলেদের অগোচর ছিল না।

সত্যি কথা বলতে কি, আমার রক্ষণাধীন ছেলেদের প্রভাবে পড়ে আমি নিজেও বাড়ির গেট আর বেড়ার আড়ালে আরামে মাথা-গোঁজা ওই কুলাক-জগতটার প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিলুম।

তবু, তা সত্ত্বেও, কুলাকদের সঙ্গে অনবরত ঝগড়া-বিবাদ বাধতে থাকায় অস্বস্তি বোধ করছিলুম। ওই ঝগড়া-বিবাদের সঙ্গে গ্রামের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের শত্রু-সম্পর্কটাও যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। লুকা সেমিওনভিচ ত্রেপ্‌কের জমিটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেও নতুন কলোনি থেকে আমাদের খেদিয়ে দেবার আশা একেবারে ছাড়েন নি। ময়দা-কলটা আর গোটা ত্রেপ্‌কে তালুক যাতে গ্রাম-সোভিয়েতের হাতে তুলে দেয়া হয় তার জন্যে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মুখে অবশ্য বলছিলেন ওখানে একটা ইশ্‌কুল প্রতিষ্ঠাই নাকি তাঁর উদ্দেশ্য। শহরে ও'র আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে অবশ্য উনি নতুন কলোনির বার-বাড়িগুলোর একখানা কিনে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। ও'র উদ্দেশ্য ছিল ওই বার-বাড়িখানা গাঁয়ে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই আক্রমণ আমরা ঠেকালুম হাতের ঘুসি আর বেড়ার খোঁটার হাতিয়ারের জোরে; তবে শহরে গিয়ে ওই বিক্রি-কবালা বাতিল করাতে আর বার-বাড়িখানা-যে লুকা সেমিওনভিচ ও তাঁর আত্মীয়দের জ্বালানি-কাঠের প্রয়োজন মেটাতে কেনা হয়েছে এটা প্রমাণ করতে আমাকে যারপরনাই বেগ পেতে হল।

লুকা সেমিওনভিচ ও তাঁর বশংবদ ব্যক্তিরা কলোনির বিরুদ্ধে অগুনতি নালিশ-ফরিয়াদ শহরে লিখে-লিখে পাঠাচ্ছিলেন, নানা সরকারি দপ্তরে গিয়ে আমাদের গালিগালাজ করছিলেন। ও'দেরই জিদের ফলে মিলিত্‌শিয়া-বাহিনী আমাদের কলোনিতে সেবার হানা দিয়েছিল।

এরও বেশ কিছু আগে শীতকালের দিকে একদিন সন্ধেবেলা লুকা সেমিওনভিচ হুড়মুড় করে আমার ঘরে ঢুকে রীতিমতো মেজাজি চালে দাবি জানিয়েছিলেন:

'কামারশালে কাজের জন্যি গাঁয়ের মান্‌ষির কাছ থ্যেকে ট্যাকা-পয়সা যা আপনেরা পান তার হিসাব-পত্তর যে-খাতায় রাখেন সেডা আমারে একবার দ্যাখান দেখি।'

'বেরিয়ে যান!' জবাবে আমি বলেছিলুম।

'তার মানে?'

'বেরিয়ে যান এখান থেকে!'

বলা বাহুল্য, টাকা-পয়সার কী গতি হয়েছে তা জানার ব্যাপারে আমার মুখচোখের ভঙ্গি বড়-একটা সাফল্যের ইঙ্গিত দিচ্ছিল না, তাই আর বাক্যব্যয় না-করে লুকা সেমিওনভিচ সেদিন আস্তে-আস্তে সরে পড়েছিলেন। তবে, এরপর থেকে তিনি আমার এবং আমাদের সমস্ত সংগঠনের পয়লা নম্বরের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অপরপক্ষে, কলোনির বাচ্চা সদস্যরাও তাদের অল্পবয়সী আবেগের তীব্রতা নিয়ে লুকাকে অত্যন্ত ঘৃণা করত।

জুন মাসের এক উত্তপ্ত দুপুরে হ্রদের অপর পারে দিকচক্রবাল ঘেঁষে একদিন রীতিমতো একটা মিছিল নজরে পড়ল। মিছিলটা ক্রমে যখন কলোনির আরও কাছে এল আমরা তখন তার জন-সমষ্টির খুঁটিনাটি লক্ষ্য করতে সমর্থ হলুম। হতবাক হয়ে দেখলুম — দু-জন মুজিক অপ্রিশ্‌কো আর সরোকাকে দেহের সঙ্গে হাতবাঁধা-অবস্থায় ধরে আনছে।

যে-কোনো বিচারেই অপ্রিশ্‌কো ছিল প্রাণবন্ত, তেজি ছেলে। কলোনিতে একমাত্র আন্তন ব্রাত্‌চেঙ্কো ছাড়া আর কাউকেই সে ভয় পেত না। ব্রাত্‌চেঙ্কোর অধীনে ও কাজ করত, দরকার মনে করলে ব্রাত্‌চেঙ্কোই একমাত্র ওকে ধমক-ধামক দিত। অপ্রিশ্‌কো অবশ্য আন্তনের চেয়ে অনেক বড়সড় আর বেশি বলশালীও ছিল। কিন্তু, আমাদের হেড-সহিসের প্রতি ওর সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য শ্রদ্ধা-ভালোবাসা এবং হেড-সহিসের মাতব্বরি ভাবভঙ্গির প্রতি তন্ময় আকর্ষণ ওকে ওর শারীরিক শক্তির সুযোগ গ্রহণে বাধা দিত। বাকি ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার সময় অপ্রিশ্‌কো অবশ্য পুরোদস্তুর মর্যাদা নিয়ে চলত, কাউকে কখনও নিজের ওপর মাতব্বরি করতে দিত না। ওর চমৎকার নরম মেজাজ ছিল ওর সপক্ষে। কারণ, সব সময়েই ও হাসি-মস্করা নিয়ে থাকত আর হৈ-হল্লা নিয়ে আছে এমন ছেলেদের সঙ্গ ছাড়া আর কিছুই চাইত না। তাই, কলোনির সেই সব কোণেই ওকে পাওয়া যেত কোনোরকম নোংরামি-ইতরামি আর বিরস বদন যার কাছেপিঠে ঘেঁষত না। কলোনিতে আসার আগে গোড়ার দিকে ও কিছুতেই কোলেক্‌তর* ছেড়ে আসতে চায় নি। ফলে আমাকে নিজেকে গিয়ে ওকে কলোনিতে নিয়ে আসতে হয়। যেদিন আমি ওকে আনতে যাই সেদিন ওখানে পেঁৗছে দেখি ও বিছানায় শুয়ে, মুখেচোখে বিরক্তির ভাব মাখানো।

* কোলেক্‌তর -- রাস্তার অনাথ ছেলেদের জন্যে সাময়িক আশ্রয়-শিবির। — অনুঃ

আমাকে বলল, 'আপনে যে-চুলায় ইচ্ছা যাতি পারেন। আমি এ-জায়গা ছাড়্যে কোথাও লড়ত্যেছি না!'

ওর নাটুকে, গ্রাম্ভারি স্বভাবের কথা জানা ছিল, তাই ওর সঙ্গে কথা বলার সময় প্রথম থেকেই আমি যথোপযুক্ত ভঙ্গির আশ্রয় নিলুম।

বললুম, 'স্যর, আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু আমার ওপর ন্যস্ত দায়িত্বভার আমাকে বাধ্য করছে একথা বলতে যে আপনার জন্যে তৈরি শকটে দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।'

আমার এই 'মধ্যযুগীয় বীরোচিত সম্ভাষণ'-এ অপ্রিশ্‌কো প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল, এমন কি বিছানা ছেড়ে ওঠার একটা ভঙ্গিও করল যেন। কিন্তু পরমুহূর্তে ওর আগের মতলবটাই ফের মাথা চাড়া দিগে উঠল, ফলে আবার ও মাথাটা বালিশের ওপর নামিয়ে নিল।

'আমি তো বল্যেছি, আমি যাত্যেছি না!..'

'সেক্ষেত্রে, সম্মানিত মহাশয়, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি বাধ্য হব আপনাকে বলপ্রয়োগে নিয়ে যেতে।'

অপ্রিশ্‌কো এবার ওর কোঁকড়া চুলে-ভরা মাথাটা বালিশ থেকে তুলে একেবারে নির্ভেজাল বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল:

'ঈশ্বরের দোহাই, কোথা থ্যেকে আপনে উদয় হলেন কন তো? আপনে কি মনে করেন আমারে গায়ির জোরে ধর্য্যে নিয়ি যাওয়া অতই সোজা?'

'মনে রাখবেন...'

গলাটাকে ভয়-দেখানোর মতো যথাসম্ভব গম্ভীর করে বলতে শুরু করলুম, সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে এককোঁটা শ্লেষের রসও দিলুম মিশিয়ে:

'...প্রিয় অপ্রিশ্‌কো...'

আর এরপরই হঠাৎ গর্জন করে উঠলুম:

'এ্যা-ই, ওঠো শিগ্‌গিরি! এখনও শুয়ে আছ কী করতে, শুনি? নারকী কোথাকার! ওঠো, ওঠো বলছি!'

হঠাৎ বিছানা ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে ও জানলার দিকে দৌড়ল।

চিৎকার করে বলল, 'জানলা দিয়ি লাফায়্যে নিচি পড়ব্য। ক্ষ্যামতা থাকলি ধরেন দিকি আমারে। এই লাফ দিত্যেছি!'

'হয় এই মুহূর্তে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়,' আমি তাচ্ছিল্যের স্বরে বললুম, 'আর নয়তো গাড়িতে গিয়ে ওঠ — তোমার সঙ্গে খেলা করবার সময় নেই আমার।'

আমরা ছিলুম তিনতলায়। ফলত, অপ্রিশ্‌কো খুশি হয়ে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল।

বলল, 'আপনের হাত থ্যেকে নিস্তার নাই দেখত্যেছি।.. তা কী করা যায়? আপনেই কি গোর্কি কলোনির ডিরেক্টর?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'তা, আগি আমারে এ-কথা বলেন নাই ক্যানে? তাইলে সেই কখন আপনার সাথে চল্যে যাতাম।'

সঙ্গে সঙ্গে যাবার জন্যে জোর তোড়জোড় শুরু করে দিল।

কলোনিতে থাকতে ও অন্য ছেলেদের প্রত্যেক ধরনের ক্রিয়াকলাপে যোগ দিত, তবে কখনই কোনো ব্যাপারে নেতৃত্ব নিত না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হোত, ওই সব ব্যাপারে লাভের চেয়ে মজার সন্ধানই ছিল ওর লক্ষ্য।

অপ্রিশ্‌কোর চেয়ে বয়সে ছোট ছিল সরোকা। গোলমতো, সুন্দর মুখের অধিকারী সরোকা ছিল একেবারে নিরেট নির্বোধ, কথাবার্তায় অসাব্যস্ত, তাছাড়া ছেলেটা ছিল অস্বাভাবিক-রকমের দুর্ভাগা। যে-কাজই করতে যেত তাতেই পস্তাতে হোত ওকে। তাই ছেলেরা যখন দেখল যে অপ্রিশ্‌কোর পাশে-পাশে হাত-বাঁধা অবস্থায় ও আসছে, তখন ভারি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল:

'সরোকার সাথে দ্মিত্রি-যে কিসের জন্যি নিজিরে জড়াত্যে গেল কে জানে?'

মিছিলটার অপর দু-জন অংশীদার ছিলেন গ্রাম-সোভিয়েতের চেয়ারম্যান-সাহেব আর আমাদের পুরনো বন্ধু মুসি কার্‌পভিচ।

মুসি কার্‌পভিচকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন নির্যাতিত নিষ্পাপ ব্যক্তির একখানি প্রতিমূর্তিবিশেষ। লুকা সেমিওনভিচ আসছিলেন বিচারকসুলভ ধীরস্থির ভঙ্গিতে, চালচলনে সরকারি কর্মচারীর ঔদাসীন্য জাহির করতে-করতে। ও'র লালচে দাড়ি ছিল পরিচ্ছন্নভাবে আঁচড়ানো, কোটের তলা থেকে উ'কি দিচ্ছিল কল্‌কাদার ঝকঝকে শাদা কামিজ। স্পষ্ট বোঝা গেল উনি সবেমাত্র গির্জে থেকে ফিরছিলেন।

চেয়ারম্যান-সাহেবই প্রথম শুরু করলেন।

বললেন, 'ছেল্যাপিলাদের আপনে চমৎকার মানুষ করতিছেন বটে।'

'আমি কীভাবে মানুষ করি না-করি তাতে আপনার কী?'

'আমার কী তাই বলতিই তো এস্যেছি — অদের জন্যি মানষির সুখশান্তি সব গোল্লায় গ্যাচে-যে — অরা রাস্তাঘাটে রাহাজানি করত্যেছে, মানষির যথাসব্বস্ব চুরি করত্যেছে।'

'বলি, অ খুড়ামশয়! অদের অমনে আষ্টেপৃষ্ঠে বান্ধ্যে রাখার অধিকার আপনারে কে দেছে?' কলোনি-ছেলেদের ভিড়ের ভেতর থেকে একটা গলা ভেসে এল।

'উনি ভাবত্যেছেন পুরানো রাজত্বিই রয়ি গেছে বুঝি...'

'ওনারেই শায়েস্তা করা দরকার হয়্যে পড়্যেছে...'

'তোমরা চুপ কর তো!' ধমক দিয়ে বললুম। তারপর আগন্তুকদের দিকে ফিরে আবার বললুম, 'ব্যাপারটা কী ঘটেছে বলুন দেখি?'

এবার মুসি কার্‌পভিচ গপ্পের খেই ধরল।

'আমার ইস্তিরি একখান শায়া আর একখান কম্বল বেড়ার গায়ি মেল্যে দিছিল। অরা দুইজনা তখন পাশ দিয়ি যেত্যেছিল। পরক্ষণেই দেখি কী, জিনিস দুডা গায়েব হয়্যে গেছে। তা, অদের পিছনে তাড়া লাগালাম, দেখ্যে অরাও দৌড় দিল। বলেন দেখি, আমি কী অদের মতন অত জোরে ছোটতি পারি নাকি! ভাগ্যে ঠিক সেই সময় লুকা সেমিওনভিচ গির্জা থ্যেকে বারি হয়ে আসত্যেছিলেন, তাই তো আমরা অদেরে পাকড়াও করলাম...'

'তা, অদেরে বান্ধ্যে রাখ্যেছেন ক্যানে?' জনতার ভেতর থেকে আবার গলা শোনা গেল।

'যাতে অরা পলাত্যে না পারে। আবার ক্যানে...'

'ওসব কথা এখানে আলোচনা না-করল্যেও চলবে,' চেয়ারম্যান বাধা দিয়ে বললেন। 'চলেন, জবানবন্দী একখান লেখ্যে ফেলা যাক।'

'জবানবন্দী না-লিখলেও চলবে। ওরা কি জিনিসগুলো ফেরত দিয়েছে?'

'দেছে তো হয়্যেছেটা কী? জবানবন্দী নিচ্চয় লেখতি লাগবে।'

আমাদের অপদস্থ করার জন্যে চেয়ারম্যান-সাহেব আগে থেকেই কোমর বেঁধে এসেছিলেন, তাছাড়া ব্যাপারটাও ওঁর অনুকূলে ছিল — কেননা, সেই প্রথম কলোনির ছেলেরা হাতেনাতে ধরা পড়েছিল।

আমাদের পক্ষে অবস্থাটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এজাহার লেখা মানেই ছিল ছেলেদের নির্ঘাত জেল-খাটা আর কলোনির কপালে অনপনেয় কলঙ্ক লেপা।

বললুম, 'দেখুন, ছেলে দুটি এই প্রথমবার ধরা পড়ল। পড়শিতে-পড়শিতে নানা ধরনের ঝুট-ঝামেলাই তো ঘটে থাকে! প্রথম অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া উচিত।'

'না,' লাল-চুলো লোকটি বললেন। 'ক্ষ্যামা করা চলে না! চলেন, আপিসে গিয়ি এজাহার লেখ্যে নেন!'

মুসি কার্পভিচ পুরনো দিনের কথা তুলল:

'আপনের স্মরণ আছে, এক রাত্তিরে আমারে ধর্য়োছিলেন? আমার কুড়ালখান তো এখনও আপনেদের হেফাজতে আছে — আর জানেন তো আমারে কী পরিমাণ জরিমানা দিতি হয়্যোছিল!'

এ-কথার আর কোনো জবাব ছিল না। না, এড়িয়ে যাওয়ার কোনো পথ ছিল না। কুলাকরা আমাদের ধরাশায়ী করে ফেলেছিল। বিজয়ীপক্ষকে পথ দেখিয়ে অফিস-ঘরে নিয়ে যেতে-যেতে ক্ষোভে চেঁচিয়ে ছেলেদের বললুম:

'কেমন, এবার ল্যাজে-গোবরে হয়ে গেছ তো? গোল্লায় যাও সব! এবার কী, না শায়া চুরি! ছি-ছি, এ-লজ্জা কী ভোলবার... এবার দেখছি হতচ্ছাড়া ছেলেগুলোকে বেত লাগাতে হবে। আর ওই গর্দভ দুটোকে জেলে যেতে হবে এবার।'

ছেলেরা চুপ করে রইল। সত্যিই ওরা 'ল্যাজে-গোবরে' হয়ে গিয়েছিল।

শিক্ষা-বিজ্ঞান-বহির্ভূত উপরোক্ত কথাগুলো বলে আমিও অফিস-ঘরের দিকে চলে গেলুম।

দু-ঘণ্টা ধরে চেয়ারম্যানের কাছে কাকুতিমিনতি করলুম আমি, কেবল হাতে-পায়ে ধরতেই যা বাকি রাখলুম। কথা দিলুম, আর কখনও এমন জিনিস ঘটবে না, গ্রাম-সোভিয়েতের জন্যে তৈরির দামে চাকার ধুরো বা অক্ষদণ্ডসহ একজোড়া নতুন চাকা বানিয়ে দিতেও রাজি হয়ে গেলুম। অবশেষে চেয়ারম্যান-সাহেব তাঁর চরম শর্ত পেশ করলেন:

'ছেল্যারা নিজিরাই আমারে ছাড়্যে দিতি বলুক!'

ওই দু-ঘণ্টায় চেয়ারম্যানের ওপর আমার সারা জীবনের মতো ঘেন্না জন্মে গেল। কথাবার্তা যখন চলছিল তখনই থেকে-থেকে মনের মধ্যে এই

রক্তপিপাসু চিন্তাটা চমকে-চমকে যাচ্ছিল — হয়তো কোনোদিন অন্ধকারের মধ্যে চেয়ারম্যান-সাহেব ধরা পড়ে যাবেন, আর তখন যদি উনি মার খান, আমি অন্তত ওঁকে বাঁচাতে ছুটব না।

এড়িয়ে যাবার অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু অন্য কোনো পথ মিলল না। অগত্যা, গাড়িবারান্দার নিচে ছেলেদের সারি দিয়ে দাঁড়াতে বললুম। কর্তৃপক্ষ বেরিয়ে এসে সিঁড়ির ওপর দাঁড়ালেন। স্যালুটের ভঙ্গিতে টুপিতে হাত ছুঁইয়ে আমি কলোনির পক্ষ থেকে জানালুম যে আমাদের কমরেডদের ভুলের জন্যে আমরা গভীরভাবে দুঃখিত। ওদের হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনাও করলুম। তারপর প্রতিজ্ঞা করলুম, ভবিষ্যতে এ-ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না। অতঃপর লুকা সেমিওনভিচ নিচের বক্তৃতাটি ঝাড়লেন:

'এ-ধরনের কাজির জন্যি আইন-অনুযায়ী নিঃসন্দেহে সবথ্যেকে কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত, কারণ গেরামবাসীরা নিঃসন্দেহে খাট্যে-খাওয়া মানুষ। অতএব, কোনো গেরামবাসী যদি মেয়্যাদের একখান স্কার্ট বেড়ায় মেলেও দেয় আর তোমরা তা নিয়ি নেও, তাইলে বোঝতে হবে তোমরা জনগণের শত্তুর, প্রলেতারিয়েতের শত্তুর। সোভিয়েত সরকারের কাছ থ্যেকে দায়িত্ব পায়্যেছি আমি, বে-আইনী কাজ-কারবার — তার অর্থ, যে-কোনো ডাকাত কিংবা অপরাধী তার যা খুশি তাই হাতাব্যে — তা কোনোমতেই হতি দিতি পারি নে। আর তোমাদের উপরোধ-অনুরোধ, আর কথা-দেয়া, আর হেন-তেন সাত-সতারো, তার ফল যে কী দাঁড়াব্যে তা ভগমানই জানে। তা, তোমরা যদি কোমর পের্‌যন্ত নুয়্যে সেবা দাও, আর অদেরে ছাড়্যে দিতি বল আর তোমাদের ডিরেক্টর যদি কথা দেন যে চোর-ডাকাত তৈয়ের না-কর্যে সৎ নাগরিক কর্যে তোমাদেরে গড়্যে তোলবেন... তাইলেই একমাত্তর বিনাশর্তে তোমাদেরে ক্ষ্যামা করতি পারি।'

অপমানে, রাগে আমি তখন থরথর করে কাঁপছি। ওদিকে অপ্রিশ্‌কো আর সরোকা মড়ার-মতো-ফ্যাকাশে মুখে কলোনির বাচ্চা বাসিন্দাদের সারিতে দাঁড়িয়ে আছে।

অতঃপর চেয়ারম্যান-সাহেব আর মুসি কার্‌পভিচ আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। জাঁকালো ভঙ্গিতে গুটিকতক ভালো-ভালো কথাও বলে গেলেন। কিন্তু তার কিছুই আমার কানে ঢুকল না।

'সারবন্দী দাঁড়ানো খতম!'

জ্বলন্ত সূর্য কলোনির মাথার ওপর এসে দাঁড়াল, তারপর চোখ-ধাঁধানো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। পুদিনা-পাতার গন্ধে ম-ম করতে লাগল পৃথিবীর মাটি। বায়ুস্রোত স্তব্ধ হয়ে গিয়ে বনের গাছপালার ওপর ঝুলে রইল দৃঢ় নীলাভ পর্দার মতো।

আমার চারপাশে তাকিয়ে দেখলুম... সেই একই কলোনি, একই আয়তক্ষেত্রাকার দালানগুলো, সেই এক ছেলেরা, আর আসচে কাল থেকে সবই আবার একভাবে ফিরে-ফিরতি শুরু হয়ে যাবে — মেয়েদের পরনের শায়া, চেয়ারম্যান-সাহেব, মুসি কার্পভিচ, নিরানন্দ মাছি-ভন্ভন শহরে যাওয়া আর আসা, যাওয়া আর আসা... ঠিক সামনেই ছিল আমার ঘরের দরজা, ঘর, ক্যাম্পখাট, রঙ না-করা টেবিল, আর টেবিলের ওপর এক প্যাকেট সরু ফালি-করে-কাটা তামাক।

'কী করা যায়? কী করি আমি? কী করি?'

জঙ্গলের পথ ধরলুম।

দুপুরবেলা পাইন-বনে ছায়া পড়ে না। কিন্তু সে-বনে সবকিছুই সর্বদা এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর সাজানো-গোছানো যে বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার পথ দেখা যায়, আর পরিচ্ছন্নভাবে-সাজানো মঞ্চে যেমনটি দেখা যায় তেমনই আকাশের নিচে একহারা পাইনগাছগুলো সার বেধে চমৎকার শৃঙ্খলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে।

যদিও বনের মধ্যেই ছিল আমাদের বাস তবু এর আগে আর কখনও আমি ওই বনের গভীরে ঢুকেছিলুম কিনা সন্দেহ। মানুষকে নিয়েই ছিল আমার কারবার, আর সেই কাজ নির্মমভাবে আমাকে বেঁধে রেখেছিল টেবিল-টেবিলে, লেদ-মেশিনে, গুদামে আর এজমালি শোবার ঘরগুলোয়। পাইন-বনের নৈঃশব্দ্য আর বিশুদ্ধতা, পাইন-আঠার সৌরভে মাতোয়ারা বাতাস — এ-সবকিছুর একটা নিজস্ব মোহিনী-শক্তি ছিল। মনে হচ্ছিল, এ-জায়গা ছেড়ে আর কখনও কোথাও যাব না, যেন এইখানেই পরিণত হয়ে যাব পাতলা একহারা, জ্ঞানী, সৌগন্ধ্যে-ভরপুর একটা গাছে, আর আকাশের নিচে এই পরিশীলিত, সুমার্জিত গাছের সমাজে গাছ হয়ে থেকেই যাব।

হঠাৎ পায়ের নিচে মট করে একটা ডাল ভাঙল। চমকে উঠে চারিদিকে তাকালুম — আরে, মনে হল সমস্ত বনটাই যেন কলোনির বাচ্চা বাসিন্দায় ভরে গেছে। গাছের গুঁড়ির থামের আড়ালে-আড়ালে গলিপথে সতর্কভাবে ওরা

এগোচ্ছিল, আর বনের একেবারে দূর-দূর ফাঁকা জায়গাগুলো দিয়ে ছুটে-ছুটে আমার কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছিল।

আশ্চর্য হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে ওরাও যে-যার জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে সন্ধানী, তীক্ষ্ম চোখে আমাকে দেখতে লাগল। মনে হল, সে-চোখে একধরনের স্তম্ভিত আতঙ্ক জমাট বেঁধে আছে।

'তোমরা এখানে কী করছ? আমার পিছুই-বা নিয়েছ কেন?'

তখন আমার সবচেয়ে কাছাকাছি ছিল জাদোরভ। একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ও প্রায় রূঢ়স্বরেই বলল:

'কলোনিতে ফিরে চলুন।'

কথাটা শোনামাত্র এক মুহূর্তের জন্যে যেন হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল।

'কেন? কলোনিতে কী হল আবার?'

'কিছুই না... চলুন, ফিরে যাই।'

'আরে, ধুত্তোর, খোলসা করে বলই-না কী বলতে চাও!'

দ্রুত হেঁটে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। অন্য দু-তিনটি ছেলেও কাছে এগিয়ে এল। অন্যেরা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। জাদোরভ ফিস্‌ফিস করে বললে:

'আমরা ফিরে যাব, তবে যদি একটা কাজ করেন।'

'ব্যাপারটা কী? কী চাও, বল তো?'

'আপনার রিভলবারটা দিন।'

'আমার রিভলবার?'

আচমকা মাথায় খেলে গেল, ও কী বলতে চাইছে। সঙ্গে সঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠলুম:

'ওহ্‌-হো, আমার রিভলবারটা চাই? নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই. সানন্দে! সত্যি, তোমরা ভারি মজার ছেলে তো! আরে তেমন ইচ্ছে থাকলে আমি তো গলায় দড়ি দিতে পারি, কিংবা হ্রদের জলে ঝাঁপও দিতে পারি।'

হঠাৎ প্রচন্ড শব্দ করে হেসে উঠল জাদোরভও।

'ঠিক আছে, তাহলে ওটা আপনার কাছেই রাখুন! আমাদের কেন যেন মনে হল যে... ও, আপনি তাহলে বেড়াচ্ছিলেন? ঠিক আছে, বেড়ান তাহলে। এই ছেলেরা, ফিরে চল্‌!'

আসলে, ব্যাপারটা ঘটেছিল এইরকম।

আমি যখন বনের পথ ধরলুম সরোকা তখন দৌড়ে এজমালি শোবার ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে বলেছিল:

'ওহ্, ছেল্যারা! ওহ্, দোস্তরা! শিগ্গির, শিগ্গির, জঙ্গলে চল! আন্তন সেমিওনভিচ নিজিরে গুলি করতি যাচ্ছেন...'

আর, ওর কথা শেষ হবার আগেই ছেলেরা সবাই দৌড়ে এজমালি শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

সন্ধেবেলায় সকলকেই অস্বাভাবিক-রকমের অপ্রস্তুত মনে হল — একমাত্র কারাবানভই ভাঁড়ামি করে বেড়াচ্ছিল, আর বিছানাগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে আচ্ছন্নের মতো নাচনকোঁদন জুড়েছিল। মন-দুর্বল-করে-দেয়া তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসছিল জাদোরভ, আর কেন যেন শেলাপুতিনের ছোট্ট ফুটফুটে মুখখানি নিজের গায়ের সঙ্গে চেপে-চেপে ধরছিল। আর নাছোড়বান্দার মতো রহস্যময় নিস্তব্ধতা বজায় রেখে বুরুন আমার পাশে-পাশে থাকছিল, কিছুতেই অন্যত্র যাচ্ছিল না। ওদিকে অপ্রিশ্কো হিস্টিরিয়ার রোগীর মতো খ্যাপামি জুড়েছিল, কোজিরের ঘরে তার বিছানায় শুয়ে চোখের জলে নোংরা বালিশটা ভাসাচ্ছিল। আর ছেলেদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কোথায় গিয়ে যেন লুকিয়ে ছিল সরোকা।

একসময়ে জাদোরভ বললে:

'আসুন, জরিমানা-জরিমানা খেলা যাক!'

আর সত্যিই আমরা তারপর জরিমানা-জরিমানা খেলা খেলতে লাগলুম। শিক্ষাদান-সংক্রান্ত বিজ্ঞানও কখনও-কখনও বিচিত্র রূপ ধারণ করে --- যেমন, বলতে গেলে প্রায়-ছেঁড়া জামাকাপড়-পরা ও অর্ধাশনে থাকা চল্লিশটি ছেলের পক্ষে যতটা খুশি থাকা সম্ভব ততটা হাসিখুশি হয়ে একটামাত্র তেলের কুপির আলোয় জরিমানা-জরিমানা খেলা... একমাত্র এ-খেলায় যেমন রীতি সেই চুম্বনটাই ছিল অনুপস্থিত।

## ২০

## ঘোড়ার বদলে ফসলকাটাই যন্ত্র

বসন্তকাল লাগাদ ঘোড়ার সমস্যা আমাদের প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলল। 'খোকাবাবু' আর 'ডাকাতনী'-কে দিয়ে কাজ চলছিল না, ওদের দিয়ে কোনো কিছু করানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। আর প্রতিদিন ভোরবেলা থেকে

আস্তাবলে বসে কালিনা ইভানভিচ প্রতিবিপ্লবী বক্তৃতা ঝেড়ে যাচ্ছিল, উলটোপালটা পরিচালনা আর জন্তু-জানোয়ারের প্রতি নিষ্ঠুরতার দায়ে সোভিয়েত গভর্নমেন্টের ওপর দোষারোপ করে।

ও বলত, 'যদি খামারই চালাইতে চাও তাইলে সত্য-সত্য ঘোড়ার যোগান দিতে হইব, অবোলা জীবের উপর জবরদস্তি কইরলে চলব না। তাত্ত্বিক বিচারে অবশ্য এয়ারে ঘোড়াই কইতে লাগে, কিন্তু বাস্তবে এয়া তো সব্বদাই পইড়্যা-পইড়্যা যাইতেছে, আর তখন এয়ার দিকে তাকাইলেই দুঃখ লাগে, এয়ারে দিয়া কাম করান তো কোন্ ছার।'

এ-ব্যাপারে ব্রাত্‌চেঙ্কোর মনোভাব ছিল জলের মতো সরল। ছেলেটা ঘোড়াগুলোকে নিছক ঘোড়া বলেই ভালোবাসত, আর ওর ওই প্রিয় জীবগুলোর ওপর বাড়তি কোনো কাজ চাপালেই খেপে উঠত আর নয়তো মর্মান্তিক দুঃখিত হোত। এ-ব্যাপারে সব রকমের পীড়াপীড়ি আর ধমকধামকের জবাবে সবাইকে চুপ করিয়ে দেয়ার মতো একটি যুক্তিই ও শেষপর্যন্ত মোক্ষম অস্ত্রের মতো ছাড়ত। তা হল:

'লাঙ্গল ঠেলবে কী করে, শুনি? লাঙ্গল নিয়ে কেমন নাস্তানাবুদ হও তাই আমি দেখতে চাই একবার...'

কালিনা ইভানভিচের বক্তৃতার যে-তাৎপর্য ও বুঝেছিল তা হল, ঘোড়াগুলোকে দিয়ে একেবারেই কোনো কিছু না-করানোর নির্দেশ। আর আমরাও ওকে এ-নিয়ে বেশি পীড়াপীড়ি করতে চাইছিলুম না। নতুন কলোনিতে আস্তাবলগুলো ইতিমধ্যে মেরামত করা হয়ে গিয়েছিল, বসন্তের শুরুতেই লাঙল দেয়া আর বীজবোনার জন্যে ঘোড়া দুটোকে সেখানে স্থানান্তরিত করার দরকার ছিল। কিন্তু স্থানান্তরিত করার মতো ঘোড়াই তো ছিল না।

একদিন শ্রমিক ও কৃষকদের জেলা পরিদর্শন-দপ্তর-প্রধান চের্‌নেঙ্কোর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে আমাদের অসুবিধের কথাটাও তুললুম। বললুম — চাষের যন্ত্রপাতি যা-আছে তা দিয়ে অন্তত বসন্তকালটা আমরা কোনোরকমে চালিয়ে দিতে পারব, কিন্তু ঘোড়ার অভাব মেটাব কী করে? ষাট দেসিয়াতিনা জমি, বড় কম নয়! আর আমরা যদি এবার চাষ করতে আর বীজ বুনতে না-পারি তাহলে গ্রামবাসীরা যা হৈ-হল্লা শুরু করবে তা আর কহতব্য নয়!

ব্যাপারটা নিয়ে এক মুহূর্ত ভাবল চের্নেঙ্কো, তারপর হঠাৎ আনন্দে লাফিয়ে উঠল:

'এক সেকেন্ড! আমার এখানে এট্টা সরবরাহ বিভাগ আছে-না! বসন্তকালে আমাদের অতগুলান ঘোড়ার দরকারডা কিসির? আমি তোমারে আপাতত তিনডা ঘোড়া দিব, তাতে আমাদের ঘোড়ার খাই-খরচাও বাঁচ্যে যাবে-নে, আর সপ্তা ছয় বাদে ঘোড়াগুলারে ফিরত দিলিই চলব্যে। আমাদের সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজারের সাথে কথা কও-না গিয়ি।'

শ্রমিক ও কৃষকদের জেলা পরিদর্শন-দপ্তরের সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজার লোকটি দেখা গেল অত্যন্ত কড়া আর বিষয়ী। ঘোড়াগুলোর ভাড়াবাবদ তিনি বেশ মোটা দামই চাইলেন — প্রতি মাসে পাঁচ পুদ হিসেবে গম আর ওঁদের দু-চাকার গাড়ির জন্যে একজোড়া চাকা। বললেন:

'আপনেদের তো গাড়ির চাকা-বানানোর কামারশাল আছে, তাই না?'

'আপনি কি আমাদের জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নিতে চান নাকি? জানেন, আমরা কারা?'

'আরে, আমি মশয় সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজার, দানছত্রের মালিক নই। বোঝলেন? আমাদের ঘোড়াগুলারে একবার দ্যাখেন-না আপনে! আমি হল্যে তো দুনিয়ার কোনোকিছু বদলি আপনেদের হাতে অদেরে দিতাম না — আমি তো জানি, আপনেরা অদেরে খাটায়্যে মারব্যেন, দফারফা কর্যে দিবেন অদের। আমার কী আর জানতি কিছু বাকি আছে! পুরা দুই বচ্ছর লাগ্যেছে আমার ঘোড়াগুলারে ঢুঁড়্যে বার করতি। অরা নিছক ঘোড়া না, বোঝলেন, অরা হুরী-পরী!'

যাই হোক, দরকার পড়লে লোকটিকে মাসে একশো পুদ করে গম আর শহরের সব ক-খানা গাড়ির জন্যে চাকা বানিয়ে দেয়ার শর্তেও আমি রাজি হয়ে যেতুম। যে-করে হোক ঘোড়া আমাদের তখন নিতেই হোত।

সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজার একখানি প্রতিলিপিসহ একটা চুক্তিপত্রের খসড়া করে ফেললেন, তাতে সবকিছুই বেশ জাঁকালো আর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সন্নিবিষ্ট হল:

> '... অতঃপর ইহাতে 'কলোনি' নামে উল্লিখিত হইবে... পূর্বোক্ত চাকাগুলি একটি বিশেষ কমিশন দ্বারা গৃহীত হইবার পর এবং

এ-ব্যাপারে একখানি উপযুক্ত একরারনামা লিখিত হইলে পর শ্রমিক ও কৃষকদিগের জেলা পরিদর্শন-সংস্থার সরবরাহ-বিভাগের হস্তে সেগুলি অর্পিত হইল বলিয়া গণ্য হইবে... অশ্বগুলি প্রত্যর্পণ করার নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর প্রতিটি অতিরিক্ত দিনের জন্য কলোনি শ্রমিক ও কৃষকদিগের জেলা পরিদর্শন-সংস্থার সরবরাহ-বিভাগকে অশ্বপিছু দশ পাউন্ড করিয়া গম দিতে সম্মত থাকিল... এই দলিলনামায় উল্লিখিত শর্তাবলী পূরণে কলোনি অসমর্থ হইলে যে-ক্ষতি হইবে তাহার পাঁচ গুণ মূল্যের সম-পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে উক্ত কলোনি বাধ্য থাকিল...'

পরদিন কালিনা ইভানভিচ আর আন্তন মহা আড়ম্বরে, বিজয়গর্বে গাড়ি হাঁকিয়ে কলোনিতে ঢুকল। আমাদের বয়ঃকনিষ্ঠ ছেলেরা সেদিন সকাল থেকেই ওদের আসার প্রত্যাশায় ঘর-বার করছিল; শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ সারা কলোনিই অধীর আগ্রহে ছিল ওদের প্রতীক্ষায়। শেলাপুতিন আর তোস্‌কা ছিল এ-ব্যাপারে সবচেয়ে ভাগ্যবান — বড় শড়কেই ওরা ঘোড়ার শোভাযাত্রার সাক্ষাৎ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দু-জনে দুটো ঘোড়ার পিঠে চেপে বসেছিল। কালিনা ইভানভিচ বেচারা না-পারছিল হাসতে না-পারছিল কথা বলতে — ওর সমস্ত হাবভাবে এতখানি গুরুত্বের ভাব এবং গরিমা ঠিকরে বেরুচ্ছিল। আর আন্তন তো আমাদের দিকে মুখই ফেরাচ্ছিল না — আমাদের গাড়িখানার লেজে-বাঁধা তিনটে কালো ঘোড়া ছাড়া আর সব জীবন্ত প্রাণীই ওর কাছে তখন তাৎপর্য হারিয়ে বসেছিল।

হাঁচোড়পাঁচোড় করে গাড়ি থেকে নেমে, কোটের গা থেকে খড়ের টুকরো ঝেড়ে ফেলতে-ফেলতে কালিনা ইভানভিচ আন্তনকে বলল:

'তুমিই অগো দেখাশোনা কইর‍্যো, ঠিক-ঠিক রাখনের ব্যবস্থা কইর‍্যো, কেমন? মনে রাইখ্যো, অরা কিন্তু 'ডাকাতনী'-র মতন মামুলি ঘোড়া না।'

সঙ্গে সঙ্গে আন্তনও তার সহকারীদের হুড়মুদুড়ুম হুকুম করা শুরু করে দিল, আগে যারা ছিল ওর প্রাণের প্রিয় সেই ঘোড়াগুলোকে সবচেয়ে দূরের আর সবচেয়ে কম সুবিধাজনক স্টলগুলোয় ভরে দিতে লাগল, আর কেউ কৌতূহলী হয়ে আস্তাবলে উঁকি দেয়ার চেষ্টা করলে তাকে মারবার

ভয় দেখাতে লাগল জিন আটকানোর বেল্‌ট্‌ দিয়ে। কালিনা ইভানভিচের কথার জবাবে ও বেশ সমবয়স্ক মুরুব্বির চালে গম্ভীরভাবে বলল:

'এখন সত্যিকার ঘোড়ার সাজপোশাক কিছু যোগাড় কর‍্যে দ্যান দেখি, কালিনা ইভানভিচ, এই ভুষি মাল দিয়ি তো কাজ চলব্যে না!'

নতুন-আনা ঘোড়াগুলোর সব কটাই ছিল কালোরঙের, বেশ উঁচু আকারের আর হৃষ্টপুষ্ট। ওদের নামগুলোর মধ্যেই ছেলেরা একধরনের আভিজাত্যের গন্ধ পাচ্ছিল। ঘোড়া তিনটের নাম ছিল 'সিংহ', 'বাজপাখি' আর 'মেরী'।

'সিংহ' কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে আমাদের হতাশ করল। ভারি সুশ্রী চেহারার মদ্দা ঘোড়া 'সিংহ' চাষবাসের কাজে মোটেই অভ্যস্ত ছিল না, সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ত। দমও কম ছিল ওর। অপরপক্ষে 'বাজপাখি' আর 'মেরী' ছিল সব দিক থেকেই উপযুক্ত — ওরা যেমন ছিল শক্তপোক্ত, তেমনই শান্ত, আবার তেমনই সুশ্রী দেখতে। এটা সত্যি যে এই ঘোড়াগুলোকে গাড়িতে জুতে টবগবগিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে আমাদের জাঁকজমকে শহরের অন্য সব কোচোয়ানকে ম্লান করে দেয়ার যে-স্বপ্ন আন্তন দেখছিল শেষপর্যন্ত তা সফল হল না বটে, কিন্তু লাঙল এবং বীজবোনার যন্ত্র টানার কাজে ওরা চমৎকার ফল দেখাচ্ছিল। প্রতিদিন সন্ধেবেলায় সেদিন কতটা জমি চষা হল আর কতটা জমিতে বীজ বোনা হল তার রিপোর্ট দিতে গিয়ে কালিনা ইভানভিচ মুখে ঘোঁৎঘোঁৎ আওয়াজ করে নিজের খুশির জানান দিতে লাগল। কেবল একটিমাত্র জিনিস যা তাকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল তা হল ওই ঘোড়াগুলোর মালিকদের উঁচু সরকারি পদমর্যাদা।

প্রায়ই বলত ও, 'বুঝছি, সবই তো ভালো, ক্যাবল শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন-দপ্তরের সাথে আপনেগো জড়াইয়া ফেলা খুবই খারাপ কাম হইছে। অগো যা খুশি তাই করবার পারে অরা। আর তার লেগ্যে নালিশ-ফরিয়াদ করতে যামু কোথায়? শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন-দপ্তরে?'

নতুন কলোনিতে জীবনের স্পন্দন অনুভূত হতে শুরু করল। একখানা দালান ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছিল, কলোনির ছ-টি বাচ্চা বাসিন্দাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা হল। বাচ্চারা ওখানে একাই রয়ে গেল, বয়স্কদের রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই, এমন কি ওদের রান্না করে দেবার লোকও রইল না। তবু, আমাদের ভাঁড়ারগুলো থেকে যা-কিছু খাবারদাবার সংগ্রহ করতে পারল তা-ই নিয়ে এবং ফল-বাগানে একটা ছোট স্টোভে নিজেদের সাধ্যমতো

রান্নাবান্না করে ওরা রয়ে গেল। ফল-বাগান আর বাড়ি-তৈরির কাজ পাহারা দেয়া, কলমাকের খেয়া-পারাপারের দায়িত্ব নেয়া এবং আস্তাবলের কাজ ওদের দায়িত্বের মধ্যে অর্শাল। ব্রাত্‌চেঙ্কোর প্রতিনিধি হিসেবে অপ্রেশ্‌কোর তত্ত্বাবধানে নতুন কলোনির আস্তাবলে দ্বটো ঘোড়া রাখা হল। আন্তন নিজে আদি কলোনিতে থাকা স্থির করেছিল; সেখানে লোক বেশি ছিল, ফলে প্রাণচাঞ্চল্যও ছিল সেখানে বেশি। নতুন কলোনিতে ও অবশ্য প্রতিদিন পরিদর্শনে যেত। আর ওর এই পরিদর্শনের ব্যাপারটাকে শুধু অপ্রেশ্‌কো আর তার সহকারীরাই নয়, কলোনির সব বাসিন্দাই রীতিমতো ভয়ের চোখে দেখত।

নতুন কলোনির আবাদে এই সময়ে প্রচণ্ড কাজ চলছিল। প্বরো ষাট দেশিয়াতিনা জমিতেই বীজ বোনা হয়েছিল। এটা সত্যি যে এই কাজে চাষবাস-সম্পর্কিত কোনো বিশেষ দক্ষতা কিংবা খেতগুলো নিয়ে সঠিক কোনো পরিকল্পনার পরিচয় কিছুমাত্র ছিল না, তবু তা সত্ত্বেও, বসন্ত আর শীতের ফলনে দু-রকমের গম, বাজরা আর জই সবই বোনা হয়েছিল। তাছাড়া অল্প কয়েক দেশিয়াতিনা জমিতে রোয়া হয়েছিল আলু আর বীটের চারা। এর জন্যে এই শেষোক্ত জমিতে আগাছা নিড়নো আর উঁচু করে মাটির আল-বাঁধার দরকার ছিল, আর এই সব কাজ ঠিক-ঠিক করার জন্যে আমাদের যথেষ্ট পরিশ্রম আর প্রয়াস করতে হচ্ছিল। এই সময়ে আমাদের কলোনির মোট বাসিন্দার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ষাটে।

সারা দিন ধরে, এমন কি অনেক রাত পর্যন্তও, দুই কলোনির মধ্যে তখন অনবরত আমাদের আনাগোনা চলত। দলে-দলে ছেলেরা নতুন কলোনিতে কাজ করতে যেত, আবার কাজ সেরে ফিরে আসত। আমাদের নিজস্ব গাড়িগুলো শস্যের বীজ, ঘোড়ার দানা আর কলোনির বাসিন্দাদের জন্যে খাবারদাবার নিয়ে যেত, গ্রাম থেকে বাড়ি-তৈরির মালমশলা বয়ে আনত ভাড়া-করা গাড়িগুলো। কোত্থেকে কে জানে কোন্ ফিকিরে আদায়-করা একখানা প্রাচীন এক্কাগাড়িতে চেপে টক্কর খেতে-খেতে যাওয়া-আসা করত কালিনা ইভানভিচ, আর আশ্চর্য স্বাচ্ছন্দ্যে 'সিংহের' পিঠে চেপে আন্তন ঘোড়া ছুটিয়ে নিত্যি-নিত্যি আনাগোনা করত।

রবিবারে-রবিবারে প্রায় গোটা কলোনিই — শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং অন্যান্যরাও — কলমাক নদীতে স্নান করতে যেত। আর ক্রমে-ক্রমে

পাড়াপড়শিদের বাড়ির যত যুবক-যুবতী, পিরগোভ্কা আর গন্চারোভ্কা গাঁয়ের যত কম্সমোল-সদস্য, আর আমাদের কুলাক-খামারবাড়িগুলোর ছেলেপিলেদের সকলের অভ্যাস হয়ে গেল ওই নয়নাভিরাম নদীটির পাড়ে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার। আমাদের ছুতোর-মিস্ত্রিরা কলমাকের অপর পাড়ে ছোট্ট একটা পারঘাটাও বানিয়ে ফেলল, আর সেই ঘাটের ওপর আমরা 'গ. ক.'* এই অক্ষরদুটিসহ একটা নিশান উড়িয়ে দিলুম। ওই একই ধরনের নিশান-ওড়ানো সবুজরঙের একখানা নৌকো সারা দিন ওই পারঘাটা থেকে নদীর এপার পর্যন্ত খেয়া-পারাপার করত। নৌকোর দাঁড় বাইত মিত্কা জেভেলি আর ভিত্কা বগইয়াভ্লেন্স্কি। কলমাক নদীতে আমাদের এই আধিপত্যের গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করে আমাদের মেয়েরাও তাদের বাড়তি নানারকম টুকরো-টাকরা পশমী কাপড় দিয়ে মিত্কা আর ভিত্কার জন্যে গোটা দুই নাবিক-গেঞ্জি বানিয়ে দিল। ফলে আর দেখে কে, কি আমাদের কলোনিতে, কি কয়েক মাইল আশপাশের মধ্যে যত বাচ্চা ছেলে ছিল তারা সবাই পৃথিবীর এই সবচেয়ে ভাগ্যবান দুটি ছেলে সম্পর্কে মনে-মনে সাংঘাতিক ঈর্ষা পোষণ করতে শুরু করল। এইভাবে কলমাক নদীর তীর আমাদের কেন্দ্রীয় ক্লাবঘরে পরিণত হল।

আর আমাদের কলোনি ইতিমধ্যে প্রাণচঞ্চল আর মুখর হয়ে রইল একটানা কাজকর্মের তীব্রতায়, ওই কাজের ফলে উদ্ভূত অবশ্যম্ভাবী ভাবনাচিন্তায়, গ্রাম্য খরিদ্দারদের আনাগোনায়, আর আন্তনের খুঁতখুঁতুনি, কালিনা ইভানভিচের গ্রাম্ভারি বক্তৃতা, কারাবানভ, জাদোরভ আর বেলুখিনের অজচ্ছল হাসি-তামাশা আর নষ্টামি, সরোকা আর গালাতেঙ্কোর দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা, পাইনগাছগুলোর বীণাবাদন, অজচ্ছল রৌদ্রালোক আর যৌবন-প্রাণমত্ততায়।

ইতিমধ্যে আমরা আগেকার সেই ময়লা, ছারপোকা আর খোস-চুলকনার অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়েছিলুম। কলোনি এখন ঝক্ঝক করছিল পরিচ্ছন্নতায় আর নতুন-নতুন জোড়াতাপ্পিতে। যেখানেই ফাঁক-ফোকর বা ফেঁসে-যাওয়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল সেখানেই তাপ্পি লাগানো হচ্ছিল সুন্দর করে — তা সে কি ট্রাউজার্সে, কি বেড়ার গায়ে, কি গুদাম-ঘরের দেয়ালে, বা কি পুরনো গাড়িবারান্দাটায়। এজমালি শোবার ঘরগুলোয় সেই একই সব পুরনো ক্যাম্প-

* গ. ক. — গোর্কি কলোনি। — অনুঃ

খাট ছিল বটে, কিন্তু দিনের বেলায় তাতে বসা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, বসার জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল রঙ না-করা পাইন-কাঠের বেঞ্চির। খাবার ঘরে একই ধরনের রঙ না-করা টেবিলগুলোকে কামারশালে বিশেষভাবে-তৈরি ছুরি দিয়ে প্রতিদিন চাঁছার ব্যবস্থাও হয়েছিল।

কামারশালেও ইতিমধ্যে গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। কালিনা ইভানভিচের শয়তানি পরিকল্পনা পুরোপুরি সফল করে তোলা সম্ভব হয়েছিল। মাতলামি এবং খরিদ্দারদের সঙ্গে প্রতি-বিপ্লবী কথাবার্তা বলার দায়ে কাজ থেকে বরখাস্ত হয়ে গিয়েছিল গলভান। ও এমন কি কামারশালে-দেয়া ওর যন্ত্রপাতিগুলো ফেরত নেয়ারও চেষ্টা করল না, সম্ভবত সে-চেষ্টা সফল হবার আশা নেই জেনেই। ছেড়ে যাবার সময় কেবল বিদ্রুপ-মেশানো তিরস্কারের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল:

'তোমরা সক্কলেই দেখি সেই মালিকদের মতন! মালিক কিনা তোমরা, তাই ভাবো লোকেরে সব্বোস্বান্ত করার অধিকার আছে তোমাদের!'

বেলুখিন কিন্তু এ-ধরনের কথায় দমবার পাত্র ছিল না। মিথ্যে-মিথ্যেই কি আর ও বইপত্তর পড়েছে আর জীবনে অনেক কিছু দেখেছে-শুনেছে! তাই গলভানের মুখের ওপর একগাল হেসে জবাব দিল:

'সফ্রোন, তুমি দেখত্যেছি একবারে অজমুখ্যু নাগরিক! আমাদের সাথে বছরখানেকের উপর তো কাম করলে, তবু বোঝলে না কিছু! আরে, এ-সবই হল্য গিয়ে উৎপাদনের উপায়!'

'আম্মোও তো তাই কই...'

'আর, বিজ্ঞান অনুযায়ী উৎপাদনের উপায়, বোঝলে কিনা, প্রলেতারিয়েতের সম্পত্তি। আর প্রলেতারিয়েত তো এইখানেই আছে — ওই-যে দেখত্যেছ তো?'

এই বলে ও মহিমান্বিত প্রলেতারীয় শ্রেণীর বাস্তব, জীবন্ত প্রতিনিধি — যথা, জাদোরভ, ভের্শ্নেভ আর কুজ্মা লেশি-র দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

অতঃপর কামারশালের ভার দেয়া হল সেমিওন বগ্দানেঙ্কোর ওপর। সেমিওনরা ছিল বংশ-পরম্পরায় কামার। রেলওয়ে কারখানার এঞ্জিন-মেরামতি ঘরে বহুকাল ধরে কাজ করার জন্যে বিখ্যাত এক পরিবারের ছেলে ছিল ও। সেমিওন কামারশালে সামরিক শৃঙ্খলা আর পরিচ্ছন্নতা কায়েম করল। বড়-ছোট প্রত্যেকটা নেহাইয়ের পাত আর হাতুড়ির গায়ে ঢাকনা পরিয়ে

যেখানে যেটি রাখা দরকার তা রেখেও ওর খুঁতখুঁতুনি গেল না। অতি-বড় গৃহকর্ত্রীর কুঁড়েঘরের মেঝে যেভাবে ধোয়ামোছা হয় সেইভাবে কামারশালের মাটির মেঝেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখল সেমিওন, ফলে হাপরের মাথাতেও এক কণা কয়লার চিহ্ন রইল না কোথাও। খরিদ্দারদের সঙ্গে ওর কথাবার্তার ধরনও ছিল খুব সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ:

'এটা গির্জা নয়, বোঝলে! এখানে দর-কষাকষি চলব্যে না।'

সেমিওন বগ্‌দানেঙ্কো লিখতে-পড়তে জানত, পরিষ্কার করে গোঁফদাড়ি কামাত আর কথা বলতে গিয়ে মুখ-খারাপ করত না কখনও।

কামারশালে তখন আমাদের নিজেদের জন্যে আর গাঁয়ের প্রয়োজন মেটাতে কাজও চলছিল যেমন, তেমনই আবার মাঝে-মাঝে ফাঁকাও যাচ্ছিল। ওই সময়টায় একমাত্র চাকা-বানানোর কারখানা ছাড়া আমাদের আর সব কারখানার কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চাকার চাহিদার কমতি না-ঘটায় কেবল কোজির আর অন্য দুটি ছেলে চাকা-বানানোর কারখানা-ঘরে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকছিল।

শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন-দপ্তরের সরবরাহ-বিভাগ আমাদের কাছে রবারের টায়ার-লাগানোর উপযোগী বিশেষ ধরনের চাকা বানিয়ে দেয়ার দাবি জানাচ্ছিল। কিন্তু মুশকিল হল এই যে কোজির তার আগে আর কখনও ওই ধরনের চাকা বানায় নি। সভ্যতার এই আজগবি খামখেয়ালিপনায় ও তো সাংঘাতিক হকচকিয়ে গেল। কাজের শেষে প্রতিদিন সন্ধেয় এসে করুণ সুরে ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করত ও:

'আমাদের তো বাপের জম্মে কখনও রবারির টায়ার ছেল না। আমাদের পিরভু যিশু খৃষ্ট আর তাঁর শিষ্যরা সব পায়ে হাঁট্যেই যাতায়াত করতেন... আর এখন দেখতি পাই লোকে লোহার চাকা দিয়িও গাড়ি চালাতি পারে না...'

আর অমনি কালিনা ইভানভিচ কড়া ধমকের সুরে কোজিরের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিত:

'তাইলে রেলগাড়ি সম্বন্ধে কী বলবা? আর মোটরগাড়ি? সে-সম্বন্ধেই বা তোমার কী বলার আছে, কও? তা, তোমার পিরভু যিশু পায়ে হাঁইট্যা যাইতেন তো তাতে হইল কী? তিনি নিচ্চয় অশিক্ষিত ছিলেন, কিংবা তোমারই মতন গাঁয়ের মানুষ ছিলেন আর-কি। কে জানে হয়তো তিনি

ভবঘুরে ছিলেন, তাই ট্যাঙ্গসট্যাঙ্গস কইর‍্যা পায়ে হাঁইট্যা যাইতেন। তবে কেউ যদি পথের মধ্যি তাঁরে গাড়িতে উঠাইয়া লইতে চাইত, তাইলে নিচ্চয় তিনি আপত্তি করতেন না। হুঃ, পায়ে হাঁইট্যা যাওয়া! বুড়া হইয়াও তুমি এমনধারা কথা বল, তোমার শরম লাগা উচিত।'

জবাবে ভিতু-ভিতু হাসি হাসত কোজির, আর কেমন-যেন বিহ্বলভাবে নিজের মনে বিড়বিড় করে বলত:

'রবারির টায়ার-লাগানো চাকা একখান যদি একবার দেখতি পাতাম, তাইলে পিরভুর কৃপায় কয়েকখান চাকা হয়তো বানাত্যে পারতাম। অমনধারা চাকায় যে কয়খান অর লাগে তাও পের্যন্ত জানি নে ছাই!'

'তা, তুমি সোজা শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন-দপ্তরে চইল্যা যাও-না ক্যান, গিয়া আপন চক্ষে দেইখ্যা আইস? এক-এক কইরা অর-কয়খান গইন্যাও ফেলবা তাইলে।'

'ঈশ্বরের দোহাই, আমার মতন বুড়া মানষি জায়গা খুঁজি পাব্যে কী কর্যে?'

জুন মাসের মাঝামাঝি একদিন চের্নেঙ্কোর মাথায় খেয়াল চাপল যে আমাদের ছেলেদের একটু আনন্দ দিতে হবে।

বলল, 'ব্যাপারডা নিয়ি আমি আলাপ করত্যেছিলাম। জনাকয়েক বালেরিনা তোমাদের ওখানে যাত্যেছে — ছেল্যারা অদের দেখার এট্টা সুযোগ পাবে আর-কি। বোঝলা, আমাদের থিয়েটরে-না জনাকয়েক দারুণ বালেরিনা আছে। যে-কোনো এট্টা সন্ধ্যায় অদেরে তোমরা ডাক্যে পাঠাতি পার।'

'তাহলে তো ভালোই হয়।'

'তবে সাবধান কিন্তু, অরা আবার ননির পুতুল সব. তোমার ডাকাত-ছেল্যারা অদের ভয় দেখায় না যেন। তা, অদের নিয়ি যাবেটা কিসি?'

'আমাদের একখানা ফিটনগাড়ি আছে।'

'আরে, বাদ দাও, ও আমি দেখ্যেছি, ওয়াতে কাজ চলব্যে না। তুমি শুধু গোটা দুই ঘোড়া পাঠায়্যে দিও, আমি আমার গাড়িখান অদের ব্যাভার করতি দেব-নে — এইখানেই গাড়িতি ঘোড়া জুত্যে বালেরিনাদের ডাক্যে পাঠাব-নে। আর রাস্তায় পাহারার বন্দোবস্ত রেখ্যো, নইলি কেউ আবার অদেরে ধর্যে-পাকড়্যে নিয়ি যাবে-নে - অরা সব মোহিনী মায়া কিনা।'

অতঃপর একদিন একটু রাত করে বালেরিনারা এল। শোনা গেল সারা রাস্তা নাকি ওরা কাঁপতে-কাঁপতে এসেছে আর এতে ভারি মজা পেয়েছে আন্তন। সে নাকি ওদের আশ্বস্ত করারও প্রয়াস পেয়েছে।

বলেছে, 'আপনেদের এত ভয়ডা কিসির? আপনেদের ঠেঁয়ে চুরি করার মতন তো কিছু নাই। তার উপর এখন শীতকালও না — শীত হল্যে না-হয় অরা আপনেদের গা-থ্যেকে কোট খুল্যে নিত।'

রাস্তার মধ্যে এক জায়গায় হঠাৎ বনের মধ্যে থেকে আমাদের পাহারার ছেলেরা বেরিয়ে আসায় বালেরিনাদের অবস্থা এমনই শোচনীয় হয়ে পড়ে যে কলোনিতে পেঁাছনোমাত্র তাদের হৃদ্‌যন্ত্র সবল করার ওষুধ পর্যন্ত দিতে হয়। অত্যন্ত অনিচ্ছা নিয়ে বালেরিনারা নাচল, ফলে ওদের সম্বন্ধে আমাদের বাচ্চাদের সাংঘাতিক অপছন্দ জন্মে গেল। বালেরিনাদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিল বেশ অল্পবয়সী, আর তার পিঠখানা ছিল সুন্দর, সুগঠিত, আর অভিব্যক্তিতে পূর্ণ। সারাটা সন্ধে দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে ওই পিঠখানা দেখিয়ে মেয়েটি সারা কলোনির প্রতি তার উঁচকপালে, সূক্ষ্ম তাচ্ছিল্য দেখিয়ে গেল। এই মেয়েটির চেয়ে বয়সে কিছু বড় অপর একজন তো খোলাখুলি সন্ত্রস্ত চোখ নিয়ে আগাগোড়া আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। শেষের এই মেয়েটিকে দেখে আন্তন তো চটেই অস্থির।

'আমি আপনেরে জিজ্ঞাস করি — দু-দুটা ঘোড়ারে দু-বার কর্যে একবার শহরে আরেকবার কলোনিতে দৌড় করানোর কি দরকার ছিল কিছু? শহর থেকে অমন অনেক মেয়েছেলেরে আমি পায়ে হাঁটায়্যে নিয়ে আসতি পারি।'

'কেবল তোমার মেয়েরা নাচবে না, এই-যা,' জাদোরভ হেসে বলল।

'হ্যাঃ, নাচব্যে-না বললেই হল!'

বালে-নাচের সঙ্গে সঙ্গত করতে সেদিন পিয়ানোয় বসেছিলেন একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না। আমাদের একখানা এজমালি শোবার ঘরে পিয়ানোটা বহুদিন পর্যন্ত নিছক অলঙ্কার হিসেবে শোভা পেয়ে আসছিল, এতদিনে তা কাজে লাগল। একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না অবশ্য তেমন কিছু বাজিয়ে ছিলেন না, তাছাড়া যে-সব সুর উনি জানতেন তা বালে-নাচের সঙ্গে বাজানোর উপযোগীও ছিল না। অপরদিকে বালেরিনাদেরও অবস্থা বুঝে মানিয়ে চলার মতো এতটা সুস্থ মনমেজাজ ছিল না যে তারা দুটো কি তিনটে পর্দার ভুলকে উপেক্ষা করবে। মারাত্মক সব ভুলভ্রান্তি আর স্থানে-অস্থানে থেমে-যাওয়ার

ফলে বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিল তারা। তাছাড়া ওই দিন সন্ধেবেলাতেই আর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নাচের বায়না থাকায় ফিরে যাবার জন্যে তারা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

আস্তাবলের সামনে লণ্ঠনের আলোয় আর আন্তনের দাঁতচাপা গালিগালাজের ফিস্‌ফিসানির মধ্যে ঘোড়াগুলোকে যখন গাড়িতে জোতা হচ্ছিল, বালেরিনাদের তখন শোচনীয় অবস্থা। পরবর্তী নাচের আসরে পেঁছতে নিশ্চয়ই দেরি হয়ে যাবে এই ভেবে তারা বিষম বিচলিত হয়ে পড়েছিল। এতই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল তারা এবং নির্জন প্রান্তরে ওই কলোনি, পাথরের মূর্তির মতো নিঃশব্দ ছেলেরা, তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ওই পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি তাদের তাচ্ছিল্য আর ঘৃণার ভাব এতদূর প্রবল হয়ে উঠেছিল যে কথা পর্যন্ত বলতে পারছিল না তারা, কেবল পরস্পরের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে উঃ-আঃ করার ক্ষমতাটুকু ছিল মাত্র। কোচবাক্সে উঠে বসে সরোকা তখনও লাগাম নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল আর চেঁচিয়ে বলছিল যে সে গাড়ি চালাতে পারবে না। তাই শুনে অতিথিদের উপস্থিতিকে গ্রাহ্যের মধ্যে না-এনে আন্তন বলে উঠল:

'তুই নিজেরে কী ভেবেছিস, শুনি — কোচোয়ান, না বালেরিনা? কোচবাক্সে বসে অমন নাচন জুড়িচিস কেন? কী বলতে চাস — যাবি নে? শিগ্‌গির গাড়ি ছাড়্‌ বলত্যেছি!..'

অবশেষে সরোকা লাগামে ঝাঁকি দিল। ওর পিঠে-ঝোলানো বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে মারাত্মক ভয় পেয়ে বালেরিনারাও গেল চুপ মেরে। গাড়িটা সত্যি-সত্যিই নড়তে শুরু করল। এমন সময় হঠাৎ আবার ব্রাত্‌চেঙ্কো চেঁচিয়ে উঠল:

'তুই কর্‌যেছিস কী, গাধা কোথাকার! পাগল হলি নাকি তুই, ঘোড়াগুলারে এমন কর্‌যে গাড়িতে জুতেছিস-যে? দ্যাখ্‌, দ্যাখ্‌, 'লালু'-রে কোন্‌ দিকে জুতেছিস একবার তাকায়্যে দ্যাখ্‌! ওদের খুল্যে ফেলে ফের গাড়িতে ঘোড়া জোত্‌! কতবার তোরে বলেছি না যে 'বাজপাখি' সব্বদা ডানদিকে থাকবে?'

আস্তেধীরে পিঠ থেকে বন্দুকটা খুলে নামাল সরোকা, তারপর বালেরিনাদের পায়ের কাছে সেটাকে আড়াআড়িভাবে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভেতর থেকে চাপা ফোঁপানির অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এল।

আমার পেছনে দাঁড়িয়ে কারাবানভ বলছিল:

'অ, তাইলে ফোয়ারার মুখ খুল্যে দেছে অরা! আমার তো ভয় ছিল, বুঝি ফোয়ারাডা খোলবেই না! তা, ভালো, ভালো!'

মিনিট পাঁচেক পরে গাড়িখানা আবার নতুন করে যাত্রা শুরু করল। অত্যন্ত সংযতভাবে স্যালুটের ভঙ্গিতে হাত তুলে আমরা টুপিতে আঙুল ছোঁয়ালুম, ওদিক থেকে সাড়া মেলার বিন্দুমাত্র আশা নেই তা জেনেও। গাড়ির রবারের চাকাগুলো রাস্তার পাথরে ধাক্কা খেয়ে অল্প-অল্প লাফিয়ে গড়াতে শুরু করেছে, এমন সময় একটা জ্যাবড়া-জোবড়া মূর্তি হাত নাড়তে-নাড়তে আর চিৎকার করতে-করতে আমাদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়ে গাড়ির পিছু-পিছু ধাওয়া করল:

'আরে, থামাও! থামাও, যিশুর দোহাই! গাড়িখান থামাও একবার, অ দোস্ত!'

থতমত খেয়ে রাশ টানল সরোকা; আচমকা গাড়ি থামায় একজন বালেরিনা তো আসন থেকে লাফিয়েই উঠল।

'ও-হো, আমি কথাডা বিলকুল ভুল্যে বস্যেছিলাম। দয়াময় পিরভু আমারে ক্ষ্যামা করেন! একবার — আমারে শুধু চাকার অরগুলান একবার গোনতি দাও...'

একখানা চাকার ওপর ঝুঁকে পড়ল কোজির। গাড়ির ভেতর থেকে ফোঁপানির শব্দ এবার জোরালো হয়ে উঠল, আর সেই সঙ্গে যুক্ত হল একটা মিঠে মেয়েলি খাদের গলা:

'আঃ, হচ্ছে কী!..' একটু যেন ধমকের সুর লাগল গলাটায়।

কারাবানভ গিয়ে ধাক্কা দিয়ে কোজিরকে চাকার কাছ থেকে সরিয়ে দিল:

'চাচা, সর্যে যাও তো দেখি...'

তারপর বেগ সামলাতে না-পেরে নিজেই 'এই-এই' করতে করতে একটা গাছের পেছনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

এ-দৃশ্য আর সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল।

চেঁচিয়ে বললুম:

'গাড়ি ছেড়ে দাও, সরোকা! হাসি-মস্করা যথেষ্ট হয়েছে! তুমি গাড়ির মাথায় বসে আছ কী করতে?'

ছপ্‌টিটা অনেকখানি ঘুরিয়ে 'বাজপাখি'র পিঠে শপাং করে ঘা লাগাল সরোকা। আর, ছেলেরা হেসে উঠল সজোরে, হো-হো করে। কারাবানভ

তখনও কাত্‌রাচ্ছে ঝোপের মধ্যে বসে। এমন কি আন্তনও হেসে উঠল শেষপর্যন্ত:

'ডাকাইতরা যদি অদের গাড়িখান আটকায় তাইলে কী মজাই না হয়! তাইলে অদের নাচির আসরে সত্যিই দেরি হয়্যে যাবে-নে!'

আর ওই ভিড়ের মধ্যে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কোজির — ওর গাড়ির চাকার অর গোনা বন্ধ করে দেয়ার মতো এমন কি ঘটল তা বুঝতে সম্পূর্ণ অপারগ হয়ে।

এত জিনিস নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হচ্ছিল যে কখন-যে ছ-সপ্তাহ পার হয়ে গেছে আমরা খেয়ালই করি নি। শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন-দপ্তরের সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজার কিন্তু একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক দিনে এসে উপস্থিত।

'কী, ঘোড়াগুলানের খবর কী?'

'বাঁচ্যে-বর্ত্যে আছে সবাই।'

'ওগুলান ফিরত দিত্যেছ কবে লাগাদ?'

প্রশ্ন শুনে আন্তন কেমন ফ্যাকাশে মেরে গেল।

' 'ফিরত দিত্যেছ' মানে? তাইলে খেতখামারের কাজডা করবে কেডা?'

'কমরেড-সব, বোঝলেন, এয়া হল্য গিয়ি চুক্তির ব্যাপার,' সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজার শুকনো খর্‌খরে গলায় বললেন, 'চুক্তির ব্যাপার কিনা। তা, আমরা গমডা পাত্যেছি কবে লাগাদ?'

'গম? আগে মাঠ থেকে ফসল তুলি তারপর তা ঝাড়াই-মাড়াই হোক, তবে তো। গম-ফসল তো এখন মাঠে।'

'আর সেই চাকা-বানানোর কী হল্য?'

'দেখুন, আমাদের চাকা-বানানোর মিস্ত্রি চাকার অরের সংখ্যা গুনতে পারে নি ·· চাকায় যে কখানা অর লাগে তা ও জানে না। তাছাড়া, চাকার বেড়টাও...'

সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজার কলোনিতে এসে নিজেকে একজন কেউকেটা লোক বলে ঠাউরেছিলেন। সোজা কথা নয় তো, যাকে বলে শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন-দপ্তরের সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজার! অতএব:

'চুক্তি-অনুযায়ী আপনেদের জরিমানা দিতি হবে। চুক্তির শর্ত সেই কথাই বলে। আজ থ্যেকে দৈনিক দশ পাউন্ড কর্‍্যে, দশ পাউন্ড হিসাবে গম দিতি লাগব্যে আর-কি। বোঝ্যেছেন? এখন কী করবেন তা-ই ঠিক করেন।'

সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজার-মশাই গাত্রোত্থান করলেন। ওঁর অপসৃয়মাণ দ্রোশ্‌কির দিকে কটমট করে তাকিয়ে ব্রাত্‌চেঙ্কো সংক্ষেপে মন্তব্য করল:

'শোরের বাচ্চা!'

আমরা বিষম বিচলিত হয়ে পড়লুম। ঘোড়াগুলোকে রেখে দেয়া আমাদের পক্ষে একান্ত দরকার, আবার জরিমানা-স্বরূপ আমাদের পুরো ফসল সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজারকে দিয়ে দিতেও পারি না!

কালিনা ইভানভিচ গাঁইগুঁই করতে লাগল:

'আমি কখ্‌খনো অদের — ওই পরগাছাগুলারে — খ্যাতের গম দিমু না! পনারো পুদ কইর‍্যা মাসে দেওনের কথা, আর এখন কয় কি দৈনিক আরও দশ পাউন্ড কইর‍্যা গম দিতে লাগব! অরা ওখানে বইয়া-বইয়া তত্ত্বকথা ফলায় আর যা প্রাণে চায় লেইখ্যা থোয়, আর আমাগো তো প্যাটে রুটি যোগানোর লেগ্যে কাম করতে হয়, নাকি। আর তারপর কিনা আমাগো মুখের রুটি অগো দিতে লাগব, তার উপর ঘোড়াগুলারেও নাকি আবার ফিরত দিতে লাগব। যেখান থেইক্যা পার অগো যোগাড় কইর‍্যা দ্যাও গিয়া, আমি কিন্তু একদানাও গম দিমু না!'

ছেলেরাও সকলে চুক্তি পূরণের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠল:

'অদেরে গম দেয়ার বদলে গম গাছেই শুকায়্যে ফেলব-নে। আর নয়তো অরাই মাঠ থ্যেকে ফসল কাট্যে নিয়ি যাক, আর ঘোড়াগুলান আমাদেরে দিয়্যে দিক।'

ব্রাত্‌চেঙ্কো তো মিটমাটের শর্ত পর্যন্ত ঠিক করে সমস্যার মীমাংসাই করে ফেলল:

'তোমরা গম, বাজরা, আলু, সব ফসল দিয়্যে দিতি পার, কিন্তু ঘোড়াগুলারে আমি দিব না। যাই গালাগালি কর-না ক্যানে — ঘোড়াগুলা ওরা কিছুতেই পাবে না।'

জুলাই মাস এসে গেল। খেতের ঘাস নিড়নো শুরু করল ছেলেরা। কিন্তু দেখা গেল কালিনা ইভানভিচের মনে শান্তি নেই:

'পোলারা ভালোমতো ঘাস নিড়াইতে পারত্যাছে না, ঘাস নিড়াইতে জানে না অরা। কিন্তু এয়া তো খড়কাটার ব্যাপারমাত্র, বাজরা কাইটবার সময় অবস্থাটা দাড়াইব কী? কে জানে, আমি তো কিছু বুঝত্যাছি না। সাত দেসিয়াতিনা জমির বাজরা, আট দেসিয়াতিনার গম, তার উপর বসন্তের রবিশস্য আর জই-ফসল তো আছেই। তাইলে, করা কী এখন? আমাগো একখান ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্তর কিনতে লাগব।'

'তা কী করে হবে, কালিনা ইভানভিচ? ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্র কেনার মতো টাকা কোথায় আমাদের?'

'তাইলে, একখান ছোটমোট ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্তর শুধু কেনা যাউক। আগে তো ছোট একখান যন্তরের দাম আন্দাজ দেড় শত-দুই শত রুবল ছিল।'

ওইদিন সন্ধেবেলায় একমুঠো বাজরা তুলে এনে ও আমায় দেখাল:

'দ্যাখ্‌তাছ, দুই দিনের মধ্যি ফসলকাটা শুরু করতে লাগবে আমাগোরে, অর থেইক্যা এক মিনিট দেরি করলে চইলবে না।'

কাস্তে দিয়েই ফসলকাটার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। ঠিক হল, ফসলকাটার উৎসব বা প্রথম আঁটিবাধা ফসলের উৎসব উদ্‌যাপন করতে হবে। আমাদের কলোনির সংলগ্ন গরম বেলেমাটিতে বাজরা তাড়াতাড়ি পেকে উঠেছিল, তাই ছুটির উৎসব উদ্‌যাপনের পক্ষে আমাদের সুবিধে হয়ে গেল। যেন একটা মস্ত পরব উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি এইভাবে তোড়জোড় শুরু করলুম আমরা। বহু লোককে নেমন্তন্ন করা হল, ভোজের আয়োজনও করা হল দারুণভাবে, আমাদের ফসলকাটার সমারোহ-পূর্ণ সূচনার উপযোগী একটা চমৎকার আর তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান-কর্মসূচি ভেবেচিন্তে স্থির করা গেল। ইতিমধ্যেই তোরণ তুলে আর পতাকা দিয়ে ফসলের খেতটা সাজিয়ে ফেলা হয়েছিল, ছেলেদের জন্যে নতুন পোশাকও বানানো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবু কালিনা ইভানভিচকে অত্যন্ত বিচলিত বলে মনে হতে লাগল।

'পাকা ফসল নষ্ট হইয়া যাইত্যাছে! ফসল যখন কাটা শুরু হইব, দানাগুলা ততদিনে ভুঁয়ে ঝইর‍্যা পড়তে থাকব। আমরা কাকের খাদ্যি যোগানোর লেগ্যে কাম করলাম দ্যাখত্যাছি।'

কিন্তু কারখানা-ঘরগুলোয় ছেলেরা ততদিনে কাস্তেয় শান দিতে আর কাস্তের সঙ্গে জুড়ে নেয়ার জন্যে ফসল-টানা আঁকশি বানাতে লেগে গিয়েছিল। তারা কালিনা ইভানভিচকে সান্ত্বনা দিতে লাগল:

'কিছু নষ্ট হবে না, কালিনা ইভানভিচ — সত্যিকার মুজিকদের থ্যেকে আমরা কোনো অংশে খারাপ ফসল কাটব্য না, দেখবেন-নে।'

অবশেষে আটজন দিনমজুর নিয়োগ করা হল।

উৎসবের দিন খুব ভোরবেলায় আন্তন আমাকে ডেকে তুলল।

বলল, 'একজন লোক আমাদের জন্যে একখান বড় ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্র নিয়ে এসেছে।'

'কোন্ ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্র?'

'একখান যন্ত্রের মতন যন্ত্র। পাল-টাল খাটানো মস্ত বড় — ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্র একখান। আমরা যন্ত্রটা কিনব কিনা লোকটা জানতে চায়।'

'ওকে চলে যেতে বল। আমরা যন্ত্রের দাম দেব কোত্থেকে, শুনি? আমাদের অবস্থা কী তা তো তুমি জানই।'

'লোকটা বলত্যেছে. আমরা যন্ত্রটারে বদলি হিসাবে নিতে পারি। যন্ত্রটার বদলি ও একটা ঘোড়া চায়।'

পোশাক পরে আস্তাবলের দিকে চললুম। যাবার সময় দেখলুম উঠোনের মাঝখানে একখানা ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্র দাঁড় করানো আছে। যন্ত্রটা মোটের ওপর নতুনই, তাছাড়া বিক্রির উদ্দেশ্যে ওটাকে বিশেষ করে রঙ করা হয়েছে। যন্ত্রটা ঘিরে ছেলেদের জটলা চলছিল, আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে কালিনা ইভানভিচ একবার যন্ত্রটা, একবার তার মালিক, আর একবার আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল।

'লোকটা আমাদের সাথে মস্করা জুইড়তে আসছে নাকি? অরে এখানে আনল কে?'

ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্রের মালিক ঘোড়ার সাজ খুলছিল। শ্রদ্ধাউদ্রেককর শাদা দাড়িসহ লোকটাকে বেশ সম্ভ্রান্ত বলে ঠাহর হচ্ছিল।

'যন্তরডা তুমি বেচতি চাও ক্যানে?' বুরুন লোকটাকে শুধোল।

মুখ তুলে তাকাল লোকটা। বলল:

'ছেল্যাডারে বিয়া দিতি চাই। তা, আমার আরও একখান ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্তর আছে। একখানাতেই কাজ চল্যে যাবে আমাদের, তাছাড়া ছেল্যাডারে এট্টা ঘোড়া দিতি হবে কিনা, তা-ই।'

কারাবানভ আমার কানে-কানে ফিস্‌ফিস করে বলল:

'লোকডা মিথ্যা কথা বলত্যেছে। অরে আমি চিনি...' তারপর বুড়োর

দিকে ফিরে শুধোল, 'আপনে তো স্তরজেভোয়ে থ্যেকে আসত্যেছেন, তাই না?'

'ঠিক কয়্যেছ — স্তরজেভোয়ে থ্যেকে আসত্যেছি। তা, তুমি কে বাছা? অ, তুমি সেমিওন কারাবানভ-না? পানাসের ছেল্যা?'

'নিচ্চয়!' খুশির সুরে সেমিওন জবাব দিল। 'তাইলে, আপনে নিচ্চয় অমেল্‌চেঙ্কো? মনে হয়, যন্তরডা বাজেয়াপ্ত কর্যে নেবে বল্যে আপনি ভয় পায়্যেছেন? ঠিক না?'

'যন্তরডা বাজেয়াপ্ত কর্যে নিতি পারে সেডাও বটে, তাছাড়া ছেল্যাডার বিয়া দিতি যাচ্ছি...'

'আপনার ছেল্যা তো কসাক-বদমায়েসদের দলে আছে, তাই না?'

'না-না! ভগমান রক্ষে করেন!..'

কেনাবেচার সমস্ত ব্যাপারটার ফয়সলার ভার সেমিওন নিজেই নিয়ে নিল। ঘোড়াগুলোর মুখের কাছে দাঁড়িয়ে যন্ত্রের মালিকের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলল ও; অনেকক্ষণ পরস্পর ঘাড়-নাড়ানাড়ি আর পরস্পরের পিঠ আর কাঁধ থাবড়া-থাবড়ি করল দু-জনে। সত্যিকার কৃষকের মতো কথাবার্তা চালিয়ে গেল সেমিওন, আর স্পষ্ট বোঝা গেল অমেল্‌চেঙ্কোও ওকে অভিজ্ঞ লোক হিসেবে গণ্য করছে।

এর আধ-ঘণ্টাটাক পরে কালিনা ইভানভিচের দোরগোড়ায় বসে সেমিওন একটা গোপন পরামর্শ-সভার অনুষ্ঠান করল। আমি, কালিনা ইভানভিচ, কারাবানভ, বুরুন, জাদোরভ, ব্রাত্‌চেঙ্কো, এবং বড় ছেলেদের মধ্যে আরও দু-তিন জন এই সভায় যোগ দিলুম। বাকি ছেলেরা ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্রটা ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। নিঃশব্দে তন্ময় হয়ে হয়তো তারা ভাবছিল, দুনিয়ায় এমনও মানুষ আছে যন্ত্র-জগতের যা শেষ কথা তেমন একখানা যন্ত্রের নমুনার যে-কিনা মালিক হতে পারে।

পুরো ব্যাপারটা সেমিওন খুলে বলল। লোকটা ওর ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্রের বদলে একটা ঘোড়া চায়, কারণ স্তরজেভোয়ে গাঁয়ে কার কী যন্ত্রপাতি আছে তার একটা সরকারি হিসেবনিকেশ হতে যাচ্ছে আর ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্রের মালিক ভয় পাচ্ছে যে তার যন্ত্রটা হয়তো ক্ষতিপূরণ ছাড়াই বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে ঘোড়া থাকলে তা বাজেয়াপ্ত হবে না, কারণ লোকটি ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্ছে, তাই।

'কথাটা সত্যি হতেও পারে আবার না-হতেও পারে,' জাদোরভ বলল। 'তবে তাতে আমাদের কিছু যায়-আসে না। আমাদের খালি ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্রটা চাই। যন্ত্রটা পেলে আজই আমরা ওটাকে মাঠে নামাতে পারি।'

'কিন্তু কোন্ ঘোড়াটা দিবে তুমি, শুনি?' আন্তন বলল। ' 'খোকাবাবু' আর 'ডাকাতনী' তো কোনো কম্মের নয়। তাইলে, 'লালু'-রে দিয়ে দেবে নাকি?'

জাদোরভ বলল, 'তা 'লালুই'-বা নয় কেন? বদলি কী পাচ্ছি সেটা দেখতে হবে তো, একটা আস্ত ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্র!'

' 'লালু'-রে? তোমাদের কি...'

মাথা-গরম আন্তনকে বাধা দিয়ে এবার কারাবানভ যেন তার মনের কথাতেই সায় দিয়ে বলল:

'নিচ্চয়, 'লালু'-রে আমরা কখনও দিতি পারি না। কলোনিতে ওডাই এক-মাত্তর ঘোড়ার মতন ঘোড়া। তা, 'লালু' ক্যানে, আমরা তো লোকডারে 'সিংহ'-রেও দিতি পারি! ও ঘোড়াডা তো ভারি চমৎকার দেখতি, তাছাড়া ওডা এখনও পাল ধরানোর উপযুক্ত আছে।'

কথাটা বলে সেমিওন দুষ্টুমি-ভরা চোখে কালিনা ইভানভিচের দিকে তাকাল।

কালিনা ইভানভিচ কিন্তু সেমিওনের কথার উত্তর পর্যন্ত দিল না। দরজার চৌকাঠে পাইপটা ঠুকে পোড়া তামাক বের করে ফেলে দাঁড়িয়ে উঠল। বলল:

'এমনধারা বাজে কথা শোনার সময় নাই আমার।'

তারপর পেছন ফিরে ঘরে ঢুকে গেল।

কালিনা ইভানভিচের চলে-যাওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে চোখ টিপে সেমিওন এবার ফিস্‌ফিস করে বলল:

'সত্যি বলত্যেছি, আন্তন সেমিওনভিচ, 'সিংহ'-রে দিয়া দিলি কেমন হয়? দ্যাখবেন, শেষে সব ঠিকঠাক হয়্যে যাবে-নে। বাড়তি, আমাদের এট্টা ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্তর লাভ হয়্যে যাবে।'

'ওরা আমাদের জেলে দেবে তাহলে।'

'কারে?.. আপনেরে? মোট্টেও-না! ঘোড়ার থ্যেকে ফসলকাটাই-বাঁধাই

যন্তরের মূল্য বেশি। শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন-দপ্তর 'সিংহ'-এর বদলি যন্তরডাই নিক-না ক্যানে। তাতে অদের পাওনাগণ্ডার কী ইতরবিশেষ হবে? অদেরও এতে কোনো ক্ষেতি নাই, আমাদেরও ফসলকাটা শেষ হয়্যে যাবে-নে। 'সিংহ'-ডা তো ন-দেবায়-ন-ধম্মায়...'

সংক্রামক হাসি ছড়িয়ে জাদোরভও বলল:

'ওঃ, বলতেও পারে বটে! তা, যা বলেছে, সত্যি তা-ই করুন-না কেন?..'

বুরুন কেবল কিছু বলল না। শুধু মিটিমিটি হাসতে লাগল আর বাজরার ছোট্ট একটা শিষ মুখের সামনে নেড়েচেড়ে দোলাতে লাগল।

জ্বলজ্বলে চোখে এবার হেসে উঠল আন্তন।

বলল, 'তাইলে যা একখান মজা হবে-না। শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন-দপ্তর 'সিংহ'-এর বদলি... ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্রটারে ফিটনগাড়িতে জুতে চালাবে তখন।'

ছেলেরা সবাই প্রত্যাশায়-ভরা চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল।

'আন্তন সেমিওনভিচ, হাঁ বলেন... দয়া কর্যে হাঁ বলেন একবার! ক্ষেতি কী এতে? যদি এর জন্যি ওরা আপনেরে জেলেও দেয়, তাইলেও তা এক সপ্তার বেশি দিনির জন্যি হবে না নিচ্চয়।'

অবশেষে বুরুন গম্ভীর হয়ে গেল। বলল:

'এড়ায়্যে যাবার আর কোনো উপায় নাই — মন্দা ঘোড়াডারে আমাদের দিয়া দিতিই হবে। যদি তা না-দিই, সবাই আমাদেরে বোকা বলবে, এমন কি শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন-দপ্তরও বলবে।'

বুরুনের দিকে একবার তাকিয়ে আমি সংক্ষেপে বললুম:

'ঠিক বলেছ! যাও, আন্তন, মন্দা ঘোড়াটাকে বাইরে নিয়ে এস!'

শোনামাত্র সব কটা ছেলে পড়ি-কি-মরি করে আস্তাবলের দিকে ছুটল।

'সিংহ'-কে পরীক্ষা করে ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্রের মালিক খুশি হল। এদিকে আমার জামার হাতা টেনে ধরে কালিনা ইভানভিচ ফিস্‌ফিসিয়ে বললে:

'তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হইছে নাকি? জেবনে বিতৃষ্ণা আইস্যা গেছে নাকি, কও দেখি? কলোনি চুলায় যাউক, বাজরা-ফসলও গোল্লায় যাউক... খাঁড়ার নিচে ঝুটমুট তুমি মাথা বাড়াইয়া দ্যাও ক্যান?'

'চুপ কর দেখি, কালিনা... কী শুরু করেছ তুমি! আরে, আমরা বলে একটা ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্র পেয়ে যাচ্ছি, তার আবার।'

এর এক ঘণ্টা পরে 'সিংছ'কে নিয়ে বুড়ো চলে গেল। আর তারও দু-ঘণ্টা পরে আমাদের ছুটির উৎসবে যোগ দিতে কলোনিতে এসে উপস্থিত হল চের্‌নেঙ্কো। এসেই উঠোনে দাঁড়-করানো ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্রটা দেখতে পেল সে।

'ওরে ব্বাস, ওহে ওস্তাদ ছোকরারা! বলি, এই সুন্দরীটিরে কোথা থ্যেকে বাগাল্যে?'

হঠাৎ ছেলেরা সবাই চুপ মেরে গেল। মনে হল, যেন ঝড় ভেঙে পড়ার আগের নিস্তব্ধতা। বুক-ধুকপুক নিয়ে চের্‌নেঙ্কোর দিকে তাকিয়ে আমি জবাব দিলুম:

'দৈবক্রমে, বলতে পার আর-কি।'

হাততালি দিয়ে উঠে আন্তন হঠাৎ তিড়িং-তিড়িং লাফানি জুড়ে দিল।

'কমরেড চের্‌নেঙ্কো, নেয্য হোক আর অনেয্য হোক, ওই ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্রটা আমাদেরই। আপনে কি অল্প এট্টুখানি কাজ করতি চান আজকে?'

'কী, ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্তরডারে নিয়ি?'

'হ্যাঁ, তাই!'

'ঠিক আছে, আবার পুরানো দিনির কথা মনে পড়্যে যাবে-নে!.. তাইলে, চল্যে এস সব! ওডারে পরীক্ষে কর্যে দেখা যাক্!'

উৎসবের অনুষ্ঠান শুরু হওয়া পর্যন্ত চের্‌নেঙ্কো আর ছেলেরা ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্রটা নিয়ে মেতে রইল — তেল দিল, পালিশ লাগাল, যন্ত্রপাতি ঠিক-ঠিক নিয়ন্ত্রণ করে যন্ত্রটা চালু করল, তারপর ওটাকে চালিয়ে পরীক্ষা করে দেখল।

আর উৎসবের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান শেষ হওয়ামাত্রই চের্‌নেঙ্কো চেপে বসল ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্রটার ওপর। তারপর মাঠের ওপর দিয়ে গড়গড় করে চালিয়ে দিল যন্ত্রটাকে। তাই দেখে কারাবানভের তো হাসতে-হাসতে দম বন্ধ হবার যোগাড়। প্রাণপণে চিৎকার করে ও বলল:

'আরে, আরে, ওস্তাদ যন্তর-চালিয়ে যাতিছে দ্যাখো!'

ওদিকে শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন-দপ্তরের সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজার মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন আর যাকেই দেখতে পেলেন তাকেই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন:

'আচ্ছা, 'সিংহ'-ডারে কোথাও দ্যাখত্যেছি না ক্যানে? ওডা কনে আছে?'

জবাবে আন্তন তার হাতের চাবুকখানা দিয়ে পূবদিকে কোথাও একটা দেখিয়ে দিল:

' 'সিংহ' আছে নয়া কলোনিতে। আসচে কাল আমরা ওখানে বাজরা-ফসল কাটব কিনা, তাই অরে এট্টু বিশ্রাম দিছি আর-কি।'

বনের মধ্যে ভোজের টেবিল পাতা হল। চের্‌নেঙ্কোকে মহা-সমাদরে টেবিলে বসিয়ে ছেলেরা অনবরত ওকে বড়া আর বাঁধাকপির স্যুপ যুগিয়ে যেতে আর কথাবার্তায় ব্যস্ত করে রাখতে লাগল।

'তোমরা এট্টা ভারি জবর মতলব ঠাউরিয়েছ তো, এই ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্তরডা যোগাড় কর‍্যে,' ও বলল।

'ঠিক তাই, নয় কি?'

'খুব ভালো, খুব ভালো!'

'আচ্ছা, কমরেড চের্‌নেঙ্কো, কোন্‌টা বেশি ভালো — ঘোড়া না ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্র?' জ্বলন্ত চোখে একধার থেকে ছেলেদের সারি-সারি মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করল ব্রাত্‌চেঙ্কো।

'তা, এক কথায় বলা যায় না। ওডা নিভ্‌ভর করে কোন জাতের ঘোড়া তার উপর।'

'ধরেন, যদি 'সিংহ'-এর মতন ঘোড়া হয়!'

কথাটা শুনেই সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজার-মশাই তাড়াতাড়ি চামচ নামিয়ে রাখলেন। মনে হল যেন আতঙ্কে ওঁর কানদুটো নড়েচড়ে উঠল। আচমকা সজোরে ফু-ফু করে হেসে উঠে কারাবানভ তাড়াতাড়ি টেবিলের নিচে মাথা লুকোল। আর ওর এই পথ দেখানোর যেটুকু অপেক্ষা ছিল, সঙ্গে সঙ্গে বাকি সব ছেলে হাসির দমকে কাঁপতে শুরু করল। সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজার লাফ দিয়ে উঠে পড়ে বিহ্বলভাবে চারপাশের গাছপালার দিকে তাকাতে লাগলেন, যেন ওখান থেকে সাহায্য খুঁজছেন ভাবখানা এমন। চের্‌নেঙ্কোর তো পুরোপুরি ধাঁধা লেগে গেল:

'ব্যাপারখান কী — 'সিংহ' খারাপ ঘোড়া নাকি?'

বিন্দুমাত্র হাসির প্রবণতা ছিল না একমাত্র আমার। গম্ভীরভাবে বললুম:

' 'সিংহ'-এর বদলে আমরা ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্র পেয়েছি। বদলির কাজটা আজই সারা হয়েছে।'

কথাটা শোনামাত্র সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজার-মশাই ধপ করে বেঞ্চিতে বসে পড়লেন। হাঁ-করে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে তাকিয়ে রইল চের্‌নেঙ্কো। অন্য সবাই চুপ।

'ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্তরের সাথে তারে বদল করা হয়্যেছে?' সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল চের্‌নেঙ্কো।

বেঞ্চি ছেড়ে এবার দাঁড়িয়ে উঠলেন সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজার। বোঝা গেল তিনি অপমানিত বোধ করেছেন।

বললেন, 'ইশ্‌কুলের ছেল্যাসুলভ আস্পদ্ধা ছাড়া এ কিছু নয়! এ হল্য গিয়ে গুণ্ডামি, অবাধ্যতা...'

হঠাৎ খুশির হাসিতে ফেটে পড়ল চের্‌নেঙ্কো।

'ওহ্‌, কুত্তির বাচ্চারা! সত্যিই এমনধারা কাজ কর্য়েছ? তা, আমরা ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্তর নিয়ি করবডা কী?'

'তাইলে, আমাদের চুক্তি অনুযায়ী — ক্ষেতির পাঁচ গুণ পূরণ করত্যে লাগবে।' যেন কাঠের উপর করাত চালালেন এমন কড়া সুরে বলে উঠলেন সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজার।

কথাটা চের্‌নেঙ্কোর পছন্দ হল না। বলল, 'মোট্টেও না! অমনধারা চুক্তি তুমি করত্যেই পার না!'

'করতি পারি না?'

'না, পার না। তাই চুপ মের্য়ে থাক দেখি! অরা যা কর্য়েছে তা করার অধিকার রাখে অরা! অদের ফসল কাটতি হবে না? অরা জানে তোমার ওই 'পাঁচ গুণ'-এর চাইতি অদের ফসল অনেক দামি, বোঝলে! আর, অরা-যে তোমারে-আমারে ভয় পায় নাই এডাও খুবই ভালো কথা। মোটমাট, আজ আমরা অদের ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্তরডা উপহার দিয়ি যাত্যেছি।'

ভোজের টেবিলগুলো আর শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন-দপ্তরের সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজারের বুকখানাকে তছনছ করে দিয়ে ছেলেরা চের্‌নেঙ্কোকে নিয়ে আকাশের দিকে বারবার ছুড়ে-ছুড়ে লোফালুফি করতে লাগল। অবশেষে হাসতে-হাসতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ও যখন

ফের নিজের পায়ে দাঁড়াল তখন আন্তন ওর কাছে এসে দাঁড়াল। বলল:

'তাইলে 'মেরী' আর 'বাজপাখি'-র কী হবে?'

' 'কী হবে' মানে?'

'অদের কি আমাদের ফিরত দিতে হবে?' কথাটা বলেই আন্তন সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজারের দিকে ইঙ্গিত করে মাথাটা একটু ঝোঁকাল।

'ফিরত দিতি লাগবে বৈকি।'

'আমি কিন্তু ফিরত দিত্যেছি না,' বলল আন্তন।

এবার চের্‌নেঙ্কো রাগ করে বলল, 'দিত্যেছ বৈকি! তোমরা তো ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্তরডা পায়্যে গেলে!'

কিন্তু রাগ দেখাতে আন্তনও বড় কম পটু নয়। জোর গলায় বলল:

'আপনেদের ফসলকাটাই-বাঁধাই যন্ত্র নিয়ি যান! গোল্লায় যাক আপনেদের যন্ত্র! আমরা কি কারাবানভরে অর সাথে জুত্যে চালাব?'

কথাটা বলেই আস্তাবলমুখো চলে গেল ও।

'ওহ্, আচ্ছা কুত্তির বাচ্চা তো!' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চের্‌নেঙ্কো বলে উঠল।

চারপাশে সবাই তখন চুপ করে রয়েছে। এবার সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজারের দিকে তাকাল চের্‌নেঙ্কো।

বলল, 'তুমি-আমি আচ্ছা ফেসাদে পড়লাম তো। অদের কাছি ঘোড়াগুলারে তোমারে বেচত্যে হবে ওই একরকম কিস্তিবন্দী পরিকল্পনা কর্যে আর-কি। শয়তানগুলান যা হয়্যেছে-না! তবে ডাকাত হইলে কী হয়, চমৎকার সব ছেল্যাপিলা! আস দেখি, তোমার ওই খ্যাপা শয়তানডারে খুঁজ্যে বের করা যাক!'

আস্তাবলে ঢুকে দেখা গেল একগাদা খড়ের ওপর শুয়ে আছে আন্তন।

চের্‌নেঙ্কো ওকে বলল, 'ঠিক আছে, আন্তন, তোমারে আমি ঘোড়াগুলান বিক্রি করলাম।'

খড় থেকে মাথা তুলে আন্তন শুধোল:

'খুব আক্রা নয় তো?'

'কোনোরকমে যা পার দিবে আর-কি।'

'এটা এট্টা কথার মতন কথা বটে।' আন্তন বলল। 'আপনে ভারি চালাক লোক।'

'আমারও তাই তো মনে হয়,' চের্‌নেঙ্কো হেসে বলল।

'আপনের সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজারির চাইতে বেশি চালাক আপনে।'

## ২১

## জবালাতুনে বুড়োর দল

কলোনিতে গ্রীষ্মের সন্ধেগুলো ছিল ভারি মনোরম। কোমল, নির্মল আকাশটা পরিব্যাপ্ত থাকত বিশাল পটভূমির মতো, গোধূলির আলোয় মৌন হয়ে থাকত বনপ্রান্ত, সব্জি-বাগানের ধার-ঘেঁষে-বসানো সূর্যমুখীর ফুলগুলো আসন্ন অন্ধকারে মিলেমিশে গিয়ে একটা একটানা নক্‌শায় পরিণত হোত, মনে হোত দিনের উত্তাপের পর তারা যেন বিশ্রামরত, আর হ্রদের খাড়াই, কন্‌কনে-ঠান্ডা পাড়টা আস্তে-আস্তে ডুবে যেত ঘনায়মান অন্ধকারে। আর এবাড়ি-ওবাড়ি গাড়িবারান্দার নিচে বসে থাকত লোকে, তাদের কথার গুন্‌গুনানি শোনা যেত অস্পষ্টভাবে; কিন্তু তারা যে কে, কতজন বসে আছে তা কখনও বোঝা যেত না।

সন্ধের ঝোঁকে এমন একটা প্রহর আসে যখনও পর্যন্ত প্রায় আলো আছে বলা চলে, অথচ যখন কোনো জিনিস চেনা কিংবা একটা থেকে আরেকটাকে ঠাহর করে তফাত করা শক্ত হয়ে পড়ে। প্রতিদিনই ওই সময়টায় কলোনিটাকে জনশূন্য বলে মনে হোত। মনে-মনে ভাবতুম, সব ছেলেপিলে এ-সময়ে কোথায় যেতে পারে? অথচ কলোনির মধ্যে দিয়ে একবার পায়চারি করলেই দেখা যেত ওরা সকলে কলোনিতেই আছে। হয়তো দেখা যেত আস্তাবলের মধ্যে দেয়ালে-টাঙানো ঘোড়ার গলবন্ধনীর নিচে বসে জনা-পাঁচেকের একটা দল কী-একটা বিষয় নিয়ে যেন আলোচনায় মেতে আছে। আর রুটির কারখানায় হয়তো দেখা যেত রীতিমতো ভিড়। কারণ তার আধ-ঘন্টার মধ্যে রুটিগুলো তৈরি হয়ে যাবে, তাই কোনো-না-কোনোভাবে যারা ওই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত থাকত — যেমন যাদের ওপর রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব এবং যাদের ওপর সেই দিনকার প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত থাকত — তারা সবাই ধোয়ামোছা, খাবারদাবারে-ভরা রুটির কারখানায় একখানা বেঞ্চিতে বসে শান্তিতে কথাবার্তায় মগ্ন হয়ে থাকত। ওই সময়ে পাতকুয়োর চারপাশে

যারা ভিড় জমিয়ে থাকত তাদের মধ্যে দেখা যেত একটা ঢিলেঢালা ভাব — হয়তো তাদের কেউ এসেছে এক কলসি জল নিতে, আরেক জন ওই পথ দিয়ে যেতে-যেতে হয়তো থমকে দাঁড়িয়েছে, অপর একজন আটকে আছে ওখানে তাকে কেউ সকাল থেকে খোঁজ করে বেড়াচ্ছে বলে। আর তারা জলের কথা ভুলে গেছে সবাই, সকলেরই হয়তো অন্য কিছু কথা মনে পড়ে গেছে — খুব-যে দরকারি কোনো কথা তা কিন্তু নয়... তবু গ্রীষ্মের মধুর সন্ধেবেলা অ-দরকারি বলে কিছু থাকতে পারে কি?

উঠোনের অপর প্রান্তে, হ্রদের ঢালু পাড় শুরু হচ্ছে যেখান থেকে, সেখানে হয়তো দেখা যেত বহুদিনের একটা ছালবাকলা-ওঠা, মাটিতে-পড়ে-থাকা উইলোগাছের গুঁড়ির ওপর এক দঙ্গল বাচ্চা ছেলে চেপে বসে আছে আর তাদের মাঝখানটিতে বসে মিতিয়াগিন তার অননুকরণীয় ভঙ্গিতে গল্পের জাল বুনে চলেছে:

'...আর তারপর, সক্কালবেলা, লোকজন তো গির্জায় এয়েল। কিন্তু তারা এস্যে ইদিক দ্যাখে, উদিক দ্যাখে — অথচ এট্টা পাদ্রিরেও কোনোখানে দেখতি পায় না! ব্যাপারডা কী, হল্য কী পাদ্রিগুলার? সকল পাদ্রি একজোট হয়্যে সরি পড়ল্য কনে? তা, গির্জার চৌকিদার কয় কী, 'কী হয়্যেছে জান না বুঝি? মনে নিত্যেছে শয়তান এস্যে বোধহয় আমাদের পাদ্রিগুলারে জলায় নিয়ি গ্যাছে। আমাদের চারজনা পাদ্রি ছিল তো।' 'চারজনা।' 'হ্যাঁ, তা-ই তো মনে নিত্যেছে, চার-চারডে পাদ্রিরে রাতের বেলা চুপিচুপি জলায় ধর্য্যে নিয়ি গ্যাছে...' '

আর সম্মোহিত হয়ে চুপচাপ গল্প শুনে যেত ছেলেরা। আগ্রহে চোখগুলো যেন জ্বলত ওদের। আর তোস্‌কার সরু গলার খুশিভরা কিচিরমিচির শব্দে কখনও-সখনও স্তব্ধতার আমেজ যেত ভেঙে। শয়তানের গপ্পো শুনে যত-না মজা পেত ও তার চেয়ে ঢের বেশি আমোদ পেত সেই বোকা চৌকিদারটার কথা শুনে — যে নাকি সারাটা রাত পাহারায় থাকা সত্ত্বেও ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছিল না যে শয়তানটা ওরই গির্জের পাদ্রিগুলোকে জলায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল নাকি অচেনা অন্য কিছু পাদ্রিকে। গল্প শুনতে-শুনতে তোস্‌কার চোখের সামনে যেন ভাসত সব-একরকম-দেখতে, নামহীন, থপথপে মোটা যত পাদ্রি-সাহেব আর তাদের জড়িয়ে অমন একটা গোলমেলে ঝামেলার ছবি। ভাবো একবার, কী কাণ্ড!

পাদ্রিগুলোকে একে-একে কাঁধে তুলে নিয়ে এমন নির্বিকারভাবে জলার দিকে রওনা দেয়া — যেন নেহাতই গোটাকয়েক ছারপোকা-নিধনে মেতে উঠার ব্যাপার।

আগে বাগান ছিল অথচ পরে অযত্নে ঝোপঝাড়ে পরিণত হয়েছে এমন জায়গাগুলো থেকে হয়তো তখন কানে আসত ওলিয়া ভোরনভার দম-ফাটানো হাসির আওয়াজ, আর তার পরই হয়তো শোনা যেত বুরুনের পুরুষালি দরাজ গলায় খুনসুটির সুর, আর সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই হাসি — তবে এবার একা ওলিয়ার নয়, এক দঙ্গল মেয়ের ঐকতান হাসির সুর। আর এরপরই হয়তো দেখা যেত মাথার ওপর দোমড়ানো টুপিটাকে চেপে ধরে বুরুন লাফিয়ে পড়ল মাঠের ওপর, আর পিছু-পিছু ওকে তাড়া করে চলল প্রাণোচ্ছল, নানারঙা পোশাক-পরা এক পাল মেয়ে। ওদিকে শেলাপুতিনকে তখন দেখা যেত মাঠে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে, দলের সঙ্গে ভিড়ে হাসিতে যোগ দেবে না ছুটে পালাবে সে-ব্যাপারে মনস্থির করে উঠতে না-পেরে। ওর ওপরও মেয়েদের প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারটা থেকে গিয়েছিল, তাই।

কিন্তু এমন সব প্রশান্ত, ধ্যানমৌন, কাব্যময় সন্ধ্যাগুলোর সঙ্গে আমাদের মনের অবস্থা যে সব সময়ে খাপ খেত তা নয়। কলোনির ভাঁড়ার, গ্রামবাসীদের মাটির নিচের ঠাণ্ডা-ঘর, এমন কি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ঘরগুলো পর্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপের লক্ষ্যস্থল হওয়া থেকে তখনও পর্যন্ত বাদ যাচ্ছিল না। তবে কলোনির জীবনের প্রথম বছরে যে-পরিমাণে এই ব্যাপারটা ঘটেছিল পরে তার মাত্রা গিয়েছিল কমে, এইমাত্র। জিনিসপত্র খোওয়া যাওয়ার ব্যাপারটা পরে একেবারেই কালেভদ্রে ঘটছিল। আমাদের মধ্যে এই পরদ্রব্য-আত্মসাৎ শিল্পে নতুন কোনো বিশেষজ্ঞ যদি কখনও দেখা দিত, তাহলে সে দ্রুত এই উপলব্ধিতে পেঁাছত যে এজন্যে তাকে-যে শুধু ডিরেক্টরের সঙ্গেই মোকাবিলা করতে হবে তা নয়, গোটা যৌথ প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশের সঙ্গে তা করতে হবে এবং এ-ব্যাপারের প্রতিক্রিয়ায় বালখিল্যযৌথ অত্যন্ত নির্মম হয়ে উঠতে পারে। আলোচ্য গ্রীষ্মের গোড়ার দিকে নতুন একটি ছেলেকে কলোনির অন্যান্য সদস্যের কবল থেকে উদ্ধার করতে আমাকে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছিল। একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার ঘরে জানলা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করার সময় ছেলেটি অন্যদের হাতে ধরা পড়ে।

অন্যান্যরা যে-অন্ধ ক্রোধ ও নির্মমতার বশে ছেলেটিকে প্রহার করেছিল, তা একমাত্র জনতার পক্ষেই করা সম্ভব। সেই উন্মত্ত জনতার মাঝখানে সেদিন আমার আবির্ভাব ঘটতেই একই রকম প্রবল ধাক্কার বেগে আমাকে একপাশে হটে যেতে হল, আর শুনলুম কে যেন রাগত স্বরে চেঁচিয়ে বলে উঠল:

'নারকীটারে এখান থ্যেকে বের কর্যে দিতি আস্তনরে বাধ্য করা হোক!'

ওই বারের গ্রীষ্মেই কমিশন থেকে কুজ্‌মা লেশিকে কলোনিতে পাঠানো হয়েছিল। খুব সম্ভব অংশত বেদের বংশে জন্ম হয়েছিল কুজ্‌মার। ওর প্রকাণ্ড বড়-বড় কালো চোখ ঈষৎ শ্যামলা মুখে চমৎকার মানিয়ে গিয়েছিল, আর চোখদুটো ইচ্ছেমতো এদিক-সেদিক ঘোরানোর উপযোগী চমৎকার যন্ত্রপাতিও ছিল ওর মুখে। ওর ওই চোখদুটোর ওপর প্রকৃতি একটা বিশেষ কাজের ভার ন্যস্ত করেছিল — তা হল, সুবিধামতো চুরি-করার-উপযুক্ত কোনো বস্তু কখনও চোখ এড়িয়ে না-যাওয়া। লেশির দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও ওই দুটো বেদিয়া-চোখের হুকুম অন্ধভাবে প্রতিপালন করে চলত। যেমন, চুরির উপযোগী জিনিসটা যেখানে আছে লেশির পাদুটো তাকে ঠিক সেইখানটায় নিয়ে যেত, হাতদুটো বশংবদ মানুষের মতো এগিয়ে যেত জিনিসটার দিকে, আত্মরক্ষার উপযোগী যে-কোনো স্বাভাবিক আশ্রয়ের সুযোগ নিতে পিঠটা বেঁকত বাধ্য ছেলের মতো, আর যে-কোনো সন্দেহজনক নড়াচড়ার বা পায়ের শব্দ কিংবা অন্য কোনো আওয়াজ শোনার জন্যে ওর কানদুটো সর্বদাই সতর্ক হয়ে থাকত। কার্যকারণের এই সমগ্র ধারায় লেশির মাথাটা-যে কোন্‌ ভূমিকা পালন করত তা বলা শক্ত। কলোনির ইতিহাসে পরের দিকে লেশির মাথাটা অবশ্য তার উপযুক্ত মূল্য আর মর্যাদাই পেয়েছিল, কিন্তু গোড়ার দিকে সকলেরই মনে হয়েছিল মাথাটা বুঝি ওর দেহের সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় অংশ।

এই লেশি ছেলেটি যেমন আমাদের দুঃখকষ্টের তেমনই আমোদেরও কারণ হয়েছিল। এমন একটি দিনও যেত না তখন, যখন ও কোনো-না-কোনো ঝামেলায় না-জড়িয়ে পড়ত। একবার হয়তো শহর থেকে সবেমাত্র-এসে-পৌঁছনো গাড়িটা থেকে একদলা শুয়োরের চর্বি হাতানোর জন্যে, আবার আরেক সময়ে ভাঁড়ারীর চোখের সামনে ভাঁড়ার-ঘর থেকে একমুঠো

চিনি চুরি করার জন্যে হয়তো-বা। সঙ্গীদের পকেট থেকে ও অক্লেশে কুচনো তামাকপাতা হাতাত, রুটির কারখানা থেকে রান্নাঘরে আনতে-আনতেই অর্ধেক রুটি খেয়ে সাবাড় করে দিত, কিংবা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কারো ঘরে বসে কাজের কথা আলোচনা করার ফাঁকে চক্ষের নিমেষে এক-আধটা টেব্‌ল-ছুরি সরিয়ে ফেলতে দ্বিধা করত না। বিন্দুমাত্র জটিল কোনো পরিকল্পনার ধার ধারত না লেশি, কিংবা যত আদিমই হোক কোনো যন্ত্রপাতিই ব্যবহার করত না হাতসাফাইয়ের কাজে। এমনভাবে ওর মনটা তৈরি হয়েছিল যে আপন হাতই ওর কাছে ছিল জগন্নাথ, অর্থাৎ সবচেয়ে সেরা হাতিয়ার। প্রথম-প্রথম ছেলেরা ওকেও মারধর করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু লেশি তাতে দাঁত বের করে হেসে শুধু বলেছিল:

'আমারে মার্‌য়ো হবেডা কী? কী কর্‌য়ো-যে কাজডা আমি সার্‌য়ো ফেলি তা নিজিই বুঝি না। অমন অবস্তায় পড়্‌লি তোমরা-যে কী করত্যো তা আমার দেখার ভারি শখ!'

কুজ্‌মা ছিল ভারি হাসিখুশি ছেলে। মাত্র ষোলো বছর বয়সের মধ্যে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল ও, ঘুরেও ছিল অনেক, দেখেও ছিল বিস্তর, মাঝে-মাঝেই বিভিন্ন জেলার জেলখানায় আটক থাকতে হয়েছিল ওকে, লিখতে-পড়তে জানত। ছেলেটা ছিল রসিক, চলাফেরায় চট্‌পটে আর নির্ভয়, গপাক-নাচ নাচতে পারত চমৎকার, আর লজ্জা কাকে বলে তা জানত না।

এই সব গুণের জন্যে ওর অনেক দোষ অন্য ছেলেরা ক্ষমা করে দিত, কিন্তু ওর চুরি করার প্রবণতা অল্প দিনের মধ্যেই সকলের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগল। অবশেষে এমন একটা অতি বিশ্রী ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়ল যে তার ফলে বেশ দীর্ঘ সময় ওকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হল। ব্যাপারটা ছিল এই যে এক রাত্রে চুপিসারে রুটির কারখানায় সেঁধনোয় ও প্রচণ্ডভাবে লাঠির বাড়ি খায়। আমাদের রুটির কারিগর কোস্তিয়া ভেত্‌কোভ্‌স্কি অনেক দিন ধরে অনবরত তৈরি-রুটি কম পড়ার জন্যে যন্ত্রণাভোগ করছিল। এ-ব্যাপারটা একমাত্র কারখানা থেকে কলোনিতে রুটি দেবার সময় ধরা পড়ছিল। তাছাড়া, রুটি সেঁকার পর বাড়তি ওজনে অনবরত ঘাটতি হতে দেখা যাচ্ছিল, আর কালিনা ইভানভিচের কাছ থেকে এই সবকিছুর জন্যে অনবরতই ধমক খেতে হচ্ছিল কোস্তিয়াকে। অতএব,

কোস্তিয়া একটা ফাঁদ পাতল — আশাতীতরকম সফল একটা কৌশল, আর এক রাত্রে লেশি সরাসরি সেই ফাঁদে ধরা দিল। পরদিন সকালে সাহায্যের জন্যে লেশি গিয়ে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার শরণাপন্ন হল। জানাল, গাছে উঠে তুঁতফল পাড়তে গিয়ে হড়কে পড়ে যাওয়ায় গা-টা ছেঁচড়ে গেছে। গাছ থেকে সামান্য পড়ে যাওয়ার অমন মারাত্মক রক্তাক্ত ফলাফল দেখে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না অবশ্য খুবই অবাক হলেন, তবে এ-ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করা তাঁর কাজ নয় মনে করে তিনি লেশির মুখটা ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। তারপর লেশিকে এজমালি শোবার ঘরে পেঁছে দিয়েও আসতে হল তাঁকে, কারণ লেশির পক্ষে ওই পর্যন্ত একা যাওয়া সম্ভব ছিল না। যতক্ষণ-না উপযুক্ত সময় এল ততক্ষণ রুটির কারখানায় ওই রাত্রে কী ঘটেছিল তার বিশদ বিবরণ কোস্তিয়া কারো কাছেই ফাঁস করল না, কেবল অবসরের সবটুকু সময় ওকে কুজ্‌মার বিছানার ধারে বসে তাকে 'টম সয়ার-এর অ্যাড্‌ভেঞ্চার'-এর কাহিনী পড়ে শোনাতে দেখা গেল।

সুস্থ হয়ে ওঠার পর লেশি নিজেই পুরো গপ্পোটা বললে। নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে প্রথম মজা করল ও-ই।

শুনে কারাবানভ বলল:

'শোন্‌, কুজ্‌মা, আমার যদি সারাক্ষণই তর মতন অমন বরাত-খারাপির পালা চলত্য, তাইলে কবে আমি চুরিবিদ্যে ছাড়্যে দিতাম। বুঝলি? তুই দেখত্যেছি কোন্‌দিন এয়ার জন্যি মারা পড়বি।'

আপনমনে কুজ্‌মা বলল, 'আমি খালি-খালি ভাব্যে মরি, আমার বরাত এমনধারা মন্দ হল্য কেমনে। হয়তো, হতি পারে, আমি পাকা চোর বন্‌তি পারি নাই, তাই। তা, আর বারকয়েক চেষ্টা করি দ্যাখব-নে, যদি সফল হতি না-পারি, তাইলে এ-কাম আমারে ছাড়্যে দিতিই হবে। ঠিক তাই, নয় কি আন্তন সেমিওনভিচ?'

ওর কথার পুনরাবৃত্তি করে বললুম, 'আর বারকয়েক? তা, পরে করব বলে ফেলে না-রেখে আজই একবার চেষ্টা করে দ্যাখো না। অবশ্য জানা কথা, তাতে কিছুই লাভ হবে না। তোমার দ্বারা ও-কম্মো হবার নয়, বুঝলে বাপু।'

'হবার লয়?'

'মোটেই হবার নয়। বরং সেমিওন পেত্রোভিচ বলছিল কামার হিসেবে তুমি নাকি চমৎকার কাজের ছেলে হতে পার।'

'বলত্যেছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ, বলছিল। তবে ও আরও বলছিল কামারশাল থেকে দুটো নতুন স্ক্রু-ড্রাইভার তুমি হাতসাফাই করেছ — বোধহয় এই মুহূর্তে তা তোমার পকেটেই আছে।'

কালচে মুখে যতটা রঙ্‌ধরা সম্ভব লজ্জায় ততটা লাল হয়ে উঠল লেশি। এদিকে লেশির পকেটে হাত পুরে দিয়ে কারাবানভ হেসে উঠল হো-হো করে, যেমন অট্টহাসি হাসতে পারত একমাত্র কারাবানভই।

'অবশ্য, আছে বৈকি ওগুলা! কামারশালে তর এই পের্‌থম বার, আর পের্‌থম বারেই ঠিকে ভুল হয়্যে গেল গিয়্যে!'

'দূর হোক গে ছাই!' বলে লেশি ওর পকেটগুলো খালি করে ফেলল।

কলোনির মধ্যে অবশ্য এমনি ছোটখাট কাজ-কারবার চলছিল তখন। কিন্তু তথাকথিত পারিপার্শ্বিকের ক্ষেত্রে ব্যাপার অনেক বেশি পরিমাণে ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। গ্রামের মাটির নিচের ভাঁড়ারগুলো আগের মতোই কলোনি-বাসিন্দাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে আসছিল, তবে আলোচ্য সময়ে তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠে ভালোরকম সংগঠিত একটা ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ওই সব ভাঁড়ারে হানা দেয়ার ব্যাপারটায় তখন একমাত্র বড় ছেলেরাই অংশগ্রহণ করছিল, কনিষ্ঠদের বাদ দেয়া হয়েছিল তা থেকে। আর ছোট ছেলেরা মাটির নিচে সেঁধনোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলে ওই বড়রাই দয়াদাক্ষিণ্য না-দেখিয়ে আর বেশ সরল বিশ্বাসেই তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ আনত। বড় ছেলেরা এ-কাজে এমন অসামান্য দক্ষতা অর্জন করে ফেলেছিল যে এমন কি কুলাকদের জিভেও এই নোংরা কাজের দায়িত্ব কলোনির ওপর চাপানোর মতো কথা যোগাত না। আর, তখন আমার এ-কথাটা বিশ্বাস করার মতো এমন যথেষ্ট কারণ ঘটেছিল যে মাটির নিচের ভাঁড়ারগুলোয় হানা দেয়ার সব কটা ঘটনার কার্যকর নেতৃত্ব একমাত্র মিতিয়াগিন ছাড়া কম দক্ষ আর কোনো বিশেষজ্ঞের হাতে ছিল না।

শিশুকাল থেকেই মিতিয়াগিন ছিল চোর। কলোনির মধ্যে চুরি-চামারি না-করার তার একমাত্র কারণ ছিল এই যে সে কলোনির বসিন্দাদের মর্যাদা দিত এবং এটা ভালোভাবেই বুঝত যে কলোনির মধ্যে চুরি করা মানে তার সাথীদেরই ক্ষতি করা। কিন্তু তাই বলে শহরের বাজারগুলোয় কিংবা গ্রামবাসীদের ভিটেয় নিজের হাত চেপে-ধরার মতো পবিত্র ভাব জাগার কোনো ব্যাপার ছিল না তার মধ্যে। ফলে প্রায়ই রাত্রে সে কলোনিতে গরহাজির থাকত, আর পরদিন সকালে প্রাতরাশের জন্যে তাকে ডেকে তোলা কঠিন হয়ে পড়ত। রবিবারগুলোয় সর্বদাই সে ছুটি চাইত আর সেদিন ফিরত অনেক রাত করে, কখনও একটা নতুন টুপি কখনও-বা একটা মাফলার গায়ে চড়িয়ে, আর সব সময়েই সঙ্গে করে আনত একগাদা উপহার — যা সে বয়ঃকনিষ্ঠ ছেলেদের মধ্যে বিলি করত। বাচ্চা ছেলেরা তো মিতিয়াগিনকে পুজো করত; ওদের কাছ থেকে কী কৌশলে যেন সে নিজের খোলাখুলি লুটপাটের দর্শনকে গোপন করে রাখতে সমর্থ হোত।

আমার প্রতি মিতিয়াগিনের ভালোবাসা তখনও পর্যন্ত টিকে ছিল, তবে চুরি-চামারির ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে কখনও আলোচিত হোত না। আমি জানতুম, কথাবার্তা বলে ওর কোনো উপকার করতে পারব না।

তবু মিতিয়াগিন আমার দারুণ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। ছেলেদের মধ্যে যারা ছিল সবচেয়ে বুদ্ধিমান আর সৃষ্টিশক্তির অধিকারী ও ছিল তাদেরই একজন, সেজন্যে সকলের কাছ থেকে শ্রদ্ধা আর সম্মান পেত ও। চৌর্যবৃত্তির স্বভাবকেও দারুণ আকর্ষণীয় করে ও উপস্থাপিত করতে পারত। বড় ছেলেদের মধ্যে একদল ভক্ত সব সময়েই মিতিয়াগিনকে ঘিরে থাকত, তবে মিতিয়াগিন নিজে অন্যের মন-বুঝে-চলার যে-ক্ষমতা রাখত এবং কলোনি ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি তার যে-সম্মানবোধ ছিল ওই ছেলেরাও সেইমতো আচরণ করত। অন্ধকারের রহস্যময় প্রহরগুলোয় এই দলটি-যে কী কর্মে ব্যস্ত থাকত তা নির্ণয় করা কঠিন ছিল। এটা করতে হলে হয় ওদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করা আর নয়তো কয়েকটি ছেলেকে আড়ালে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার ছিল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল এই দুটো পদ্ধতির কোনো একটা অবলম্বন করলে অত পরিশ্রম করে তখন কলোনিতে যে-আবহাওয়া তৈরি করা গিয়েছিল তাতে বিঘ্ন ঘটত।

যখনই মিতিয়াগিনের কোনো নিয়ম-বহির্ভূত অপকর্মের কথা আমার কানে আসত, তখনই সভা ডেকে প্রকাশ্যে ওকে কঠিন তিরস্কার করতুম, কখনও-কখনও শাস্তিও দিতুম, কিংবা আমার অফিস-ঘরে ডেকে নিয়ে গোপনে ধমকধামক দিতুম। সাধারণত নির্বিকার, শান্তভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকত মিতিয়াগিন, যেন সবই বুঝতে পারছে এমন ভাব করে অত্যন্ত অমায়িক হাসি হেসে চলত, আর তারপর চলে যাবার সময় প্রীতিপূর্ণ গম্ভীর গলায় বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে যেতে একবারের জন্যেও ভুলত না। বলত:

'শুভরাত্রি, আন্তন সেমিওনভিচ!'

কলোনির সুনাম-রক্ষার খোলাখুলি সমর্থক ছিল ছেলেটা। অপকর্ম করতে গিয়ে কেউ ধরা পড়ে গেলে ও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হোত। বলত:

'বুঝি না, এই গাধাগুলান জম্মো নেয় কোন্ চুলায়? যা হজম করতি পারে না তার থ্যেকে বেশিডা ক্যানে প্যাটে পোরে!'

আমি ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম যে শেষপর্যন্ত মিতিয়াগিনের সঙ্গ আমাদের ত্যাগ করতেই হবে। এ-ব্যাপারে আমি-যে অসহায় তা নিজের কাছে স্বীকার করতে যেমন রাগ হচ্ছিল, তেমনি দুঃখও হচ্ছিল মিতিয়াগিনের জন্যে। সম্ভবত ও নিজেও বুঝতে পারছিল যে কলোনিতে থেকে ওর কোনো উপকার হচ্ছে না, তবু যেখানে ওর অত বন্ধুবান্ধব রয়ে গেছে এবং চিনি দেখলে মাছি যেভাবে ছেঁকে ধরে সেইভাবে ছোট-ছোট বাচ্চা ছেলে ওকে ছেঁকে আছে যেখানে সেই জায়গাটা ছেড়ে যেতে ওর মন উঠছিল না।

মিতিয়াগিনের উপস্থিতিতে সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার যা ঘটছিল তা হল এই যে কারাবানভ, ভের্শ্নেভ, ভোলখভের মতো ছেলে যাদের যৌথ-জীবনের নির্ভরযোগ্য সদস্য বলে মনে হচ্ছিল এমন কি তারাও মিতিয়াগিনের জীবনদর্শনে আক্রান্ত হতে শুরু করল। মিতিয়াগিনের সত্যিকার খোলাখুলি বিরোধিতা একমাত্র যে করছিল সে হল বেলুখিন। এ-প্রসঙ্গে কথাটা উল্লেখ করার মতো যে মিতিয়াগিন আর বেলুখিনের মধ্যে শত্রুতা কোনোদিন ঝগড়াঝাঁটি, হাতাহাতি, কিংবা এমন কি সাধারণ বচসার রূপও নেয় নি। বেলুখিন একদিন এজমালি শোবার ঘরে খোলাখুলি ঘোষণা করে বসল যে মিতিয়াগিন যতদিন থাকবে ততদিন কলোনিতে

চোরের বংশ দূর হবে না। মুখে হাসি ফুটিয়ে মিতিয়াগিন সেদিন ওর কথাগুলো শুনল, তারপর এতটুকু বিদ্বেষের ভাব না-দেখিয়ে জবাব দিল:

'সক্কলে আমরা সৎ হব, এডা হত্যেই পারে না, মাত্ভেই। যদি চোরই না-থাকত্য তাইলে তোর সৎ হওয়ার কোন্ কানাকড়ি দামডা থাকত্য শুনি? আমার জন্যিই তো তোরে সক্কলে ভালো কয়।'

'তোর জন্যিই সক্কলে আমারে ভালো কয়! কী আবোলতাবোল বকত্যেছিস?'

'তা ছাড়া আবার কী! আমি চুরি করি, আর তুই চুরি করিস না, আর সেই জন্যিই তর অত খাতির। কেউ যদি চুরি-বাটপাড়ি না-করত্য তাইলে সক্কলেই সমান হত্য। আমার তো মনে হয় আন্তন সেমিওনভিচের উচিত মতলব কর্যেই আমার মতন ছোঁড়াদের কলোনিতি আন্যে ঢোকানো। নাইলে তর মতন ছোঁড়াদের গুণগানডা করব্যে কেডা?'

'কী যে বাজে বকিস!' বেলুখিন বলল। 'এমন কিছু-কিছু দেশ আছে, যে-সব দেশে চোর বল্যে পদাত্থই নাই। যেমন, ধর্, ডেনমার্ক, তারপর সুইডেন, তারপর গিয়ি সুইট্জারল্যান্ড। আমি বইতে পড়্যেছি ওই সব দেশে নাকি চোর নাই।'

'মি-মি-মিথ্যা কথা!' তুতলে-তুতলে বলল ভের্শ্নেভ। 'ওখানেও চ-চ-চোর আছে, চোরে চ-চুরিও করে। আর চ-চোর না-থ-থাকলিই বা অদের ভ-ভালোডা ক-কী হত্যেছে? ভারি তো সব... খ-খুদ্দুর-খুদ্দুর দেশ — ডে-ডে-ডেনমার্ক, সু-সুইট্জারল্যান্ড!'

'আর আমাদের অবস্তাডাই-বা কী?'

'আমাদের? ক্যা-ক্যানে? আমাদের দ-দিকি ত-তাকা দে-দেখি একবার, দ্যাখ্ দে-দেখি কী ক-কান্ডডাই-না ক-কর্যেছি আমরা — আমাদের ব-বিপ্লবের দি-দিকি ত-তাকা দেখি, ত-তাকা না একবার!..'

'তদের মতন লোকজন তো পের্থমেই বিপ্লবের বিরোধিতা করে, ভারি তো বিপ্লব-বিপ্লব করত্যেছিস!..' এবার চেঁচিয়ে বলল বেলুখিন।

বিশেষ করে এই ধরনের কথা শুনলেই কারাবানভ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে, ঘুসি পাকিয়ে হাত নাড়তে-নাড়তে, আর বেলুখিনের ভালোমানুষি-ভরা মুখখানার দিকে কালো দুটো চোখ মেলে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ও চিৎকার করে বলল:

'কী নিয়ি তোর এত হৈ-হল্লা, শুনি? মিতিয়াগিন আর আমি যদি এক-আধখান বাড়তি পিঠা খায়্যেই থাকি তাইতে বিপ্লবের কী ক্ষেতিডা হয়? শুধুমাত্তর পিঠা দিয়ি তোরা সবকিছুর ভালোমন্দ বিচার কর‍্যে থাকিস...'

'দ্যাখ্, পিঠা-পিঠা করবি না, বলত্যেছি! এডা পিঠা-টিঠার ব্যাপার না, আসলে তুই হলি গিয়ি শুয়ারের ছ্যানার মতন, মাটিতি মুখ ডুবায়্যে অন্ধিসন্ধি তল্লাস কর‍্যে ফিরিস, বুঝলি!'

ওই বছর গ্রীষ্মের শেষাশেষি মিতিয়াগিন আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের ক্রিয়াকলাপ মারাত্মক আকার ধারণ করল — বিশেষ করে প্রতিবেশীদের তরমুজ-খেতে। আমাদের ওই সব অঞ্চলে সে-বছর তরমুজ আর খরমুজার চাষ ব্যাপক আকারে করা হয়েছিল, অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ কিছু-কিছু চাষী বেশ কয়েক দেসিয়াতিনা জমিতে পর্যন্ত ওই চাষ করেছিল।

খেতগুলোয় মাঝেসাঝে হানা দিয়ে ওই তরমুজ আর খরমুজা চুরি শুরু হল প্রথম। ইউক্রেনে খেত থেকে তরমুজ ইত্যাদি চুরিকে কখনও ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না, গাঁয়ের ছেলেরা এ-ধরনের ছোটখাট চুরি হামেশাই করে থাকে। খেতের মালিকরাও এ-রকম চুরি-চামারির ব্যাপারে মোটামুটি চোখ বুজেই থাকে — কারণ, এক দেসিয়াতিনা জমি থেকে তারা কখনও-কখনও বিশ হাজারের মতো তরমুজ বা খরমুজা তোলে, ফলে তা থেকে সারা গ্রীষ্ম জুড়ে শ-খানেকের মতো ফল খোয়া গেলে তাকে তারা ক্ষতি বলেই গণ্য করে না। তবু, তা সত্ত্বেও, তরমুজ-খেতের মাঝখানে একখানা কুঁড়ে তুলে কিছু বুড়োসুড়ো লোককে সেখানে পাহারায় রাখা হচ্ছে ওখানকার রেওয়াজ। আর, তরমুজ ইত্যাদি পাহারা দেয়া ওই বুড়োদের যত-না কাজ, তার চেয়ে বড় কাজ হচ্ছে রাতের বিনি-নেমন্তন্নর অতিথ্ কারা তার হিসেব রাখা।

আর প্রায়ই ওই বুড়োদের কেউ-না-কেউ নালিশ নিয়ে আমার কাছে হাজির হচ্ছিল। একদিন ওদের একজন এসে বলল:

'আপনের ছেল্যারা গতকাল তরমুজ-খ্যাতে ঢুক্যেছিল। অদের এট্টু বলবেন যে এডা করা ঠিক না। অরা সোজা কুঁড়্যেতি চল্যে আসুক-না, খেতি দেয়ার মতন যথেষ্ট ফল সব্বদা ওখেনে থাকে। তাছাড়া, অরা আমারে কয় না ক্যানে -- খ্যাত থ্যেকে বাছা-বাছা ফল তুলি আমি নিজিই তো আপনেদেরে দিতি পারি।'

বুড়োর অনুরোধের কথা ছেলেদের জানিয়ে দিলুম। আর তারপর থেকে প্রতি সন্ধ্যায় তারা ওই অনুরোধ রক্ষা করে চলতে লাগল বটে, তবে বৃদ্ধ যে-ধরনের অনুরোধ জানিয়েছিল তাতে অল্প একটু পরিবর্তন ঘটিয়ে, এইমাত্র তফাত রেখে। যেমন, একদিকে বৃদ্ধের নিজের-হাতে-বাছা সবসেরা তরমুজ ইত্যাদি খাওয়া আর তার সঙ্গে গতবছরের তরমুজ আর জাপানী যুদ্ধের বছরের ফসল এই দুইয়ের গুণাগুণ নিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ তুলনামূলক আলাপ-আলোচনা যেমন চলতে লাগল, তেমনই তার সঙ্গে সঙ্গে বিনি-নেমন্তন্নর অতিথ্‌রা ওদিকে সব রকম কথাবার্তা সম্পূর্ণ স্থগিত রেখে তরমুজ ইত্যাদির খেত আগাগোড়া চষে বেড়াতে লাগল আর কামিজের তলার দিকটা উলটে নিয়ে সেই কোঁচড়, বালিশের ওয়াড় আর থলে আষ্টেপৃষ্ঠে তরমুজ আর খরমুজায় বোঝাই করে চলল। প্রথম দিন সন্ধেয় ভের্‌শ্‌নেভ প্রস্তাব করল যে বৃদ্ধের সদয় আমন্ত্রণের সুযোগ নিয়ে বেলুখিন তার কুঁড়েয় দেখা করতে যাক। এই পক্ষপাতিত্বে অন্যরা কিন্তু কোনো আপত্তি জানাল না। খেত থেকে মাত্‌ভেই সেদিন ফিরে এল ভারি পরিতৃপ্ত হয়ে:

'এত ভালো লাগল্য, সত্যি, কী বলি! আমাদের মধ্যি কথাবার্তা হল্য, বুড়া তো খুবই খুশি।'

মিটিমিটি হাসতে-হাসতে এই সময়ে ভের্‌শ্‌নেভ এসে একটা বেঞ্চিতে বসল। হঠাৎ হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে কারাবানভ বলে উঠল:

'তা, মাত্‌ভেই, সময়ডা ভালোই কাটল্য, কেমন?'

'বুঝ্যেছিস, সেমিওন, ইচ্ছা করলি আমাদের মধ্যি ভালো পড়শি-সম্পক্কও গড়্যে উঠতি পারে।'

'তর তো খুবই মজায় কাটল্য! প্যাট ভর্যে তরমুজ আর খরমুজা খেলি, তা আমরা পেলামডা কী?'

'আচ্ছা, মজার কথা বলত্যেছিস তো! আরে, তুই নিজিই তো অর কাছে যাতি পারিস।'

'ভালো কথা বললি বটে! তোর শরম লাগা উচিত! এট্টা লোক আমাদেরে নিমন্তন্ন জানাল্য, আর অমনে দলবলসুদ্ধা সবাইরে যাতি হবে নাকি? আমরা তো সবসুদ্ধা ষাটজনা আছি — সক্কলে গেলি যাচ্ছেতাই বাড়াবাড়ি হয়্যে যেত না!'

এর পরদিন ভের্‌শ্‌নেভ ফের প্রস্তাব করল যে সেদিনও বেল্‌খিন বুড়োর সঙ্গে দেখা করতে যাক। কিন্তু উদারতা দেখিয়ে বেল্‌খিন সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল — বলল, আর কেউ যাক।

'আর কারে পাঠানোর জন্যি পাব এখন? আরে, আয়-না! না-হয় তুই আজ তরমুজ খাস না। কুঁড়েয় বস্যে বুড়ার সাথে কথা তো চালাতি পারবি।'

বেল্‌খিন ভাবল, ভের্‌শ্‌নেভ ঠিক কথাই বলছে। এমন কি এই মতলবটা ওর বেশ পছন্দসই মনে হল যে বুড়োর কাছে গিয়ে ও প্রমাণ করে দেবে কলোনির বাসিন্দারা তার কাছে খালি তরমুজ খেতেই যায় না।

কিন্তু দেখা গেল বুড়ো তার অতিথিকে একান্তই নিরুত্তাপভাবে অভ্যর্থনা জানাল। ফলে, বেল্‌খিনের পক্ষে তরমুজে বীতস্পৃহা দেখানোর কোনো সুযোগই মিলল না। উলটো, বুড়ো ওকে তার বন্দুকটা দেখিয়ে বলল:

'গতকাল তুমি যখন এখেনে বস্যে আমার সাথে ভালোমান্‌ষির মতন কথাবাত্তা চালাতিছিলে তখন তোমার শয়তান বন্ধুরা আমার আদ্ধেক তরমুজ তুলি ফাঁক কর্যে দেছে। কী কর্যে এমন কাম করতি পারলা? দ্যাখত্যেছি, তোমাদের সাথে অন্যরকম ব্যাভার করতি লাগবে আমার। এবার দ্যাখলেই গুলি করব আমি, হাঁ!'

একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে বেল্‌খিন তাড়াতাড়ি কলোনিতে ফিরে এল। তারপর এজমালি শোবার ঘরে ঢুকেই রাগে গর্‌গর করতে-করতে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। ছেলেরা সবাই হাসতে লাগল, খালি মিতিয়াগিন বলল:

'তর ব্যাপারখান কী, শুনি — বুড়া তোরে উকিল পাকড়াল্য নাকি? কাল তো তুই প্যাট ভর্যে সেরা-সেরা তরমুজ খায়্যে আলি — তা আইন বাঁচায়্যে খায়্যেছিস বটে — এর বেশি আর চাস কী, শুনি? তাছাড়া, নিজির চক্ষি তুই নিচ্চয় কাউরে দেখিস নাই। আমরা যে চুরি কর্যেছি তার কী পের্‌মান আছে বুড়ার কাছে, ক' দেখি?'

বৃদ্ধ আর নালিশ জানাতে আমার কাছে এল না। তবে নানারকম লক্ষণ আর ইঙ্গিত থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যেতে লাগল যে খেত থেকে তরমুজ চুরির একটা সত্যিকার মচ্ছব চলেছে।

একদিন সকালে এজমালি শোবার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি সারা মেঝেটা জুড়ে যত্রতত্র তরমুজের খোসা ছড়ানো। মনিটরকে ডেকে এজন্যে বকাবকি করলুম, এক-আধজনকে শাস্তিও দিলুম, বললুম আর যেন এমন জিনিস হতে না-দেখি। ফলে এরপর কয়েক দিন এজমালি শোবার ঘরগুলো আবার আগের মতোই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রইল।

গ্রীষ্মের মিষ্টি, মনোরম সন্ধেগুলো কথাবার্তার কূজনে, প্রীতিপূর্ণ আবহাওয়ায়, হৈ-হৈ হাসির অপ্রত্যাশিত দমকে পূর্ণ হয়ে উঠে আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যেতে থাকল গম্ভীর, স্ফটিকস্বচ্ছ রাত্রিতে।

আর ঘুমন্ত কলোনির ওপর ভেসে বেড়াতে লাগল স্বপ্ন, পাইন আর পুদিনা-পাতার সৌগন্ধ্য, পাখিদের আচমকা ডানা-ঝাপটানি আর দূর-দূরে গাঁয়ের কুকুরের দূরাগত ডাকের প্রতিধ্বনি। একদিন গাড়িবারান্দার নিচে একা-একা বেরিয়ে এলুম। বাড়ির কোণের দিক থেকে রাত্রের পাহারায় নিযুক্ত মনিটরকে আসতে দেখা গেল। ও এসে কটা বেজেছে জিজ্ঞাসা করল আমাকে। গায়ে ছিটে-দাগওয়ালা কুকুর 'তোড়া' ছেলেটির পিছু-পিছু নিঃশব্দ পায়ে রাতের ঠাণ্ডা বাতাস শুঁকতে-শুঁকতে চলে গেল। শান্তিতে ঘুমোতে গেলুম আমি।

কিন্তু এই আপাত-শান্তির আবরণের নিচে অত্যন্ত জটিল আর বিচলিত-করে-তোলার মতো ঘটনা ঘটে চলেছিল।

ইভান ইভানভিচ একদিন কথায়-কথায় আমায় জিজ্ঞাসা করলেন:

'আচ্ছা, আপনার নির্দেশেই কি ঘোড়াগুলো সারা রাত্তির উঠোনে ঘুরে বেড়ায়? এর ফলে ঘোড়া চুরিও তো হয়ে যেতে পারে।'

শুনে ব্রাত্‌চেঙ্কো তো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। শুধোল:

'তাইলে, ঘোড়াগুলারে কি একটুকুন হাওয়াও খাওয়ানো যাবে না?'

পরদিন কালিনা ইভানভিচ আমায় জিজ্ঞাসা করল:

'ঘোড়াগুলা এজমালি শোওনের কোঠার জানলা দিয়া চুপি দেয় ক্যান?'

'কী বলছ? তার মানে?'

'তুমি নিজেই একদিন পরখ কইর‍্যা দ্যাখ না ক্যান? ঠিক ভোর হওয়া মাত্তর ওগুলা গিয়া জানলার নিচে খাড়াইয়া যায়। অমন করে ক্যান উয়ারা?'

নিজেই একদিন ব্যাপারটার সত্যাসত্য পরীক্ষা করে দেখলুম: কথাটা ঠিকই — খুব ভোরবেলায় আমাদের সব কটা ঘোড়া আর বলদ 'গাভ্রিউশ্‌কা'

(বেশি বয়সের দরুন অপদার্থ হয়ে পড়ায় ওটাকে জনশিক্ষা-দপ্তরের অর্থনৈতিক শাখা আমাদের উপহার দিয়েছিল) জানলাগুলোর নিচে লাইল্যাক আর পাখি-চোরি গাছগুলোর মধ্যে সার বেঁধে দাঁড়ায়। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা ওরা ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে মন-লোভানো কোনো কিছু পাওয়ার আশায় নিশ্চয়ই।

এজমালি শোবার ঘরে ছেলেদের এ-নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলুম:

'ঘোড়াগুলো তোমাদের জানলায় এসে উঁকি দেয় কেন?'

শুনে বিছানায় উঠে বসে জানলার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল অপ্রেশ্‌কো। তারপর কাকে যেন চেঁচিয়ে বলল:

'সেরিওজা, যা দেখি, গিয়ি ওই মুর্খ্যগুলারে শুধা দেখি, অরা জানলার নিচি অমন দাঁড়ায়্যে থাকে ক্যানে?'

কম্বলগুলোর তলা থেকে খিলখিল হাসির আওয়াজ উঠল। আড়মোড়া ভেঙে মিতিয়াগিন গুরুগম্ভীর হেঁড়ে গলায় বলল:

'সব ব্যাপারে নাক গলাতি চায় এমন জন্তুগুলারে কলোনিতি ঢুকানো আমাদের উচিত হয় নাই — এর জন্যি আপনেরে আবার বেশি কর্য়ে ব্যতিব্যস্ত হতি হচ্ছে...'

আন্তনকে আক্রমণ করলুম আমি:

'এর রহস্যটা কী, বল দেখি? রোজ সকালে ঘোড়াগুলো ওখানে অমন ঘুরঘুর করে কেন? ওদের কিসের লোভ দেখাও তোমরা?'

হাত দিয়ে আন্তনকে সরিয়ে দিয়ে এবার বেলুখিন এগিয়ে এল।

বলল, 'আপনে ভয় পাবেন না, আন্তন সেমিওনভিচ, ঘোড়াগুলার কোনো ক্ষেতি হবে না। আন্তন ইচ্ছা কর্য়েই ওগুলারে এখানে নিয়ি আসে, যাতে অরা ভালো কিছু খাতি পায়।'

'থাম্‌, থাম্‌, যথেষ্ট আলতু-ফালতু বকবক কর্যেছিস!' কারাবানভ বলল। 'আমরা বলত্যেছি আপনেরে। আপনে তো মেঝের উপরি তরমুজের খোসা ফেলতি মানা কর্যেছিলেন, তাই না? তা, আমাদের মধ্যি সব্বদাই কেউ-না-কেউ এক-আধডা তরমুজ পায়্যে যায় আর-কি...'

'তরমুজ 'পেয়ে যায়'? তার মানে?'

'হ্যাঁ, পায়্যে যায় তো বটেই! কখনও বুড়া আমাদের খাতি দেয়, কখনও ছোঁড়ারা গেরাম থ্যেকে নিয়ি আসে...'

'বুড়ো তোমাদের খেতে দেয়?' সজোরে ধমক দিয়ে বললুম।

'ওই আর-কি, সে কিংবা আর কেউ দেয়। তা, খোলা-বাকলা আমরা ফেলব কনে? তাই আন্তন ঘোড়াগুলান ছাড্যে দেয়। আর ছোঁড়ারা অদের তা-ই খাওয়ায়।'

রাগ করে এজমালি ঘর ছেড়ে চলে এলুম।

দুপুরের খাওয়ার পর প্রকান্ড একটা তরমুজ ঘাড়ে করে মিতিয়াগিন হুড়মুড় করে আমার অফিস-ঘরে এসে ঢুকল।

'আপনের খাওয়ার জন্যি, আন্তন সেমিওনভিচ।'

'কোত্থেকে পেলে এটা? তোমার তরমুজ নিয়ে বেরিয়ে যাও বলছি! সত্যি-সত্যি তোমাদের এবার কড়া শাসনে রাখব, মনে করছি।'

'তরমুজডা একদম নিয়মমাফিক যোগাড় করা, বিশেষ কর্যে আপনের জন্যিই বেছেবুছে আনা হয়্যেছে। এডার জন্যি বুড়ারে সত্যিই দাম দেয়া হয়্যেছে। অবিশ্যি আপনে আমাদেরে শাসন করবেন তাতে আর কথা কী, শাসন করা উচিত বৈকি। শাসন করল্যে আমরা মোটেই দোষ ধরব না জানবেন।'

'বক্তৃতা বন্ধ করে তুমি তোমার তরমুজ নিয়ে সরে পড় দেখি!'

দশ মিনিট পরে আবার সেই তরমুজটা ঘাড়ে করে রীতিমতো একটা প্রতিনিধিদল ঘরে ঢুকল। অবাক হয়ে দেখলুম এবার দলের মুখপাত্র হয়েছে বেলুখিন। হাসির দমকে ও প্রায় কথাই বলতে পারছিল না:

'উঃ, আন্তন সেমিওনভিচ, আপনে যদি জানতেন এই শুয়ারের বাচ্চাগুলান পেত্যেক রাত্তিরে কতগুলান কর্যে তরমুজ খায়! তা, কথাডা লুক্যে রাখ্যে হবেডা কী... ভোলখভ একাই... অবশ্য সেডা কোনো কথা না... কেমন কর্যে যোগাড় করে — সেডা অদের বিবেকের ব্যাপার — তবে এডা এড়ায়্যে যাওয়া চলে না যে লোচ্চাগুলান আমারেও ভাগ দেয়। আমার এই কচিকাঁচা বুকডার মধ্যি যে-দুব্বলতা আছে সেডা অরা ধর্যে ফেল্যেছে, বোঝলেন — তরমুজ বলতি আমি পাগল। এমন কি মেয়্যারাও ভাগের ভাগ পায়, তোস্‌কাডাও প্যাট পুরি খাতি পায়। এডা স্বীকার পাতিই হয় যে ছোঁড়াদের শরীলে দিব্যি মায়াদয়া আছে। তা, আমরা জানি আপনের কপালে তরমুজ জোটে না, এই হতচ্ছাড়া তরমুজগুলার জন্যি আপনের জোটে খালি ভাবনা-চিন্তা, দুঃখকষ্ট। তাই, আমরা বলতি চাই, দয়া কর্যে আপনে আমাদের এই সামান্য জিনিসডা নেন। আমি একজন সৎ লোক, আপনের ভের্‌শ্‌নেভদের মতন নই, আমারে

আপনে বিশ্বেস করতি পারেন, এই তরমুজডার জন্যি বুড়ারে দাম ধরি দেয়া হয়্যেছে, এডা ফলাতি যতখানি মানবিক শ্রম লাগ্যেছে তার মূল্যের চাইতি বোধকরি বেশিই দেয়া হয়্যেছে। কথাডা অর্থনৈতিক রাজনীতি অনুসারে বলা চলে।'

অবশেষে বক্তৃতা শেষ করে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বেলুখিন তরমুজটা আমার টেবিলের ওপর রাখল, তারপর বিনীতভাবে একপাশে সরে দাঁড়াল।

যথারীতি উস্কোখুস্কো চেহারা নিয়ে ছেঁড়া জামাকাপড়-পরা ভের্শ্নেভ মিতিয়াগিনের পেছন থেকে এই সময়ে উঁকি দিল।

বেলুখিনকে সংশোধন করে দিয়ে বলল, 'রা রা-রাজনীতি সংক্রান্ত অর্থনীতি, অ-অ-অর্থনৈতিক রা-রা-রাজনীতি নয়।'

'ওই হল্য,' বলল বেলুখিন।

জিজ্ঞাসা করলুম:

'বুড়োকে কীভাবে দাম দিলে তোমরা?'

আঙুলের কড় গুনে কারাবানভ হিসেব দিতে শুরু করল:

'ভের্শ্নেভ বুড়ার মগের হাতলডা ঝালাই কর্যে দেছে; গুত্ তালি মার্যেছে ওর বুটজুতায়, আর আমি আদ্ধেক রাত্তির জাগি অর হয়্যে খ্যাত পাহারা দিছি।'

'আমি বেশ কল্পনা করতে পারছি, ওই রাত্তিরে এই তরমুজটার সঙ্গে আরও কতগুলো তরমুজ যোগাড় হয়ে গেছে!'

'কথাডা বড় মিথ্যা বলেন নাই!' বেলুখিন বলল। 'তবে আপনের ও-কথার জবাব আমিই দায়িত্ব নিয়ি দিতি পারি! আমরা এখন বুড়ার সাথে যোগাযোগ রাখ্যে চলত্যেছি। তবে কী জানেন, জঙ্গলডার ঠিক বাইরি এট্টা তরমুজ-খ্যাত আছে, সেখানকার পাহারাওলাডা আবার ভারি বজ্জাত লোক — সব্বদাই গুলি করবার জন্যি বন্দুক বাগায়্যে আছে।'

'সে কি — তুমিও তরমুজ-খেতে যেতে শুরু করেছ নাকি?'

'না — আমি নিজি যাই না বটে, তবে গুলির আওয়াজ শুনতি পাই — বোঝলেন না, আশপাশ দিয়ি মাঝেসাঝে যাতি লাগে তো...'

অতঃপর, চমৎকার তরমুজটা উপহার দেয়ার জন্যে ছেলেদের আমি ধন্যবাদ জানালুম।

এর অল্প কয়েক দিন পর সেই 'ভারি বজ্জাত লোকডা'-র দেখা মিলল।

লোকটি আমার কাছে এল নিতান্ত নিরুদ্যম হয়ে।

বলল, 'এর শেষ হবে ক্যামনে কইতি পারেন? এর আগি অরা সাধারণত রাত্তিরিই চুরি করতি বেরাত্য, আর এখন দিনির বেলাতেও অদের হাত থ্যেকে নিস্তার নাই — ঠিক দুপ্পরের খাওয়ার সময়ডায় দল বাঁধ্যে আসব্যে সব। একবারে নাকের-জলে-চোখের-জলে কর্য্যে ছাড়ে মানুষজনেরে — একজনার পিছু দৌড়াই তো বাকি সব কয়ডা সারা খ্যাত জুড়ি হুড়াহুড়ি শুরু কর্য্যে দেয়।'

ছেলেদের সাবধান করে দিয়ে বললুম যে এরপর থেকে আমি নিজেই গিয়ে তরমুজ-খেত পাহারা দেব, আর নয়তো কলোনির খরচে একজন চৌকিদার বহাল করব।

'আপনে ওই মুজিকডার কথা বিশ্বেস করবেন না,' মিতিয়াগিন বলল। 'এডা মোটেই তরমুজ চুরির ব্যাপার না, ও লোকডা তরমুজ-খ্যাতের পাশ দিয়িও কারেও হাঁটতি দিতি চায় না।'

'তা, তোমরাই-বা খেতের পাশ দিয়ে যাও কেন? ওখানে যাবার দরকারটা কী তোমাদের?'

'আমরা যেখানেই যাই-না ক্যানে, তাতে অর কী? ও গুলিই-বা ছোড়ে ক্যানে?'

আরেক দিন বেলুখিন আমাকে সাবধান করে দিল:

'এয়ার ফলাফল কিন্তু খুব খারাপ হতি যাচ্ছে। ছোঁড়ারা একবারে খেপ্যে আছে। বুড়া এখন একা কুঁড়েয় থাকতি ভয় পায়, আরও জনা দুই লোকেরে অর সাথে চৌকি দেয়ার কাজে বহাল কর্য্যেছে, আর অদের পেত্যেকের সাথে বন্দুক আছে। ছোঁড়ারা এডা মোটেই মান্যে নিতি রাজি না।'

ওই রাত্রেই কলোনির ছেলেরা রণসাজে সেজে তরমুজ-খেতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। যে-সামরিক কুচকাওয়াজে ওদের আমি অভ্যস্ত করিয়ে ছিলুম, তা-ই এখন কাজে লেগে গেল। মধ্যরাত্রি লাগাদ কলোনির অর্ধেক ছেলে তরমুজ-খেতের সীমানার ঠিক বাইরে সারবন্দী হয়ে শুয়ে পড়ল। এর আগেই ওরা পর্যবেক্ষণের জন্যে প্যাট্রোল ও সন্ধানী দল পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারপর খেতের পাহারাদাররা যেই হৈ-চৈ করে উঠল অমনি ছেলেরাও 'হুররা!' বলে হাঁক পেড়ে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাহারাদাররা পিছিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল, ভয়ে বন্দুকগুলো কুঁড়েয় ফেলেই চম্পট দিল তারা। এরপর

কিছু-কিছু ছেলে যুদ্ধে-জয়-করা ফলগুলো লতা থেকে তুলে মাঠের সীমানার দিকে ঢালু জমি-বরাবর সেগুলোকে গড়িয়ে দিতে লাগল, আর অন্যেরা প্রতিশোধ নেয়ার নাম করে বড় চালাঘরটাতেই দিল আগুন লাগিয়ে।

চৌকিদারদের একজন প্রাণপণে ছুটে কলোনিতে এসে আমাকে ঘুম থেকে তুলল। তাড়াহুড়ো করে আমরা রণক্ষেত্রের দিকে রওনা হলুম।

গিয়ে দেখলুম, ছোট্ট একটা ঢিপির ওপরকার কুঁড়েখানা দাউদাউ করে জ্বলছে, চারিদিক এত আলো হয়ে গেছে যে মনে হচ্ছে আস্ত একখানা গ্রামই বুঝি আগুনে জ্বলছে। তরমুজ-খেতের দিকে দৌড়ে যেতে-যেতে কয়েকটা গুলির আওয়াজও কানে এল। ছেলেদের দেখতে পাচ্ছিলুম, সেনাবাহিনীর মতো ছোট-ছোট নিয়মিত দলে ভাগ হয়ে ওরা তরমুজ-খেতের মধ্যে শুয়ে ছিল। মাঝে-মাঝেই এই দলগুলো দাঁড়িয়ে উঠে জ্বলন্ত কুঁড়েটার দিকে খানিকটা করে ছুটে এগিয়ে যাচ্ছিল। আর, ডান দিকে কোথা থেকে যেন হুকুম জারি করছিল মিতিয়াগিন।

'সিধা নয়, ঘুর্যে যা!'

'গুলি ছুড়ছে কে?' বৃদ্ধকে শুধোলুম।

'কী কর্যে জানব? কুঁড়েয় তো কেউ নাই। হতি পারে, কেউ একজন ওখেনে বন্দুক ফেল্যে গেছে, আর সেই বন্দুক থ্যেকে আপনা-আপনি গুলি ছোটত্যেছে।'

কার্যত অবশ্য অভিযান শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমাকে দেখতে পাওয়ামাত্র ছেলেরা যেন শূন্যে মিলিয়ে গেল। এরপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ তার ঘরে ফিরে গেল। আমিও ফিরে এলুম কলোনিতে। দেখলুম এজমালি শোবার ঘরগুলোয় পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। সকলে শুধু ঘুমোচ্ছে না, রীতিমতো নাক ডাকছে তাদের। আমার জীবনে এমন নাক-ডাকা আর কখনও শুনি নি। ফিস্‌ফিস করে বললুম:

'ভাঁড়ামি রাখো। উঠে পড় সবাই।'

ফলে নাক-ডাকা থামল। কিন্তু একগুঁয়ের মতো নিঃসাড়ে তখনও ঘুমিয়ে রইল সবাই।

'উঠে পড়, বলছি।'

এলোমেলো চুলে-ভরা মাথাগুলো এবার বালিশ থেকে উঁচু হয়ে উঠল। শূন্যদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে মিতিয়াগিন বলল:

‘কী হয়েছে?’

কিন্তু কারাবানভ আর বেশিক্ষণ এই খেলা চালিয়ে যেতে পারল না। বলল:

‘ঢের হয়েছে, মিতিয়াগা, কী লাভ এয়া কর্যে!’

চারিদিক থেকে আমায় ঘিরে ধরে সবাই মিলে তখন উৎসাহের সঙ্গে সেই দারুণ গৌরবময় রাত্রের খুঁটিনাটি বিবরণ দিতে শুরু করল। হঠাৎ তারানেত্স এমনভাবে লাফিয়ে উঠল, মনে হল তাকে কী যেন কামড়েছে।

চেঁচিয়ে বলল, ‘ওই কুঁড়েয় অনেকগুলা বন্দুক ছেল!’

‘তা, সেগুলা কী আর আছে, এতক্ষণে পুড়্যে ছাই হয়ি গ্যাছে!’

‘কাঠের কুঁদাগুলান পুড়্যেছে, কিন্তু বাকিডা ব্যাভার করা চলতি পারে।’

বলেই ও এজমালি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়ল।

আমি বললুম:

‘দ্যাখো, তোমাদের কাছে এটা খুব মজার ব্যাপার হতে পারে, তবু এ নিছক ডাকাতি ছাড়া কিছু নয়। এ-জিনিস আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তোমরা যদি এইভাবেই চলতে চাও তাহলে আমাকে তোমাদের ত্যাগ করতে হবে। সত্যি, এটা লজ্জার ব্যাপার — কি দিনে কি রাত্রে, কি কলোনিতে কি সারা তল্লাটে কোথাও তোমাদের জন্যে এতটুকু শান্তি নেই!’

শুনে কারাবানভ আমার বাহুমূল চেপে ধরল। বলল:

‘এ-জিনিস আর হবে না! আমরা নিজিরাই বোঝতে পারত্যেছি ব্যাপারডা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়্যে গেছে। তাই না, দোস্ত-সব?’

গুন্‌গুন করে ছেলেরা একবাক্যে ওর কথায় সায় দিল।

আমি বললুম, ‘ও তো শুধু কথার কথা, তাছাড়া আর কী। যাই হোক, আমি তোমাদের ভালোরকম সতর্ক করে দিচ্ছি, এই ধরনের ডাকাতি-রাহাজানি যদি এরপরও চলতে থাকে, তাহলে তোমাদের মধ্যে কাউকে-না-কাউকে কলোনি থেকে বের করে দিতে হবে। মনে রেখ, এই কিন্তু আমি শেষবারের মতো তোমাদের সাবধান করে দিলুম।’

পরদিন কয়েকখানা গাড়ি উৎসন্ন তরমুজ-খেতে গিয়ে যা-কিছু অবশিষ্ট তরমুজ পড়ে ছিল তা-ই কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নিয়ে ফিরে গেল।

আর আমার টেবিলের ওপর পড়ে রইল আগুনে-পোড়া বন্দুকগুলোর গোটা কয়েক নল আর টুকরো-টুকরো কিছু অংশ।

## ২২

## অস্ত্রোপচার

ছেলেরা কিন্তু ওদের কথা রাখল না। কি কারাবানভ, কি মিতিয়াগিন, কি ওদের গোষ্ঠীর অন্য কোনো ছেলে কেউই তরমুজ ইত্যাদির খেতে হানা দেয়া কিংবা গাঁয়ের গুদামঘরে আর মাটির নিচের ঠাণ্ডা ভাঁড়ারে উৎপাত করা বন্ধ করল না। অবশেষে একদিন ওরা একটা নতুন আর অত্যন্ত জটিল ধরনের অভিযান সংগঠিত করল, যার ফলস্বরূপ পরপর প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর দুই ধরনেরই কতগুলো ঘটনা ঘটল।

এক রাত্রে চুপিচুপি ওরা লুকা সেমিওনভিচের বাগানে ঢুকে মধু আর মৌমাছিসুদ্ধ গোটা দুই মৌচাক ভেঙে তুলে নিয়ে এল। রাত্রেই মৌচাক দুটো কলোনিতে এনে ওরা সে-দুটো জুতো-বানানোর কারখানা-ঘরে রেখে দিল। বলা বাহুল্য, ওই কারখানায় ওই সময়টায় কাজ বন্ধ ছিল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওরা তারপর একটা ভোজেরই আয়োজন করে ফেলল, আর তাতে যোগ দিল বেশ কিছু ছেলে। কারা-কারা এই অভিযানে যোগ দিয়েছিল তার একটা পুরো তালিকাই পরদিন সকালবেলা তৈরি করতে বেগ পেতে হল না, কারণ অভিযাত্রীরা সকলেই লাল আর ফোলা-ফোলা মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। লেশিকে এমন কি একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার কাছ থেকে ওষুধ ইত্যাদি সাহায্য পর্যন্ত চাইতে হয়েছিল।

অফিসে ডেকে পাঠানোর পর মিতিয়াগিন সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করল যে পুরো অভিযান সংগঠন করাটা ওরই কীর্তি। তবে সাঙ্গপাঙ্গদের নাম বলতে ও অস্বীকার করল, উলটে ভাব দেখাল যেন এ-নিয়ে হৈ-চৈ করায় ভারি অবাক হয়ে গেছে। বলল:

'এ এট্টা এমন কী ব্যাপার! মৌচাকগুলান আমরা তো নিজিদের জন্যি আনি নাই, কলোনির জন্যি এন্যেছি। আপনে যদি মনে করেন কলোনিতি মৌমাছি রাখা চলব্যে না, তাইলে ও-দুটারে ফিরত দিয়ি আসতি পারি।'

'কী ফেরত দেবে তুমি? মধু তো সব খেয়ে ফেলেছ, আর মৌমাছিগুলোও উড়ে পালিয়ে গেছে।'

'তা আপনে যা ভালো বোঝেন। আমি ভালো মনে করোই বলত্যেছিলাম।'

'না, মিতিয়াগিন, সবচেয়ে ভালো হচ্ছে তুমি যদি আমাদের শান্তিতে থাকতে দাও... ইতিমধ্যেই তুমি সাবালক হয়ে উঠেছ, তাছাড়া তুমি আর আমি, আমরা কখনই কোনো ব্যাপারে একমত হতে পারব না, আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হওয়াই বাঞ্ছনীয়।'

'আমারও তাই মনে নিত্যেছে।'

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিতিয়াগিনের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া একান্ত দরকার হয়ে পড়েছিল। এতদিনে এ-কথাটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে আমার উপরোক্ত সিদ্ধান্তকে কার্যকর না-করে ঠেকিয়ে রাখা এবং আমাদের মধ্যে ক্রমে-ক্রমে যে-পচন ধরার পালা শুরু হয়েছিল সেদিকে চোখ বন্ধ করে রাখা আমার পক্ষে ক্ষমার অযোগ্য অন্যায় হয়েছিল। তরমুজ-খেতে হানা দেয়া কিংবা মৌচাক চুরির অভিযান সংগঠনের মতো ব্যাপারগুলোর মধ্যে হয়তো বিশেষ করে শয়তানি মনোবৃত্তির প্রকাশ না-থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এই ধরনের নষ্টামিতে ছেলেদের অবিরাম উৎসাহ, দিন-রাত্তির ওই একই চিন্তা-ভাবনা আর চেষ্টা নিয়ে মাথা-ঘামানো — এ-সব আমাদের নৈতিক উৎকর্ষ-বৃদ্ধির প্রয়াস একেবারে খারিজ করে দেয়া এবং ফলত স্থবিরতাকে প্রশ্রয় দেয়ার ইঙ্গিতই বহন করছিল। আর অনুসন্ধিৎসু চোখে আমাদের সেই নিস্তরঙ্গ বদ্ধ জলার উপরিতলে ইতিমধ্যেই অত্যন্ত অপ্রীতিকর নানা সমোন্নত দেহরেখার হদিশ মিলছিল — যেমন, ছেলেদের নিজেদের মধ্যেই সৌজন্যবর্জিত একধরনের হালকা চাল, কলোনির প্রতি এবং সব ধরনের কাজের প্রতি তাদের মনোভঙ্গিতে একটা সুনির্দিষ্ট অশালীনতার প্রকাশ, একটা ক্লান্তিকর শূন্যগর্ভ ইয়ার্কি-ফাজলামির আবহাওয়া, এবং এ-সবকিছুর মধ্যে নিঃসন্দেহে নিহিত ছিল তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মনোবৃত্তি। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছিলুম, এমন কি বেলুখিন ও জাদোরভের মতো ছেলেরাও, নিজেরা কোনোরকম অপরাধমূলক কাজকর্মে যোগ না-দিলেও, ক্রমশ তাদের আগেকার ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলছিল, এবং কেমন-যেন একটা আঁশের আবরণে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, কোনো একখানা কৌতূহলোদ্দীপক বই, রাজনৈতিক সমস্যাবলী, সবকিছুই আমাদের যৌথ-জীবনে পেছনে পড়ে যাচ্ছিল, সেই জায়গায় মনোযোগের কেন্দ্রে এসে দাঁড়াচ্ছিল কতগুলো শস্তা, স্বতঃস্ফূর্ত নষ্টামির

অভিযান আর তা-ই নিয়ে অন্তহীন আলোচনা। ছেলেদের বাহ্য অবস্থা ও সমগ্রভাবে কলোনি, এই উভয়ের ওপরই উপরোক্ত সবকিছুর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে চলেছিল তখন — যেমন, শিথিল, এলোমেলো চলনবলন, সুড়সুড়ি দিয়ে রসিকতা করার জন্যে হাল্কা মেজাজে হুড়োহুড়ি করে প্রতিযোগিতা চালানো, অযত্নে-পরা কাপড়জামা, ঘরের ময়লা মেঝের এককোণে জমিয়ে রাখা ইত্যাদি।

মিতিয়াগিনের জন্যে একখানা ছাড়পত্র তৈরি করে ফেললুম আর রাহাখরচ বাবদ পাঁচ রুব্‌ল দিলুম ওকে। ও বলল, অদেসায় যাচ্ছে। তারপর বিদায়জ্ঞাপক শুভেচ্ছা জানালুম।

'দোস্তদের কাছে বিদায় নিতি পারি তো?'

'নিশ্চয়।'

জানি না কীভাবে ও বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিল। সন্ধের দিকে কলোনি ছেড়ে চলে গেল মিতিয়াগিন। যাবার সময় প্রায় পুরো কলোনিই ওকে বিদায়-সংবর্ধনা জানাল।

ওই দিন রাত্রে সকলকেই কেমন-যেন মনমরা ঠেকতে লাগল। অল্পবয়সী ছেলেদের দেখে মনে হল স্বাভাবিক অফুরন্ত প্রাণশক্তি যেন কমে গেছে তাদের, কেমন-যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে তারা। ভাঁড়ারঘরের বাইরেটায়-রাখা একটা উলটনো প্যাকিংবাক্সের ওপর নেতিয়ে পড়ল কারাবানভ। রাত্রে বিছানায় শুতে যাওয়ার সময় পর্যন্ত সে ওখানেই পড়ে রইল।

একসময় লেশি আমার অফিস-ঘরে এল।

বলল, 'মিতিয়াগিনের অভাব আমরা বড় বেশি বোধ করত্যেছি।'

আমার কাছ থেকে এ-কথার জবাবের জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল ও। কিন্তু আমি কোনো উত্তর না-দেয়ায় যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করলুম। রাত দুটোর সময় অফিস ছেড়ে যেতে গিয়ে নজরে পড়ল আস্তাবলের ওপরের চিলেকোঠায় আলো জ্বলছে। আন্তনকে ডেকে তুলে শুধোলুম:

'চিলেকোঠায় কে আছে?'

প্রশ্ন শুনে নির্বিকারভাবে একটা কাঁধে ঝাঁকানি দিল আন্তন, তারপর যেন কিছুটা অনিচ্ছাভরে বলল:

'মিতিয়াগিন আছে।'

'কেন ও আছে ওখানে?'

'তা আমি কী করে জানব?'

সিঁড়ি বেয়ে চিলেকোঠায় উঠলুম। দেখলুম, আস্তাবলের একটা আলোর চারধারে জড় হয়ে আছে কয়েক জন — কারাবানভ, ভোলখভ, লেশি, প্রিখোদ্‌কো আর অসাদ্‌চি। নিঃশব্দে ওরা আমার দিকে তাকিয়ে রইল। কোঠার এক কোণে মিতিয়াগিন কী নিয়ে যেন ব্যস্ত ছিল, অন্ধকারে তাকে প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না।

বললুম, 'তোমরা সকলে অফিসে এস।'

অফিস-ঘরের দরজার তালা খুলতে-খুলতে শুনতে পেলুম কারাবানভ বলছে:

'সকলের যাওয়ার দরকার নাই। মিতিয়াগিন আর আমি গেলিই চলব্যে।'

আমি এতে কোনো আপত্তি করলুম না।

আমরা তিনজন অফিস-ঘরে ঢুকলুম। কারাবানভ ঝুপ করে কৌচে বসে পড়ল, দরজার কাছে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে রইল মিতিয়াগিন।

'কলোনিতে তুমি আবার ফিরে এলে কেন?'

'কিছু কাজ ছেল, তাই।'

'কী কাজ?'

'আমাদের এট্টা কাজ আর-কি।'

এতক্ষণ আমার দিকে জ্বলন্ত, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে ছিল কারাবানভ। হঠাৎ নিজের সর্বশক্তি কেন্দ্রীভূত করে সাপের মতো এঁকেবেঁকে ও চলে এল আমার টেবিলের কাছে। তারপর টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে জ্বলন্ত চোখদুটো আমার চশমার কাছে নিয়ে এসে বলল:

'ব্যাপারডা কী জানেন, আন্তন সেমিওনভিচ? ব্যাপারডা কী জানেন? আমিও মিতিয়াগিনের সাথে চল্যে যাব।'

'তা চিলেকোঠায় বসে কী মতলব ভাঁজছিলে?'

'বিশেষ কিছু না, সত্যি। তবে ওই আর-কি, কলোনির কোনো ব্যাপার না। আর আমি মিতিয়াগিনের সাথে চল্যে যাব। আমাদের সাথে যখন আপনের বনত্যেছে না তখন ঠিক আছে — আমরা চল্যেই যাব, আমাদের

ভাগ্যের সন্ধানে বাইরিই ঢুঁড়ে বেড়াব্য। কলোনির জন্যি আপনে হয়তো আরও ভালো-ভালো ছেল্যা পায়্যে যাবেন।'

সব সময়েই একটা অভিনেতাসুলভ ভাব ছিল কারাবানভের। আর ওই সময়ে ও নির্যাতিতদের একজনের ভূমিকায় অভিনয় করছিল। মনে-মনে ওর নিশ্চয়ই এই ভরসা ছিল যে নিজের নিষ্ঠুর আচরণে লজ্জিত হয়ে শেষপর্যন্ত আমি মিতিয়াগিনকে আবার কলোনিতে থাকতে দেব।

সরাসরি কারাবানভের চোখের দিকে তাকিয়ে আমি আরও একবার প্রশ্ন করলুম:

'তা, সবাই মিলে কোন্ মতলবে ওখানে জড় হয়েছিলে?'

এর জবাবে কারাবানভ কোনো কথা না-বলে সপ্রশ্ন চোখে মিতিয়াগিনের দিকে তাকাল।

টেবিলের ওধার থেকে উঠে এসে এবার কারাবানভকে বললুম:

'তোমার সঙ্গে রিভলবার আছে, তাই না?'

'না.' দৃঢ়ভাবে ও জবাব দিল।

'পকেটগুলো উলটে ফেল দেখি।'

'আপনে নিচ্চয় আমারে তল্লাসি করতি যাতিছেন না, আন্তন সেমিওনভিচ!'

'পকেটগুলো উলটে ফেল বলছি।'

'দ্যাখেন, দ্যাখেন, আপনের যত ইচ্ছা!' হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো চেঁচিয়ে উঠল কারাবানভ। বলতে-বলতে ট্রাউজার্স আর কোটের সব কটা পকেট উলটে-উলটে মেঝের ওপর কুচনো তামাক-পাতা আর বাজরার রুটির টুকরো ফেলতে লাগল।

এবার মিতিয়াগিনের কাছে গেলুম।

'এবার তোমার পকেটগুলো ওলটাও দেখি।'

আনাড়ির মতো পকেটগুলো হাতড়াতে লাগল মিতিয়াগিন। তারপর একে-একে একটা মনিব্যাগ, একগোছা চাবি আর একটা সব-খোল্ চাবি বের করে দেখিয়ে অতি লাজুক হাসি হেসে বলল:

'এ-ই আছে মাত্তর।'

ওর ট্রাউজার্সের বেল্টের মধ্যে হাত পুরে দিয়ে আমি এবার একটা মাঝারি-আকারের স্বয়ংক্রিয় পিস্তল টেনে বের করলুম। দেখলুম, পিস্তলের ক্লিপে তিনটে টোটা ভরা।

'এটা কার?'

'ওডা আমার রিভলবার,' কারাবানভ বলল।

'তাহলে আমার কাছে মিথ্যে কথা বললে কেন যে তোমাদের কাছে রিভলবার নেই? অ্যাঁ?.. ঠিক আছে! কলোনি ছেড়ে চলে যাও, একদম জল্‌দি! আর বাইরে গিয়ে বাইরেই থেকো! বুঝেছ?'

আবার টেবিলে বসে কারাবানভের জন্যেও একখানা ছাড়পত্র তৈরি করে ফেললুম। নিঃশব্দে ও কাগজখানা নিল। তারপর, ওর দিকে যে-পাঁচ রুব্‌ল বাড়িয়ে দিয়েছিলুম তার দিকে ঘৃণাভরে তাকিয়ে বলল:

'ওয়া না-হলিও চলব্যে। বিদায়।'

আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আঙুলগুলোকে সজোরে পিষে দিল ও। মনে হল, কী-যেন বলতে চাইল, কিন্তু কোনো কথা না-বলে হঠাৎ খোলা দরজাটার দিকে ছুটে গেল তারপর মিশে গেল সেই অন্ধকার ফোকরটার মধ্যে। মিতিয়াগিন কিন্তু হাতও বাড়িয়ে দিল না, বিদায়-সম্ভাষণও জানাল না। সজোরে কোটের দুটো পাট গায়ের ওপর জড়িয়ে নিয়ে চোরের মতো নিঃশব্দে পা টিপে-টিপে কারাবানভের পিছু-পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে আমিও দরজায় গিয়ে দাঁড়ালুম। গাড়িবারান্দাটার সামনে ছেলেদের একটা দল জটলা করে দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলে দুটো যখন চলে যাচ্ছে লেশি তখন ওদের পিছু-পিছু দৌড় লাগাল। তবে জঙ্গলটার কিনার অবধি গিয়ে আবার ফিরে এল। সিঁড়ির সবচেয়ে ওপরের ধাপে দাঁড়িয়ে তখন বিড়বিড় করে কী-যেন বলছিল আন্তন। হঠাৎ বেলুখিনের গলার আওয়াজে নৈঃশব্দ্য ভাঙল:

'এ হত্যেই হবে। হ্যাঁ -- এর নেয্যতা আমি স্বীকার করি বটে।'

'এ-এ-এডা নে-নেয্য হতি পা-পারে,' ভের্‌শ্‌নেভ তুত্‌লে বলল, 'ত-ত-তবে দুঃখ না-না-না-পায়্যে পা-পারত্যেছি না।'

'কার জন্যে?' আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

'সেমিওন আ-আর মিতিয়াগার জ-জন্যি। আ-আপনে কষ্ট পা-পাতিছেন না?'

'আমি তোমার জন্যেই দুঃখ বোধ করছি, কোল্‌কা।'

ফিরে ঘরে ঢোকার সময় শুনতে পেলুম বেলুখিন ভের্শ্নেভকে মৃদু তিরস্কার করে বলছে:

'তুই এট্টা গাধা, কিস্স্যু যদি বুঝিস — বই পড়্যে তোর কোনো উব্গার হয় নাই রে।'

কলোনি ছেড়ে যারা চলে গেল তাদের সম্বন্ধে এরপর দিন দুয়েক আর কিছু শোনা গেল না। কারাবানভ সম্পর্কে আমার খুব বেশি দুশ্চিন্তা ছিল না — ওর বাবা স্তরজেভোয়েতে বাস করতেন। জানতুম, ও সপ্তাহখানেক শহরে ঘুরঘুর করে শেষে বাপের কাছে ফিরে যাবে। তবে মিতিয়াগিনের ভবিতব্য আমি যেন ছবির মতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম। বছরখানেক ও রাস্তায়-রাস্তায় টহল দেবে, বার কয়েক মেয়াদ খাটবে, তারপর গুরুতর কোনো একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে আর অন্য শহরে চালান হয়ে যাবে। অবশেষে বছর পাঁচ-ছয়েকের মধ্যে হয় নিজের দলের কারো হাতে ছুরি খাবে, আর নয়তো গুলি করে মারার সাজা দেয়া হবে ওকে। ওর সামনে এ ছাড়া আর কোনো রাস্তা খোলা ছিল না। কে জানে, হয়তো কারাবানভকেও ওই পিছল পথে টেনে নামাবে ও। আগেও তো একবার এমনটা হয়েছে — কারাবানভও রিভলবার নিয়ে ওর সঙ্গে ছিন্তাই করতে গেছে।

দিন দুয়েক পরে কলোনিতে কানাঘুসো শোনা গেল:

'লোকে বলাবলি করছে সেমিওন আর মিতিয়াগা নাকি বড় রাস্তায় লোকজনের কাছ থেকে ছিন্তাই করছে। গত রাত্রে রেশেতিলভ্কা থেকে কয়েক জন কসাই আসছিল, তাদের জিনিসপত্র নাকি ওরা কেড়েকুড়ে নিয়েছে।'

'কে বললে?'

'যে-গয়লাবৌ ওসিপভদের দুধ দেয় তার কাছেই শোনা গেল সেমিওন আর মিতিয়াগিন এ-কাজ করেছে।'

ছেলেরা কোণে-কোণে দাঁড়িয়ে কানাকানি করতে লাগল, আর কেউ কাছে গেলেই চুপ করে যেতে লাগল। বড় ছেলেরা পড়াশুনো, কথাবার্তা সবকিছু বন্ধ করে ভুরু কুঁচকে, মুখ ভারি করে বেড়াতে লাগল, আর সন্ধেবেলায় দু-তিনজন একত্র হয়ে নিজেদের মধ্যে ফিস্ফিস করে কী-যেন বলাবলি করা শুরু করল।

যারা চলে গেছে তাদের সম্পর্কে আমার উপস্থিতিতে কোনো কথা উল্লেখ না-করতে চেষ্টা করতেন শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। কেবল একবার কথায়-কথায় লিদচ্কা বলেছিল:

'যতই যাই হোক, ছেলে দুটোর জন্যে দুঃখিত না-হয়ে পারা যায় না।'

তাতে আমি বলেছিলুম, 'শোনো, লিদচ্কা, আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি করা যাক। তুমি প্রাণ ভরে ওদের করুণা কর, কিন্তু দোহাই, আমাকে তা থেকে নিস্তার দাও।'

শুনে অভিমান করে লিদিয়া পেত্রোভ্না বলল, 'ও, ঠিক আছে!'

এর দিন পাঁচেক পরে একদিন শহর থেকে এক্কায় চেপে ফিরছি। প্রাণের আনন্দে দুলকি চালে গাড়ি টেনে চলেছে 'লালু', আগের গ্রীষ্মে ভালো খেয়েদেয়ে ও তখন বেশ মোটাসোটা হয়েছে। আমার পাশটিতে বসে আছে আন্তন, নিজের ভাবনায় ডুবে মাথাটা বুকের ওপর অনেকখানি ঝুঁকিয়ে দিয়ে। আমাদের জনশূন্য রাস্তাটায় চলাফেরা করতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি তখন, রাস্তায় কৌতূহল জাগানোর মতো যে কিছু ঘটতে পারে তা কারো মনেও হয় নি।

হঠাৎ আন্তন বলল:

'আরে, দ্যাখেন, অরা আমাদের ছোঁড়া না? আরে, আরে, অরা সেমিওন আর মিতিয়াগিন না হয় তো কী বল্যেছি!'

আমাদের সামনে ফাঁকা রাস্তায় বেশ কিছুটা দূরে দুটো মূর্তির আবির্ভাব ঘটেছিল।

একমাত্র আন্তনের জোরালো চোখের দৃষ্টিতেই ওরা মিতিয়াগিন আর তার বন্ধু বলে অত নিশ্চিতভাবে ধরা পড়েছিল। 'লালু' দ্রুত আমাদের টেনে নিয়ে চলল ওদের দিকে। হঠাৎ দেখা গেল আন্তন অস্বস্তি বোধ করছে আর বারবার আমার রিভলবারের খাপটার দিকে তাকাচ্ছে।

'আপনে পিস্তলটা পকেটে রাখেন না কেন, তাইলে ব্যবহার করতে সুবিধা হবে।'

'বাজে বোকো না।'

'তাইলে আপনার যা প্রাণ চায় করেন।'

বলতে-বলতে লাগাম টেনে গাড়ি র্খল আন্তন।

'আমাদের কী সৌভাগ্যি আপনের দেখা পালাম।' সেমিওন বলল। 'জানেন তো, আমরা তখন তেমন বন্ধুভাবে বিদায় নিই নাই।'

আগেকার মতোই অমায়িক হাসি হাসল মিতিয়াগিন।

'তোমরা এখানে কী করছ?'

'আমরা আপনের দেখা পাওয়ার অপিক্ষেতে ছেলাম। আপনে বল্যেছিলেন-না, আমরা যেন কলোনিতি আর মুখ না-দেখাই? তাই আমরা আর ওখেনে যাই নাই।'

'তা, অদেসায় যাও নি কেন?' মিতিয়াগিনকে জিজ্ঞাসা করলুম।

'এখন এখেনেই তো বেশ ভালো কাটত্যেছে। শীত পড়ল্যে আমি অদেসায় যাব-নে।'

'তুমি কোনো কাজকর্ম করবে না?'

'দেখি, শেষ পের্‌যন্ত ব্যাপারডা কী দাঁড়ায়,' মিতিয়াগিন বলল। 'আন্তন সেমিওনভিচ, আমরা আপনের উপর মোট্টেও রাগ করি নাই, মনে করবেন না — আমরা কিস্‌সু মনে নিয়্যেছি। আপনের, আমাদের পেত্যেকের চলার পথ ভেন্ন-ভেন্ন, এই আর-কি।'

প্রাণখোলা আনন্দে ঝলমল করছিল সেমিওন।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'তুমি কি মিতিয়াগিনের সঙ্গেই থাকবে?'

'বলতি পারি না। আমি তো চেষ্টা পাত্যেছি আমার সাথে অরে আমার বুড়ার কাছে — আমার বাপের কাছে — নিয়্যি যেতি, কিন্তু ও খালি-খালি ফ্যাঁকড়া তোলত্যেছে।'

'অর বাপ তো মুজিক,' মিতিয়াগিন বলল, 'অমন ঢের-ঢের মুজিক দেখা আছে আমার।'

কলোনির দিকে মোড় নেয়া পর্যন্ত ওরা আমার সঙ্গে-সঙ্গে এল।

বিদায় নেবার সময় সেমিওন বলল, 'আমাদের জন্যি মনে এট্টু দয়া রাখবেন! আসেন, বিদায় নেবার আগি এট্টা চুমো দিই!'

ওর কথা শুনে মিতিয়াগিন হাসল। বলল:

'তুই বড্ড ভাবে-ভরা দুব্বল মানুষ, সেমিওন। তোরে দিয়্যি কিস্‌সু হবার লয়।'

'তুই তার চাইতি কোন অংশে ভালো?' পালটা জবাব দিল সেমিওন।

ওদের দু-জনের মিলিত হাসিতে বন-প্রান্তর মুখর হয়ে উঠল। টুপি তুলে নাড়তে লাগল ওরা। আমরা চলে এলুম।

## ২৩

## নির্বাচিত বীজ

হেমন্তের শেষাশেষি থেকে কলোনিতে এক অত্যন্ত বিষাদাচ্ছন্ন যুগ শুরু হল — আমাদের সমগ্র ইতিহাসে সেটা ছিল সবচেয়ে বিষণ্ণ অধ্যায়। কারাবানভ আর মিতিয়াগিনের বহিষ্কার ছিল কলোনির দেহে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক একটা অস্ত্রোপচারবিশেষ। 'সব থ্যেকে চট্‌পটে আর কাজ-জানা ছোকরা দুটা', ওই সময় পর্যন্ত কলোনির ওপরে যে-দুটি ছেলে সবচেয়ে বেশি প্রভাববিস্তারে সমর্থ হয়েছিল, কলোনি থেকে তাদেরই বহিষ্কারের ফলে অন্যেরা যেন কাণ্ডারীহীন হয়ে পড়েছিল।

কারাবানভ আর মিতিয়াগিন দু-জনেই ছিল উৎকৃষ্ট কর্মী। কী করে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে আর উদ্দীপনায় টগবগ করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় কারাবানভ তা জানত; কাজ করে আনন্দ পেত ও, আর সেই উল্লাস অন্যের মধ্যেও সংক্রামিত করে দিত। কাজের সময় ওর হাত থেকে যেন কর্মশক্তি আর অনুপ্রেরণার স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে বেরুত। অলস আর ঢিলেঢালা-স্বভাবের ছেলেদের ও-যে প্রায়ই বকাঝকা করত তা নয়, কিন্তু যখন ও সত্যিই বকত তখন সংশোধনের অযোগ্য ফাঁকিবাজকেও লজ্জা পেতে বাধ্য করত। কাজের ক্ষেত্রে মিতিয়াগিন ছিল কারাবানভের উপযুক্ত ও চমৎকার পরিপূরক। খাঁটি সিঁধেল চোরের উপযুক্ত ওর চলাফেরা ছিল ধীরস্থির আর নিঃসাড় গতিতে, কিন্তু যাতেই ও হাত দিত তা-ই উত্‌রে যেত চমৎকার, সব ব্যাপারটাই ছিল সৌভাগ্য আর শান্তশিষ্ট স্বভাবের ফল। আর কলোনির জীবনযাত্রা সম্পর্কে ওরা দু-জনেই ছিল সংবেদনশীল, এমন কি স্পর্শকাতরও। দিনের প্রতিটি ঘটনার, তুচ্ছতম উত্তেজনার প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখা যেত ওদের মধ্যে।

তাই যখন চলে গেল ওরা তখন কলোনির সবকিছু হঠাৎ কেমন

নীরস, প্রাণহীন হয়ে পড়ল। আগের চেয়েও বেশি করে ভেরশ্নেভ ডুবে গেল ওর বইয়ের মধ্যে, বেল্খিনের রসিকতাগুলোও হয়ে উঠল অতিরিক্ত-রকমের গুরুগম্ভীর আর তীব্র ব্যঙ্গাত্মক, ভোলখভ, প্রিখোদ্‌কো আর অসাদ্‌চির মতো ছেলেরা বেশ চোখে-পড়ার-মতো গম্ভীর আর বিনীত হয়ে উঠল, সবচেয়ে ছোট বাচ্চারাও কেমন চুপচাপ হয়ে গেল, মনে হল সবকিছু ওদের কাছে একঘেয়ে ঠেকছে — এক কথায়, পুরো যৌথ-সংস্থাটাতেই হঠাৎ কেমন বয়স্ক মানুষের সমাজের বাহ্য লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠল। সন্ধেবেলায় খেলাধুলো আমোদ-প্রমোদ করার জন্যে ছেলেদের এক জায়গায় জড় করাও শক্ত হয়ে উঠল -- দেখা গেল, প্রত্যেকের অন্য কাজ আছে, প্রত্যেকেই ব্যস্ত। একমাত্র জাদোরভ একা তার হাসিখুশিভাব বজায় রেখে চলল, মুখে তার সেই খোলামেলা মিষ্টি হাসিটি লেগেই রইল। কিন্তু তার ওই প্রাণবন্ত ভাবের অংশীদার আর কেউ রইল না। নির্জনে, মিষ্টি হাসিটি মুখে নিয়ে সে ঝুঁকে থাকত বইয়ের ওপর, কিংবা আগের বসন্তে স্টিম এঞ্জিনের যে-মডেলটি সে বানাতে শুরু করেছিল তার ওপর।

চাষবাসের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু-কিছু ব্যর্থতাও এই সর্বব্যাপী মনমরা ভাবের জন্যে ছিল অংশত দায়ী। একদিকে কালিনা ইভানভিচ ছিল যেমন কৃষিবিৎ হিসেবে অজ্ঞ — পর্যায়ক্রমিক ফসল ফলানো ও বীজবোনার কলাকৌশল সম্পর্কে যতসব আজগবি ধারণার বশবর্তী — তেমনি গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খেতগুলোও আমরা আগাছায়-বোঝাই আর নিঃশেষিত নিরেস অবস্থায় পেয়েছিলুম। আর তাই গ্রীষ্মে ও হেমন্তে ছেলেদের অমানুষিক পরিশ্রম সত্ত্বেও হিসেবের সময় দেখা গেল আমাদের ফসলের পরিমাণ শোচনীয়-রকমের কম। শীত-ফসলের খেতে গমের চারার চেয়ে আগাছার পরিমাণই বেশি দেখা গেল, বসন্তের ফসলের অবস্থা দাঁড়াল করুণ রকমের, আর বীট আর আলুর ফলনের অবস্থা ততোধিক শোচনীয়।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মহলেও হতোদ্যম ভাব দেখা গেল।

হয়তো এর অন্য কোনো কারণ ছিল না, আমরা এমনিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম — কারণ, কলোনি চালু হওয়ার পর থেকে কেউই আমরা ছুটি নিই নি। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা কেউ

অনুযোগেও করেন নি। তবে, আমাদের কাজের ভবিষ্যৎ না-থাকার কথা, 'এই ধরনের ছেলেদের' ক্ষেত্রে সামাজিক শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রয়োগ যে ভস্মে ঘি ঢালার সামিল সেই পুরনো কথা আবার উঠতে থাকল; আমাদের সকল প্রচেষ্টাই কর্মশক্তি আর শরীর-মনের ব্যর্থ অপচয়মাত্র, এই পুরনো তত্ত্বকথাটাও কেউ-কেউ আওড়াতে লাগলেন।

ইভান ইভানভিচ বললেন, 'শেষপর্যন্ত এ-সবই ছেড়েছুড়ে দিতে হবে। কারাবানভের কথাই ধরুন, ওর সম্পর্কে আমাদের কতই-না গর্ব ছিল — তা, কী হল? ওকেও বের করে দিতে হল তো? তাছাড়া, ভোলখভ, ভের্শ্নেভ, অসাদ্চি, তারানেত্স, আর ওই ধরনের আরও সব ছেলের ওপর বিশেষ আশা-ভরসা রাখাও কোনো কাজের কথা নয়। তাহলে একা বেলুখিনের জন্যে একটা গোটা কলোনি চালানোর কী যুক্তি থাকতে পারে?'

আমাদের আশাবাদী মনোভাবের প্রতি অবিচল বিশ্বস্ততার কারণে আগে যিনি আমার প্রধানতম সহকারী ও বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন এমন কি সেই একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না পর্যন্ত আর অতখানি বিশ্বস্ত থাকতে পারছিলেন না। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে ভুরু কুঁচকে বেড়াচ্ছিলেন তিনি, আর সেই চিন্তার ফলাফল যখন প্রকাশ করলেন তখন তা ভারি অদ্ভুত আর অপ্রত্যাশিত ঠেকল।

বললেন, 'শুনুন! হয়তো আমরা একটা সাংঘাতিক ভুল করছি: হয়তো কোনো যৌথ-জীবনের অস্তিত্বই নেই এখানে, একেবারেই কোনো যৌথ-জীবন নেই হয়তো, বুঝলেন, অথচ আমরা কিনা যৌথ-জীবনের কথা বলে যাচ্ছি, যৌথ-জীবন সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব কল্পনার জাল বুনে নিজেদের নিছক সম্মোহিত করে রাখছি।'

'দাঁড়ান, এক মিনিট,' ওঁর বক্তৃতার স্রোতে বাধা দিয়ে বলে উঠলুম। ' 'এখানে কোনো যৌথ-জীবনের অস্তিত্ব নেই' বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন? কলোনির ষাট জন সদস্য, তাদের কাজকর্ম, তাদের জীবনযাত্রা, তাদের বন্ধুত্ব — এগুলো তাহলে কী?'

'এগুলো কী জানেন? সব মিলিয়ে এগুলো একটা খেলা, বেশ কৌতূহলোদ্দীপক এবং সম্ভবত কায়দা-করে মাথা-খাটিয়ে-বের-করা একটা খেলা। এ-খেলায় আমরা মেতে উঠেছিলুম, আর আমাদের উৎসাহ দেখে

ছেলেরাও মেতে উঠেছিল, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল সাময়িক। এখন মনে হচ্ছে খেলতে-খেলতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, প্রত্যেকের কাছেই ব্যাপারটা একঘেয়ে ঠেকছে, শিগ্‌গিরই সবাই খেলা বন্ধ করে দেবে, আর তখন সবকিছুই পরিণত হয়ে যাবে একটা মামুলি, প্রাণহীন শিশু-সদনে।'

'একটা খেলা খেলতে-খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে আরেকটা খেলাও শুরু করতে পারেন,' আমাদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টায় লিদিয়া পেত্রোভ্‌না রসিকতা করে বলল।

আমরা হাসলুম বটে, তবে করুণভাবে। কিন্তু হার স্বীকার করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না আমার। বললুম:

'মামুলি মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধিজীবীর মনোভাব পেয়ে বসেছে আপনাকে, বুঝলেন একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না। সে-ই এক মামুলি নাকী কান্না। আপনার কখন কী রকম মন-মেজাজ থাকবে তা থেকে সিদ্ধান্তে আসার কোনো মানে হয় না -- মন-মেজাজ একেক সময় একেক রকম থাকে, আবার বদলেও যায়। আপনি প্রচণ্ডভাবে চেয়েছিলেন যে মিতিয়াগিন আর কারাবানভকে আমরা বশ করে ফেলব। পরিপূর্ণ নৈতিক শুদ্ধতা অর্জনের তত্ত্ব, খামখেয়াল, কোনো ব্যাপারে বাড়াবাড়ি-রকমের আগ্রহ -- এ-সবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ঘটে নাকী কান্না আর হতাশায়।'

নিজের মধ্যে সম্ভবত ওই একই ধরনের মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধিজীবীর মনোভাবকে জোর করে চেপে রেখে কথাগুলো বললুম। কারণ, আমার মনেও মাঝে-মাঝে এই ধরনের অস্পষ্ট একটা চিন্তা উঁকিঝুঁকি মারছিল যে ধুত্তোর, সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিই, কলোনির জন্যে অনবরত যে-সমস্ত ত্যাগস্বীকার আমাদের করতে হচ্ছে একা বেলুখিন কিংবা জাদোরভের জন্যে তা মেনে নেয়ার কোনো মানে হয় না। এই ধারণাটা তখন আমার মাথায় ঢুকেছিল যে আমরা ইতিমধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেছি, আর তাই সাফল্য অর্জন অসম্ভব।

কিন্তু নিঃশব্দে ধৈর্য ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার পুরনো অভ্যেসটা তখনও আমায় ত্যাগ করে নি। কলোনির বাচ্চা সদস্য আর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামনে আমি কর্মোদ্দীপনা আর আত্মপ্রত্যয় দেখানোর চেষ্টা করে যেতে থাকলুম; দুর্বলচিত্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চেপে ধরে তাঁদের বোঝানোর

চেষ্টা করতে লাগলুম যে আমাদের ঝুট্ঝামেলা সবই সাময়িক, সবই কালক্রমে ভুলে যাব আমরা। আর, ওই কঠিন সময়ে আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকারা যে-অসামান্য সহনশীলতা আর শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন তার জন্যে আজ তাঁদের সশ্রদ্ধ বিনতি জানাই।

আগের মতো তখনও তাঁরা একেবারে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে সময়নিষ্ঠ ছিলেন, ছিলেন সক্রিয় এবং কলোনির জীবনে এতটুকু বেসুরো সুর বাজলে সে-সম্পর্কে উৎকর্ণ, সতর্ক; আমাদের চমৎকার ঐতিহ্য অনুসারে তখনও তাঁরা আঁটো-করে-পরা, নিখুঁতভাবে পরিচ্ছন্ন তাঁদের সবসেরা পোশাকে কর্তব্যকর্ম নিষ্পন্ন করে চলেছিলেন।

অতঃপর হাসি আর আমোদ-আহ্লাদ বাদ দিয়েও কলোনি এগিয়ে চলল, এগিয়ে চলল ভালোরকম, অবিচ্ছিন্ন তালে-লয়ে, পুরোপুরি চালু অবস্থায় একটা যন্ত্র যে-ভাবে কাজ করে সেইভাবে। আমি আরও লক্ষ্য করলুম যে কলোনির পূর্বোক্ত দুই সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সুফল দেখা দিয়েছে — যেমন, গাঁয়ের মধ্যে হানা দেয়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, মাটির নিচের ঠান্ডা ভাঁড়ারে আর তরমুজ-খেতে অভিযানও অতীতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রক্ষণাধীন ছেলেপিলেদের মনমরা ভাব লক্ষ্য না-করার ভান করতে লাগলুম আমি, এমন আচরণ করতে লাগলুম যেন গ্রামবাসীদের প্রতি সুশৃঙ্খল ব্যবহার ও আনুগত্যের এই নতুন মনোভঙ্গি খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার, যেন সবকিছুই ঠিকঠিক আগের মতো চলছে, আর আগের মতো সামনের দিকেই এগিয়ে চলেছে।

এই সময়ে কয়েকটা নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিতে হল। নতুন কলোনিতে আমরা নাতিশীত আবহাওয়ায় বাগান করার উদ্দেশ্যে একটা হট্হাউস তৈরির কাজ শুরু করলুম। ত্রেপ্কের ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করে পায়ে-চলার পথ বানানো ও উঠোন সমান করার কাজও চলতে লাগল। তাছাড়া, নতুন-নতুন বেড়া দেয়া আর তোরণ বাঁধা, কলমাক নদীর সবচেয়ে সংকীর্ণ জায়গাটায় একটা পুল তৈরি, কলোনিতে ব্যবহারের জন্যে কামারশালে লোহার খাট বানানো, চাষের যন্ত্রপাতি মেরামত এবং নতুন কলোনির বাড়িগুলো শেষবারের মতো মেরামতির কাজ একেবারে ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলছিল। গা-ছেড়ে চলার কিছুমাত্র অবকাশ না-দিয়ে কঠোরভাবে ক্রমশ

বেশি-বেশি কাজ আমি কলোনির ওপর চাপিয়ে যাচ্ছিল়ুম, আর আমাদের সমগ্র সমাজ-কাঠামোর কাছ থেকে আগেকার মতোই যথাযথতা আর নিখুঁতভাবে কাজ সম্পাদনের দাবি জানাচ্ছিল়ুম।

আমি নিজেই জানি না সামরিক শিক্ষাদানকে কেন আমি অমন ব্যগ্র হয়ে গ্রহণ করেছিল়ুম — হয়তো শিক্ষাদান-সম্পর্কিত অচেতন কোনো প্রবৃত্তির তাড়নায় এ-কাজ করে থাকব।

এর কিছু আগেই কলোনিতে ব্যায়াম-চর্চা আর সামরিক কুচকাওয়াজ চালু করেছিল়ুম। নিজে আমি কখনই ব্যায়াম-চর্চায় বিশারদ ছিল়ুম না, আবার এ-ব্যাপারে শিক্ষক নিযুক্ত করার মতো আর্থিক সামর্থ্যও আমাদের ছিল না। আমি যা জানতুম তা হল সামরিক কুচকাওয়াজ আর ফৌজী ব্যায়াম-চর্চা, আর এ-সবই ছিল ফৌজের কম্পানিতে যুদ্ধ-প্রস্তুতির অন্তর্ভুক্ত। আগে বিন্দুমাত্র না-ভেবেচিন্তে এবং আমার শিক্ষাদানগত বিবেকের একটুমাত্র তাড়না অনুভব না-করেই ছেলেদের আমি এই সব প্রয়োজনীয় শাস্ত্রে শিক্ষাদান শুরু করে দিল়ুম।

ছেলেরাও নিজে থেকে সানন্দে এসবের চর্চা শুরু করল। দিনের কাজের শেষে প্রতিদিন ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা-দুয়েকের জন্যে ব্যায়াম করার উদ্দেশ্যে গোটা কলোনি আমাদের প্যারেড গ্রাউণ্ডে — অর্থাৎ, বেশ বড় একটা আয়তক্ষেত্র উঠোনে — এসে জড় হোত। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে আমাদের এই ফৌজী ক্রিয়াকলাপের পরিধিও বিস্তৃত হতে লাগল। শীতকালের মধ্যে আমাদের সৈন্যদল আশপাশের খামারবাড়িগুলোসহ গোটা এলাকাটা জুড়ে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ও জটিল সব চলাচল ও কসরত দেখানো শুরু করেছিল। বেশ সাবলীল গতিতে এবং পদ্ধতির দিক থেকে সঠিকভাবে আমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুগুলোর ওপর — অর্থাৎ, কুঁড়ে আর ভাঁড়ারঘরগুলোর ওপর — আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল়ুম। এই সব অভিযানের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল বেয়নেট নিয়ে আক্রমণ, আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এর ফলে ওই সব বাড়ি আর ভাঁড়ারের মালিক-মালিকানীদের স্পর্শকাতর মনে রীতিমতো আতঙ্কের সঞ্চার। আমাদের রণধ্বনি কানে আসামাত্র ওই সব কর্তা-কর্ত্রী শাদা রঙ-করা তাদের দেয়ালের আড়ালে হেঁট হয়ে ছুটে উঠোনে বেরিয়ে পড়ত, তারপর যার-যার ভাঁড়ার আর গুদামে ঝট্‌পট তালা লাগিয়ে দরজাগুলোর গায়ে সটান সেঁটে

থাকত আর ভয়বিহ্বল চোখে আমাদের ছেলেদের সেনাদলের মতো সার-বাঁধা চলাচল লক্ষ্য করত।

এই পুরো ব্যাপারটা ছেলেদের কাছে ছিল দারুণ উপভোগ্য। এরপর খুব অল্পদিনের মধ্যেই সত্যিকার রাইফেল পেয়ে গেলুম আমরা, কারণ সাধারণ সামরিক প্রশিক্ষণ-দপ্তর বুদ্ধিমানের মতো আমাদের অতীতের অপরাধমূলক কার্যকলাপকে উপেক্ষা করে সানন্দে আমাদের তাদের কর্তৃত্বাধীন করে নিল।

সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ার সময়ে সত্যিকার সেনাপতির মতো আমি ছেলেদের কাছ থেকে কড়াকড়িভাবে কাজ আদায় করে তবে ছাড়তুম আর কোনোরকম কাকুতিমিনতিতে কর্ণপাত করতুম না। ছেলেরাও কিন্তু আমার এ-ব্যাপারটা প্রাণভরে সমর্থন করত। এইভাবে আমাদের মধ্যে একটা নতুন খেলার সূত্রপাত ঘটল, যে-খেলা পরবর্তী কালে আমাদের জীবনে অন্যতম প্রধান চর্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এর ফলে যে-জিনিসটা প্রথমেই আমার নজর কাড়ল তা হল, যথাযথ সামরিক আচরণের সু-প্রভাব। প্রতিটি বাচ্চা কলোনি-বাসিন্দার বাহ্য আচার-আচরণে ও চেহারায় এর ফলে একটা পরিবর্তন ঘটল — তাদের দেহ ছিপছিপে আর সুঠাম হয়ে উঠল, টেবিলে কিংবা দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়ানো বন্ধ হল, সহজে, স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে শিখল তারা — কোনো ধরনের খুঁটোয় ভর দিয়ে দাঁড়ানোর প্রয়োজন আর বোধ করল না। এই সময়ে নতুন ছেলেদের সঙ্গে পুরনোদের তফাত করে চিনে নেয়া সহজ হয়ে উঠল। ছেলেদের হাঁটার ভঙ্গিও আগের চেয়ে আরও দৃঢ় আর প্রত্যয়যুক্ত হয়ে উঠল, ঘাড় সোজা রেখে হাঁটতে শুরু করল তারা, হাঁটার সময় হাতদুটো পকেটে ঢুকিয়ে দেয়ার অভ্যেসও দিল ছেড়ে।

সামরিক শৃঙ্খলার প্রতি ভক্তির আতিশয্যে নৌ ও সামরিক জীবনের প্রতি স্বাভাবিক বালকসুলভ আকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে ছেলেরা নিজেরাই মাথা খাটিয়ে নানারকম নিয়ম-কানুন আবিষ্কার করে সে-সবও মেনে চলতে লাগল। ঠিক এই সময়েই কলোনিতে এই নতুন রীতি প্রবর্তিত হল যে যে-কোনো হুকুমের জবাবে অনুমোদন ও সম্মতি জানাতে হলে 'ঠিক হ্যায়!' কথা দুটো বলতে হবে, আর এই চমৎকার জবাবটা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে কায়দা

করে একটা পাইওনিয়র স্যাল্যুট ঠুকতে হবে। আর এই সময় থেকেই কলোনিতে বিউগ্‌ল বাজানোরও প্রচলন হল।

এর আগে পর্যন্ত কোনো ব্যাপারে সংকেত জানাতে হলে আগেকার কলোনির ফেলে-যাওয়া একটা পুরনো ঘণ্টা বাজানো হোত। এই সময়ে আমরা গোটা দুই বিউগ্‌ল কিনে ফেললুম, আর প্রতিদিন গুটিকয় ছেলে নিয়ম করে শহরে ব্যান্ড-মাস্টারের কাছে যেতে লাগল কোন্‌ প্রয়োজনে ঠিক কোন্‌ সুরে কীভাবে বিউগ্‌ল বাজাতে হয় তা শিখতে। কলোনি-জীবনের প্রতিটি দৈনন্দিন ঘটনার সংকেত কী হবে তা কাগজে লিখে ফেলা হল, আর শীত এসে পড়তে-পড়তে ঘণ্টার ব্যবহার বন্ধ করে দিতে আমরা সমর্থ হলুম। আমাদের বিউগ্‌ল-বাদক তখন প্রতিদিন কয়েকবার আমার গাড়িবারান্দাটার নিচে চলে আসত আর বিশেষ ধরনের সংকেতের সুরেলা, গমগমে আওয়াজ কলোনির আকাশে দিত ছড়িয়ে।

সন্ধেবেলার নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতায় কলোনি, হ্রদ আর খামারবাড়িগুলোর চালের ওপর দিয়ে ভেসে-বেড়ানো বিউগ্‌লের আওয়াজ বিশেষ করে রোমাঞ্চ জাগাত। আর, কোনো একটা এজমালি শোবার ঘরের খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে কেউ, হয়তো কচি গলার চড়া সুরে সেই সংকেত-ধ্বনির অনুরণন তুলত, আবার কেউ পিয়ানোর রীডে আচমকা তুলত তার প্রতিধ্বনি।

জনশিক্ষা-দপ্তরের লোকজন যখন আমাদের এই সামরিক 'পাগলামি'-র বিবরণ শুনল তখন থেকে বহুদিন পর্যন্ত আমাদের কলোনির ডাকনাম থেকে গেল 'ব্যারাক'। কিন্তু আমাকে তখন এত ঝঞ্ঝাট নিয়ে জ্বালাযন্ত্রণা সইতে হচ্ছিল যে এই সামান্য চিমটি-কাটার ব্যাপারটায় মাথা ঘামাতে রাজি ছিলুম না। সোজা কথা, আমার তখন অত সময়ই ছিল না।

অগস্ট মাসে প্রজনন-কেন্দ্র থেকে দুটো শুয়োর-ছানা কলোনিতে নিয়ে এলুম। ছানা দুটো ছিল বিশুদ্ধ ইংরেজ-বংশীয়, আর তাই জবরদস্তি 'কলোনিজাত করা'-র বিরুদ্ধে সারা রাস্তা প্রতিবাদ জানাতে-জানাতে আর গাড়ির মেঝের একটা ফোকর দিয়ে ক্ষণে-ক্ষণে শরীর গলিয়ে দিতে-দিতে এল ও-দুটো। আপত্তি জানাতে-জানাতে শুয়োর-ছানা দুটো অবশেষে পাগলের মতো দাপাদাপি আর চেল্লাচিল্লি শুরু করে দিল। আন্তন খেপে গিয়ে বলল

'যেন আমাদের ঝামেলার কিছু অভাব ছিল, তাই শুয়ার-ছানা না-আনলি চলছিল না।'

ব্রিটিশ-বংশীয় ছানা দুটোকে নতুন কলোনিতে পাঠিয়ে দেয়া হল। বয়ঃকনিষ্ঠ ছেলেদের মধ্যে সেখানে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি সংখ্যক আগ্রহী পালক পাওয়া গেল। ওই সময়ে নতুন কলোনিতে বাস করছিল জনা-কুড়িরও বেশি ছেলে, আর তাদের সঙ্গে থাকছিলেন শিক্ষকদের একজন — রদিম্‌চিক নামে কিছুটা অক্ষম এক ব্যক্তি। ওখানকার বড় বাড়িটায় মেরামতির কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছিল। কারখানা-ঘর আর ক্লাসরুমের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল বাড়িটা, আমরা ওটার মার্কা দিয়েছিলুম 'সেকশন এ' নাম দিয়ে। কিন্তু আপাতত ছেলেরাই ওখানে থাকছিল। এছাড়া আরও কয়েকখানা বাড়ি আর বাড়ির অংশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তবে জার-আমলের স্থাপত্যের নিদর্শনস্বরূপ প্রকাণ্ড দোতলা প্রাসাদটার মধ্যে মেরামতির কাজ তখনও বহু বাকি ছিল। এই বাড়িখানা নির্দিষ্ট ছিল এজমালি শোবার ঘর করার জন্যে। তাছাড়া গুদাম, আস্তাবল আর গোলা-ঘরে রোজই নতুন-নতুন তক্তায় পেরেক ঠোকাঠুকি চলছিল, দেয়ালে-দেয়ালে লাগানো চলছিল প্লাস্টারের আস্তর, ঝোলানো হচ্ছিল দরজার-পর-দরজা।

নতুন লোক পেয়ে যাওয়ায় আমাদের কৃষির কাজেও এই সময়ে জোর শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল। সত্যিকার একজন কৃষিবিদকে আনিয়ে নিয়েছিলুম আমরা। আর কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল, আমাদের কলোনি-বাসিন্দাদের অনভ্যস্ত চোখের পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য এক ব্যক্তি — এদুয়ার্দ নিকলায়েভিচ শেরে — কলোনির মাঠে-মাঠে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন।

কালিনা ইভানভিচের মতো শেরে কখনও অতিমাত্রায় ক্রোধ কিংবা উৎসাহে ফেটে পড়তেন না, তিনি ছিলেন সর্বদা সমভাবাপন্ন, এবং অল্প-বিস্তর রসিকতাপ্রিয়ও। কলোনির সকল সদস্য, এমন কি গালাতেঙ্কোকেও, তিনি ('তুমি'-র বদলে) আনুষ্ঠানিকভাবে 'আপনি' বলে সম্ভাষণ করতেন, কখনও গলা চড়িয়ে কাউকে কিছু বলতেন না, আবার কারো সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্বও পাতাতেন না। ছেলেরা তো দেখেশুনে সেদিন স্তম্ভিতই হয়ে গিয়েছিল, যেদিন প্রিখোদ্‌কোর 'এঃ, ক্যাবান্ট-ফলের খ্যাত! ক্যারান্ট-খেতি কাম করতি বয়্যে গেছে আমার!' এই রূঢ় কথার জবাবে বিন্দুমাত্র ভানের আশ্রয় না-নিয়ে বা কায়দাদুরস্তভাবে নিজেকে জাহির না-করে নিছক সহজ, মৃদু বিস্ময় প্রকাশ করে শেরে বললেন :

'ও, আপনি ও-কাজ করতে চান না? ঠিক আছে, তাহলে আপনার নামটা শুধু আমাদের বলুন যাতে এর পরে ভুল করে আপনাকে আবার কোনো কাজের ভার দিয়ে না-বসি।'

'আমারে আর যে-কোনো কাজির ভার দিবেন আমি তা করতি রাজি আছি, কেবল ওই ক্যারান্ট-ফলের খেতি ছাড়া।'

'আরে না-না, আপনাকে ছাড়া আমি ঠিকই কাজ চালিয়ে নিতে পারব, বুঝলেন না — আপনি অন্য কোথাও কাজ খুঁজে নেন গিয়ে।'

'ক্যানে?'

'দয়া করে আপনার নামটা শুধু বলুন, বাড়তি কথা বলার সময় নেই আমার।'

মুহূর্তে প্রিখোদ্‌কোর জলদস্যুসুলভ মহিমা যেন ম্লান হয়ে গেল। চটেমটে কাঁধদুটো ঝাঁকিয়ে ও ক্যারান্ট-খেতের দিকেই চলল, অথচ তার এক মুহূর্ত আগেও মনে হয়েছিল ক্যারান্ট-খেতে কাজ করাটা এই দুনিয়ায় বুঝি ওর পেশার ঘোরতর পরিপন্থী।

বয়সে শেরে ছিলেন অপেক্ষাকৃত তরুণ, তবু, তা সত্ত্বেও, অদম্য আত্মনির্ভরশীলতা আর কাজ করার অমানুষিক ক্ষমতা দিয়ে তিনি হতবুদ্ধি করে দিতেন ছেলেদের। কলোনি-বাসিন্দাদের মনে হোত উনি বোধহয় কখনও শুতে যান না। সকালবেলায় সারা কলোনির মানুষ সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে দেখত বকের মতো লম্বা-লম্বা পা ফেলে এদুয়ার্দ নিকলায়েভিচ তখনই মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আবার রাত্রে শুতে যাওয়ার বিউগ্‌ল বাজলে পর হয়তো দেখা যেত শুয়োরের খোঁয়াড়ে ছুতোর-মিস্ত্রির সঙ্গে তখনও কী নিয়ে যেন আলাপ করছেন শেরে। আর দিনের বেলায় তাঁকে প্রায় একই সঙ্গে দেখা যেত আস্তাবলে, 'হট্‌হাউস' তৈরির জায়গায়, শহরমুখো রাস্তায় আর মাঠে সার দেয়ার তদারকিতে ব্যস্ত থাকতে; শেরের অলৌকিক পাদুটো তাঁকে এত দ্রুত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেত যে তার ফলে সকলের ওই রকম একটা ধারণা জন্মেছিল যে উনি বুঝি সব কাজ একসঙ্গেই সেরে থাকেন।

আসার পর দ্বিতীয় দিনেই আস্তাবলে শেরের সঙ্গে আন্তনের ঝগড়া বেধে গেল। আন্তন একেবারেই বুঝতে পারছিল না যে এদুয়ার্দ নিকলায়েভিচ অনবরত জিদ ধরে যে-ধরনের সুপারিশ করছিলেন ঘোড়ার মতো অমন

একটা অনুভবক্ষম ও আনন্দদায়ক প্রাণীর প্রতি কেউ কী করে তেমন গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারে।

'ওঁয়ার মাথায় এ-খেয়ালডা ঢুকল্য কী করি? ওজন করতি হবে? খড় আবার ওজন করতি হয় এ-কথা কে কবে শুন্যেছে? উনি বলত্যেছেন, এই তোমার বরাদ্দ তোমারে দিয়ি দেলাম, এখন এর থ্যেকে বেশি বা কম যেন খরচা না হয়। আর এমন এট্টা গাড়োলের মতন র‍্যাশনের বরাদ্দ — সবকিছুই এট্টু-এট্টু করি। এখন ঘোড়াগুলান যদি মরে তো তার দায়িক হব আমি। আবার উনি বলত্যেছেন আমাদের নাকি ঘড়ি ধর্যে কাজ করতি হবে। আবার একখান নোটবইও বার কর্যেছেন না-জানি কোত্থেকে — আর কে কয় ঘণ্টা কাজ করত্যেছে তার হিসাব টুক্যে রাখত্যেছেন।'

তার চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী আন্তন যখন এই বলে চেঁচামেচি শুরু করে দিল যে সে কিছুতেই শেরের হাতে 'বাজপাখি'-কে ছাড়বে না কারণ আন্তনের হিসেব অনুযায়ী তার পরের পরশু দিন 'বাজপাখি'-কে নাকি কী-একটা সাংঘাতিক শক্ত কাজ করতে হবে, তখন শেরে কিন্তু এতটুকুও ঘাবড়ালেন না। এদুয়ার্দ নিকলায়েভিচ তখন নিজেই সোজা আস্তাবলে ঢুকে গেলেন, তারপর ব্রাত্‌চেঙ্কোর দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না-করে ঘোড়াটাকে বাইরে এনে তাকে সাজ পরালেন। আর এই ঘোর দৌরাত্ম্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল আন্তন। অবশেষে মুখ কালো করে হাতের চাবুকখানা আস্তাবলের এক কোণে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর সন্ধের দিকে রাগ একটু পড়লে আস্তাবলে উঁকি দিতে গিয়ে আন্তন দেখল অর্‌লোভ আর বুব্‌লিক সেখানে কর্তৃত্ব করছে। এতে মর্মান্তিক মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে আমার কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করার জন্যে পা বাড়াল। কিন্তু উঠোনের মাঝ-বরাবর আসতেই হাতে একখানা কাগজ নিয়ে শেরে ছুটে ওর কাছে চলে এলেন আর যেন কিছুই হয় নি এমন ভাব করে হেড-সহিসের ক্রুদ্ধ মুখখানার কাছে ঝুঁকে পড়ে বললেন:

'শুনুন, আপনার নাম তো ব্রাত্‌চেঙ্কো, তাই না? এই নিন, ধরুন, আপনার সারা সপ্তার কাজের লিস্ট। দেখুন, সবকিছু যেমন-যেমন দরকার সেইমতো লিখে রেখেছি, একেকটা দিনে প্রত্যেকটা ঘোড়ার কী-কী কাজ আছে, কখন তাকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে, এই সব। এইখানে লেখা আছে দেখুন, কোন্ ঘোড়াকে গাড়িতে জোতা যাবে, কাকে বিশ্রাম দিতে হবে। আপনার

কমরেডদের সঙ্গে বসে ভালো করে দেখুন দিকি এটা, তারপর আসচে কাল আমাকে জানাবেন কোথায় কী-কী অদলবদল করা আপনারা প্রয়োজন বিবেচনা করছেন।'

বিস্ময়ে হতবাক ব্রাত্‌চেঙ্কো কাগজখানা নিয়ে ফের ফিরে গেল আস্তাবলে।

আর পরদিন সন্ধেবেলা দেখা গেল আন্তনের কোঁকড়া-চুলো আর শেরের ছুচ্‌লো-মতো, ছোট-করে-ছাঁটা চুলে-ভরা মাথা দুটো আমার টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী-যেন একটা গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। আমি তখন কাজ করছিলুম নক্‌শা-আঁকার টেবিলে বসে, আর প্রায়-প্রায়ই কাজ থামিয়ে কান খাড়া করে ওদের কথা শুনছিলুম।

'আপনি ঠিকই বলেছেন। ঠিক আছে, 'লালু' আর 'ডাকাতনী' প্রত্যেক বুধবার লাঙল ঠেলতে পারে...'

'...'খোকাবাবু' কিন্তু বীটের কন্দ খেতি পারে না, অর দাঁত...'

'না-না, ও কিছু না, বীট আরও কুচি-কুচি করে দিলেই চলবে — আপনি চেষ্টা করে দেখুন-না...'

'...কিন্তু, ধরেন, যদি অপর কেউ একই দিনি শহরে যেতি চায়?'

'তাকে পায়ে হেঁটে যেতে হবে তাহলে। আর নইলে গাঁ থেকে ঘোড়া ভাড়া করে নিতে হবে। তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকারটা কী?'

'ওহো, তাই তো!' আন্তন বলল। 'পথ এট্টা বার কর্য়েছেন বটে!'

এটা স্বীকার করতেই হবে যে গাড়িটানার জন্যে দিনে একটা করে ঘোড়ার বরাদ্দ যাতায়াত ও জিনিসপত্র আনা-নেয়ার ব্যাপারে আমাদের চাহিদা মেটানোর পক্ষে একেবারেই সন্তোষজনক ছিল না। কিন্তু এ-ব্যাপারে কালিনা ইভানভিচও শেরেকে দিয়ে কিছুই করাতে পারল না। অর্থনীতি-সংক্রান্ত কালিনার প্রবল যুক্তিতর্কের স্রোত এই নির্বিকার নিরুত্তাপ জবাব দিয়ে মাঝপথে বন্ধ করে দিলেন শেরে:

'আপনার মাল-টানাটানির জন্যে গাড়ির দরকার, তো আমি করবটা কী? খাবারদাবার আপনি যাতে খুশি আনুন-না কেন, কিংবা একটা ঘোড়া কিনেই নিন-না নিজে। আমাকে ষাট দেসিয়াতিনা চষতে হবে, বুঝলেন? আপনার সমস্যাটা ফের আমার কাছে না-তুললেই খুশি হব।'

সজোরে টেবিলের ওপর ঘুসি মেরে কালিনা ইভানভিচ চেঁচিয়ে উঠল:

'আমার যখন ঘোড়ার প্রেয়জন হইব নিজেই আমি ঘোড়ারে সাজ পরাইয়া লইব!'

ক্ষিপ্তপ্রায় কালিনা ইভানভিচের দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না-করে শেরে তাঁর নোটবইয়ে কী-যেন একটা টুকে নিলেন। তারপর এক ঘণ্টা পরে অফিস ছেড়ে যাবার সময় আমায় সাবধান করে দিয়ে গেলেন:

'আমার সম্মতি ছাড়া ঘোড়াগুলোর কাজের রুটিনে যদি অদলবদল করা হয় তাহলে আমি কিন্তু তখনই কলোনি ছেড়ে চলে যাব।'

তাড়াতাড়ি কালিনা ইভানভিচকে অফিস-ঘরে ডেকে পাঠিয়ে বললুম:

'ওর কাজে মাথা গলিও না। যা নিজে ভাববে তা-ই ও করবে, তুমি ওকে দিয়ে কিছুই করাতে পারবে না।'

'কিন্তু মাত্তর একটা ঘোড়া দিয়া ক্যামনে কাম চালামু আমি? আমাগো শহরে যাইতে লাগে, জল আনতে লাগে, তারপর নয়া কলোনির লেগ্যে কাঠ আর খাবারদাবার পৌঁছাইয়া দিতে হয়...'

'সে আমরা ভেবে দেখছি কী করা যায়।'

আর শেষপর্যন্ত একটা উপায়ও বের করে ফেললুম আমরা।

নতুন-নতুন মুখ, নতুন দায়দায়িত্ব-ভাবনাচিন্তা, নতুন কলোনি, নয়া কলোনিতে অক্ষম রদিম্‌চিক, ভালোভাবে মন-বসে-যাওয়া কলোনি-বাসিন্দাদের চেহারাগুলো, আমাদের আগেকার দারিদ্র্য, আমাদের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি — প্রবল পরাক্রান্ত এক সমুদ্রের মতো এই সবকিছু আমাদের মনমরা-ভাব আর ধূসর বিষণ্ণতার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত অলক্ষিতে গ্রাস করে ফেলল। অগ্নি-পরীক্ষার ওই দিনগুলোর পর থেকে আগের চেয়ে আমার মুখে হাসি ফুটছিল একটু কম পরিমাণে। ১৯২২ সালের শেষদিককার ঘটনাবলী ও আবেগের ঘাত-প্রতিঘাত যে-বাহ্য কাঠিন্যের মুখোস পরিয়ে দিয়েছিল আমার মুখে এমন কি আমার আন্তর, জীবন্ত আনন্দের স্রোতও সেই কাঠিন্যকে লঘু করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। এই মুখোসে আমার নিজের অবশ্য কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না, আমি ওটাকে প্রায় লক্ষ্যই করতুম না। কিন্তু কলোনির বাসিন্দাদের সব সময়েই নজরে পড়ত ওটা। ওরা হয়তো জানত ওটা নেহাত আমার মুখোসই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার প্রতি ওদের আচরণে বাড়াবাড়ি-রকমে সম্মান দেখানোর এমন একটা সূক্ষ্ম সুর, আড়ষ্টতার এমন একটা অস্পষ্ট আভাস, এবং সম্ভবত এমন একধরনের

ভীরুতার ছোঁয়াচ লাগছিল যে তার স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করা আমার পক্ষে কঠিন। অপরপক্ষে যখনই আমি ছেলেদের সঙ্গে মিশে একসঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করতুম, খেলতুম, ভাঁড়ামি করতুম, কিংবা হাতে হাত বেঁধে বারান্দাগুলোয় নিছক পায়চারি করতুম, তখন সব সময়েই নজরে পড়ত আমার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ এক আত্মিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে কেমন ফুলের মতো প্রাণের আনন্দে ফুটে উঠছে ওরা।

এমনিতে কলোনি থেকে আগের যত কাঠিন্য আর যত অপ্রয়োজনীয় গাম্ভীর্য সব লোপ পেয়ে গিয়েছিল। এই পরিবর্তন কবে থেকে-যে ঘটেছিল আর নতুন অবস্থা স্থিতিশীল হয়েছিল কেউ তা বলতে পারত না। আগের মতো তখনও আমাদের ঘিরে উৎসারিত হোত হাসি আর ঠাট্টা-তামাশা, আগের মতোই সবাই কানায়-কানায় পূর্ণ হয়ে থাকত রসিকতায় আর কর্মশক্তিতে; কেবল একমাত্র তফাত ছিল এই যে আগের মতো ছোটখাট শৃঙ্খলাভঙ্গ কিংবা এলোমেলো, অগোছালো চলাফেরার ব্যাপার আর ঘটছিল না, ফলে সবকিছু বিস্বাদ হয়েও যাচ্ছিল না।

আর, শেষপর্যন্ত কালিনা ইভানভিচও পরিবহণ সমস্যার একটা সমাধান বের করে ফেলেছিল। বলদ 'গাভ্রিউশ্‌কা'-র ওপর শেরের কোনো দাবি ছিল না — কেননা একটা মোটে বলদ দিয়ে কোন্‌ কাজটা করা সম্ভব? তাই 'গাভ্রিউশ্‌কা'-র জন্যে একটা প্রাণীর উপযোগী একখানা জোয়াল তৈরি হয়ে গেল, আর 'গাভ্রিউশ্‌কাই' গাড়ি টেনে কাঠের বোঝা আর জলের ভারা বইতে লাগল, কলোনির জন্যে টানতে লাগল যাবতীয় মালপত্র। আর এপ্রিল মাসের এক মিষ্টি-মধুর দিনে আমাদের এক্কাগাড়িখানায় 'গাভ্রিউশ্‌কা'-কে জুতে আন্তন যখন শহর থেকে কী-একটা জিনিস আনার জন্যে গাড়ি হাঁকিয়ে যাত্রার তোড়জোড় করল সারা কলোনি তখন এমন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল যেমন হাসি বহুদিন আমরা হাসতে ভুলে গিয়েছিলুম।

আন্তনকে বললুম, 'দেখো, এ-জন্যে তোমাকে আবার গ্রেপ্তার না-করে।'

'চেষ্টা পায়ে দেখুক-না একবার,' ও জবাব দিল। 'আমরা সবাই এখন সমান। 'গাভ্রিউশ্‌কা'-ও তো ঘোড়ার মতনই কাজের, নয় কি?.. ও-ও তো শ্রমজীবী।'

আর তারপর, বিন্দুমাত্র লজ্জিত না-হয়ে, এক্কাখানাকে টেনে নিয়ে শহরে চলল 'গাভ্রিউশ্‌কা'।

## ২৪

# সেমিওনের দুঃখ-কণ্টকিত পথ

শেরে কাজকর্ম শুরু করে দিলেন প্রচন্ড তেজে। বসন্তকালীন রবিশস্যের বীজবোনার ব্যাপারটা ছয়-খেতি ব্যবস্থা অনুযায়ী করলেন তিনি, আর এই ব্যাপারটাকে কলোনিতে বেশ একটা প্রাণবন্ত ঘটনায় পরিণত করে তুলতেও সমর্থ হলেন। যেখানেই হাত লাগালেন তিনি সেখানেই নতুন কৃষি-পদ্ধতি সংগঠিত হয়ে গেল — তা সে কি খেত-খামারে, কি আস্তাবলে, কি শুয়োরের খোঁয়াড়ে, কি এজমালি শোবার ঘরগুলোয় — কিংবা, বলা চলে, যত্রতত্রই, যেমন রাস্তায়, খেয়াঘাটে, আমার অফিসে, কিংবা খাবার ঘরে। ছেলেরা ওঁর নির্দেশ-যে সব সময়ে বিনা তর্কে মেনে নিত তা নয়, আর সুশৃংখলভাবে চট্‌পট ওজর-আপত্তি জানাতে পারলে শেরেও কখনও তা কানে নিতে আপত্তি করতেন না। এমন কি, কখনও-কখনও, কাটখোট্টা-রকমের সৌজন্য দেখিয়ে একেবারে সংক্ষিপ্ততম ভাষায় আলোচ্য ব্যাপারে তাঁর নিজের মতামত পর্যন্ত ব্যাখ্যা করার মতো সদয়ও হতেন, তবে সব সময়ে কথা শেষ করতেন নিজের মতটি বহাল রেখেই। বলতেন:

'আমি যা বলছি তাই করুন দেখি।'

আগাগোড়া একই ভাবে, বিন্দুমাত্র হৈ-চৈ না-করে, প্রতিটি দিন পুরো সময় ধরে প্রচন্ডরকম কাজ করতেন শেরে; আগাগোড়া একই ভাবে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে ওঠা শক্ত ছিল; অথচ তিনিই আবার ঘোড়ার জাবনার গামলার পাশে অসীম ধৈর্য নিয়ে দু-তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে, কিংবা বীজবোনা-যন্ত্রের পিছু-পিছু ঘণ্টা-পাঁচেক হেঁটে বেড়াতে ছিলেন একই রকম পটু। প্রতি দশ মিনিট অন্তর শুয়োরের খোঁয়াড়ে দৌড়ে-দৌড়ে যাওয়া-আসা করা আর শুয়োর-পালকদের বারেবারে ভদ্রভাবে অথচ খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে হাজার গন্ডা প্রশ্ন করতেও তাঁর জুড়ি ছিল না। তিনি শুধোতেন:

'শুয়োরগুলোকে জাবনা দিয়েছেন কখন? সময়টা লিখে রাখতে খেয়াল ছিল তো? আমি যেমন দেখিয়েছিলাম তেমনভাবে লিখেছেন তো? ওদের চান করানোর জন্যে সব ঠিকঠাক করে রেখেছেন?'

কলোনির সদস্যরা শেরের প্রতি একটা চাপা আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করেছিল, যদিও, বলা বাহুল্য, তারা একেবারে নিশ্চিত ছিল যে 'আমাদের শেরে' 'আমাদের' বলেই অমন একটা আজব মানুষ হতে পেরেছেন, অন্য কোথাও থাকলে উনি কখনই এমন তাজ্জব ভেল্‌কি লাগানোর ধারেকাছে ঘেঁসতে পারতেন না। ছেলেদের এই শ্রদ্ধাভক্তির প্রকাশ ঘটতে দেখা যেত শেরের কর্তৃত্ব নিঃশব্দে মেনে নেয়ায় আর তাঁর কথাবার্তা, ধরনধারণ, আবেগ-উচ্ছ্বাসে তাঁকে টলাতে না-পারা আর তাঁর জ্ঞানগম্যি নিয়ে নিজেদের মধ্যে অনবরত আলোচনার মধ্যে দিয়ে।

ওদের এই মনোভাবে আমি কিন্তু অবাক হই নি। তখনই আমি বুঝে গিয়েছিলুম যে যে-সব লোক শিশুদের প্রতি স্নেহমমতা জাহির করে দেখায় আর তাদের নিয়ে বেশিরকম মাতামাতি করে শিশুরা একমাত্র তাদেরই ভালোবাসে এমনধারা তত্ত্বকথার সঙ্গে বাস্তবে বাচ্চাদের আচরণের কখনই মিল দেখা যাবে না। অনেক দিন থেকেই বরং এ-বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে উপরোক্তদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধাঁচের মানুষের প্রতিই তরুণদের — অন্ততপক্ষে আমাদের কলোনির ছেলেদের তো বটেই — সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধাভক্তি আর ভালোবাসা জন্মে থাকে। তরুণদের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যা আকর্ষণ করে থাকে তা হল, আমরা যাকে বলি উচ্চ গুণাবলী, নিশ্চিত ও যথাযথ জ্ঞান, মানসিক যোগ্যতা, কাজে দক্ষতা, তৎপর দুটো হাত, বাহুল্যবর্জিত কথাবার্তা, অলঙ্কৃত বাগাড়ম্বর থেকে বিরত থাকা, এবং কাজ করার অবিচল ইচ্ছা।

ছেলেদের সঙ্গে যত খুশি রুক্ষ ব্যবহার করতে পারেন আপনি, কাজ আদায়ের ব্যাপারে রীতিমতো কড়া হতে পারেন, ওদের উপেক্ষা করে চলতে পারেন — এমন কি যদি ওরা আপনার পিছু-পিছু ঘুরঘুর করতে থাকে তবুও, -- ওদের ভালোবাসার প্রতি ঔদাসীন্যও দেখাতে পারেন স্বচ্ছন্দে, কিন্তু যদি আপনি আপনার কাজে, জ্ঞানগম্যিতে আর সাফল্যের ক্ষেত্রে বাহাদুরি দেখাতে পারেন, তাহলে এতটুকু চিন্তা করতে হবে না — আপনার সপক্ষে ওদের সবাইকে আপনি পাবেনই, কখনও আপনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না ওরা। কীভাবে, কিংবা কোন্ কাজে আপনি নিজের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করছেন — ছুতোর-মিস্ত্রি, না কৃষিবিৎ, কামার, শিক্ষক, না এঞ্জিন-ড্রাইভার -- তাতে কিছুই যাবে-আসবে না।

অপরপক্ষে যতই দয়ালু হোন, যতই চৌকস হোন কথাবার্তায় আর মাত করে দিন সবাইকে, আচরণে যতই ভালোমানুষি আর অমায়িক ভাব দেখান, দৈনন্দিন জীবনে কাজ আর বিশ্রামের সময় যতই মধুর হোক আপনার ব্যক্তিত্ব, কাজে যদি আপনার অনবরত বিপত্তি আর ব্যর্থতা দেখা দিতে থাকে, প্রতি পদক্ষেপে যদি স্পষ্ট বোঝা যায় যে নিজের কাজ আপনি ঠিকমতো বোঝেন না, যা-কিছুই আপনি করছেন তা-ই যদি নষ্ট হয়ে আর তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকে, তাহলে ছেলেদের কাছ থেকে অবজ্ঞা আর ঘৃণা ছাড়া কোনোদিন আর কিছু পাবেন না। তা সে কখনও কিছুটা প্রশ্রয়দানের ভঙ্গিতে আর হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়েও হতে পারে, আবার কখনও হতে পারে প্রচণ্ড ক্রোধের প্রকাশ আর মারাত্মক শত্রুতাসাধনের, কিংবা অনর্গল গালিগালাজ বর্ষণের মাধ্যমে।

একসময়ে মেয়েদের এজমালি শোবার ঘরে একটা চুল্লী বানানোর উদ্দেশ্যে একজন চুল্লী-মিস্ত্রিকে ডাকা হয়। আগুনের আঁচ যাতে বেশি হয় এমন একটা গোলমতো চুল্লী বানানোর নির্দেশ দেয়া হল। যেন জরুরি কোনো কাজ নেই এমনিই ঘুরতে এসেছে এমন ভঙ্গি করে চুল্লী-মিস্ত্রি একদিন কলোনিতে এসে উপস্থিত হল, তারপর সারাটা দিন খালি এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াল, কোথায়-যেন একটা উনোন মেরামত করল, আস্তাবলের দেয়ালও মেরামত করল কিছুক্ষণ। লোকটিকে দেখে কেমন খামখেয়ালি বলে মনে হচ্ছিল -- গোলগাল, প্রায় টাক-পড়া মাথা, কথাবার্তায় একেবারে মধুঢালা। লোকটির বাঙ্‌ময়ে ছিল সুভাষিতাবলী আর সরস উক্তির ছড়াছড়ি, আর ওর নিজের মতে দুনিয়ায় অমন চুল্লী-মিস্ত্রি নাকি আর দুটি ছিল না।

দল বেঁধে ছেলেরা ওর পিছু-পিছু ঘুরতে লাগল। কিন্তু ওর গপ্পো শুনলেও তা যে বিশ্বাস করছিল তা নয়, আর শ্রোতাদের মধ্যে যে-ভাব জাগানোর ভরসা করে লোকটি নিজের সম্বন্ধে নানা খবরাখবর দিচ্ছিল তা মোটেই সেইভাবে গ্রহণ করছিল না তারা।

'তারপর, বোঝলে কিনা খোকারা, অখানকার চুল্লী-মিস্তিরিরা সবাই আমার থ্যেকে বয়সে-যে বড় ছিল তা না-বললিও চলে, কিন্তু কাউন্ট আর কাউরে দিয়ি কাজ করাতি রাজি না। বলল, 'ডাক আর্তেমিরে, দোস্ত! ও যদি চুল্লী বানাতি রাজি হয়, তাইলে সেইডাই হবে চুল্লীর মতন চুল্লী!' তা, বোঝলে কিনা, আমি তো তখন বাচ্চা মিস্তিরি মাত্তর, আর চুল্লী বানাতি হবে আর

কারো ভিটেয় নয় খোদ কাউন্টের ভিটেয়, তা তোমরাই ভাবো একবার ব্যাপারখান... কাউন্ট কখনও-কখনও নিজিই চল্যে এস্যে চুল্লী বানানো দেখত, আর বলত: 'ভাল্লো করি চুল্লী বানা, আর্তেমি — ভাল্লো করি বানা...'

'তা, চুল্লীডা তৈয়ের হল্য কেমন?' ছেলেরা শুধোল।

'খুব ভালো, সে আর বলতি। কাউন্ট তো সব সময় আসি দ্যাখত...'

ওর বানানো চুল্লী কাউন্ট কীভাবে দেখত তাই দেখাতে গিয়ে কাউন্টের অনুকরণে নিজের থুতনিটা জবরদস্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে দিল আর্তেমি। আর তাই দেখে ছেলেরা নিজেদের সামলাতে পারল না, কাউন্টের থেকে আর্তেমির আকার-প্রকারে এত তফাত ছিল যে তারা হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল।

চুল্লী বানানোর কাজ শুরু করল আর্তেমি গুরুগম্ভীর আর অত্যন্ত জটিল ওর পেশাগত বুকনি ঝাড়তে-ঝাড়তে, বেশি আঁচের কত রকম চুল্লী ও জীবনে দেখেছে আর তার মধ্যে কতগুলো ভালো চুল্লী নিজেই বানিয়েছে আর কত বাজে চুল্লী অন্য লোকে তৈরি করেছে তার ফিরিস্তি দিতে-দিতে। আবার ওই একই সঙ্গে এতটুকু লজ্জা না-পেয়ে ওর পেশার সব গুপ্ত তথ্যও ফাঁস করে দিতে লাগল, বেশি আঁচওয়ালা চুল্লী বানানোর যে হাজারো-রকমের অসুবিধে তাও বলল।

'আসল কথা হল্য, ব্যাসার্ধ ঠিকঠিক টানতি পারা। অনেক লোক আছে যারা ব্যাসার্ধই ঠিকমতো টানতি পারে না।'

ছেলেরা প্রায়ই তখন মেয়েদের এজমালি শোবার ঘরে যেন তীর্থযাত্রায় যেত, আর নিশ্বাস বন্ধ করে আর্তেমির 'ব্যাসার্ধ টানা' দেখত।

চুল্লীর ভিত তৈরি করতে-করতে অনবরত বকবক করে গেল আর্তেমি। কিন্তু যখন আসল চুল্লী তৈরির সময় এল তখন ওর কাজকর্মে কেমন একটা আস্থার অভাব দেখা গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে বকরবকরও গেল বন্ধ হয়ে।

আর্তেমির কাজ দেখতে গেলুম একদিন। ছেলেরা আমায় পথ করে দিয়ে উৎসুকভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। দেখেশুনে মাথা নেড়ে আমি বললুম:

'জিনিসটা এত পেটমোটা বানাচ্ছ কেন?'

'প্যাটমোটা?' আর্তেমি বলল। 'অমনধারা দেখাত্যেছে বটে, তবে এ্যা প্যাটমোটা না। এখনও বানানো শেষ হয় নাই কিনা, তাই। পরে ও সব ঠিক হয়্যে যাবে-নে।'

চোখ কুঁচকে চুল্লীর দিকে তাকিয়ে জাদোরভ বলল:

'কাউন্টের চুল্লীও এই রকম পেটমোটা দেখতে হয়েছিল নাকি?'

কিন্তু রসিকতাটা ধরতে পারল না আর্তেমি। বলল:

'নিশ্চয়! শেষ না-হওয়া অবধি সব চুল্লীই অমনধারা দেখায়। যেমন ধর...'

এর তিন দিন পরে আর্তেমি চুল্লী তৈরি শেষ হওয়ার খবর দিয়ে আমাকে দেখতে ডাকল। গোটা কলোনি তখন এজমালি ঘরখানায় গিয়ে হাজির হয়েছে। গর্বে মাথা উঁচু করে চুল্লীটার চারপাশে থপথপ করে হেঁটে বেড়াচ্ছে আর্তেমি। ভারসাম্য হারিয়ে একদিকে হেলে পড়ে ঘরের মাঝখানে খাড়া হয়ে আছে চুল্লীটা... হঠাৎ, কোথাও কিছু নেই, হুড়মুড় করে প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে পড়ল বস্তুটা। ঘরের মধ্যে এদিক-ওদিক ঠিকরে পড়ল ইটগুলো, ধুলোয় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল। পরস্পরকে পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলুম না আমরা। কিন্তু চুল্লী ভাঙার আওয়াজ যতই হোক, একই সঙ্গে উৎসারিত প্রচণ্ড হাসি, কাতরানি আর চিল-চিৎকারের দমককে ডুবিয়ে দেয়ার ক্ষমতা ছিল না তার। অনেকেরই গায়ে ইট ছুটে এসে লেগেছিল, কিন্তু কারো যন্ত্রণা লক্ষ্য করার মতো অবস্থা ছিল না। এজমালি ঘরে সবাই তখন বেদম হাসছে, তারপর ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে বারান্দায়, বারান্দা থেকে উঠোনে, সর্বত্র লুটোপুটি খেয়ে হাসির ধুম পড়ে গেছে। ইট আর ধুলোর জঞ্জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করে পাশের ঘরে গিয়ে দেখি আর্তেমির জামার কলার চেপে ধরেছে বুরুন আর ধুলো আর সুরকিতে মাখামাখি ওর টাকে মারার জন্যে ঘুসি তুলেছে।

আর্তেমিকে তাড়িয়ে দেয়া হল। তবে তার পরেও বহুদিন ধরে ওই নামটা অজ্ঞ, অসার দাম্ভিক আর কাজ পণ্ড করতে ওস্তাদের প্রতিশব্দ হিসেবে টিকে রইল।

কেউ হয়তো বলল, 'লোকডা কেমন?'

তার জবাবে অন্য কেউ বলত, 'দেখতি পাচ্ছ না — ও তো আর্তেমি!'

ছেলেদের চোখে আর্তেমির চেয়ে সবথেকে পৃথক ধরনের মানুষ ছিলেন শেরে। তাই কলোনিতে শেরে ছিলেন সর্বজনীন শ্রদ্ধার পাত্র, আর তাই কৃষির কাজও দ্রুত, সফলভাবে এগিয়ে চলল। শেরের আরও কিছু-কিছু ক্ষমতা ছিল, — তিনি জানতেন কীভাবে বেওয়ারিস সম্পত্তি খুঁজে পেতে হয়, বিলের পাওনা ঠেকিয়ে রাখতে হয়, আর ধার পেতে হয় — ফলে

কলোনিতে নিত্যি নতুন শেকড়-ওপড়ানোর যন্ত্র, বীজবোনার আর বীজের আধারী-যন্ত্র, এমন কি এঁড়ে-শুয়োর আর গাইগোরুর পর্যন্ত আবির্ভাব ঘটতে লাগল। ভাবুন একবার — তিন-তিনটে গোরু জুটে গেল আমাদের! মনে হল, শিগ্‌গিরই কপালে দুধও জুটে যাবে।

চাষবাস সম্পর্কে সত্যিকার উৎসাহ-উদ্দীপনার সূচনা দেখা দিল কলোনিতে। একমাত্র যে-সব ছেলে কারখানাগুলোর কাজে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করেছিল তারাই কেবল খেতে নেমে পড়ার ইচ্ছে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকল। কামারশালের পেছনের জমিটায় মাটি খুঁড়ে শেরে সেখানে নাতিশীত আবহাওয়ার ফলফুলুরি ফলানোর উদ্যোগ করতে লাগলেন, কাঠের কারখানায় বানানো চলতে থাকল হট্‌হাউসের ঘরের কাঠামো। নতুন কলোনিতে অবশ্য বিরাট আকারে হট্‌হাউস তৈরির কাজ চলছিল তখন।

ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে চাষের কাজ ঠিক যখন তুঙ্গে উঠেছে সেই সময়ে একদিন কারাবানভ হঠাৎ কলোনিতে এসে উপস্থিত। দেখা হতেই ছেলেরা মহা-উৎসাহে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে লাগল। কোনোরকমে তাদের হাত ছাড়িয়ে ও এসে আমার ঘরে ঢুকল। বলল:

'আপনেদের কেমনধারা চলত্যেছে তাই দেখ্‌তি আলাম।'

ছেলেদের, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের, ধোপাখানার মেয়েকর্মীদের হাসিমাখা খুশি-খুশি মুখগুলো অফিস-ঘরের দরজা-জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল।

'আরে, সেমিওন এস্যেছে! দ্যাখ্, দ্যাখ্! ভারি ভালো হয়েছে, তাই না?'

সন্ধে পর্যন্ত কলোনিতে ঘুরে বেড়াল সেমিওন. 'ত্রেপ্‌কে'-ও ঘুরে এল। তারপর সন্ধেবেলায় ম্লান বিষণ্ণভাবে, গুম-মেরে-গিয়ে আমার কাছে ফিরে এল।

'তারপর, কী খবর সেমিওন? কেমন কাটছে তোমার, শুনি?'

'অমনিই... আমি আমার বাপের সাথে আছি।'

'আর মিতিয়াগিন? সে কোথায়?'

'সে চুলায় যাউক! আমি তার সঙ্গ ছাড়্যে দিছি। আমার যদ্দুর মনে হয়, সে মস্কো গেছে।'

'তা, তোমার বাবার ওখানে খবর-টবর কী?'

'ওই আর-কি, গাঁয়ের লোকে যেমন চেরকাল ছিল তেমনিই আছে আমার বুড়া এখনও দিব্যি শক্তসমথ আছে... ভাইডা আমার খুন হয়েছে..

‘কী করে খুন হল?’

‘ও ছিল গ্যেরিলা যোদ্ধা — তা, পেত্‌লিউরার লোকেরা শহরের রাস্তায় অরে খুন করোছে।’

‘তা, তুমি কী করবে ঠিক করেছ — বাবার সঙ্গেই থাকবে?’

‘না, আমি বাপের সাথে থাকতি চাই না... কী যে করব ঠিক জানি না...’

অস্বস্তিভরে চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসল ও। তারপর চেয়ারখানা সরিয়ে আমার আরো কাছে আনল।

‘দ্যাখেন, আন্তন সেমিওনভিচ!’ হঠাৎ হুড়মুড় করে বলে ফেলল ও। ‘ধরেন, আমি যদি কলোনিতি থাক্যে যাই? তাইলে কেমন হয়?’

দ্রুত আমার দিকে এক-নজর তাকিয়ে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত মাথা ঝুঁকিয়ে বসল সেমিওন।

‘তা, থাক-না কেন?’ সহজভাবে, খুশিভরা গলায় আমি বলে উঠলুম। ‘নিশ্চয়ই! থেকে যাও! তাহলে আমরা সবাই খুব খুশি হব।’

চাপা আবেগে থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে চেয়ার ছেড়ে এবার লাফিয়ে উঠল সেমিওন।

সজোরে বলে উঠল, ‘আর আমি সহ্যি করতি পারত্যেছিলাম না! সত্যিই পারত্যেছিলাম না! পের্‌থম-পের্‌থম অত খারাপ লাগে নাই, কিন্তু পরে — আর কিছুতেই সহ্যি হচ্ছিল না! এদিক-সেদিক ঘুরি বেড়াতাম, কাম করতাম, দুপরে খেতি বসতাম, আর সবকিছু মনে পড়্যে যেত আমার, আর তখন ডাক ছাড়্যে কানতি ইচ্ছে করত! আমার কী হয়্যেল জানেন — কলোনিরি আমি ভালোবাস্যে ফেল্যেছিলাম, আর আমি নিজিই তা বুঝতি পারি নাই। পের্‌থমে ভাব্যেছিলাম এডা বুঝি দুইদিনির ব্যাপার, কাট্যে যাবে-নে, আর তারপর একদিন ভাবলাম — যাই, গিয়ি দেখ্যে আসি একবার। তারপর এখেনে যখন আলাম আর দেখলাম আপনেদের কাজকম্মো কেমন চলত্যেছে – তখন মনে হল্য, দারুণ ব্যাপার-স্যাপার চলত্যেছে! আপনেদের এই শেরে লোকডা...’

বললুম, ‘নিজেকে অত উত্তেজিত করে তুলো না। তুমি তো সরাসরি এখানে চলে আসতে পারতে। নিজেকে অতদিন ধরে অমন কষ্ট দিতে গেলে কেন?’

'নিজিও আমি তাই ভাব্যেছিলাম বটে। কিন্তু তারপর সেই সব কাণ্ড-কারখানা মনে পড়্যে গেল, যেভাবে আমরা আপনের সাথে ব্যাভার করোছি, আর তাই আমি...' হাতঝাড়া দিয়ে মনের অস্বস্তি প্রকাশ করে হঠাৎ ও চুপ করে গেল।

বললুম, 'ঠিক আছে। থাক, হয়েছে।'

এবার মাথা তুলে সতর্কভাবে তাকাল সেমিওন:

'হতি পারে আপনে ভাবত্যেছেন... আমি অভিনয় করত্যেছি, সেই সেবার যেমন বল্যেছিলেন আপনে। কিন্তু সত্যিই তা না! ওঃ, আপনে যদি জানতেন কী শিক্ষেডাই না পায়্যেছি আমি! আচ্ছা, সোজাসুজি বলেন তো — আপনে আমারে বিশ্বেস করেন?'

'তোমাকে বিশ্বাস করি বৈকি,' গম্ভীরভাবে বললুম।

'না-না, সত্য কথা বলেন দেখি — সত্যই বিশ্বেস করেন আমারে?'

হাসতে-হাসতে বললুম, 'আঃ, জ্বালিয়ে মারলে দেখছি! তুমি আবার তোমার সেই পুরনো অভ্যেসে ফিরে যেতে চাইছ নাকি?'

'এই তো দ্যাখেন, আমার উপর আপনের পুরা আস্থা নাই...'

'নিজেকে অযথা অত উত্তেজিত করে তুলো না, সেমিওন! প্রত্যেককেই আমি বিশ্বাস করি, তবে কাউকে বেশি কাউকে কম এই-যা তফাত। কোনো-কোনো লোককে এক ইঞ্চি বা দু-ইঞ্চি বিশ্বাস করি, আবার কাউকে-কাউকে এক ফুট বা দু-ফুট।'

'আর আমারে?'

'তোমাকে এক মাইল বিশ্বাস করি।'

'আর আপনের কথা আমি একদম বিশ্বেস করি না,' হিংস্রভাবে মুখের ওপর বলে দিল সেমিওন।

'শোনো কথা ছেলের!'

'আচ্ছা, ঠিক আছে! আমি আপনেরে আবার পের্‌মান দেব-নে...' কথাগুলো বলে এজমালি শোবার ঘরের দিকে চলে গেল সেমিওন।

প্রথম দিনটি থেকেই শেরের ডান হাত হয়ে দাঁড়াল কারাবানভ। কৃষিকাজের ব্যাপারে ওর একটা সুস্পষ্ট প্রবণতা ছিল, ও-ব্যাপারে বেশ কিছু জ্ঞানও অর্জন করেছিল, তাছাড়া পিতৃপিতামহের কাছ থেকে স্তেপের প্রান্তরে অর্জিত জীবনের অভিজ্ঞতা বংশ-পরম্পরায় রক্তের মধ্যে দিয়ে

সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে ওর মধ্যে অর্শেছিল। আবার সেই সঙ্গে কৃষিবিদ্যাগত নবতন ধ্যানধারণা এবং কৃষিতে প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠবও সাগ্রহে আত্মসাৎ করছিল ও।

শেরের প্রত্যেকটি হাবভাব, চলাফেরা দুই চোখ মেলে সেমিওন যেন রাক্ষসের মতো গিলত, আবার শেরেকে দেখানোর চেষ্টা করত যে ও-ও সহনশীলতার আর অবিরাম কাজ করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু এদুয়ার্দ নিকলায়েভিচের ধীরস্থির ভাব অনুকরণ করা ওর পক্ষে ছিল অসাধ্য। সব সময়েই একটা উত্তেজিত আর উল্লসিত অবস্থার মধ্যে থাকত ও, আর অনবরতই উপচে পড়তে থাকত — কখনও ক্রোধে আর ঘৃণায় কখনও উৎসাহ-উদ্দীপনায়, আবার কখনও-বা নিছক জান্তব শক্তির প্রাচুর্যে।

কলোনিতে ফিরে আসার দু-সপ্তাহ পরে একদিন সেমিওনকে ডেকে পাঠিয়ে সহজভাবে বললুম:

'এই নাও ওকালতনামা। সরকারি অর্থনৈতিক দপ্তর থেকে পাঁচ শো রুব্‌ল নিয়ে এস দেখি।'

শুনে চোখদুটো বড়-বড় আর মুখটা হাঁ হয়ে গেল ওর। মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল গোটা মুখখানা। অবশেষে আনাড়ির মতো কোনোরকমে বললে:

'পাঁচ শো রুব্‌ল! আর তারপর কী করতি হবে?'

'কী আবার!' টেব্‌লের ড্রয়ারে কী-যেন খুঁজতে-খুঁজতে জবাব দিলুম, 'টাকাটা আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

'ঘোড়ায় চড়্যে যাব কি?'

'নিশ্চয়! আর এই রিভল্‌বারটাও সঙ্গে রাখ, বলা তো যায় না যদি দরকার পড়ে।'

আগের হেমন্তে মিতিয়াগিনের বেল্‌ট্‌ থেকে যে-রিভল্‌বারটা খুলে নিয়েছিলুম, তিনটে কার্ট্রিজ-ভরা অবস্থায় সেই রিভল্‌বারটাই সেমিওনের হাতে তুলে দিলুম। যন্ত্রের মতো রিভল্‌বারটা হাতে নিল কারাবানভ, বিহ্বল চোখে একবার তাকিয়ে দেখল ওটার দিকে, তারপর দ্রুত হাতে ওটাকে পকেটে পুরে, একটাও কথা না-বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। দশ মিনিট পরে পাথরে-বাঁধানো রাস্তায় ঘোড়ার খুরের খটাখট আওয়াজ পেলুম।

দেখলুম আমার জানলার পাশ দিয়ে দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে বেরিয়ে গেল একজন ঘোড়সওয়ার।

সন্ধের দিকে সেমিওন এসে অফিস-ঘরে ঢুকল। কামারের খাটো চামড়ার জ্যাকেট গায়ে, কোমরে বেল্ট্-বাঁধা, ছিপছিপে একহারা, সুঠাম গড়ন, কিন্তু অন্ধকার মুখ। নিঃশব্দে এক বান্ডিল নোট আর সেই রিভল্বারটা আমার টেবিলে এনে রাখল।

নোটের তাড়াটা তুলে নিয়ে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা নির্বিকার আর ভাবলেশহীন গলায় প্রশ্ন করলুম:

'টাকাটা গুনে নিয়েছিলে তো?'

'হ্যাঁ।'

নোটের পুরো বান্ডিলটা হেলায়-ফেলায় ড্রয়ারের মধ্যে ছুড়ে দিয়ে বললুম:

'ধন্যবাদ! যাও, এখন খাওয়াদাওয়া কর গিয়ে।'

জ্যাকেটে-বাঁধা বেল্ট্টাকে ধরে একবার ডান-দিক একবার বাঁ-দিক ঘোরাল কারাবানভ, দ্রুত পায়ে একটুখানি পায়চারিও করল। কিন্তু শেষপর্যন্ত শান্তভাবে বলল:

'ঠিক আছে।' তারপর বেরিয়ে গেল।

আরও দু-সপ্তাহ কেটে গেল। এর মধ্যে যখনই ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে তখনই কেমন গোমড়া-মুখে আমাকে ও সম্ভাষণ করেছে। মনে হয়েছে কেমন-যেন অস্বস্তি বোধ করছে।

আমার নতুন নির্দেশও ও একই রকম মুখ-গোমড়া করে শুনল:

'যাও, দু-হাজার রুব্ল নিয়ে এস।'

স্বয়ংক্রিয় রিভল্বারটা পকেটে পুরতে-পুরতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কী-যেন পরীক্ষা করল সেমিওন। তারপর প্রতিটি কথা যেন ওজন করে-করে বলল:

'দু-হাজার? কিন্তু. ধরেন যদি ট্যাকাডা নিয়া না-ফিরি?'

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বললুম:

'দয়া করে তোমার ওই বোকার মতো কথাবার্তা বন্ধ করবে? তোমার নির্দেশ পেয়ে গেছ তো, এখন যাও দেখি যা বলা হয়েছে তাই কর গিয়ে! মনস্তত্ত্বের ওই সব ছেঁদো কথা বাদ দাও তো!'

কাঁধ-ঝাঁকানি দিয়ে এবার ফিস্‌ফিসিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল কারাবানভ: 'আচ্ছা... ঠিক আছে...'

আমায় যখন টাকা এনে দিল ও, তখন আর কিছুতেই আমায় ছাড়তে চায় না।

'গুন্যে দ্যাখেন।'

'কেন, কী জন্যে?'

'দয়া কর্যে ট্যাকাডা গোনেন!'

'কিন্তু তুমিই তো গুনেছ টাকাটা, তাই না?'

'বলত্যেছি আপনারে, গোনেনই-না ট্যাকাডা।'

'আঃ, বিরক্ত কোরো না তো!'

নিজের গলাটা এমনভাবে চেপে ধরল ও যেন গলায় কিছু বেধে দম বন্ধ হয়ে আসছে, তারপর কামিজের কলার ধরে সজোরে টানাটানি করতে লাগল আর টলতে লাগল দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে।

'আপনে আমারে বোকা বানাত্যেছেন! কখনই আমারে এতডা বিশ্বেস করতি পারেন না। অসম্ভব! বোঝতি পারত্যেছেন না? এয়া অসম্ভব! ইচ্ছা কর্যে আপনে বিপদের ঝুঁকি নিতিছেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, জানি, জানি, ইচ্ছা কর্যেই তো...'

দম ফুরিয়ে যাওয়ায় ঝুপ করে একখানা চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল ও।

বললুম, 'তোমাকে কাজ করতে বলে দেখছি আমাকে মোটা দাম দিতে হচ্ছে তার জন্যে।'

'দাম? সেডা আবার কী?' আচমকা সামনে ঝুঁকে পড়ে সেমিওন বলল।

'তোমার হিস্টিরিয়ার প্রলাপ শুনতে হচ্ছে, এই আর-কি।'

এবার জানলার তাকটা চেপে ধরল সেমিওন। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল: 'আন্তন সেমিওনভিচ!'

সত্যিই এবার একটু ভয় পেয়ে বলে উঠলুম, 'কী ব্যাপার তোমার, বল তো?'

'ওঃ, আপনে যদি জানতেন! যদি জানতেন আপনে! রাস্তা দিয়ি ঘোড়া ছুটায়্যে সারাডা পথ আসতি-আসতি কেবলই ভাবত্যেছিলাম — হায়, হায়, যদি একবারের তরে ভগমান থাকত! জঙ্গল থ্যেকে ভগমান যদি একবারের তরে কাউরে পাঠায়্যে দিত আমার উপর হামলা করতি... অরা যদি দশজনা

থাকত, যতজনা খ্বশি থাকত... আমি খালি গ্বলি চালাতাম, কামড় দিতাম, কুত্তার মতন অদেরে অস্থির কর্য়ো তোলতাম, যতক্ষণ আমার মধ্যি পেরানডা থাকত অদেরে নাস্তানাব্বদ কর্য়ো ছাড়তাম... আর জানেন, আমি পেরায় কাঁদ্যেই ফেল্যেছিলাম। অথচ আমি ভালোই জানতাম আপনে এখেনে বস্যে-বস্যে ভাবত্যেছেন: 'ছোঁড়াডা কি ট্যাকাডা আনব্যে, না মার্য়ো দেবে?' আপনে এট্টা ঝ্বঁকি নিয়িছিলেন, তাই না?'

'তুমি তো আচ্ছা মজার ছেলে, সেমিওন! আরে, টাকার ব্যাপার হলেই সব সময়ে বিপদের ঝ্বঁকি থাকে। বিপদের ঝ্বঁকি না-নিয়ে এক বান্ডিল নোট কেউ কখনই কলোনিতে আনতে পারে না। কিন্তু আমি মনে-মনে ভেবেছিল্বম, টাকাটা যদি তুমি আন, তাহলে ঝ্বঁকিটা কম নেয়া হয়। তোমার বয়স অল্প, গায়ে রীতিমতো শক্তি রাখ, চমৎকার ঘোড়াও চালাতে পার তুমি, কাজেই ডাকাতদের এড়িয়ে তুমি যত সহজে চলে আসতে পারবে আমি তা পারব না, আমাকে ওরা সহজেই ধরে ফেলবে।'

খ্বশিতে চোখ পিটপিট করে সেমিওন বলল:

'আপনে ভারি চালাক লোক, আন্তন সেমিওনভিচ!'

বলল্বম, 'এতে চালাক হওয়ার কী আছে? কী করে টাকা আনতে হয় তুমি এখন তা শিখে গেছ। ভবিষ্যতেও আবার তুমি আমাকে টাকা এনে দেবে। এর জন্যে তো কোনো বিশেষ চালাকি খাটানোর দরকার পড়ে না। আমি একটুও ভয় পাই নি কিন্তু। ভালোই জানি, নিজে আমি যতখানি সৎ তুমিও ততখানি সৎ। এ আমি আগেও জানতুম — তুমি কী এটা ব্বঝতে পার নি?'

'না। আমি ভাব্যেছিলাম আমি সৎ কিনা তা আপনে জানেন না,' সেমিওন বলল। তারপর তারস্বরে একটা ইউক্রেনীয় গানের কলি ভাঁজতে-ভাঁজতে অফিস ছেড়ে চলে গেল:

খাড়া পাহাড়, পিছন থ্যেকে
ঈগল উড়ি গেল ডাক্যে
মৌন তারা পায়ে রাখ্যে
গেল উড়ি স্বখের লেগ্যে।

## ২৫

# ফৌজী শিক্ষাবিজ্ঞান

১৯২৩ সালের শীতকাল সঙ্গে করে নিয়ে এল সংগঠন-সংক্রান্ত অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, যা তার পরের দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের যৌথ-সংস্থার নানা দিকের নানা ধাঁচ নির্ধারিত করে দিয়েছিল। এই সব আবিষ্কারের মধ্যে আবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল — ছোট-ছোট নানা বাহিনী ও তাদের দলনেতা নির্দিষ্ট করে দেয়া।

এ-বই যখন লিখছি তখনও পর্যন্ত গোর্কি কলোনি, দ্জের্জিন্স্কি কমিউন ও ইউক্রেনের চারিদিকে ছড়ানো অন্যান্য কলোনিগুলিতেও ওই বাহিনী আর দলপতিদের অস্তিত্ব বর্তমান আছে।

অবশ্য ১৯২৭—১৯২৮ সালে গোর্কি কলোনির বাহিনীগুলির সঙ্গে দ্জের্জিন্স্কি কমিউনের বাহিনীর কিংবা জাদোরভ ও বুরুনের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম বাহিনীগুলির মিল ছিল যৎসামান্য। কিন্তু এর অনেক আগে, সেই ১৯২৩ সালের শীতকালেই, এ-ব্যাপারের কিছু-একটা মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের বাহিনীগুলির তাত্ত্বিক তাৎপর্য অবশ্য এর অনেক পরে অনুভূত হয়েছিল, যখন কুচকাওয়াজের তালে-তালে পা ফেলে চলার রীতি ব্যাপকভাবে চালু হওয়ায় শিক্ষা-জগৎ রীতিমতো নাড়া খেয়েছিল এবং যখন উপরোক্ত তত্ত্ব শিক্ষা-জগতের কলম-পেষা তাত্ত্বিক একটা অংশের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে-সময়ে আমাদের সব কাজকর্মকে 'ফৌজী শিক্ষাবিজ্ঞান' নামে অভিহিত করা একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়েছিল, বোধহয় এটা ধরে নেয়া হয়েছিল যে উপরোক্ত শব্দগুচ্ছের ওই সমন্বয়টি ঘটালেই সেটা আমাদের তীব্র নিন্দাবাদের সামিল হবে।

১৯২৩ সালে কিন্তু কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে ভবিষ্যতে একদিন যাকে কেন্দ্র করে প্রচণ্ড ক্রোধ ও আপত্তির ঝড় বয়ে যাবে সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধানের প্রবর্তনা ঘটল আমাদের সেই জঙ্গল-এলাকায়।

ব্যাপারটার সূচনা ঘটেছিল অবশ্য একটা সামান্য ঘটনা থেকে।

ওই বছর যথারীতি আমাদের যোগাড়-যাগাড় করে নেয়ার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে কেউ কাঠ সরবরাহ করল না। আগের মতোই তখন আমরা

মরা-ঝরা গাছ আর আমাদের দিকে জঙ্গলের যে-অংশটা সাফ করা হয়েছিল সেখানকার ডালপালা কাঠকাটরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছিল্ম। বোঝাই যায়, জ্বালানি হিসেবে এ-সব বিশেষ ম্ল্যবান ছিল না, তাছাড়া তার আগের গ্রীষ্মে সংগৃহীত এই সব জ্বালানি নভেম্বর মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল আর আবার আমাদের জ্বালানি-সংকট শ্রু হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কী, মরা গাছের কাঠ সংগ্রহ করতে-করতে আমরা মনেপ্রাণে তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছিল্ম। ওই ধরনের গাছ-কাটা শক্ত ছিল না, কিন্তু শ-খানেক প্দের মতো ওজনের ওই জিনিস, যাকে মোলায়েম করে ভদ্রভাষায় কাঠ বলতুম আমরা, তা সংগ্রহ করতে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে বেশ কয়েক একর জায়গা তছনছ করে আমাদের ঢুঁড়ে বেড়াতে হোত, ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে সেঁধোতে হোত কষ্ট করে, আর শেষপর্যন্ত মাথায়-পিঠে বয়ে কলোনিতে যা আমরা নিয়ে আসতুম তা হল প্রচণ্ড ও অনর্থক শক্তিক্ষয়ের বিনিময়ে একগাদা ভাঙা ডালপালা, আগাছা, এইসব জিনিস, ভালো জ্বালানি হিসেবে যা নাকি ছিল সন্দেহজনক। উপরন্তু এই কাজটা জামাকাপড়ের পক্ষে ছিল মারাত্মক ক্ষতিকর (জামাকাপড়ের দিক থেকে এমনিতেই তখন আমাদের অবস্থা রীতিমতো খারাপ), তাছাড়া শীতকালে জ্বালানির সন্ধান মানেই ছিল পায়ের আঙ্ল ঠান্ডায় জমে যাওয়ার সমস্যা আর আস্তাবলে এ-নিয়ে তুম্ল হৈ-চৈ আর ঝগড়া বাধা। কারণ, কাঠ বয়ে আনার জন্যে ঘোড়া দেয়ার ব্যাপারে আন্তন কারো কথাই শ্নতে রাজি ছিল না।

'কাজটা তোমরা নিজি-নিজিই কর গিয়ে, ও-কাজের জন্যি ঘোড়া মিলবে না। জ্বালানি আনবার জন্যি ঘোড়া চাই — বটে! ওরে তোমরা জ্বালানি কও নাকি?'

'কিন্তু ব্রাত্চেঙ্কো, আমাগো কোঠা গরম করন লাগব না?' কালিনা ইভানভিচ শ্ধোল, ভাবল ব্ঝি একটা অকাট্য, মোক্ষম য্ক্তি খ্ঁজে বের করেছে।

আন্তন কিন্তু এক ফ্ঁয়ে উড়িয়ে দিল য্ক্তিটা:

'আমার কথা যদি ধরেন তাইলে বলব, লাগবে না। আস্তাবল তো বে˙ গরম করে না, কাজেই আমরা ভালোই আছি।'

যাই হোক, জ্বালানি নিয়ে মহা-সমস্যায় পড়ে গেল্ম। অবশেষে একটা

সাধারণ সভায় সমবেত হয়ে শেরেকে শেষপর্যন্ত রাজি করানো গেল যে সার বওয়ার জন্যে গাড়ির ব্যবহার তিনি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখবেন, আর স্থির হল ছেলেদের মধ্যে যাদের গায়ের জোর সবচেয়ে বেশি আর যাদের সবচেয়ে শক্তপোক্ত ভালো জুতো আছে জঙ্গলে কাঠ-কাটার কাজ করবে তারা। এ-উদ্দেশ্যে কুড়ি জনকে নিয়ে একটা দলও তৈরি হয়ে গেল। সামাজিক কাজকর্মে যারা ছিল সবচেয়ে সক্রিয় এই দলে স্থান পেল তারা — যেমন, বুরুন, বেলুখিন, ভের্শ্নেভ, ভোলখভ, অসাদ্চি, চোবত ও অপর কয়েকজন। প্রতিদিন সকালবেলায় পকেটে কিছু রুটি ভরে নিয়ে এই দলের ছেলেরা সারাটা দিন জঙ্গলে কাটাতে লাগল। সন্ধেবেলা লাগাদ আমাদের বাঁধানো রাস্তা-বরাবর ভাঙা ডালপালার অনেকগুলো স্তূপ পর-পর জমে উঠত। আর দু-ঘোড়ার শ্লেজ-গাড়িখানা অনবরত আনা-নেয়া করতে-করতে আন্তন এই কাঠের স্তূপগুলো কলোনিতে বয়ে-বয়ে আনত আর মুখে সারাক্ষণ এমন একটা ভাব ফুটিয়ে রাখত যেন এই বাজে কাজটা করতে ওর অত্যন্ত বিরক্তিকর ঠেকছে।

সারা দিনের কাজের শেষে অভুক্ত অথচ হাসিখুশি, প্রাণবন্ত ভাব নিয়ে ছেলেরা ফিরে আসত। আর ফেরার পথটায় একঘেয়েমি কাটাতে প্রায়ই একটা অদ্ভুত ধরনের খেলা খেলতে-খেলতে আসত। ওদের অনেকের সঙ্গে এককালে-যে ডাকাতের দলের সংস্রব ছিল সেই পূর্বস্মৃতির ছিটেফোঁটা চিহ্ন এই খেলাটার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেত। গুটি দুয়েক ছেলের সাহায্যে আন্তন যতক্ষণে শ্লেজগাড়িতে কয়েক খেপের মতো ডালপালা বোঝাই করে আনা-নেয়া করতে থাকত বাকিরা ততক্ষণ জঙ্গলে একে অন্যকে তাড়া করে দৌড়োদৌড়ি করে ফিরত আর তারপর হাতাহাতি লড়াই চালিয়ে ডাকাত-দলকে ধরার খেলা চালাত। কুড়ুল আর করাতের হাতিয়ারধারী 'জঙ্গলের বাসিন্দা'দের এরপর পাকড়াও করে সারিবন্দীভাবে কলোনিতে নিয়ে আসা হোত। কলোনিতে ধরে আনার পর মজা করার জন্যে আমার অফিস-ঘরে ঢোকানো হোত ডাকাতদের। আর অসাদ্চি বা করিতো (এই ছেলেটি আগে একসময়ে ডাকাত-সর্দার মাখ্নোর অধীনে কাজ করেছিল আর সেই কাজে নিজের হাতের একটি আঙুলও খুইয়েছিল) কেউ একজন হয়তো চেঁচামেচি করে আমার কাছে দাবি জানাত:

'ওডার মুণ্ডুডা কাট্যে ফেলেন, নয়তো গুলি কর্যে মারেন ওডারে!

বনের মধ্যি অস্তর-হাতে পাওয়া গেছে লোকডারে — কে জানে, অর মতন আরও কিছু ওখানে রয়ে্যে গেছে হয়তো।'

ব্যস, শুরু হয়ে যেত জেরা। ভুরু-টুরু কুঁচকে ভোলখভ হয়তো পেড়ে ফেলত বেলুখিনকে:

'বল্যে ফেল্ দেখি — কয়ডা মেশিন-গান আছে দলের সাথে?'

হাসিতে ফাটো-ফাটো হয়ে এর জবাবে পালটা প্রশ্ন করে বসত বেলুখিন:

' 'মেশিন-গান', সেডা আবার কারে কয়? খাবার জিনিস বুঝি?'

'কী? মেশিন-গান খাওয়া? সেপাইয়ের বেজম্মা কোথাকার!..'

'অ, তাইলি খেতি ভালো নয়? তয় মেশিন-গান নিয়ি আমার কামডা কী?'

ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে পাকাপোক্ত গেঁয়ো ফেদরেঙ্কোকে হয়তো হঠাৎ প্রশ্ন করা হোত:

'স্বীকার পা দেখি — মাখ্নোর অধীনি তুই কাম করত্যেছিলি, তাই না?'

খেলার তাল না-কেটে কীভাবে জবাব দিতে হবে সে-ব্যাপারে মনস্থির করতে ফেদরেঙ্কোরও দেরি হত না। বলত:

'হ্যাঁ, কাম করত্যেছিলাম।'

'তা, কী কাম করত্যেছিলি?'

কী জবাব দেবে যতক্ষণ ভাবছে ফেদরেঙ্কো তার মধ্যে পেছন থেকে কে-যেন ওরই গলা নকল করে ঘুমঘুম-গলায় হদ্দ বোকার ভঙ্গি করে বলে বসত:

'গোরুগুলান মাঠে চরাতি নিয়ি যাতাম।'

চট্ করে মাথা ঘুরিয়ে ফেদরেঙ্কো দেখতে চেষ্টা করত কে বলল কথাটা, কিন্তু দেখা যেত পেছনে সকলেরই মুখে নিরীহ ভাব মাখানো একেবারে। সঙ্গে সঙ্গে হাসির হুল্লোড় পড়ে যেত। আর, সঙ্কুচিত ফেদরেঙ্কো খেলার সঙ্গে তাল রাখতে না-পেরে দ্রুত খেই হারিয়ে ফেলত। এই সময়ে ফের হঠাৎ নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হোত তাকে:

'গোরুতি মেশিন-গানের গাড়ি টানত্য নাকি?'

এতে খেলার তাল কেটে যেত একেবারে। আর প্রসিদ্ধ ইউক্রেনীয় ভঙ্গিতে মুখব্যাদান করে হাসতে থাকত ফেদরেঙ্কো।

জ্বলন্ত চোখে ফেদরেঙ্কোর দিকে এক-নজর তাকিয়ে করিতো এবার আমার দিকে ফিরত, তারপর তীব্র উত্তেজনা প্রকাশ করে ফিস্‌ফিস করে বলত:

'অরে ফাঁসি দেন! সাংঘাতিক লোক ও — চোখের দিকি তাইক্যে দেখেন একবার।'

আর আমিও তখন একই রকম ভঙ্গিতে জবাব দিতুম:

'সত্যি, ওকে প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়। তা এক কাজ কর, খাবার ঘরে নিয়ে গিয়ে ফিরে-ফিরতি দু-বার ওকে খেতে দাও দিকি।'

'এ-যে ভয়ানক শাস্তি দেখি!' করুণ গলায় বলে উঠত করিতো।

আর সঙ্গে সঙ্গে বেলুখিন হয়তো বকরবকর শুরু করত:

'তা, সে-কথা বলতি গেলি আমি নিজিই এক সাংঘাতিক ডাকাত... কসাক-মোড়লদের গোরু চরাতাম আমি...'

একমাত্র তখন রসিকতাটা বুঝে ফেদরেঙ্কো হাসত আর হাঁ-হয়ে-থাকা মুখটা বন্ধ করত অবশেষে। এরপর নিজেদের মধ্যে দিনের কাজের অভিজ্ঞতার লেনদেন শুরু করত ছেলেরা। বুরুন বলত:

'আমাদের বাহিনী বারোখান গাড়ি-বোঝাই কাঠ এন্যেছে আজ। এয়ার চাইতি কম হবে না। আগিই কয়্যেছি, ক্রিস্‌মাসের মধ্যি আমরা হাজার পুদ ওজনের কাঠ যোগাড় করি ফেলব-নে। এ-কাজ করতিই হবে।'

বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গ প্রশমিত হয়ে সেনাবাহিনীর 'রেজিমেন্ট', 'ডিভিশন' ইত্যাদি সুশৃঙ্খল খাতে যখনও পর্যন্ত প্রবাহিত হয় নি সেই যুগে স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক-পৃথক সৈন্যদল অর্থে 'বাহিনী' শব্দটার খুব চল ছিল। বিশেষ করে আমাদের ইউক্রেনে বহুদিন পর্যন্ত গ্যেরিলা যুদ্ধ চালান হয় শুধুমাত্র ছোট-ছোট বাহিনী দিয়েই। একটা বাহিনীতে তখন কখনও কয়েক হাজার, আবার কখনও-বা শ-খানেকেরও কম লোক থাকত -- কিন্তু কোনোক্ষেত্রেই সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শনের ঘাটতি ছিল না। এই সব বাহিনীর আশ্রয়স্থল ছিল বন-জঙ্গলের গভীর অংশগুলি।

বিপ্লবী সংগ্রামের সামরিক-গ্যেরিলা তৎপরতা-সম্পর্কিত রোমান্টিক কল্পনা-বিলাসের প্রতি আমাদের বাচ্চা কলোনি-বাসিন্দাদের আকর্ষণ ছিল বিশেষরকম। ভাগ্যের খামখেয়ালিতে যে-সব ছেলেপিলে সেদিন শত্রু-শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর শিবিরে স্থান পেয়েছিল, তাদের কাছেও প্রথম ও প্রধানতম

আকর্ষণ ছিল এই এক রোমান্টিক কল্পনা-বিলাস। এই শেষোক্ত ছেলেদের অনেকেই সেদিনকার সংগ্রামের অথবা শ্রেণী-দ্বন্দ্বের সত্যিকার তাৎপর্য জানতও না, বুঝতও না, আর তাই ওদের কাছ থেকে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের বিশেষ কিছু পাবার ভরসা না-থাকায় তাঁরা ওদের পাঠিয়ে দিতেন কলোনিতে।

আমাদের বনের গাছ-কাটা বাহিনীটির ছেলেপিলেদের হাতে কুড়ুল আর করাত ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র না-থাকলেও তাদের মনে সেই আগেকার বাহিনীগুলোর পরিচিত, প্রিয় স্মৃতি জেগে উঠত, অন্তত সে-সম্পর্কে সত্যিকার ঘটনার কোনো স্মৃতি থাক বা না-থাক অসংখ্য কাহিনী আর রূপকথা ছিল তাদের সম্বল।

আমাদের কলোনি-বাসিন্দাদের বিপ্লবী সহজপ্রবৃত্তির এই অর্ধ-সচেতন লীলাখেলায় বাধা দেয়ার কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না। আমাদের বাহিনীগুলোর আর ফৌজী খেলাধুলোর অত কড়া সমালোচনা করছিল যারা শিক্ষা-বিভাগের সেই কানুন-লিখিয়েদের এই সহজ ব্যাপারটাই বোঝার ক্ষমতা ছিল না যে এ-সবের মূলের কথাটা কী। দেশের বাহিনীগুলো একদিন যাদের হাতে-নাতে বিচার আর শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল -- তাদের ঘরবাড়ি দখল করে, মনস্তত্ত্ব উপেক্ষা করে, তাদের 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' কিংবা চিন্তাকুঞ্চিত কপালের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না-করে তিন-ইঞ্চি ব্যাসের বন্দুকের নল থেকে এলোপাতাড়ি ডাইনে-বাঁয়ে গুলি চালিয়েছিল — তাদের কাছে অবশ্য 'বাহিনী' শব্দটার অনুষঙ্গ খুব প্রীতিকর যে ছিল না তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ-ব্যাপারে করারও কিছু ছিল না। আমাদের সমালোচকদের সূক্ষ্ম রুচিকে কলা দেখিয়ে কলোনিতে বাহিনী গড়ার সূত্রপাত ঘটল এইভাবে।

গাছ-কাটা বাহিনীতে সব সময়েই মূল-গায়েনের ভূমিকায় থাকত বুরুন. তার এই পদের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার মতো অপর কেউ ছিল না। ওপরে যে-খেলার কথা বলা হয়েছে তার রীতি মেনে ছেলেরা ওকে কসাক-মোড়ল বলে ডাকতে শুরু করে দিলে।

আমি বললুম, 'আমরা কাউকে কসাক-মোড়ল বলে ডাকতে পারি না। একমাত্র ডাকাত-দলেরই এ-ধরনের মোড়ল বা সর্দার থাকে।'

ছেলেরা আপত্তি জানিয়ে হৈ-চৈ করে উঠল, 'খালি ডাকাতদের ক্যানে, গ্যেরিলাদেরও মোড়ল ছেল। লাল পার্টিজানদের অমন কত মোড়ল ছেল।'

'লালফৌজে কাউকে মোড়ল-টোড়ল বলা হয় না।'

'লালফৌজে অবশ্য কম্যাণ্ডার আছে। কিন্তু আমরা তো লালফৌজ নই।'

'লালফৌজ নই তো হয়েছে কী। 'কম্যাণ্ডার' বা 'দলপতি' শব্দটা অনেক ভালো।'

গাছ-কাটার পালা সাঙ্গ হল। পয়লা জানুয়ারি লাগাদ হাজার পুদেরও বেশি ওজনের কাঠ জমে গেল আমাদের। কিন্তু বুরুনের বাহিনী আমরা ভেঙে দিলুম না, নতুন কলোনিতে হট্‌হাউসগুলো তৈরির কাজে গোটা বাহিনীটাকেই দিলুম লাগিয়ে। প্রতিদিন সকালে বাহিনী কাজে চলে যেত, দুপুরের খাওয়া বাইরেই সারত, ফিরত সন্ধে লাগাদ।

একদিন জাদোরভ আমায় বললে:

'দেখুন, আমাদের ব্যাপারগুলো কেমন এলোমেলোভাবে ঘটছে। বুরুনের বাহিনীটা মাত্র তৈরি হয়েছে, কিন্তু অন্য ছেলেদের নিয়ে কী করা যায়?'

এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় বেশি সময় নষ্ট করলুম না। ওই সময়ে কলোনিতে প্রতিদিন সেই দিনের কাজের নির্দেশনামা জারি করা হচ্ছিল, তারই মধ্যে জাদোরভের নেতৃত্বে দ্বিতীয় একটা বাহিনী সংগঠনের নির্দেশও যোগ করা হল। এই গোটা দ্বিতীয় বাহিনী আমাদের কারখানাগুলোয় কাজ করতে লাগল। বেলুখিন আর ভের্‌শ্‌নেভের মতো দক্ষ কর্মীরা বুরুনের বাহিনী ছেড়ে যোগ দিল জাদোরভের বাহিনীতে।

দ্রুত আরও কয়েকটা বাহিনী গড়ে উঠল এরপর। নতুন কলোনিতে নিজস্ব দলপতিদের নেতৃত্বে গড়ে উঠল তৃতীয় আর চতুর্থ, দুটো বাহিনী। তাছাড়া নাস্তিয়া নচেভ্‌নায়ার নেতৃত্বে মেয়েরাও পাঁচ নম্বর বাহিনী গড়ল।

বসন্তকালের মধ্যে এই বাহিনী গঠনের ব্যবস্থা শেষপর্যন্ত পুরোপুরি রূপ পেল। বাহিনীগুলো গেল অপেক্ষাকৃত ছোট হয়ে, কারখানা-ঘরগুলোয় কর্মরত ছেলেদের আলাদা-আলাদা ভাগের ভিত্তিতে সংগঠিত হল সেগুলো। জুতো-সেলাই বিভাগের কর্মীদের সব সময়ে মার্কা দেয়া হোত এক নম্বর বাহিনী হিসেবে, আর কামারশালার কর্মীদের ছ-নম্বর, সহিসদের দু-নম্বর, আর শুয়োর-পালকদের দশ নম্বর হিসেবে। প্রথম-প্রথম আমাদের কোনো বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন বা অধিকার ছিল না, দলপতিদেরও নির্বাচন করতুম

আমিই কিন্তু বসন্তকাল লাগাদ ক্রমশ ঘনঘন দলপতিদের সভা (ছেলেরা এই সভার একটা নতুন ও আরও প্রীতিকর নামকরণ করেছিল, তা হল 'দলপতি-পরিষদ') ডাকতে শুরু করলুম। দলপতি-পরিষদের সভা না-ডেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে হাত না-দিতে শিগ্‌গিরই অভ্যস্ত হয়ে পড়লুম আমি। দলপতি নিযুক্ত করার দায়িত্বও ক্রমশ পরিষদের ওপর ছেড়ে দেয়া হল, এইভাবে পরিষদ-সদস্যদের ভোটে সদস্য নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে পরিষদের আকারও বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। ব্যাপক সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে দলপতি নিযুক্ত করা এবং নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দলপতিদের দায়ী থাকার প্রথা এরও বহু পরে চালু হয়। এই ধরনের অবাধ নির্বাচন চালু করাটা যে একটা বড় কিছু কৃতিত্ব, এটা অবশ্য আমি নিজে কখনই মনে করি নি, এখনও তা করি না। কারণ, দলপতি-পরিষদে নতুন দলপতি নির্বাচনের ব্যাপারটাও সব সময়ে অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার মধ্যে দিয়ে নিষ্পন্ন হোত। কখনও এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটত না। আর পরিষদের ভোটে পরিষদের নতুন সদস্য নির্বাচনের প্রথা চালু থাকার কল্যাণে সব সময়েই আমরা অতি চমৎকার সব দলপতি পেতুম, আবার ওই একই সঙ্গে এমন একটা পরিষদ আমরা পেয়েছিলুম যা সংস্থা হিসেবে কখনও তার কাজকর্ম বন্ধ করে নি, কিংবা পদত্যাগ করে নি।

একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম যা আজও পর্যন্ত বহাল আছে তা হচ্ছে, দলপতিদের কোনোরকমের বিশেষ সুযোগসুবিধা পাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ করা। অতিরিক্ত পাওনা বলে কোনো কিছু তারা কখনও পায় না এবং কাজ করা থেকেও তাদের অব্যাহতি নেই।

১৯২৩ সালের বসন্তকাল লাগাদ এই বাহিনী-গঠন ব্যবস্থায় আমরা বহুতর ও প্রভূত উন্নতি ঘটালুম। আর এই ধরনের উন্নত ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটি পরে আমাদের যৌথ-সমাজের তেরো বছরের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক আবিষ্কার হিসেবে গণ্য হয়েছে। একমাত্র এই আবিষ্কারটিই আমাদের বাহিনীগুলোকে মিলেমিশে একটা খাঁটি, দৃঢ়মূল, অখণ্ড যৌথ-সমাজে একীভূত হতে সাহায্য করেছে। অথচ তারই সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে গেছে বাহিনীতে-বাহিনীতে কাজ ও সংগঠনগত পার্থক্য, সর্বসাধারণের সভায় গৃহীত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ, শৃঙ্খলা, প্রতিটি কমরেডের কাছে অপর কমরেডের বশ্যতাস্বীকার, ইত্যাদি।

এই আবিষ্কারটি হল আর কিছুই নয়, যৌগিক অথবা 'মিশ্র' বাহিনী গঠন।

আমাদের এই সব ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরোধীরা - 'ফৌজী শিক্ষাবিজ্ঞান'-কে যারা অমন ক্ষিপ্ত হয়ে আক্রমণ করে আসছিল — তারা আমাদের কোনো দলপতিকে কখনও হাতে-কলমে কাজ করতে দেখে নি। কিন্তু এটাও অতটা বড় কথা নয়। এর চেয়ে অনেক বেশি বড় কথা হল এই যে তারা কোনোদিন আমাদের মিশ্র বাহিনীর নাম পর্যন্ত শোনে নি, ফলে আমাদের বাহিনী-গঠন ব্যবস্থার মূল নীতি যে কী সে-সম্পর্কে কোনো ধারণাই জন্মায় নি তাদের।

মিশ্র বাহিনীর জন্ম হল এই কারণে যে আমাদের প্রধান কাজই ছিল চাষবাস। আমাদের জমির পরিমাণ ছিল প্রায় সত্তর দেসিয়াতিনা, তাই গ্রীষ্মকালে চাষের কাজের জন্যে শেরে ছেলেদের সকলের সাহায্য চাইলেন। অথচ কলোনির প্রতিটি সদস্য তখন কোনো-না-কোনো কারখানার কাজে নিযুক্ত, আর কেউই কারখানার সঙ্গে নিজের সংযোগ নষ্ট করতে চাইছিল না। কারণ, কৃষিকাজকে সকলেই নিছক জীবনধারণের আর জীবনযাত্রার উন্নতির উপায় বলে গণ্য করছিল, আর কারখানাকে মনে করছিল দক্ষতা ও জীবনে যোগ্যতা অর্জনের পন্থা হিসেবে। শীতকালে চাষের কাজ যখন প্রায় বন্ধ ছিল সব কটা কারখানা-ঘর তখন ছেলেতে বোঝাই হয়ে রইল। কিন্তু জানুয়ারি মাস থেকেই হট্‌হাউসগুলোয় কাজের জন্যে আর গাড়ি করে জমির সার বয়ে আনার উদ্দেশ্যে শেরে কলোনি-সদস্যের সাহায্য চাইতে শুরু করলেন। দিনকে-দিন এই দাবি ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠল।

ক্রমাগত জায়গা আর চাষের ধরনের পরিবর্তন ছিল জমির কাজের বৈশিষ্ট্য। তাই নানা বিচিত্র ধরনের কাজের জন্যে যৌথ-সংস্থাকে বহুতর দল-বেদলে ভাগ করার দরকার হয়ে পড়ল। কাজের ক্ষেত্রে দলপতিদের পুরো কর্তৃত্ব বজায় রাখা আর প্রথম থেকেই তাদের ওপর সবকিছুর দায়িত্ব অর্পণ আমাদের কাছে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে হয়েছিল। বিষয়টা শেরেই প্রথম তুলেছিলেন। বলেছিলেন, কাজের সময় কলোনির যে-কোনো একজন সদস্যকে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যন্ত্রপাতি-সাজসরঞ্জামের দায়িত্ব নেয়া, পুরোপুরি কাজটারই দায়দায়িত্ব এবং তার গুণগত উৎকর্ষ বজায় রাখার ভার নেয়া, এ-সবই করতে হবে। এখনও পর্যন্ত একজনও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এই দাবির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলতে দেখি না;

এমন কি, আমার মনে হয় সেই সময়েও একমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রের পণ্ডিতপ্রবররা ছাড়া এতে অপর কেউ আপত্তি করত না।

খুবই স্বাভাবিক সাংগঠনিক প্রয়োজন মেটাতে সেদিন আমাদের মাথায় মিশ্র বাহিনী গঠনের বুদ্ধি গজাল।

আমাদের মিশ্র বাহিনীগুলো ছিল সাময়িক কাজের উদ্দেশ্যে গঠিত অস্থায়ী বাহিনীমাত্র, একসঙ্গে সপ্তাহ-খানেকের বেশি সময়ের জন্যে সেগুলো সংগঠিত হোত না। তাদের কাজও হোত সংক্ষিপ্ত আর সুনির্দিষ্ট — যেমন, কোনো একটা বিশেষ আলুখেত নিড়নো, একটা বিশেষ জমি চাষ করা, ভালো-মন্দ বাছাই করে বীজগুলোকে আলাদা করা, গাড়ি করে খেতে সার বয়ে নিয়ে যাওয়া, একটা সুনির্দিষ্ট এলাকায় বীজ বোনা, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ওপরের ওই প্রতিটি কাজের জন্যে পৃথক-পৃথক সংখ্যক কর্মীর দরকার পড়ত — কোনো-কোনো মিশ্র বাহিনীতে মাত্র জনা-দুয়েক কর্মী থাকলেই কাজ চলত, আবার কোনো-কোনোটাতে দরকার হোত পাঁচ, আট, এমন কি বিশজন কর্মীরও। একেকটা কাজের জন্যে যতটা সময় দরকার হোত সেই অনুযায়ী মিশ্র বাহিনীগুলোর কাজেরও তারতম্য ঘটত। শীতকালে ছেলেদের যখন ইশ্‌কুল করতে হোত, তখন তারা দুপুরের খাওয়ার আগে কিংবা পরে দুই শিফ্‌টে কাজ করত। আবার ইশ্‌কুল যখন ছুটি থাকত তখন দৈনিক ছ-ঘণ্টা করে কাজের সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হোত, আর সকলে একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করত তখন। তবে জন্তুগুলোকে আর সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি পুরোপুরি কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে কিছু-কিছু ছেলেকে ভোর ছ-টা থেকে দুপুর বারোটা আর অপর কিছু ছেলেকে দুপুর বারোটা থেকে সন্ধে ছ-টা পর্যন্ত কাজ করতেই হোত। কখনও-কখনও এত বেশি কাজ করার থাকত যে সাধারণ দৈনিক কাজের সময় পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে হোত।

কাজের ধরন ও কাজের সময়ের এত বৈচিত্র্যের ফলে মিশ্র বাহিনীগুলোতেও বহু তারতম্য ঘটতে দেখা যেত। আমাদের মিশ্র বাহিনীগুলোর কাজকর্মের জটিল ব্যবস্থার সঙ্গে রেলওয়ের গাড়ি-চলাচলের সময়-নির্ঘণ্টের অনেকটা মিল ছিল।

কলোনির সকলেরই জানা ছিল যে তৃতীয় 'ও' মিশ্র বাহিনী দুপুরের খাওয়ার সময়টুকু বাদ দিয়ে প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে

পর্যন্ত কাজ করত, আর তাদের কাজ সব সময়েই নির্দিষ্ট থাকত সব্জি-বাগানে। তেমনই তৃতীয় 'সি' মিশ্র বাহিনী কাজ করত ফলের বাগানে, তৃতীয় 'আর' মিশ্র যাবতীয় মেরামতির এবং তৃতীয় 'এচ্' হট্‌হাউসে। এছাড়া প্রথম মিশ্র বাহিনী ভোর ছ-টা থেকে দুপুর বারোটা আর দ্বিতীয় মিশ্র বাহিনী দুপুর বারোটা থেকে সন্ধে ছ-টা পর্যন্ত কাজ করত। মিশ্র বাহিনীগুলোর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে শেষপর্যন্ত তেরোয় এসে দাঁড়িয়েছিল।

মিশ্র বাহিনীগুলো ছিল নিছকই বিশেষ নির্দিষ্ট কাজের কর্মী-বাহিনীমাত্র। নির্দিষ্ট কাজটা শেষ করে ছেলেরা কলোনিতে ফিরে আসার পরই মিশ্র বাহিনীর অস্তিত্ব যেত লোপ পেয়ে।

অপরদিকে কলোনির প্রতিটি বাসিন্দাই ছিল এককেটা স্থায়ী বাহিনীর সদস্য। আর সেই বাহিনীর নিজস্ব স্থায়ী দলপতি থাকত, থাকত কারখানাগুলোর কাজে, এজমালি শোবার ঘরে আর খাবার ঘরে তার নিজস্ব নির্দিষ্ট স্থান। এককেটা স্থায়ী বাহিনী ছিল কলোনির পক্ষে এককেটা মূল যৌথস্বরূপ, প্রতিটি বাহিনীর দলপতিকে নিশ্চিতভাবেই দলপতি-পরিষদের সদস্য হতে হোত। কিন্তু বসন্তকাল থেকে শুরু করে যতই গ্রীষ্ম এগিয়ে আসতে লাগল তত বেশি ঘনঘন কলোনির প্রতিটি বাচ্চা সদস্যকে এককেটা নির্দিষ্ট কাজে একেক সপ্তাহের জন্যে যে-কোনো একটা মিশ্র বাহিনীর সঙ্গে জুড়ে দেয়া হতে লাগল। এমন কি যখন মাত্র জনা-দুই ছেলে নিয়ে একটা মিশ্র বাহিনী গড়া হোত তখন তাদের মধ্যে থেকেই একজনকে করা হোত দলপতি। নির্দিষ্ট কাজটা সংগঠিত করত সে-ই, কাজের ভালোমন্দের জন্যে জবাবদিহিও করতে হোত তাকে। তবে কাজের ঘণ্টা যেই শেষ হোত মিশ্র বাহিনীও ভেঙে দেয়া হোত সঙ্গে সঙ্গে।

প্রতিটি মিশ্র বাহিনী গড়া হোত মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে, ফলে কলোনির প্রত্যেক সদস্য ব্যক্তিগতভাবে পরের সপ্তাহের জন্যে সাধারণত নতুন দলপতির অধীনে নতুন কাজের ভার পেত। পরের সপ্তাহের এই নতুন বাহিনীর দলপতিও নিযুক্ত হোত দলপতি-পরিষদের নির্দেশে, এবং তা মাত্র ওই এক সপ্তাহের জন্যেই। আর, সাধারণত পরের সপ্তাহের মিশ্র বাহিনীতে এই দলপতি আর দলপতি না-থেকে একেবারেই সাধারণ কর্মী-সদস্যে পরিণত হয়ে যেত।

কলোনির প্রতিটি বাচ্চা সদস্যকেই দলপতি-পরিষদ পালাক্রমে কোনো-না-কোনো মিশ্র বাহিনীর দলপতি নিযুক্ত করার চেষ্টা পেত — নিতান্তই যারা অনুপযোগী বলে গণ্য হোত তাদের বাদ দিয়ে অবশ্য। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে অন্যায় পক্ষপাতিত্বের ব্যাপার কিছু ছিল না, কেননা মিশ্র বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া ছিল গুরুতর দায়িত্বের ও নানান ঝুট্‌ঝামেলার কাজ। এই প্রথা চালু হওয়ার কল্যাণে প্রায় সমস্ত কলোনি-সদস্যই শুধু-যে বাঁধাধরা কাজে হাত লাগাত তাই নয়, তারা সাংগঠনিক দায়িত্বও বহন করতে শিখছিল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল এটা, তাছাড়া কমিউনিস্ট-শোভন শিক্ষা-গ্রহণের দিক থেকেও ঠিক এই জিনিসটারই দরকার ছিল। আর এই প্রথার কল্যাণে ১৯২৬ সালে আমাদের কলোনি যে-কোনো কাজে নিজেকে চমৎকারভাবে খাপ খাইয়ে নেয়ার গৌরব অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। তখন দেখা গিয়েছিল আমাদের মধ্যে আছে নানা ধরনের কর্তব্য সম্পাদনের উপযোগী প্রচুর যোগ্য ও আত্মনির্ভরশীল সংগঠক, এবং পুরোপুরি নির্ভর করা চলে এমন সব কুশলী তত্ত্বাবধায়ক।

যাই হোক, এর ফলে স্থায়ী বাহিনীগুলোর দলপতি-পদের গুরুত্ব অনেকখানি কমে গেল। স্থায়ী বাহিনীর দলপতিরা প্রায় কখনই নিজেদের মিশ্র বাহিনীর দলপতি নিযুক্ত করত না, তারা মনে করত এমনিতেই তাদের যথেষ্ট কাজ করার আছে। ফলে, স্থায়ী বাহিনীর দলপতি মিশ্র বাহিনীতে সাধারণ সদস্য হিসেবে কাজ করতে যেত, আর কাজের সময় মিশ্র বাহিনীর দলপতির নির্দেশ মেনে চলত। আর প্রায় সময়ই দেখা যেত, মিশ্র বাহিনীর দলপতি হয়তো স্থায়ী দলপতির নিজের বাহিনীরই একজন সাধারণ সদস্যমাত্র। এর ফলে কলোনিতে পারস্পরিক আনুগত্য মেনে চলার এমন একটা অত্যন্ত জটিল পরম্পরা সৃষ্টি হয়েছিল যে কলোনির বাসিন্দাদের কোনো ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য পাওয়া, কিংবা যৌথ-জীবনে মাতব্বরি করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

যৌথ ও ব্যক্তিগত কাজকর্মের ক্ষেত্রে পালা করে কাজ করা আর সাংগঠনিক দায়িত্বপালন, নেতৃত্ব দেয়া আর আনুগত্য-স্বীকারের এই রীতিসহ মিশ্র বাহিনী সংগঠনের পুরো ব্যবস্থাটি কলোনির জীবনকে বেঁধে দিল উঁচু পর্দায়, পূর্ণ করে দিল আগ্রহে উদ্দীপনায়।

২৬

## নতুন কলোনির দৈত্যদানা

ব্রেপ্‌কের মেরামতির কাজ দু-বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছিল। ১৯২৩ সালের বসন্তকাল লাগাদ আমরা নিজেরাই দেখে প্রায় অবাক হয়ে গেলুম যে কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। অতঃপর নতুন কলোনি আমাদের জীবনে বেশ লক্ষণীয় অংশ জুড়ে বসল। শেরের কাজকর্মের প্রধান ক্ষেত্র ছিল ওই জায়গাটাই, কারণ গোশালা, আস্তাবল, শুয়োরের খোঁয়াড় সবকিছুই ছিল ওখানে। গ্রীষ্মঋতুর সূচনার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বারের মতো জীবন সে-বছর নিষ্কর্মা হয়ে ঝিমিয়ে পড়ল না, বরং কাজকর্মে ফুটতে লাগল রীতিমতো টগ্‌বগ করে।

তখনও কিছুদিন পর্যন্ত পুরনো কলোনির মিশ্র বাহিনীগুলো ওই জীবনের চালকশক্তি হয়ে রইল। সারাটা দিন ধরে তখন চোখে পড়ত আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথগুলোয় আর দুই কলোনির সীমারেখা-বরাবর মিশ্র বাহিনীগুলোর প্রায়-অবিরাম চলাফেরা -- কোনো একটা বাহিনী হয়তো কাজে যাচ্ছে নতুন কলোনিতে, আবার অন্য একটা বাহিনী দুপুরের বা রাত্রের খাওয়া উপলক্ষে পা চালিয়ে আসছে পুরনো কলোনিমুখো।

পর-পর সার বেঁধে মিশ্র বাহিনীর সদস্যরা দুই কলোনির মধ্যেকার পথটা দ্রুত পার হয়ে যেত। বালকসুলভ ফন্দিফিকির খাটিয়ে দুঃসাহসের বশে ওরা অন্যের ভূ-সম্পত্তির ওপর অলঙ্ঘ্য অধিকারকে কাঁচকলা দেখাতে আর জমির সীমারেখা টপকে যেতেও বড়-একটা অসুবিধে বোধ করত না। প্রথম-প্রথম খামারখোলার মালিকরা এই সব ফন্দিফিকির ঠেকাতে অল্পস্বল্প প্রয়াস পেত, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারা বুঝে ফেলল যে এ ঠেকানো অসম্ভব। ছেলেরা ছিল নাছোড়বান্দা, দিব্যি হাসতে-হাসতে খেলার ছলে বিভিন্ন খামারবাড়ির মধ্যেকার যোগাযোগের পথগুলোর অদলবদল ঘটিয়ে সেগুলোকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পেঁছিনোর উপযোগী আর সরল করে তুলল তারা। আর যে-সব জায়গায় ওদের তৈরি পথের এই সরলরেখা কোনো-না-কোনো খামারবাড়ির উঠোন ভেদ করে যেত, সেখানে-সেখানে জ্যামিতিক উপায় বর্জন করে ছেলেদের অন্য উপায় অবলম্বন করতে হোত। কেননা

সে-সব ক্ষেত্রে অতিক্রম করতে হোত কুকুর, ডালপালার আর কাঠের বেড়া, গেট, ইত্যাদি বিপত্তি।

এই সব বাধা-বিপত্তির মধ্যে কুকুরদের এড়ানো ছিল সবচেয়ে সহজ। আমাদের ছেলেদের তহবিলে জমানো রুটির টুকরো থাকত যথেষ্ট, তাছাড়া রুটি না-থাকলেই বা কী, কলোনির বাচ্চা সদস্যদের প্রতি খামারবাড়ির কুকুরদের এমনিতেই বেশ কিছুটা দুর্বলতা ছিল। প্রাণবন্ত দর্শনীয় বস্তু আর স্বাস্থ্যপ্রদ হাস্যরোলে মুখর হয়ে ওঠার অভাবে ওই অঞ্চলের শ্বাপদ-জীবন আগে কেমন একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল, এমন সময় অকস্মাৎ নতুন-নতুন, অভূতপূর্ব আর উত্তেজক অভিজ্ঞতার ধাক্কায় তা হয়ে উঠল জীবন্ত। কুকুরগুলো পেয়ে গেল বিচিত্র মানুষজনের সঙ্গ, কৌতূহলোদ্দীপক আলাপ-পরিচয়ের স্পর্শ, যে-কোনো খড়ের গাদায় খণ্ডযুদ্ধ, কোস্তাকুস্তির দৃশ্য, আর শেষে একেবারে তুরীয়ানন্দের ব্যবস্থা — অর্থাৎ, দ্রুত কুচকাওয়াজ-করে-চলা বাহিনীর পাশে-পাশে লাফিয়ে-লাফিয়ে চলার পরম অধিকার, কখনও-বা কোনো বাচ্চা ছেলের হাত থেকে ছোট্ট, ভাঙা ডাল ছিনিয়ে নেয়া, আবার কখনও গলায় ঝলমলে রঙিন ফিতে ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ানোর পুরস্কার-প্রাপ্তিযোগ পর্যন্ত। এমন কি খামারবাড়িগুলোর শ্বাপদ চৌকিদারদের চেন-বাঁধা প্রতিনিধিগুলো পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতক বনে গেল, বিশেষ করে তাদের আক্রমণাত্মক হৈ-চৈয়ের প্রধান লক্ষ্যবস্তুগুলো পরে আর না-থাকায় — অর্থাৎ, বসন্তের শুরু থেকেই ছেলেরা ট্রাউজার্স ছেড়ে শর্ট্‌স পরতে শুরু করায়। ট্রাউজার্সের চেয়ে শর্ট্‌স বেশি স্বাস্থ্যকর, দেখতেও ভালো আর দামেও কম ছিল, তাই।

কুকুরদের দলত্যাগের দরুন খামারবাড়ির আশ্রিত-সমাজে যে-ভাঙন শুরু হল তা বেড়েই চলল দিনের-পর-দিন, যতদিন-না 'কলোনি-কলমাক' পথকে সরল রেখায় রূপান্তরিত করার পথে সকল বাধা-বিপত্তি গেল ধূলিসাৎ হয়ে। প্রথমে দশ থেকে ষোলো বছর বয়ঃসীমার মধ্যে খামারবাড়িগুলোর যত সব আন্দ্রেই, নিকিতা, নিচিপর আর মিকোলা আমাদের পক্ষে চলে এল। জীবনের রোমান্টিক দিক আর কলোনির কাজকর্ম ওই ছেলেদের আকৃষ্ট করেছিল। অনেক দিন থেকেই ওরা আমাদের বিউগ্‌লের ডাক শুনছিল আর মস্ত এক আনন্দমুখর যৌথ-জীবনের অবর্ণনীয় আকর্ষণ অনুভব করছিল মনে-মনে। আর তার পরে 'মিশ্র বাহিনী', 'দলপতি'

আর সবচেয়ে নিদারুণ ব্যাপার 'রিপোর্ট করা'-র মতো উন্নততর মানবিক ক্রিয়াকলাপের সব কটি দৃশ্য তারা ভক্তিতে শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে হাঁ-করে তাকিয়ে দেখত। ওদের বাড়ির বয়স্ক লোকেরাও আমাদের চাষবাসের নতুন পদ্ধতিতে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল — পর্যায়ক্রমিক ফসল ফলানোর খের্সন-পদ্ধতিই শুধু নয়, আমাদের ফসলভরা মাঠ, এমন কি আমাদের বীজবোনা-যন্ত্র পর্যন্ত শুধু ছেলেদের নয় তাদের বাপেদেরও আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোনো-না-কোনো খামারবাড়ি থেকে এক-আধটি বাচ্চা বন্ধুর নিজেদের ফসল-ঝাড়াই গুদাম থেকে চুপিসারে-সরানো নিড়ানি বা কোদাল-হাতে এসে যোগ দেয়াটা প্রতিটি মিশ্র বাহিনীর ক্ষেত্রে একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন। সন্ধেবেলাতেও ওই ছেলেরা এসে জড় হয়ে যেত কলোনিতে, প্রায় আমাদের অজান্তেই কেমন করে যেন ওরা কলোনির অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। আর তখন চোখ দেখলে টের পাওয়া যেত কলোনির সদস্য হওয়াটা সারা জীবনের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে ওদের। পরে অবশ্য ওদের মধ্যে কারো-কারো এই স্বপ্ন সফল হয়েছিল, যখন পরিবার, দৈনন্দিন জীবন, কিংবা ধর্মের মধ্যে নিহিত মতদ্বৈধ ও সংঘর্ষের কারণে তারা বাপ-মায়ের কোল ছেড়ে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল।

খামারবাড়িগুলোর এই ভাঙনের পালা শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ করে দিল দুনিয়ার সবচেয়ে জোরালো শক্তিটি — ওই সব বাড়ির অল্পবয়সী মেয়েরা কলোনির খালি-পা, চট্পটে, হাসিখুশি, মার্জিতরুচি ছেলেদের আকর্ষণ বেশিদিন উপেক্ষা করতে পারল না। পুরুষজাতের স্থানীয় অল্পবয়সী প্রতিনিধিদের এমন কোনো বিশেষ গুণ ছিল না যা দিয়ে ওই আকর্ষণকে দাবিয়ে রাখা চলত। বিশেষ করে কলোনির ছেলেরা কুমারী মেয়েদের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ নিতে ব্যস্ত হয়ে না-পড়ায়, মেয়েদের পিঠের দুই পাখনার মাঝখানে মৃদু চড়-চাপড় দেয়ায় মনোযোগী না-হওয়ায় এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হস্তার্পণ বা জোর-জবরদস্তি না-করায় আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমাদের বড় ছেলেরাও ইতিমধ্যে 'রাব্ফাক' বা 'কমসমোল-এ ভর্তির কাছাকাছি বয়সে পেঁছে যাওয়ায় এ-ব্যাপারে মার্জিত সৌজন্য-প্রদর্শন আর আগ্রহ-উদ্দীপক কথাবার্তার আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব তারা অনুভব করতে শুরু করেছিল।

খামারবাড়ির মেয়েদের এই আকর্ষণ তখনও পর্যন্ত অন্ধ মোহের রূপ

নেয় নি। কলোনির মেয়েদেরও ওরা পছন্দ করছিল, কারণ বুদ্ধিমতী আর 'শহুরে' মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও প্রথমোক্ত মেয়েরা চাল-চালিয়াতির ধার ধারত না। প্রেমে পড়ার ব্যাপারটা এরও অল্প কিছু পরে ঘটেছিল। গাঁয়ের মেয়েরা আমাদের ছেলেদের মধ্যে 'মিলনের পূর্বনির্দিষ্ট দিনক্ষণ' স্থির করা কিংবা রাতের পাপিয়া-কূজন যত-না খুঁজত তার চেয়ে বেশি করে খুঁজত নতুন সামাজিক মূল্যবোধ। আর তাই ক্রমশ ঘনঘন তারা দল বেঁধে কলোনিতে আসছিল। তখনও পর্যন্ত একা আসার সাহস ছিল না বলে সদলবলে এসে বেঞ্চিগুলোয় সার-বেঁধে বসে থাকত আর যত রকমের অভিনব ব্যাপার-স্যাপার নিঃশব্দে বসে-বসে হজম করত। কিংবা ঘরের ভেতরে বা বাইরে সূর্যমুখীর বীজ খুঁটে-খুঁটে খাওয়া বারণ থাকার জন্যেই কি তারা হতচকিত হয়ে থাকত? কে জানে! আমাদের কান্ড-কারখানার প্রতি তরুণ ছেলেমেয়েদের সহানুভূতির কারণে ঘরবাড়ির ডালপালার বেড়া আর গেট আগের মতো মালিকদের কাজে আসছিল না - অর্থাৎ, ব্যক্তি মালিকানা-যে অলঙ্ঘনীয় তার হুঁশিয়ারী হিসেবে ওগুলো আর কার্যকর হচ্ছিল না আর-কি। অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের ছেলেরা এত দুঃসাহসী হয়ে উঠল যে বেড়া-টপকানো যে-সব জায়গায় সবচেয়ে কষ্টকর সেই সব জায়গার জন্যে তারা একধরনের সিঁড়ি পর্যন্ত বানিয়ে ফেলল। যানবাহনের এ-ধরনের উৎকৃষ্ট পদ্ধতির ব্যবহার বোধহয় রুশদেশের আর কোথাও দেখা যায় নি। পদ্ধতিটা আর কিছুই নয়, ডালপালার বেড়ার মধ্যে দিয়ে সরু একখানা কাঠের তক্তা চালান করে আর বেড়ার দু-দিকে দুটো খোঁটা পুঁতে তার ওপর ঠেস দিয়ে তক্তাখানাকে উঁচু-করে-রাখা।

কলমাক-কলোনি শড়ককে সরলরেখায় পরিণত করা হল খামারিদের ফসল কিছু পরিমাণে নষ্ট করার মধ্যে দিয়েও — এই অন্যায় স্বীকার না-করে উপায় নেই। তবে ১৯২৩ সালের বসন্তঋতু লাগাদ এই শড়কটি যে চেহারা নিয়েছিল তার সঙ্গে কোনো-না-কোনো দিক থেকে অক্টোবর রেলপথ*-এর তুলনা টানা চলতে পারত। এই শড়কের দৌলতে আমাদের মিশ্র বাহিনীগুলোর কাজকর্মে ভারি সুবিধে হল।

* অক্টোবর রেলপথ — এই রেলপথটি কোথাও কোনো বাঁক না-নিয়ে সটান সোজা মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদ চলে গেছে। — **অনুঃ**

মিশ্র বাহিনীগুলোকেই প্রথম দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হোত। দুপুর বারোটা-কুড়ি লাগাদ প্রথম মিশ্র বাহিনী খাওয়া শেষ করে ফের কাজে যাত্রা করত। যাত্রার সময় বাহিনীর দলপতির হাতে সেদিনকার কলোনির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকা একখানি কাগজ ধরিয়ে দিতেন যাতে প্রয়োজনীয় সবকিছু খুঁটিনাটি নির্দেশ লেখা থাকত। যেমন, বাহিনীটির সূচক সংখ্যা, বাহিনী-সদস্যদের নামের তালিকা, দলপতির নাম, কী কাজ করতে হবে তার নির্দেশ এবং কাজের নির্ধারিত সময়। এই সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে শেরে আবার উচ্চতর গণিতের আঁকজোক ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, ফলে কাজটা একেবারে নিক্তির ওজনে মেপে শেষ রতি পর্যন্ত হিসেব করে দেয়া হোত।

দ্রুত পা চালিয়ে চলে যেত মিশ্র বাহিনীটি, আর মিনিট পাঁচ-ছয়েকের মধ্যে দেখা যেত মাঠের বহুদূর দিয়ে সার বেঁধে বাহিনী চলেছে। আর তারপরেই লাফ দিয়ে ডালপালার একটা বেড়া ডিঙিয়ে কুঁড়েঘরগুলোর আড়ালে যেত অদৃশ্য হয়ে। এর পরে-পরেই — অর্থাৎ কলোনির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকা আগের বাহিনীর দলপতির সঙ্গে কতক্ষণ কথা বললেন সেই অনুযায়ী দূরত্ব বজায় রেখে — এসে পড়ত দ্বিতীয় বাহিনীটি: তৃতীয় 'কে', কিংবা হয়তো তৃতীয় 'সি' সংখ্যক বাহিনী। অল্প সময়ের মধ্যেই সারা মাঠের মানচিত্রটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেত আমাদের বাহিনীগুলোর সারি-বাঁধা লাইন দিয়ে। আর দেখা যেত মাটির নিচের ঠান্ডা ঘরের অল্প-উঁচু ছাদের ওপর বসে তোস্‌কা ততক্ষণে রিন্‌রিনে গলায় চেঁচাতে শুরু করে দিয়েছে:

'একের 'বি' আসত্যেছে! একের 'বি' আসত্যেছে!'

আর সত্যিই তখন দেখা যেত প্রথম 'বি' বাহিনীটা আসছে, খামারবাড়িগুলোর ডালপালার বেড়ার ফাঁকে-ফাঁকে দেখা যাচ্ছে সারি-বেঁধে-আসা ছেলেদের। প্রথম 'বি' সংখ্যক বাহিনীর কাজ ছিল সব সময়েই জমিতে লাঙল দেয়া আর বীজ বোনা। অর্থাৎ, সাধারণভাবে বলতে গেলে ঘোড়ার সাহায্যে কাজ করা। ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘর ছেড়ে যেত এই বাহিনী, সঙ্গে যেত দলপতি বেলুখিন। ঠান্ডা-ঘরের ছাদে সুবিধাজনক উঁচু জায়গায় বসে এই বেলুখিনকেই দূর থেকে চিনে বের করার জন্যে তোস্‌কা অপেক্ষা করে থাকত। এর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছ-জন সদস্য নিয়ে প্রথম 'বি' বাহিনী কলোনির উঠোনে এসে হাজির হয়ে যেত। বাহিনীর ছেলেরা যখন বনের

মধ্যে টেবিলের পাশে বসে থাকত বেলুখিন তখন কলোনির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকার হাতে তার রিপোর্টের কাগজখানা দিত। কাগজখানায় বাহিনীর কাজে উপস্থিতি ও কাজ শেষ করার সময়-লেখা জায়গাটায় রাদিম্‌চিকের অনুমোদনজ্ঞাপক সই থাকত।

আমাদের বেলুখিনকে সব সময়ে দেখা যেত খোশ-মেজাজে। সেদিন ও বলল:

'কাজে পেঁছুতি মিনিট পাঁচেক দেরি হয়্যে গিয়্যেল বোঝলেন। নৌবাহিনীর দোষে আর-কি। আমরা কাজে যাতি চাচ্ছিলাম, তা মিত্‌কা কিছুতিই শোনল না, সে তখন জনা-কয়েক ফাট্‌কাবাজরে খেয়া পার করত্যেছিল।'

শুনে কলোনির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফাট্‌কাবাজরা আবার কারা?'

'জানেন না বুঝি? অরা তো আমাদের ফলের বাগান জমা নিতি এয়্যেছে।'

'সত্যি?'

'তাইলে আর বলি কী! তা, আমি অদেরে নদীর পাড় থ্যেকে আর উদিকে যাতি দিই নাই। কলাম, 'কী মনে ভাব্যেছেন আপনেরা — আপনেরা মজা করি আপেল চিবাবেন আর আমরা বুঝি তাকায়্যে-তাকায়্যে দ্যাখব, না? যান, যান, নাগরিক-ভাইয়েরা, খেয়া পার হয়্যে ফিরি যান দেখি!..' এই-যে, আন্তন সেমিওনভিচ — কী খবর বলেন দেখি?'

'কী খবর, মাত্‌ভেই!'

'আচ্ছা, ভগমানের দোহাই, আমারে কন দেখি -- কখন ওই রাদিম্‌চিকেরে কলোনি থ্যেকে খেদায়্যে দিতি পারা যাবে? বোঝলেন, আন্তন সেমিওনভিচ, সত্যি এডা লজ্জার কথা! অমন এট্টা লোক কলোনিতি ঘুর্‌্যে বেড়াত্যেছে, আর সবারই মন-মেজাজ খারাপ করি দিত্যেছে। বোঝলেন-না? লোকের কাজকম্মো করার ইচ্ছা পের্‌যন্ত নষ্ট করি দ্যায় লোকডা। আমারে আবার অর কাছিই রিপোর্ট সই-সাবুদ করাতি নিয়্যে যাতি হয়। তা, কিসির জন্যি, শুনি?'

এই রাদিম্‌চিক লোকটি কলোনি-বাসিন্দাদের সকলের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নতুন কলোনিতে ততদিনে জনা-কুড়িকের বেশি ছেলে বাস করতে শুরু করেছিল, সেখানে কাজও ছিল তাছাড়া বাড়তি লোকেরও দরকার ছিল কিছু। শেরে কেবল আদি কলোনির মিশ্র বাহিনীগুলির সাহায্যে আবাদের কাজ চালাচ্ছিলেন মাত্র। আস্তাবল, গোশালা, ক্রমশ বড়-হয়ে-ওঠা শুয়োরের খোঁয়াড়, ইত্যাদির তত্ত্বতল্লাস করত সেই ছেলেরা যারা ওখানে থাকত। নতুন কলোনিতে ফলের বাগানটাকে ঠিকঠাক করে নিতেও প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ফলের বাগানে জমির পরিমাণ ছিল চার দেসিয়াতিনা, চমৎকার কচি-কচি তাজা গাছে ভরতি ছিল বাগানটা। ব্যাপকভাবে বাগানে কাজ শুরু করেছিলেন শেরে। সারা বাগানের জমি চষা, গাছ-পালার ডাল ছাঁটা ও গাছগুলোকে হালকা করে তোলা, কালো ক্যারান্ট-ফলের মস্ত বড় খেতের আগাছা নিড়নো, খেতের মধ্যে পায়ে-চলার পথ বানানো, ফুলের কেয়ারিতে মাটি খোঁড়া — এ-সবই করতে হচ্ছিল। বসন্তঋতুতে আমাদের নতুন-তৈরি হট্‌হাউস থেকে প্রথম ফসল পাওয়া গেল। এছাড়া নদীর পাড়ে আর জলের কিনারেও অনেক কাজ চলছিল তখন — যেমন, নদী থেকে খাল কেটে আনা, শরবন কেটে পরিষ্কার করা, ইত্যাদি।

ব্রেপ্‌কে তালুকে মেরামতির কাজ শেষ হয়ে আসছিল। ফাঁপা কংক্রিটে-তৈরি আস্তাবলটার ভাঙা ছাদও আর বিরক্তির কারণ হচ্ছিল না — কারণ, ছাদঢাকা মোটা কাগজ দিয়ে ওটাকে ঢেকে দেয়া হয়েছিল, আর ভেতরে ছুতোর-মিস্ত্রিরা শেষ করে আনছিল খোঁয়াড় তৈরির কাজ। শেরের হিসেব অনুযায়ী ওই খোঁয়াড়টায় অন্তত শ-দেড়েক শুয়োর ধরার কথা ছিল।

তবু নতুন কলোনিতে জীবনযাত্রা খুব লোভনীয় ছিল না, বিশেষ করে শীতকালে তো বটেই। পুরনো কলোনিতে আমাদের কম-বেশি মন বসে গিয়েছিল, তাছাড়া সবকিছুই সেখানে এমন সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত ছিল যে ঠান্ডা কনকনে ইটের দালানগুলো আর দৈনন্দিন জীবনে শ্রী-সৌষ্ঠবের অভাব আমাদের বড়-একটা নজরে পড়ত না। একেবারে গাণিতিক শৃঙ্খলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আর প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে নিখুঁত পারিপাট্য সৌন্দর্যের অভাব কিছুটা পূরণ করে দিচ্ছিল।

কিন্তু কলমাক নদীর বাঁকের মাথায় বন্য সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে থাকা সত্ত্বেও, নদীর দুই খাড়াই পাড়, ফলের বাগান, বড়-বড় সুন্দর দালান-ওয়ালা নতুন কলোনি তখনও পর্যন্ত ধ্বংসাবশেষের বিশৃঙ্খলা থেকে

নিজেকে মুক্ত করতে পারে নি। তখনও পর্যন্ত এখানে-ওখানে ছড়ানো ছিল পুরনো দালানের ভাঙাচোরা ইট-কাঠের স্তূপ, জমির এখানে-ওখানে চুনের ভাটির গর্ত আর সবকিছু এমন লম্বা-লম্বা আগাছায়-ভরা যে একেক সময় আমার মনে হোত ওই আগাছার হাত থেকে বুঝি কোনোদিনই আমাদের মুক্তি নেই।

নতুন কলোনিতে কোনো কিছুই তখনও পর্যন্ত সত্যি-সত্যি বসবাসের উপযোগী হয়ে ওঠে নি — যেমন, এজমালি শোবার ঘরগুলো ভালো হলে হবে কী, উপযুক্ত রান্নাঘর কি খাবার ঘর তখনও তৈরি হয়ে ওঠে নি। আর তারপর রান্নাঘর যখন মোটামুটি তৈরি হয়ে গেল, তখন দেখা গেল খাবার রাখার ঘরখানা তৈরি হয় নি। উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে সমস্ত ব্যাপারটায় অসুবিধে ঘটছিল সবচেয়ে বেশি — নতুন কলোনিতে সবকিছু চালু করে দেয়ার মতো লোক কেউ ছিল না।

আর এর ফলে কলোনির সদস্যদের মধ্যে নতুন কলোনিতে গিয়ে বসবাসের ইচ্ছে বিন্দুমাত্র দেখা যাচ্ছিল না, অথচ তারাই অমন আগ্রহ আর উদ্দীপনা নিয়ে নতুন কলোনি পুনরুদ্ধারের বিরাট দায়িত্ব কাঁধে তুলে তা নিষ্পন্নও করছিল। প্রতিদিন কুড়ি কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে দুই কলোনির মধ্যে যাতায়াত করতে আর পর্যাপ্ত খাবার আর ঘুমের অভাব সহ্য করতেও রাজি ছিল ব্রাত্‌চেঙ্কো, তবু নতুন কলোনিতে গিয়ে থাকাটা তার কাছে লজ্জাকর মনে হচ্ছিল। এমন কি অসাদ্‌চি পর্যন্ত একদিন বলে বসল:

'আমি বরং কলোনি ছাড়্যে যাব সে-ও স্বীকার, তবু ত্রেপ্‌কেয় গিয়ি থাকত্যে পারব না।'

পুরনো কলোনিতে অপেক্ষাকৃত প্রাণবন্ত যে-সব ছেলে ছিল ইতিমধ্যে তারা এমন একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল যে রীতিমতো মনে আঘাত না-দিয়ে তাদের একজনকেও অন্যদের থেকে তফাত করা সম্ভব হচ্ছিল না। আবার পুরো গোষ্ঠীটাকে নতুন কলোনিতে স্থানান্তরিত করার অর্থ ছিল একই সঙ্গে নতুন কলোনিসহ ওই ছেলেদের সব কটিকে হারানোর সম্ভাবনা মেনে নেয়া। ছেলেরা নিজেরাও এটা খুব ভালো করেই বুঝত।

কারাবানভ বলত, 'আমাদের ছোঁড়ার ভালো ঘোড়ার জাত আর-কি। ধরেন ক্যানে, বুরুনের মতন ছোঁড়ারে জোয়ালে ঠিকমতন জুত্যে হেট-হেট

করো ঠিক পথে যদি চালান যায় তাইলে ও চমৎকার চলব্যে, এমন কি রীতিমতন কেরামতিই দেখাব্যে, কিন্তু অরে নিজির ইচ্ছামাফিক চলতি দ্যান, দ্যাখবেন ও নিঘ্‌ঘাত খাড়াই রাস্তায় হুড়মুড় করো ছুট্যে নিচি গিয়ি পড়ব্যে, নিজির ঘাড়ও ভাঙব্যে, গাড়িখানও চুরমার করব্যে।'

আর ঠিক এই কারণেই নতুন কলোনিতে সম্পূর্ণ আলাদা এক মেজাজ আর মূল্যবোধ নিয়ে আরেক ধরনের যৌথ-জীবন গড়ে উঠতে শুরু করল। যে-সব ছেলে ওখানে থাকছিল পুরনো কলোনির উপরোক্ত ছেলেদের মতো তারা না-ছিল অত প্রাণবন্ত, না-অত কর্মচঞ্চল, তাদের বাগ-মানানোও অত শক্ত ছিল না। ওখানকার সমগ্র যৌথ-জীবনবিন্যাসটার মধ্যেই কেমন-যেন একটা কাঁচামির ভাব থেকে গিয়েছিল — এটা ছিল প্রথাসিদ্ধ শিক্ষা-বিজ্ঞানের ধারা অনুসরণ করে নির্বাচন করার ফল।

যদি ওখানে তখন কোনো কৌতূহলোদ্দীপক চন্‌মনে ছেলে গিয়েও থাকত — যেমন, একেবারে বাচ্চাদের মধ্যে থেকে সবে একটু বড় হয়ে উঠেছে এমন, কিংবা নতুন আগন্তুক দলের মধ্যে থেকে অপ্রত্যাশিত কেউ — তাহলেও তার বা তাদের উপস্থিতি টের পাওয়ার মতো সময় আসে নি তখনও এবং তারা হারিয়ে গিয়েছিল ত্রেপ্‌কে-বাসিন্দাদের মামুলি ভিড়ে।

সমগ্রভাবে দেখতে গেলে ত্রেপ্‌কের বাসিন্দারা এমনই ছিল যে তারা ক্রমশ বেশি-বেশি আমাকে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আর অন্যান্য কলোনি-বাসিন্দাদের হতাশ করে তুলছিল। ওখানকার ছেলেরা হয়ে উঠেছিল অলস আর নোংরা-স্বভাবের, এমন কি ভিক্ষে করার মতো মারাত্মক পাপ করতেও তারা কুণ্ঠিত ছিল না। পুরনো কলোনি সম্পর্কে তাদের মনে ঈর্ষারও সঞ্চার হোত বেশ — দুপুরের আর রাত্রের খাবার পুরনো কলোনিতে কী-কী দেয়া হয় তা নিয়ে আজগবি সব গালগপ্পোও চালু হয়েছিল ওদের মধ্যে, আদি কলোনির ভাঁড়ারে কোন্‌-কোন্‌ জিনিস আনা হয়েছে আর সে-সব জিনিস ওদের জন্যে আনা হয় নি কেন তা নিয়েও জল্পনা-কল্পনার শেষ ছিল না। কিন্তু এ-নিয়ে খোলাখুলি কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানানোরও মুরোদ ছিল না, ওরা খালি পারত ঘরের কোণে জড় হয়ে গোমড়া-মুখে কানাকানি করতে আর আমাদের সরকারি প্রতিনিধির ওপর চোটপাট করে মনের ঝাল মেটাতে।

আদি কলোনির ছেলেরা ইতিমধ্যেই ত্রেপ্‌কের বাসিন্দাদের সম্পর্কে

কিছুটা অবজ্ঞা আর ঘৃণার ভাব ব্যক্ত করতে শুরু করেছিল। মাঝে-মাঝে দেখা যেত, জাদোরভ কিংবা ভোলখভ নতুন কলোনি থেকে ওইরকম ছিঁচকাঁদুনে কাউকে ধরে এনে পুরনো কলোনির রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলছে:

'এই উপসী ছারপোকাটাকে ভালো করে খাওয়াও দেখি একপেট।'

'উপসী ছারপোকা' অবশ্য মিথ্যে আত্মম্ভরিতার বশে খেতে মোটেই রাজি হোত না তখন। আসলে, সত্যি কথা বলতে কি, নতুন কলোনির ছেলেরাই বরং অপেক্ষাকৃত ভালো খেতে পেত। আমাদের সব্জি-বাগানটা ছিল নতুন কলোনিরই কাছে, তাছাড়া ময়দা-পেষাই কল থেকেও এটা-ওটা কিনতে পারত ওরা, তদুপরি আমাদের নিজেদের গোরুগুলোও থাকত নতুন কলোনিতে। গোরুর দুধটা পুরোপুরি পেত ওরাই, কারণ পুরনো কলোনিতে দুধ পাঠানোর অসুবিধে ছিল: অতখানি দূর বলেও যেমন বাধা ছিল, তেমনই এ-কাজে লাগানোর মতো বাড়তি ঘোড়াও পাওয়া সম্ভব ছিল না কখনও।

ফলে, কিছুতেই-মন-ওঠে-না এমন ছিঁচকাঁদুনে ছেলেদের আর ফাঁকিবাজদের একটা যৌথ গড়ে উঠল নতুন কলোনিতে। আগেই বলা হয়েছে, এর জন্যে অনেকগুলো ব্যাপারই দায়ী ছিল, তার মধ্যে প্রধান ছিল ছেলেদের মধ্যে থেকে সত্যিকার একটা চালক-কেন্দ্র গড়ে তোলার মতো উপযুক্ত ছেলেপিলের অভাব আর শিক্ষকদের পক্ষ থেকে সন্তোষজনক কাজ না-করা।

এমনিতেই শিক্ষকরা আমাদের কলোনিতে কাজ করতে আসতে চাইতেন না। কারণ, মাইনে ছিল যৎসামান্য, কাজটাও ছিল কঠিন পরিশ্রমসাধ্য। তদুপরি, জনশিক্ষা-দপ্তর নতুন কলোনিতে কাজ করার জন্যে যেমন-যেমন লোক হাতের কাছে পেয়েছিল তাদেরই দিয়েছিল পাঠিয়ে — আর এরা ছিল রদিম্‌চিক ও তার পরে দেরিউচেঙ্কোর মতো লোক। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে হাজির হয়ে তারা কলোনির সবচেয়ে ভালো ঘরগুলো দখল করে বসেছিল। আমি এতে কোনো প্রতিবাদ করি নি, তার কারণ এমন কি এ-ধরনের লোকও-যে শেষপর্যন্ত পাওয়া গেছে সেজন্যে সত্যিই কৃতজ্ঞ ছিলুম।

দেরিউচেঙ্কো ছিল টেলিগ্রাফ-পোস্টের মতো ধরাছোঁয়ার মধ্যে, দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। এক-নজরেই ঠাহর হোত, দেরিউচেঙ্কো পেত্‌লিউরার

অনুসারকের একটি আদর্শ নমুনা। সে বলত, রুশভাষা 'জানতাম না'। কলোনির সব ক-খানা ঘর সে শেভ্‌চেঙ্কোর ছাপানো শস্তা ছবি দিয়ে ভরিয়ে ফেলেছিল। আর আসার পরেই কোমর বেঁধে লেগে গেল এমন একটা কাজে একমাত্র যে-কাজটাই সে জানত, তা হল ইউক্রেনীয় গান গাওয়া।

তখনও যুবক বলা চলত দেরিউচেঙ্কোকে। ইউক্রেনীয় জাতীয় পোশাকে যেমন ছাপা দেখা যায় তেমনই তাসের চিড়িতনের গোলামের মতো ওর দেহের সবকিছুই ছিল কোঁকড়ানো। গোঁফজোড়া কোঁকড়া, মাথার চুল কোঁকড়া, এমন কি এমব্রয়ডারি-করা ওর ইউক্রেনীয় কামিজের খাড়া কলারে জড়িয়ে-বাঁধা নেকটাইটা পর্যন্ত ছিল কোঁকড়ানো। আর এ-ধরনের একজন মানুষকে কিনা করতে হচ্ছিল এমন সব কাজ যার সঙ্গে 'মহান ইউক্রেনের সুমহান লক্ষ্য'-এর কোনো সম্পর্কই ছিল না। যথা, কলোনির তদারকির দায়িত্ব নেয়া, শুয়োরের খোঁয়াড় পরিদর্শনে মাঝে-মাঝে হাজিরা দেয়া, মিশ্র বাহিনীগুলো যথাসময়ে কাজে আসছে কিনা তার তত্ত্বাবধান করা, আর যেদিন তার ওপর কাজের তদারকির দায়িত্ব থাকত সেদিন ছেলেদের পাশাপাশি কাজে হাত লাগানো। ছি, ছি, কী লজ্জা! দেরিউচেঙ্কোর চোখে এ-সমস্তই ছিল অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়, আর গোটা কলোনিটাই একেবারে একটা তুচ্ছ ব্যাপার — কেননা, বিশ্ববিপ্লবের সঙ্গে কলোনির সামান্যতম সম্পর্কও ছিল না।

কলোনির কাজে রদিম্‌চিক ছিল দেরিউচেঙ্কোর মতো অতখানিই অপ্রয়োজনীয়, এমন কি বলা যায় দেরিউচেঙ্কোর চেয়ে আরও বেশি অশ্রদ্ধার পাত্র...

রদিম্‌চিক এ-দুনিয়ায় কাটিয়ে দিয়েছিল তিরিশ-তিরিশটা বছর। কলোনিতে আসবার আগে অনেক-রকমের কাজ করে এসেছিল সে — যেমন, অপরাধ-তদন্ত দপ্তরে, নানা জাতের সমবায় সমিতিতে, রেলওয়ে দপ্তরে, ইত্যাদি — অবশেষে শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে মাথা গলিয়েছিল শিশু-সদনগুলোয়। লাল টকটকে, নানারকম ভাঁজ আর বলিরেখায়-ভরা ওর মুখখানা মনে করিয়ে দিত পুরনো চামড়ার থলির কথা। কোঁচকানো, রক্তবর্ণ মুখখানায় চ্যাপটা, কোঁকড়ানো নাকটা বেঁকে থাকত পাশের দিকে, আর কানদুটো ছিল চাপা, ফোলা-ফোলা মরা মাংসর ভাঁজ যেন, সেঁটে থাকত মাথার দু-পাশে। ওর হাঁ-মুখটা ছিল কেমন তেরছামতো — দেখলে

মনে হোত দীর্ঘ দিনের ব্যবহারে আর অযত্নে ঠোঁটদ্বটো ব্বঝি জীর্ণ আর এবড়োখেবড়ো হয়ে গেছে, এমন কি ফেটেও গেছে কয়েক জায়গায়।

কলোনিতে পেঁছিনোর পর সারিয়েসন্বরিয়ে নতুন-করে-তোলা একখানা ঘরে সপরিবারে জাঁকিয়ে স্থিতু হয়ে বসে সপ্তাহখানেক কাজ করল রদিম্চিক। তারপর হঠাৎ একদিন গেল সে অদৃশ্য হয়ে। যাবার আগে কেবল একখানা চিঠি লিখে আমায় জানিয়ে গেল যে একটা বিষম গ্বর্ত্বপূর্ণ কাজে যেতে হচ্ছে তাকে। এর দিন তিনেক বাদে খামারখোলার একখানা গাড়িতে চেপে ফিরল সে, সঙ্গে গাড়ির ল্যাজে বেঁধে নিয়ে এল জলজ্যান্ত একটা গোর্। আসার পরই ছেলেদের ওপর রদিম্চিকের হ্বকুম হল, আমাদের গোর্গ্বলোর সঙ্গে গোর্টাকে একই গোয়ালে রাখার। ঘটনার এই অপ্রত্যাশিত পরিণতি দেখে এমন কি আমাদের শেরেও যেন একটু ঘাবড়ে গেলেন।

এর দিন দ্বয়েকের ভেতরেই আমার কাছে নালিশ নিয়ে হাজির হয়ে গেল রদিম্চিক:

'এখানে কর্মচারিদের সাথে যে এমন ব্যাভার করা হয় তা আমি কল্পনাও করি নাই! মনে হয়, অরা ভুল্যে গ্যাছে যে প্বরানো দিনকাল আর নাই। অপর সকলের মতন আমার ছেল্যাপিলাদের আর আমার দ্বধ খাওয়ার সমান অধিকার আছে কি নাই? আমি-যে উয্বগ দেখালাম, সরকারি দ্বধের জন্যি অপেক্ষা না-কর্য়ে প্রাণপণ চেষ্টায় আমার সামান্য প্বঁজিপাটা ভাঙ্যে এট্টা গোর্ কিনি আনলাম, নিজিই-যে সেডারে কলোনিতি নিয়ি আলাম (এ-সবই তো আপনে জানেন, কী আর কব!) — তা, এ-সব তো বাহবা দিবার ব্যাপার, গালিগালাজের না। না কী বলেন? তা, আমার গোর্ডার প্রতি কেমন ব্যাভারডা করল সবাই দ্যাখলেন? কলোনিতি বেশ কয়ডা খড়ের গাদা আছে, তার উপরি ময়দা-কল থ্যেকে কম দামে তুষ, ভুষি, এই সবও পায়্যে থাকে কলোনি। আর কান্ডডা দ্যাখেন, সব কয়ডা গোর্বে জাবনা দেয়া হয়, ক্যাবল আমারডারে ছাড়া। তা, একথা বলতি গেলি ছেল্যারা তাড়্যে উঠি কয় কি — 'তাইলে তো পেত্যেকেরই গোর্ রাখলি চলে!' শ্বন্যেছেন কথাডা অদের! আর-সব গোর্বে ধোয়ামোছা হয়, ক্যাবল আমার গোর্ডারে পাঁচ দিন ধর্য়ে ছ্যান করান হয় না, নোংরা মাখ্যে পড়্যে আছে বেচারা। বোধকরি আমার ইস্তিরিরে নিজি গিয়্যে গোর্বে সাফ-স্বত্রো করা লাগব্যে। তা,

সে তাতেও রাজি ছেল, কিন্তু ছেল্যারা অরে কোদাল, কাঁটা, কিছুই দিতি চায় না, এমন কি বিছানার নিচি পাতবার জন্যি খড় পর্যন্ত না। খড়ের মতন সামান্য জিনিস নিয়ি যদি এমনধারা হুলুস্থুল কাণ্ড করা হয়, তাইলে কিন্তু আপনারে আমি সাবধান কর্যে দিচ্ছি, উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতি বাধ্য হব আমি। আমি এখন পার্টিতি নাই তো হয়্যেছেডা কী! এককালে তো পার্টিতি ছেলাম, আমার গোরুডার প্রতি ভালো ব্যাভার নিশ্চয়ই আশা করতি পারি।'

শূন্যচোখে, ফ্যালফ্যাল করে এই ব্যক্তিটির দিকে তাকিয়ে রইলুম। এর সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করা যায় তাজ্জব বনে গিয়ে সে-কথাই চিন্তা করতে লাগলুম আমি।

অবশেষে শুরু করলুম, 'কিছু মনে করবেন না, কমরেড রদিম্‌চিক, কিন্তু ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনার গোরুটা তো ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সেটাকে কী করে অন্য গোরুর সঙ্গে একত্র রাখা যায়? আর, তাছাড়া -- আপনি তো একজন শিক্ষক, নাকি? দেখুন তো, আপনার অধীন ছেলেদের চোখে নিজের অবস্থাটা কী করে তুলছেন!'

কিন্তু রদিম্‌চিকের বকবকানি থামবার নয়। সে বলে চলল:

'ক্যানে? আমি তো মাগনা কিছু চাচ্ছি না। জাবনার দাম, এমন কি ছেল্যাদের খাটুনির দাম পর্যন্ত আমি দিবার জন্যি তৈয়ের, অবশ্য দাম যদি খুব বেশি না-চায় তাইলি। আর দ্যাখেন, আমার আর বাচ্চাডার স্কটিশ গোল টুপিডা যখন চুরি হয়্যে গেল তখন তো কথাটি বলি নাই, যদিও আমি জানতাম ছেল্যাদেরই একজনা ওডা চুরি কর্যেছে।

কোনোরকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে শেরের কাছে পাঠিয়ে দিলুম। ইতিমধ্যে শেরের হতভম্ব ভাবটা কেটে গিয়েছিল। রদিম্‌চিকের নালিশ শোনামাত্র তিনি ওর গোরুটাকে গোয়াল থেকে বের করে দিলেন। এর অল্প কয়েকদিনের মধ্যে গোরুটা একেবারেই উধাও হয়ে গেল — গোরুর মালিক ওটাকে বিক্রি করে দিল বলেই মনে হল।

অতঃপর দু-সপ্তাহ কেটে গেল। কলোনির সাধারণ সভায় তারপর একদিন প্রশ্নটা তুলল ভোলখভ:

'এ-সকলের মানে কী? রদিম্‌চিক কলোনির সব্জি-বাগানে গিয়ি আলু

খংড়্যে তুল্যে নিত্যেছেন ক্যানে? আমাদের পাকশালে বলে আলু নাই, আর রদিম্‌চিক দিব্যি নিজির জন্যি আলু তোলত্যেছেন। নিজির জন্যি বাগানের আলু নেয়ার কী অধিকার আছে ওঁয়ার?'

অন্য ছেলেরাও ভোলখভকে সমর্থন করল। জাদোরভ বলল:

'আলুটা বড় কথা না। ওঁর পরিবার আছে — উপযুক্ত জায়গায় গিয়ে চাইলে কেউ ওঁর আলু নেয়ায় আপত্তি করত না। কিন্তু আমার প্রশ্ন — রদিম্‌চিকের একেবারেই এখানে থাকার দরকারটা কী? সারা দিন হয় উনি নিজের ঘরে বসে থাকেন, আর নয়তো গাঁয়ে চলে যান। এদিকে বাচ্চারা নোংরা হয়ে ভুত সেজে ঘুরে বেড়ায় ওঁর দেখা কখনই পাওয়া যায় না। যখনই ওঁর কাছে রিপোর্ট সই করাতে যাই, তখনই পাওয়া যায় না ওঁকে — শোনা যায়, উনি ঘুমোচ্ছেন, কিংবা খানা খাচ্ছেন, আর নয়তো ব্যস্ত আছেন — ফলে সব সময়েই অপেক্ষা করে থাকতে হয়। তাহলে, ওঁকে দিয়ে আমাদের কাজটা কী?'

'এখেনকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কীভাবে কাজ করা উচিত তা আমরা জানি,' তারানেত্‌স বলল। 'আর ওই রদিম্‌চিক! ওঁর কাজির ডিউটির দিনি মিশ্র বাহিনীর সাথে কাজির জায়গায় গিয়ি নিড়ানি-হাতে আধ-ঘণ্টাটাক খাড়ায়্যে থাক্যেই, ব্যস, তারপরই উনি বল্যে বসেন: 'আচ্ছা, একটু ঘুর্যে আসত্যেছি!' আর ওই যাওয়াই ওঁর সেদিনকার মতন শেষ-যাওয়া। এর ঘণ্টা দুই বাদে হয়তো দেখা যায় গাঁ থ্যেকে ঝোড়ায় করি নিজির পরিবারের জন্যি এটা-সেটা নিয়ি আসতিছেন।'

ছেলেদের কথা দিলুম, এর একটা হেস্তনেস্ত করবই। পরের দিন রদিম্‌চিককে আমার অফিস-ঘরে ডেকে পাঠালুম। ও এল সন্ধে লাগাদ। তারপর একটু নিরিবিলি হলে বকাঝকা শুরু করলুম ওকে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে থামিয়ে দিয়ে রাগে মুখে-ফেনা-তুলে ও আবার বকবকানি শুরু করে দিল:

'জানি, জানি, কে আপনের কাছে নালিশ কর্যেছে, এ কার কাজ। কে যে আমারে লেঙ্গি মারার চেষ্টা পাতিছে তা আমি ভালোই জানি — এ আর কেউ না, ওই জার্মান-ব্যাটা! ও লোকডা-যে কেমন ধাঁচির তা একটু খোঁজ করলি আপনে ভালো করতেন, আন্তন সেমিওনভিচ। লোকডারে আমি ভালোই চিন্যে গেছি — পয়সা দিয়িও আমার গোরুডার জন্যি খড় পালাম

না, তা কী করি — দেলাম গোর্ডা বেচ্যে। আমার ছেল্যাপিলারা দুধ পায় না বলি গাঁ থ্যেকে দুধ আনতি হয় আমারে। আর এখন আমারে জিজ্ঞাস করেন তো দেখি, শেরে তার 'মিলদ্'রে কী খাওয়ায়! অরে কী খাওয়ায় লোকডা — জানেন আপনে? না, জানেন না! কলোনির মুরগির জন্যি বরাদ্দ মকাইর দানা নিয়ি তা গুঁড়া করি মণ্ড তৈয়ের কর্যে 'মিলদ্'রে খাওয়ায় লোকডা! ভাবেন একবার, মকাইর দানা খাওয়ায়! নিজির হাতে মণ্ড মাখ্যেজুখ্যে কুত্তারে ও খাতি দেয়, আর এর জন্যি এক কোপেকও দাম দেয় না। তাছাড়া কুত্তাডা লুকোছাপা কর্যেও কলোনির মকাই-দানা মাগনা খায়্যে সারে। আর এ-সকলির সুযোগ নিত্যেছে লোকডা কৃষিবিৎ আর আপনের আস্থাভাজন বল্যে।'

জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি এত সব জানলেন কী করে?'

'দ্যাখেন, প্রমাণ ছাড়া আমি কখনও এমন কথা কই না। তেমন পাত্তরই নই আমি। এই-যে দ্যাখেন...'

ভেতরের পকেট থেকে ছোট একটা কাগজের মোড়ক বের করে সেটা খুলে ধরল ও। মোড়কের ভেতরে কালোয়-শাদায় মেশানো অদ্ভুত ধরনের একটা জিনিস রয়েছে দেখতে পেলুম।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলুম, 'এটা আবার কী?'

'আমি যা বলত্যেছি তার প্রমাণ। এতিই সব প্রমাণ হয়ে যাবে-নে। এয়া হল্য গিয়ে 'মিলদ্'-এর গু। কুত্তাডার গু, বোঝলেন নি? অনেক তক্কে-তক্কে থ্যেকে তবে পায়্যেছি এডা। দেখত্যেছেন, কুত্তাডার পায়খানায় কী আছে? আসল মকাই। আপনে কি মনে করেন ওয়া পয়সা দিয়ি কেনে? মোট্টেও না, ও স্রেফ ভাঁড়ার থ্যেকে উঠায়্যে নেয়, আর কিছু না।'

বললুম, 'দেখুন, রদিম্‌চিক, আপনি বরং কলোনি ছেড়ে চলে যান।'

'চল্যে যাব — তার মানে?'

'যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে যান। আজকের নির্দেশনামায় আমি আপনাকে বরখাস্ত করব। আপনি বরং স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র দিয়ে দিন, সেটাই ভালো হবে।'

'আমি মোট্টেও অত সহজে ছাড়ব্য না, জানবেন!'

'ঠিক আছে। ছাড়বেন না তো ছাড়বেন না — কিন্তু আমি আপনাকে বরখাস্ত করছি।'

শেষপর্যন্ত রদিম্‌চিক চলে গেল। 'অত সহজে'-ই ছেড়ে দিয়ে তিন দিনের মাথায় চলে গেল ও।

ভাবতে লাগল্মুম, নতুন কলোনিকে নিয়ে কী করা যায়? ত্রেপ্‌কের বাচ্চা বাসিন্দারা কলোনির যৌথ-জীবনের সদস্য হিসেবে বিগড়ে যাচ্ছিল, আর বেশিদিন তা কোনোক্রমেই সহ্য করা যাচ্ছিল না। ছেলেদের মধ্যে প্রায়-প্রায়ই মারামারি বাধছিল সেখানে, পরস্পরের জিনিসপত্র চুরি করছিল তারা — যৌথ-জীবনযাত্রায় কোথাও একটা গোলমাল ঘটছিল, এ-সবই ছিল তার অব্যর্থ লক্ষণ।

ভাবতে লাগল্মুম, এই মহা-ঝঞ্ঝাটের কাজের জন্যে লোক পাওয়া যাবে কোথায়? খ্মুঁজে পেতে হবে সত্যিকার সব মান্মুষ! অথচ কাজটা মোটেই অত সোজা না। দ্মুর হোক-গে ছাই!

## ২৭

## কম্‌সমোল-দ্মুর্গে হানা

১৯২৩ সালে গোর্কি-পন্থীদের নিয়মিত সৈন্যদল নতুন এক দ্মুর্গের সম্ম্মুখীন হল — সে দ্মুর্গ, কম্‌সমোল। কথাটা শ্মুনলে আজ আশ্চর্য ঠেকবে, তব্মু সেদিন আমাদের সেই দ্মুর্গ সবলে জয় করে নিতে হয়েছিল।

গোর্কি কলোনি কোনোদিনই বিচ্ছিন্ন একটা সংগঠন ছিল না। ১৯২১ সাল থেকেই তথাকথিত 'পারিপার্শ্বিক জনসাধারণ'-এর সঙ্গে আমাদের যোগস্মুত্র যেমন ছিল অত্যন্ত বিচিত্র তেমনই ব্যাপক। আমাদের সবচেয়ে নিকট-প্রতিবেশীরা অবশ্য সামাজিক ও ঐতিহাসিক উভয় কারণেই ছিল আমাদের শত্র্মু। তাদের বির্মুদ্ধে আমাদের সাধ্যান্মুযায়ী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল্মুম, তবে প্রধানত আমাদের কারখানাগ্মুলোর দৌলতে তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কও বজায় রেখে চলছিল্মুম। কলোনির অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিধি অবশ্য শত্র্মু-শিবিরের সীমানা ছাড়িয়ে আরও বহ্মুদ্মুর বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল, কারণ বেশ-একটা চওড়া ব্যাসার্ধের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগ্মুলোর জন্যে নানা কাজ করে যাচ্ছিল্মুম আমরা, শ্রমশিল্পের সেবার হাত

প্রসারিত করে স্তরজিভোয়ে, মাচুখি ও ব্রিগাদিরভ্কার মতো দ্‌র-দ্‌র অঞ্চলেও সে'ধিয়ে পড়েছিল্‌ম। ১৯২৩ সালের মধ্যে গন্‌চারোভ্‌কা, পিরগোভ্‌কা, আন্দ্রুশেভ্‌কা ও জাবিরালভ্‌কার মতো আমাদের সবচেয়ে কাছের বড়-বড় গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ পাকাপাকিভাবে গড়ে উঠেছিল, আর সে-যোগাযোগ শ্‌ধ্‌ অর্থনৈতিক সংযোগমাত্র ছিল না। আমাদের অভিযাত্রী বালক-নাবিকবীররা স্থানীয় রমণী-সৌন্দর্য অবলোকন, কিংবা কেশশয্যা, শারীর গঠন, আচার-আচরণ ও ম্‌দ্‌-মধ্‌র হাস্য-বিনিময়, ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অর্জিত বিদ্যার বহর প্রদর্শনের মতো সৌন্দর্যতাত্ত্বিক লক্ষ্যে প্রণোদিত হয়ে যে-প্রথম অভিযানগ্‌লি পরিচালনা করেছিল — পল্লী-জীবনের মহাসম্‌দ্রে এমন কি সেই প্রথম নৌ-যাত্রাগ্‌লির ফলেই গ্রামগ্‌লির সঙ্গে আমাদের সামাজিক বন্ধন বহ্‌দ্‌র বিস্ত্‌ত হয়ে পড়েছিল। আর, সঠিকভাবে বলতে গেলে, এই সব ঘটনার মধ্যে দিয়েই কলোনির সদস্যরা কম্‌সমোল-সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হবার স্‌যোগ পেয়েছিল প্রথম।

পরিমাণগত ও গ্‌ণগত, উভয় বিচারেই ওই গ্রামগ্‌লোয় কম্‌সমোল-বাহিনীর শক্তি ছিল অত্যন্ত দ্‌র্বল। গ্রাম-কম্‌সমোলগ্‌লো প্রধানত উৎসাহী ছিল মেয়েঘটিত ব্যাপারে আর মদ্যপানে, ফলে আমাদের ছেলেদের ওপর তাদের কু-প্রভাব পড়ত বেশির ভাগ সময়েই। একমাত্র যখন নতুন কলোনির বিপরীত দিকে, কলমাক নদীর ডানদিকের পাড় ঘে'সে, লেনিনের নামাঙ্কিত যৌথ কৃষি-আর্তেল সংগঠিত হতে শ্‌র্‌ করল এবং যখন ওই কৃষি-আর্তেল অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের গ্রাম-সোভিয়েত আর সমগ্র কুলাক-খামারীগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রবল শত্র্‌তায় জড়িয়ে পড়ল, তখনই কম্‌সমোলের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে একটা জঙ্গী মনোভাব আবিষ্কার করতে পেরে আর্তেলের তর্‌ণতর সদস্যদের সঙ্গে আমরা বন্ধ্‌ত্ব পাতাতে শ্‌র্‌ করল্‌ম। আমাদের ছেলেরা ওই কৃষি-আর্তেলের সমস্ত ব্যাপার, আর্তেল প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ওর সংগঠকরা যে-সমস্ত অস্‌বিধের সম্ম্‌খীন হচ্ছিল তার সবকিছ্‌, এমন কি নানা তুচ্ছ খ্‌'টিনাটি ব্যাপার পর্যন্ত, খ্‌ব ভালোভাবেই জানত। প্রথমেই ওই আর্তেল কুলাক-ভূখণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত হানল, ফলে খামারবাড়িগ্‌লোর বাসিন্দাদের মিলিত ও মারাত্মক বাধার সম্ম্‌খীন হতে হল তাদের। এই লড়াইয়ে আর্তেলের জয়লাভ বড় সহজ হয় নি।

ওই সময়ে খামারখোলাগ্‌লোর মালিকপক্ষ ছিল এক প্রবল শক্তি, শহরে

তাদের প্রভাবও ছিল বেশ-কিছুটা, অথচ কী কারণে জানি না তাদের মূলত কুলাক-চরিত্র বহু শহর-কর্তৃপক্ষেরই ছিল অজানা। আর্তেলের সঙ্গে কুলাক-খামারীদের লড়াইয়ে শহরের অফিস-বাড়িগুলো ছিল প্রধান রণক্ষেত্র, আর এই লড়াইয়ের প্রধান হাতিয়ার কলম, ফলে কলোনির সদস্যরা এ-লড়াইয়ে সরাসরি যোগ দিতে পারছিল না। কিন্তু যখন জমির পরিমাণের ব্যাপারটা নির্ধারিত হয়ে গেল এবং বিষয়-সম্পত্তির অতি জটিল ধরনের হিসেবনিকেশের সময় এল, তখন আমাদের ছেলেরা আর আর্তেলের অল্পবয়সী সদস্যরা উভয়পক্ষই আগ্রহোদ্দীপক প্রচুর কাজ খুঁজে পেল। আর এই কাজ করতে গিয়েই উভয়পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ উঠল আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে।

আর্তেলের কাজে কম্‌সমোলের ছেলেরা প্রধান ভূমিকা নিতে পারল না। আমাদের বড় ছেলেদের চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তি আর পড়াশুনোর মানের বিচারে তারা ছিল নিচুস্তরের। আমাদের ইশ্‌কুলের পড়াশুনো আমাদের সদস্যদের কাছে এক মস্ত সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এর ফলে তাদের রাজনৈতিক চেতনা গিয়েছিল অনেকখানি বেড়ে। কলোনির সদস্যরা গর্বভরে নিজেদের প্রলেতারীয় শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য করতে শুরু করেছিল, নিজেদের অবস্থানের সঙ্গে গাঁয়ের তরুণ ছেলেদের অবস্থানের পার্থক্য খুব ভালোভাবে বুঝে ফেলেছিল তারা। জমিতে কঠিন এবং প্রায়শই কষ্টকর কাজও তাদের এই দৃঢ়মূল ধারণাকে কিছুমাত্র বদলাতে পারে নি যে তাদের জন্যে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কাজ অপেক্ষা করে আছে।

কলোনির এই ছেলেদের মধ্যে বয়সে যারা ছিল সবচেয়ে বড় তারা তখনই ভবিষ্যৎ থেকে তাদের কী প্রত্যাশা এবং কী তাদের হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তা কিছুটা বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করতে পারছিল। আর তাদের এই সমস্ত স্বপ্নকে সুসংবদ্ধ রূপ দেয়ার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল গ্রামের নয়, শহরের যুবশক্তিই।

আমাদের রেলওয়ে স্টেশন থেকে অল্প দূরেই ছিল প্রকাণ্ড এক এঞ্জিন-মেরামতি কারখানা। ছেলেদের কাছে ওই কারখানার শেডগুলো ছিল দামি-দামি মানুষজন আর জিনিসপত্রের সবচেয়ে কাম্য এক সংগ্রহশালা। এঞ্জিন-মেরামতি কারখানাটার ছিল উজ্জ্বল বিপ্লবী ঐতিহ্য, কারখানায় এক শক্তিশালী পার্টি-যৌথেরও অস্তিত্ব ছিল। ছেলেরা এই কারখানার

শেডগুলোকে অলৌকিক কিছু একটা — হয়তো-বা এক পরীর প্রাসাদ — জ্ঞান করত। ওদের মতে ওই প্রাসাদে ছিল এমন কিছু যা চমৎকারিত্বে 'নীল পাখি' উপাখ্যানের মায়াময় আলোকিত স্তম্ভগুলোকেও ম্লান করে দিত — কেননা, ওখানে ছিল ক্রেনের জোরালো ঝাঁপাঝাঁপি, প্রবল শক্তিসম্পন্ন স্টিমচালিত হাতুড়ি, আর ছিল চুড়োর আকারের জটিল সব লেদ-মেশিন, যাদের কাজকর্ম দেখে মনে হোত বুঝি তারা মানুষের মতোই জটিল মস্তিষ্কের অধিকারী। আর ওই প্রাসাদের সর্বত্র ঘুরে বেড়াত মানুষ — প্রাসাদের সব মালিক — এদিক-সেদিক চলাফেরা করে বেড়াত সেই সব রাজ-পুত্তুর, ট্রেনের গ্রিজ্‌কালি-মাখা চক্‌চকে দামি-দামি পোশাক পরে আর ইস্পাত আর লোহার প্রাণমাতানো সুগন্ধে ভরপুর হয়ে। ওদের অধিকার ছিল প্রাসাদের সমস্ত ধনসম্পত্তিতে হাত দেয়ার, বেলন আর শঙ্কুর আকারের সব জিনিসপত্রের পবিত্র দেহে হাত ছোঁয়ানোর। ওরা নিজেরাই-যে ছিল বিশেষ জাতের মানুষ! খামারবাড়ির বাসিন্দাদের মতো আঁচড়ানো লাল দাড়ি আর মোটাসোটা, তেলতেলে মুখ পরীর প্রাসাদের মানুষজনের মধ্যে দেখা যেত না। তাদের মুখে মাখানো থাকত প্রাজ্ঞতা আর সূক্ষ্ম মার্জিত ভাব, জ্বলজ্বল করত সে-মুখ জ্ঞানে আর শক্তিতে — যন্ত্রপাতি আর এঞ্জিনের ওপর কর্তৃত্ব করার শক্তিতে, এঞ্জিন চালানোর জন্যে যে সুইচ, ডাণ্ডাবেড়ি, লিভার, স্টিয়ারিঙের চাকা, ইত্যাদি ব্যবহারের জটিল নিয়মকানুন জানতে হয় তার জ্ঞানের মহিমায়। আবার ওই প্রাসাদের লোকজনের মধ্যে ছিল কম্‌সমোলেরও অনেক সদস্য, যাদের অভিনব আর আশ্চর্য সব ভাবভঙ্গি, ধরনধারণ আমাদের শ্রদ্ধা না-কেড়ে পারত না। এদের মধ্যে লক্ষ্য করতুম আমরা প্রত্যয়ী খুশির ভাব, এদের মুখে শুনতে পেতুম শ্রমিকের জোরালো, ঝাঁঝালো রস-রসিকতার কথা।

এঞ্জিন-মেরামতি কারখানা! না-জানি সে কেমন জায়গা! ১৯২২ সালে আমাদের বহু ছেলের চরম আকাঙ্ক্ষা ছিল বড় হয়ে ওখানে কাজ করার। ওর চেয়ে আরও চমৎকার-চমৎকার সব মানুষের-হাতে-গড়া আজব সৃষ্টির কথাও কানে পেঁৗছেছিল তাদের — খার্‌কভ আর লেনিনগ্রাদের কল-কারখানা, রূপকথার গল্পের মতো পুতিলভ আর সোর্‌মভোর কারখানার কাহিনী। তা, ঠিক আছে — দুনিয়া তো কতই আজব কাণ্ডকারখানায় বোঝাই, মফস্বলের কলোনির সামান্য একজন সদস্যের স্বপ্ন কি অত উঁচুতে ওঠার

মতো পাখা মেলতে পারে! তবে ক্রমে-ক্রমে আমরা এঞ্জিন-মেরামতি কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে আরও একটু ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করলুম, নিজের চোখে কাছ থেকে তাঁদের দেখার, আমাদের সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁদের উপস্থিতির জাদু অনুভব করার সুযোগ ঘটে গেল আমাদের, এমন কি হাত দিয়ে ছোঁয়ার সুখ-অনুভবও বাদ গেল না।

ওঁরাই প্রথম আমাদের কাছে এলেন — ওঁরা মানে, ওঁদের কম্‌সমোলের সদস্যরা। এক রবিবার কারাবানভ ছুটে আমার অফিস-ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল:

'ইঞ্জিন-মেরামতি কারখানার কম্‌সমোলরা এস্যে গেছে! দারুণ ব্যাপার, তাই না?..'

কম্‌সমোল-সদস্যরা কলোনি সম্বন্ধে অনেক ভালো-ভালো কথা শুনে আসছিল, আর তাই এসেছিল আমাদের সঙ্গে পরিচয় করতে। ওরা দলে ছিল সাতজন। ছেলেরা ভিড় করে সাদরে ঘিরে ধরল ওদের, তারপর সারাটা দিন ঘনিষ্ঠ মেশামেশির মধ্যে দিয়ে ওদের সঙ্গে গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে কাটিয়ে দিল, নতুন কলোনি দেখাল, আমাদের ঘোড়া, আমাদের চাষের ও অন্যান্য কাজের যন্ত্রপাতি, আমাদের শুয়োর, হট্‌হাউস, শেরে, সবকিছুই ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাল; আর সারাক্ষণ মর্মে-মর্মে অনুভব করতে লাগল এঞ্জিন-মেরামতি কারখানার তুলনায় আমাদের এই ঐশ্বর্য কতখানি তাৎপর্যহীন। বিশেষ করে ওদের যেটা মুগ্ধ করল সেটা হল এই যে কম্‌সমোল-সদস্যরা আমাদের সঙ্গে চালিয়াতি করা, কিংবা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাওয়া দূরে থাক, সত্যি-সত্যিই যেন কিছুটা প্রভাবিত হল বলে মনে হল, এমন কি যা দেখল তাতে যেন ওদের মনে অল্প-একটু আবেগেরও ছোঁয়া লাগল।

শহরে ফিরে যাবার আগে কম্‌সমোল-সদস্যরা কথাবার্তা বলার জন্যে আমার কাছেও এল। ওরা জানতে চাইল, কলোনিতে আমাদের কোনো কম্‌সমোল-সংগঠন নেই কেন? এ-ব্যাপারে আমাদের করুণ অভিজ্ঞতার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলুম। জানালুম, ১৯২২ সাল থেকে কলোনিতে কম্‌সমোল-কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করে আসছি, কিন্তু স্থানীয় কম্‌সমোলের সদস্যরা এর বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে আসছে — বলছে, আমাদের কলোনি শিশু আর কিশোর অপরাধীদের জন্যে, কাজেই

এখানে কী করে কম্‌সমোল থাকতে পারে? সকল অনুরোধ-উপরোধ, যুক্তিতর্ক, কাকুতিমিনতির জবাবে এ-পর্যন্ত একটাই জবাব পেয়েছি আমরা — এ হবার নয়, কারণ আমাদের সদস্যরা সবাই শিশু বা কিশোর অপরাধী। ওরা বলছে, আগে ছেলেরা কলোনি ছেড়ে বেরিয়ে আসুক, সংশোধিত হয়েছে বলে আগে ওদের সার্টিফিকেট দেয়া হোক, ব্যক্তিগতভাবে কোনো-কোনো ছেলেকে কম্‌সমোলে নেয়া হবে কিনা তা নিয়ে একমাত্র তখনই আলোচনা করা যেতে পারবে।

এঞ্জিন-মেরামতি কারখানার অল্পবয়সী শ্রমিকরা আমাদের এই অবস্থার জন্যে সহানুভূতি জানাল। কথা দিল, শহরের কম্‌সমোল-সংগঠনগুলোয় ওরা আমাদের পক্ষ-সমর্থন করবে। এর ঠিক পরের রবিবার ওদের একজন ফের আমাদের কলোনিতে এল, কিন্তু এসে খবর যা দিল তা নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক। বলল, জেলা আর শহর উভয় কমিটিই নাকি বলেছে: 'ঠিকই তো, কলোনিতি কম্‌সমোল-সদস্য থাকে কী করি, যতক্ষণ অদের মধ্যি অতগুলান মাখ্‌নোর দলের পুরানো লোক, আগেকার অপরাধী আর অন্য সব গোলমেলে চরিত্রের ছেলেছোকরা আছে?'

ছেলেটিকে আমি বুঝিয়ে বললুম যে আমাদের এখানে মাখ্‌নোর দলের লোক খুব কমই আছে, আর যারা আছে তাদেরও অতখানি গুরুত্ব দিয়ে মাখ্‌নো-অনুসারী বলে গণ্য করাটা ঠিক হবে না। শেষে আমি ওকে এও ব্যাখ্যা করে বোঝালুম যে 'সংশোধিত' কথাটাকে শহরে যে-অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে সে-রকম আনুষ্ঠানিক অর্থে ব্যবহার করা চলে না। কোনো একটি ছেলেকে 'সংশোধন' করাটাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাকে নতুন শিক্ষায় পুনঃশিক্ষিত করেও তুলতে হচ্ছে আমাদের। অর্থাৎ, এমনভাবে তাকে শিক্ষিত করে তুলতে হচ্ছে যাতে সে শুধু-যে সমাজের একজন নিছক নিরীহ মানুষে পরিণত হবে তাই নয়, নতুন যুগের উপযোগী একজন সক্রিয় কর্মীও হয়ে দাঁড়াবে। আর এই ধরনের একটি ছেলেকে কী করে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব কম্‌সমোলের সদস্য হতে চাইলে যদি তাকে না-নেয়া হয়, আর প্রত্যেকেই তার বিরুদ্ধে যত সব পুরনো, আর একান্তই শিশু-বয়সের অপরাধের বস্তাপচা নজির টানতে থাকে? এঞ্জিন-মেরামতি কারখানার অল্পবয়সী শ্রমিকটি কিছু-কিছু ব্যাপারে যেমন আমার সঙ্গে একমত হল তেমনই আবার কিছু ব্যাপারে দ্বিমতও জানাল। ওর মতে,

এ-ব্যাপারে সীমারেখা টানার প্রশ্নটির সু-সমাধান খুবই শক্ত। অর্থাৎ, কলোনির একজন সদস্যকে ঠিক কখন কম্‌সমোলে নেয়া যেতে পারে, আর কখন নয়? তাছাড়া এ-প্রশ্নের সমাধানই-বা করবে কে?

'কে সমাধান করবে? কেন, কলোনির কম্‌সমোল-সংগঠনই তা করবে নিশ্চয়।'

এঞ্জিন-কারখানার কম্‌সমোলরা এর পরেও ঘনঘন আমাদের কাছে আসতে লাগল। কিন্তু অবশেষে আমি ধরতে পারলুম যে আমাদের সম্পর্কে ওদের আগ্রহটা পুরোপুরি সুস্থ ব্যাপার নয়। প্রথমত এবং প্রধানত, ওরা আমাদের ধরেই নিয়েছিল অপরাধী বলে। খুব বেশিরকম কৌতূহল প্রকাশ করে তারা আমাদের ছেলেদের অতীত জীবন সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে চেষ্টা করছিল। তাছাড়া, আমাদের সকল সাফল্যকে তারা স্বীকার করে নিতে রাজি ছিল বটে, কেবল তার সঙ্গে একটি 'কিন্তু' যোগ করে, তবেই। যথা, কিন্তু তবু আপনের ছেল্যারা সাধারণ ছেল্যা তো নয়। ওই কম্‌সমোল-সদস্যদের মধ্যে অনেককে স্বমতে আনতে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছিল।

কলোনি প্রতিষ্ঠার প্রথম দিনটি থেকে এ-ব্যাপারে আমাদের ধ্যানধারণা কিন্তু অপরিবর্তনীয় ছিল। আমি মনে করতুম, শিশু ও কিশোর অপরাধীদের পুনঃশিক্ষায় দীক্ষিত করে তোলার প্রধান পদ্ধতির ভিত্তি হল তাদের অতীতকে, বিশেষ করে অতীতের অপরাধ অনুষ্ঠানের ব্যাপারটাকে, সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা। এই পদ্ধতিকে পুরোপুরি কার্যকর করে তোলা আমার পক্ষে কোনোক্রমেই সহজ ছিল না, কারণ এ-ব্যাপারে অন্যান্য বাধা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের প্রবৃত্তিকেও দমন করার প্রশ্ন ছিল। সব সময়েই মনের মধ্যে এ-রকম একটা বাসনা উঁকিঝুঁকি দিত: আচ্ছা, দেখা যাক তো ছেলেটাকে কেন কলোনিতে পাঠানো হয়েছে, সত্যিই কী কাজটা করেছে সে। ওই সময়কার শিক্ষা-বিজ্ঞানের রীতিসিদ্ধ যুক্তি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পদ্ধতির অনুকরণে এই আর্ষ-বচনকে আঁকড়ে ধরে ছিল যে 'অসুখ সারাতে হলে অসুখটা আসলে কী তাই প্রথম জানতে হবে।' আমার সহকর্মীদের আর জনশিক্ষা-দপ্তরের কথা তো বাদই দিলুম, উপরোক্ত যুক্তি থেকে-থেকে এমন কি আমাকেও লোভানি দিত।

শিশু ও কিশোর অপরাধী-সংক্রান্ত কমিশন আমাদের কাছে রক্ষণাধীন

ছেলেদের ব্যক্তিগত ইতিহাস-সম্পর্কিত কাগজপত্র পাঠাত। সেই সব কাগজপত্রে নানারকম জেরা-জবানবন্দী, ঝগড়াঝাঁটি, আর এই রকম যত সব আজেবাজে জিনিসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা থাকত। এ-সব নাকি রোগ-নির্ণয়ে সাহায্য করার জন্যেই পাঠানো হোত।

কলোনিতে সব সহকর্মীকে আমার পক্ষে টানতে সমর্থ হওয়ার পর, সেই বহুকাল আগেই — ১৯২২ সালেই — কমিশনের কাছে আমি অনুরোধ জানিয়েছিলুম যে আমার কাছে আর যেন ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনীর রেকর্ড না-পাঠানো হয়। রক্ষণাধীন ছেলেদের অতীত অপরাধ সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করার ব্যাপারে সত্যিই আন্তরিকভাবে ক্ষান্তি দিলুম আমরা, আর এই প্রচেষ্টা এতদূর সাফল্যমণ্ডিত হল যে অল্পদিনের মধ্যে ছেলেরা নিজেরাও তা ভুলে যেতে শুরু করল। অতীত সম্পর্কে খোঁজখবর করার মতো সমস্ত কৌতূহল কীভাবে ধীরে-ধীরে কলোনি-বাসিন্দাদের মন থেকে মুছে যাচ্ছিল, আমাদের কাছে যা ছিল দূষিত, অসুস্থ আর বিজাতীয় সেই সব হারানো-দিনের স্মৃতি পর্যন্ত লোপ পেয়ে গিয়েছিল কীভাবে তা দেখে-দেখে আমার আনন্দের আর পরিসীমা ছিল না। অন্তত এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সীমানায় পেঁৗছে গিয়েছিলুম — এমন কি কলোনির নতুন আগন্তুকরা পর্যন্ত তাদের অতীত কীর্তিকলাপের গল্প সাতখানা করে বলতে লজ্জা পেত।

এই পটভূমিতে, কলোনিতে কম্‌সমোল-কেন্দ্র সংগঠনের মতো অমন চমৎকার একটা কাজে হাত দিতে গিয়ে, হঠাৎ আমরা বাধ্য হলুম আমাদের অতীতের কথা স্মরণ করতে আর যে-সব শব্দ আমাদের কাছে হয়ে উঠেছিল ঘৃণ্য আর পরিত্যাজ্য সেগুলো নিয়ে ফের আলোচনা করতে — যেমন, 'সংশোধন', 'শিশু ও কিশোর-বয়সীর অপরাধ', 'ব্যক্তিগত জীবন-কথার রেকর্ড', ইত্যাদি।

বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হওয়ায় কম্‌সমোলে যোগ দেয়ার ব্যাপারে ছেলেদের আকাঙ্ক্ষা আরও জোরালো হয়ে উঠে একরোখা স্থির-সংকল্পে পরিণত হল। এর জন্যে লড়তে পর্যন্ত প্রস্তুত হল ছেলেরা। ওদের মধ্যে তারানেত্‌সের মতো যারা আপসে মীমাংসা করার পক্ষপাতী ছিল তারা একটু ঘুরিয়ে নাক দেখানোর প্রস্তাব করলে। বললে, যারা কম্‌সমোলে ঢুকতে চায় তাদের এই বলে সার্টিফিকেট দেয়া হোক যে তারা 'সংশোধিত' হয়ে গেছে, তবে অবশ্যই তাদের কলোনিতে থাকতে দেয়া হোক। কিন্তু

অধিকাংশ ছেলেই এই ধরনের চালাকির আশ্রয় নেয়ার বিরোধিতা করল। জাদোরভ তো রাগে, ক্ষোভে লাল হয়ে উঠে বলল:

'মোটেই না! এ মুজিকদের সাথে আমাদের কাজ-কারবার নয়, কাউকে বোকা বানানোর ব্যাপার নয় এটা। কলোনিতে কম্‌সমোল-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ চালিয়ে যেতেই হবে আমাদের, আর সেই কম্‌সমোলই জানবে কে তার সদস্য হওয়ার যোগ্য আর কে নয়।'

উদ্দেশ্যসিদ্ধির মতলবে ছেলেরা ঘনঘন শহরের কম্‌সমোল-সংগঠনগুলোর কাছে যেতে লাগল, কিন্তু মোটের ওপর তাতে কোনো ফল হল না।

১৯২৩ সালের শীতকালে সম্পূর্ণ আলাদা আরেকটা কম্‌সমোল-সংগঠনের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। ঘটনাটা ঘটল নেহাতই আকস্মিকভাবে।

আন্তন আর আমি একদিন সন্ধের দিকে ঘরে ফিরছি। শ্লেজ টানছে 'মেরী', ভালো খেয়েদেয়ে তখন মোটাসোটা হয়েছে সে, চক্‌চক করছে গায়ের চামড়া। পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে নামছি যখন ঠিক সেই মুহূর্তে এমন একটা অদ্ভুত জীবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমাদের এই শীতপ্রধান অক্ষরেখা-বরাবর যেমন প্রাণীর সাক্ষাৎ মেলে কদাচিৎ। প্রাণীটা আর কিছুই নয়, একটা উট। এই অদ্ভুতদর্শন প্রাণীটিকে দেখে তার স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা কাটিয়ে উঠতে না-পেরে 'মেরী' প্রথমে কেঁপে উঠল, তারপর পেছনের পায়ে ভর দিয়ে উঠল খাড়া হয়ে, অতঃপর লাথালাথি করে জোয়াল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা পেল, এবং অবশেষে পাগলের মতো শুরু করল দৌড়। শ্লেজের সামনের কাঠে পা আটকে প্রাণপণে রাশ টেনেও মাদী ঘোড়াটাকে কোনোরকমে বশে আনতে পারল না আন্তন। আমাদের শ্লেজ-গাড়িখানার গঠনে একটা বিশেষ ধরনের ত্রুটি (এটা সত্যি যে এই ত্রুটির কথা আন্তন ইতিপূর্বে বহুবার আমাদের জানিয়েছিল) — অর্থাৎ, ঘোড়াকে গাড়ির সঙ্গে জোতার জোয়ালের ডান্ডাদুটোর আপেক্ষিক হ্রস্বতা — ঘটনার পরবর্তী গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত করে দিল এবং আমাদের পূর্বোল্লিখিত কম্‌সমোল-সংগঠনের কাছাকাছি নিয়ে যেতে লাগল। উন্মত্তের মতো ছুটতে গিয়ে 'মেরী'-র পেছনের পাদুটো শ্লেজের লোহা-বাঁধানো সামনের দিকটায় ঠুকে যাওয়ায় এবার রীতিমতো ভয় পেয়ে আরও প্রচণ্ড বেগে আমাদের টেনে নিয়ে চলল অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের দিকে। আন্তন আর আমি দু-জনে মিলে

লাগাম ধরে টানাটানি শুরু করলুম, কিন্তু এর ফলে অবস্থা আরও খারাপ দাঁড়াল — ওপর দিকে মাথা-ঝাঁকানি দিতে-দিতে 'মেরী' আরও বেশি-বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। ততক্ষণে আমার নজর আটকে গেছে সেই জায়গাটার দিকে, এ-রকম ক্ষেত্রে যে-ধরনের জায়গায় গিয়ে কম-বেশি বিপর্যয় আর যাত্রার সমাপ্তি ঘটতে ব্যা — দেখা গেল, সামনে কিছু দূরে রাস্তার মোড়ে একদল চাষী তাদের শ্লেজগাড়িগুলো নিয়ে রাস্তার ধারের একটা জলের চৌবাচ্চার কাছে ভিড় জমিয়েছে ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়ানোর জন্যে। মনে হল, দুর্ঘটনা এড়ানোর কোনো উপায়ই নেই, কারণ মানুষে আর গাড়িতে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। কিন্তু কী-এক অলৌকিক কৌশলে যেন রাস্তার ধারের জলের চৌবাচ্চা আর শ্লেজগাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল 'মেরী'। এক লহমার জন্যে নজরে পড়ল গাড়িগুলো গাঁয়ের চাষীদের নয়, শহুরে মানুষের। যাই হোক, আমাদের গাড়িখানা ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যেতে-যেতেই কানে এল কাঠের কোনো কিছু ভেঙে পড়ার আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিৎকারের আওয়াজ। কিন্তু আমরা ততক্ষণে পগার পার, বহুদূর চলে এসেছি। অবশেষে পাহাড় শেষ হয়ে গেল, সমতল সোজা রাস্তা ধরে আগের চেয়ে কিছুটা কম জোরে ছুটে চললুম আমরা। এমন কি পেছন ফিরে একবার দেখারও অবকাশ পেল আন্তন, মাথা নেড়ে বলল:

'কারো এট্টা শ্লেজ চুরমার করে দিইচি আমরা। এখন পালানো দরকার!'

পুরো দমে ছুটে চলেছিল 'মেরী'। তবু 'মেরী'-র পিঠের ওপর ছপ্‌টি ঘোরাতে লাগল আন্তন। আমি কিন্তু ওর ত্রস্তব্যস্ত হাতখানাকে চেপে ধরে বললুম:

'পালানোর উপায় নেই হে! দেখছ-না, ওদের ঘোড়াটা একেবারে সাক্ষাৎ শয়তান!'

বাস্তবিক, একটা চমৎকার দৌড়বাজ ঘোড়া শান্তভাবে অথচ তেজিয়ান খুর ঠুকে-ঠুকে এই সময়ে আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, আর তার পেছন থেকে লাল-টকটকে ব্যাজ-আঁটা একজন লোক একদৃষ্টে এই বিফল পলাতকদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অবশেষে থামলুম আমরা। লাল ব্যাজধারী লোকটি শ্লেজের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন কোচোয়ানের দুই কাঁধে দুটো হাত রেখে। গাড়িতে তাঁর বসার জায়গা ছিল না, কারণ

পেছনের সিটটা আর শ্লেজের পেছনদিকটা ভেঙেচুরে আলগা কাঠগুলো ঝুলঝুল করছিল, আর গাড়িখানার কাদামাখা টুকরো-টুকরো অংশগুলো পেছনের রাস্তায় বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে ছিল।

'পেছন-পেছন আসুন!' সামরিক বাহিনীর লোকটি যেন গর্জন করে উঠলেন।

কথামতো চললুম। আন্তন যেন খুশিতে উপচে পড়তে লাগল। আমাদের বিপজ্জনক যাত্রার এহেন ফলাফল দেখে ও খুশি হয়েছে মনে হল। তবে মিনিট দশেকের মধ্যে অপর গাড়িখানার অনুসরণে আমরা যখন 'জি-পি-ইউ'*-এর কম্যান্ডান্টের অফিসে হাজির হয়ে গেলুম, একমাত্র তখন আন্তনের মুখে কেমন একটা বিহ্বল বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেল।

বলল, 'আরে, দ্যাখেন দেখি কান্ড, আমরা-যে একবারে 'জি-পি-ইউ'-র ঘাড়ে গিয়ি পড়েছিলাম...'

লাল ব্যাজধারী লোকেরা ছেঁকে ধরেছিল আমাদের। ওদের মধ্যে একজন আমাকে নিয়ে পড়ল। চেঁচামেচি করে বলল:

'সত্যিই তো, নিছক একটা বাচ্চাকে কোচোয়ান বানিয়েছে — তার কাছ থেকে ঘোড়াকে বাগ মানানো কী করে আশা করা যায়? আপনাকেই এর জবাবদিহি করতে হবে।'

কথাটা শুনে অপমানে আন্তনের দেহ যেন সংকুচিত হয়ে উঠল, প্রায় চোখের জল পড়ে-পড়ে এমন অবস্থায় মাথা নেড়ে লাঞ্ছনাকারীকে বলল:

'নিছক বাচ্চা, তাই বটে! তবু যদি-না উটগুলারে আপনেরা রাস্তায় ছাড়্যে দিতেন — সারা তল্লাট জুড়ি জন্তুগুলারে ঘুর্যে বেড়াতি দিতেন! বলি, আমার মাদীডা এ-সব কান্ডমান্ড সহ্যি করে কী কর্যে, কী কর্যে সহ্যি করে সে, অ্যাঁ!'

'জন্তু? কোন্ জন্তু?'

'উট, আবার কী!'

লাল ব্যাজধারীদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল।

'আপনারা কোত্থেকে আসছেন?'

'গোর্কি কলোনি থেকে,' জবাব দিলুম।

'জি-পি-ইউ' — প্রধান রাজনৈতিক দপ্তর। — অনুঃ

'ও! তাই বলুন, গোর্কি-পন্থী! তা আপনি কে — ডিরেক্টর নাকি? যাক, আজ তাহলে বেশ জবর মাছ ধরা পড়েছে জালে!' ওদের মধ্যে একটি ছোকরা হেসে বলল। তারপর চারপাশের সবাইকে ডেকে-ডেকে এমনভাবে আমাদের দেখাতে লাগল যেন আমরা ওদের বহুবাঞ্ছিত অতিথি।

আমাদের চারপাশে ভিড় জমে উঠল। নিজেদের কোচোয়ানকেই ওরা দোষারোপ করতে লাগল, আর কলোনি সম্পর্কে একটার-পর-একটা প্রশ্ন করে চলল আন্তনকে।

'অনেকদিন ধরেই কলোনিতে যাব-যাব মনে করছিলুম আমরা। সবাই বলে তোমরা নাকি দারুণ লড়াই করছ ওখানে। সামনের রবিবার ঠিক তোমাদের ওখানে যাচ্ছি।'

এমন সময় ওদের সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজার এসে হাজির। রাগ-রাগ ভাব দেখিয়ে তিনি একটা এজাহার তৈরি শুরু করে দিলেন। কিন্তু সকলেই চেঁচামেচি করে ওঁকে থামিয়ে দিল:

'লাল ফিতের কারবার বন্ধ রাখুন দেখি! এত সব লিখছেন কী জন্যে, শুনি?'

'কী জন্যে? শ্লেজখানার কী দশা করেছে দেখেছ একবার? এখন সেটা মেরামত করে দিক ওরা।'

'আপনার জবানবন্দী ছাড়াই ওরা ওটা মেরামত করে দেবে। দেবে তো, তাই না?.. আচ্ছা, এবার বল দেখি — কলোনির ব্যাপার-স্যাপার কেমন চলছে শুনি। সবাই বলে তোমাদের নাকি হাজত পর্যন্ত নেই!'

'হাজত — কী জন্যি? আপনেদের হাজত আছে নাকি?' আন্তন পালটা প্রশ্ন করল।

আবার একবার হাসির রোল উঠল ঘর জুড়ে:

'আমরা নিশ্চয়ই সামনের রবিবার তোমাদের ওখানে আসছি। শ্লেজখানাও মেরামতের জন্যে নিয়ে যাব তখন।'

'তা, রবিবার পর্যন্ত আমি কিসে যাতায়াত করব?' খ্যাঁকখ্যাঁক করে উঠলেন সরবরাহ-বিভাগের ম্যানেজার।

এবার আমি ওঁকে শান্ত করলুম।

বললুম, 'আমাদের আরও একখানা শ্লেজ আছে। আমাদের সঙ্গে কাউকে দিয়ে দিন, সে ওখানা নিয়ে আসবে।'

এইভাবে আমাদের কলোনি আরও কিছু ভালো বন্ধু পেয়ে গেল। পরের রবিবার চেকা-কম্‌সমোলের ছেলেরা কলোনিতে এল। আর আরও একবার সেই জঘন্য প্রশ্নটা আলোচনার জন্যে উঠল — আমাদের কলোনির ছেলেরা কম্‌সমোলের সদস্য হতে পারবে না কেন? এ-প্রশ্নে চেকার ছেলেরা কিন্তু সবাই একবাক্যে আমাদের পক্ষ অবলম্বন করল।

বলল: 'ওরা ভেবেছেটা কী? অপরাধী, তাই বুঝি? বিলকুল বাজে ব্যাপার! এ-কথা বলতে লজ্জা হওয়া উচিত! অথচ ওরা নিজেদের খুব বুঝদার লোক মনে করে... ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের একহাত লড়ে যেতে হয় দেখছি — এখানে যদি ফল না হয় তো, খার্‌কভেও।'

ওই সময়ে আমাদের কলোনিকে 'শিশু ও কিশোর অপরাধীদের আদর্শ সংশোধনী প্রতিষ্ঠান' হিসেবে শিক্ষা-সংক্রান্ত ইউক্রেনীয় জনগণের কমিশারিয়েতের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছিল। শিক্ষা-সংক্রান্ত জনগণের কমিশারিয়েতের ইন্‌স্‌পেক্টররা পরিদর্শনের কাজে তখন মাঝে-মাঝে কলোনিতে আসতে শুরু করেছিলেন। আর, এই সব পরিদর্শক অন্যান্যদের মতো হালকা, লঘু-প্রকৃতি মফস্বলের লোক ছিলেন না, সামাজিক শিক্ষাদানের ব্যাপারটাকে তাঁরা একধরনের আবেগের ভরা কোটাল হিসেবেও গণ্য করতেন না। খার্‌কভের কর্তৃপক্ষ সামাজিক শিক্ষাদানকে মোটেই মনে করতেন না তরুণ আত্মার উন্মোচনের ও ব্যক্তির অধিকার কায়েমের জমকালো দৃশ্যাভিনয় কিংবা ওই ধরনের কাব্যিক ভাপে-ভরা ব্যাপার বলে। এক্ষেত্রে তাঁরা যার সন্ধানে ছিলেন তা হল, নতুনতর সংগঠনের চেহারা আর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁদের মনোভঙ্গির যে-দিকটি আমাদের সবচেয়ে ভালো লেগেছিল তা হল, এক-মুহূর্তের স্বর্গসুখের সন্ধানী ফাউস্ট হিসেবে নিজেদের প্রতিপন্ন করার চেষ্টা না-করে আমাদের সঙ্গে সমানে-সমানে বন্ধুর মতো মেলামেশা করছিলেন তাঁরা, নতুন কী মিলতে পারে আমাদের মধ্যে খোঁজ করছিলেন তার, আর কণামাত্র নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়ছিলেন।

কম্‌সমোল-সংক্রান্ত আমাদের ব্যর্থতা আর দুর্ভাগ্যের কথা শুনে খার্‌কভের লোকজন ভয়ানক অবাক হয়ে গেলেন:

'বলতে চান কম্‌সমোল-কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন আপনারা, অথচ তা করতে দেয়া হয় নি?.. কে এতে আপত্তি করেছে বলুন তো?'

সন্ধেবেলাগুলোয় বয়োজ্যেষ্ঠ ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলেন

তাঁরা। দেখা যেত, ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছেন ছেলেদের সঙ্গে আর সহানুভূতিভরে মাথা নাড়ছেন।

শিক্ষা-সংক্রান্ত জনগণের কমিশারিয়েত আর আমাদের শহরের বন্ধুরা লোক-পাঠিয়ে অনবরত তাগিদ দেয়ার ফলে ইউক্রেনীয় কম্‌সমোল-সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে একেবারে — যাকে বলে — বিদ্যুৎগতিতে এই ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি ঘটে গেল। ফলে, ১৯২৩ সালের গ্রীষ্মে তিখন নেস্তরভিচ কভাল রাজনীতি-বিষয়ক শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে কলোনিতে এলেন।

তিখন নেস্তরভিচ ছিলেন কৃষক পরিবারের ছেলে। জীবনের চব্বিশটা বছর বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামের মধ্যে থেকে তিনি বহু কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার সাক্ষী হতে এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের অভিজ্ঞতার মস্ত বড় একটা সঞ্চয় সংগ্রহে সমর্থ হয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, আর তাঁর ধীরস্থির শান্ত স্বভাব বিচলিত হোত না সহজে। কলোনিতে আসার পরমুহূর্তটি থেকেই বাচ্চা সদস্যদের সঙ্গে কমরেডসুলভ সমান সম্পর্ক বজায় রেখে কথা বলতে শুরু করে দিলেন তিখন নেস্তরভিচ। আর দেখা গেল খেত আর ফসল-ঝাড়াইয়ের গোলাপালার কাজকর্মে তিনি একজন বিশেষজ্ঞবিশেষ।

অতঃপর ন-টি ছেলেকে নিয়ে কলোনিতে একটি কম্‌সমোল-কেন্দ্র সংগঠিত হল।

## ২৮

## আনুষ্ঠানিক পদযাত্রার সূচনা

আচমকা দেরিউচেঙ্কো একদিন রুশভাষা বলতে শুরু করে দিল। দেরিউচেঙ্কো-কুলায়ে পরপর ঘটে-যাওয়া কয়েকটা অপ্রীতিকর ঘটনার সঙ্গে এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটার একটা যোগসূত্র ছিল। ব্যাপারটার সূত্রপাত ঘটল সেই দিন থেকে যেদিন দেরিউচেঙ্কোর স্ত্রী (প্রসঙ্গত বলে রাখি, দেরিউচেঙ্কোর ইউক্রেনীয় আদর্শের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না) স্থির করলেন যে তাঁর সন্তান-প্রসবের দিনক্ষণ এসে গেছে। তার মহান কসাক-বংশের ধারা অব্যাহত থাকার এই শুভ সম্ভাবনায় দেরিউচেঙ্কো খুবই

অনুপ্রাণিত হল বটে, তবু তখনও পর্যন্ত ব্যাপারটা তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করতে সক্ষম হল না। গাড়ি করে ধাত্রী ডাকতে যাওয়ার জন্যে ব্রাত্‌চেঙ্কোর কাছে বিশুদ্ধতম ইউক্রেনীয় ভাষায় ঘোড়া চাইল সে। আর যায় কোথায়, দেরিউচেঙ্কো-সন্তানের জন্ম উপলক্ষ করে কিছু-কিছু স্বতঃসিদ্ধ সুভাষিত আওড়ানোর সুখ ছাড়তে ব্রাত্‌চেঙ্কোও রাজি হল না — কেননা, কলোনির গাড়ি-ব্যবহারের কর্মসূচিতে বেচারা নবজাতকের জন্যে কোনো বন্দোবস্ত ছিল না, শহর থেকে ধাত্রী ডাকার ব্যাপারটারও উল্লেখ ছিল না কোথাও। আর আন্তনের মতে তার উল্লেখ থাকবেই-বা কেন, কারণ 'ধাই ডাকা হোক আর না-হোক, ব্যাপার তো একই রকম দাঁড়াবে।' তবু শেষপর্যন্ত দেরিউচেঙ্কোকে ঘোড়া দিল ও। এর পরের দিন দেখা গেল, আসন্নপ্রসবা মহিলাটিকে শহরে নিয়ে যাওয়া দরকার। আন্তন এতে এত বিচলিত হয়ে পড়ল যে সবরকম বাস্তব বোধ হারিয়ে বলে বসল:

'আর আপনেরে ঘোড়া দিত্যেছি না!'

কিন্তু কলোনির সর্বসাধারণের সমর্থনে বলীয়ান হয়ে শেরে আর আমি ব্রাত্‌চেঙ্কোর এই আচরণের এমন কড়া আর সজোর প্রতিবাদ করলুম যে ও অবশেষে নরম হল। এর আগে দেরিউচেঙ্কো ধৈর্য ধরে আন্তনের গলাবাজি শুনছিল, আর ওর স্বাভাবিক অলঙ্কারবহুল জাঁকালো ভাষায় আন্তনকে রাজি করানোর চেষ্টা করছিল।

বলছিল, 'যেইহেতু ব্যাপারখান অত্যন্ত জরুরি সেইহেতু এয়ারে একঘণ্টার জন্যও ফেলিয়া রাখা অনুচিত হইবে, মাননীয় কমরেড ব্রাত্‌চেঙ্কো।'

গাণিতিক তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে নাকি যে-কোনো মানুষকে ঘায়েল করা যায়, আমাদের ব্রাত্‌চেঙ্কোর এমনিধারা একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাই সেই গাণিতিক উপাত্তে বলীয়ান হয়ে সে বলল:

'আচ্ছা, ধাই আনার জন্যি আপনেরে একজোড়া ঘোড়া দেয়া হয়েছে কি না? দেয়া হয়েছে তো? ধাইরে ফের শহরে রেখে আসা হয়েছে — তার জন্যি আবার একজোড়া ঘোড়া লেগেছে... তা, আপনে কি মনে করেন কার বাচ্চা হবে কি না-হবে তাতে ঘোড়াদের কিছু এসে-যায়?'

'কিন্তু, কমরেড...'

'আরে, রাখেন আপনের 'কিন্তু', 'কিন্তু'! ধরেন, পেত্যেকেই যদি এমনিধারা ঘোড়া চাওয়াচাওয়ি শুরু করে তখন!..'

সন্তান-প্রসবের মতো অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে আপত্তি জানাতে আন্তন তার সবচেয়ে কম পছন্দসই আর সবথেকে বেতো ঘোড়া দুটোকে গাড়িতে জোতার জন্যে বের করল আর অনেক দিব্যি-টিব্যি গেলে বলল যে ফিটনখানা নাকি চলছে না। শেষপর্যন্ত এক্কাখানায় ঘোড়া দুটো জুতে আর কোচোয়ান হিসেবে সরোকাকে কোচবাক্সে বসিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিল। অর্থাৎ, স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে চাইল যে গাড়ি আর ঘোড়ার এই যোগসাজস বিশেষ যুতের নয়।

কিন্তু, এরপর আবার, তৃতীয় বার দেরিউচেঙ্কো যখন ঘোড়া চাইল নতুন প্রসূতিকে ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্যে, তখন আন্তন সত্যিই ফেটে পড়ল। এখানে বলা দরকার যে দেরিউচেঙ্কোর কপালে সেবার বাপ হওয়ার সুখ লেখা ছিল না — জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাড়াহুড়ো করে 'তারাস' নামকরণ করা সত্ত্বেও ওর সেই প্রথম সন্তান মাত্র সপ্তাহখানেক বেঁচেছিল। প্রসূতি-সদনের ওয়ার্ডে থাকতেই মারা গিয়ে দেরিউচেঙ্কোর সুমহান কসাক-বংশের নাম রাখার মতো কিছুই করে যেতে পারল না বেচারা। এমন অবস্থায় মুখে যেমন শোকের ছায়া পড়া দরকার দেরিউচেঙ্কোর মুখে ঠিক সেই উপযুক্ত ভাবটি ফুটে উঠেছিল, ওর অলঙ্কারবহুল ভাষাও কিছুটা-যেন সরল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু জিদ ধরে তখনও সে ইউক্রেনীয় ভাষায় নিজের মনোভাব ব্যক্ত করে চলল। অপরপক্ষে ব্রাত্‌চেঙ্কোর ক্ষোভ, ঘৃণা আর নিষ্ফল রাগ এমন মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছিল যে সে কোনো ভাষাতেই আদৌ কোনো উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাচ্ছিল না। ওর মুখ থেকে তখন খালি আধা-দুর্বোধ্য, ভাঙা-ভাঙা কথার টুকরো বেরোচ্ছিল:

'এক্কেবারে বেফায়দা ঘোড়া দুটারে পাঠানো হইছিল! গাড়ি চাই — তাই বটে!.. কোনো তাড়া ছেল না... ঘণ্টা-খানেক অনায়াসে অপেক্ষা করা চলত... ছেলেপিলে তো লোকের সব সময়ে হয়ে চলবে, তার জন্যি... এক্কেবারে বেফায়দা!..'

সন্তানের ভাগ্যহত মা-কে দেরিউচেঙ্কো ফের আপন কুলায়ে ফিরিয়ে নিয়ে এল। ব্রাত্‌চেঙ্কোর যন্ত্রণাভোগও বন্ধ রইল কিছুকালের জন্যে। এই শোকাবহ কাহিনীতে ব্রাত্‌চেঙ্কোর কথা আপাতত এখানেই বন্ধ করছি, তবে তার অর্থ মোটেই এ নয় যে শোকাবহ কাহিনীর পরিসমাপ্তিও এখানেই ঘটছে। তারাস দেরিউচেঙ্কো যখন ভূমিষ্ঠ হয় নি তখন আপাতদৃষ্টিতে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক একটা ব্যাপার এই কাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়ে, তবে পরে দেখা

গেল শেষপর্যন্ত সেটা মোটেই অত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে রইল না। দেরিউচেঙ্কোর পক্ষে এই ব্যাপারটাও কম শোকাবহ হয় নি।

যে-রান্নাঘর থেকে কলোনি-বাসিন্দাদের খাবার দেয়া হোত কলোনির শিক্ষক-শিক্ষিকা আর অন্যান্য কর্মীরাও সেখান থেকে রান্না-করা খাবার পেতেন। কিন্তু, যে-সময়ের কথা বলছি তার কিছুকাল আগে থেকে, কোনো-কোনো পরিবারের বিশেষ চাহিদার দিকে নজর রেখে আর রান্নাঘরের খাটুনি খানিকটা হালকা করার ইচ্ছেতেও বটে, কিছু-কিছু লোককে আমি আ-রাঁধা খাবার র‍্যাশন হিসেবে দিতে অনুমতি দিয়েছিলুম কালিনা ইভানভিচকে। এই শেষোক্ত লোকজনের মধ্যে দেরিউচেঙ্কোও ছিল একজন। এখন হল কি, শহর থেকে একবার আমি অল্প খানিকটা মাখন পেয়ে গেলুম। মাখনের পরিমাণ এত কম ছিল যে সবাই মিলে মাত্র কয়েক দিনই তা খেতে পারত। স্বভাবতই তখন এটা কারো মাথায় ঢোকে নি যে এই মাখনের ভাগ আ-রাঁধা র‍্যাশন-তুলিয়েদেরও দিতে হবে। কিন্তু দেরিউচেঙ্কো এটা জেনে বিষম বিচলিত হয়ে পড়ল যে তার আগের দিন-তিনেক ধরে এই মহা-মূল্যবান পদার্থটি সর্বসাধারণের খাদ্যের অঙ্গ হয়ে আছে। ও তাই তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা সংশোধন করে নেয়ার দিকে নজর দিল। অর্থাৎ, এই মর্মে একখানা দরখাস্ত দিল যে আ-রাঁধা র‍্যাশন তোলার অধিকার ছেড়ে দিয়ে ও সাধারণের জন্যে রান্না খাবার পেতে চায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ওর খাবার নেয়ার ব্যাপারে যতক্ষণে এই পরিবর্তন ঘটানো হল ততক্ষণে কালিনা ইভানভিচের ভাঁড়ারের সবটুকু মাখন গেছে ফুরিয়ে। ঘটনার এই আকস্মিক পরিণতিতে দেরিউচেঙ্কো খেপে গেল। আমার কাছে ছুটে এসে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানিয়ে বলল:

‘আপনের কোনো অধিকার নাই জনগণরে এমনধারা ধোঁকা দেয়ার! মাখন গেল কোথায়?’

‘মাখন?’ বললুম, ‘আর নেই — সবাই খেয়ে ফেলেছে, এই আর-কি।’

দেরিউচেঙ্কো ফের দরখাস্ত দিল, সে আর তার পরিবার আবার আ-রাঁধা র‍্যাশন তুলবে। ঠিক আছে! কিন্তু এর দিন-দুয়েকের মধ্যে কালিনা ইভানভিচ আবার খানিকটা মাখন যোগাড় করে আনল, এবং আবারও ওই রকম সামান্য পরিমাণে। দাঁতে-দাঁত দিয়ে এই ভাগ্য-বিপর্যয়ও সহ্য করল দেরিউচেঙ্কো, এমন কি সর্বসাধারণের রান্না খাবারেও আর ফিরে গেল না। কিন্তু আমাদের জনশিক্ষা-দপ্তরে কী-যেন একটা কাণ্ড ঘটেছিল তখন — জনশিক্ষার ক্ষেত্রে

অধীনস্থ শিক্ষক, কর্মী ও তাদের রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েদের দেহাভ্যন্তরে দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে ক্রমে-ক্রমে একটু-একটু করে মাখন-বস্তুটি প্রবিষ্ট করিয়ে দেয়ানোর একটা প্রক্রিয়া ওই দপ্তরে যেন শুরু হয়ে গেল বলে মনে হতে লাগল। কখনও-সখনও শহর থেকে ফিরে কালিনা ইভানভিচকে দেখা যেত সিটের তলা থেকে মাখন-ঢাকা পরিষ্কার এক-টুকরো মসলিন কাপড়ে মুখঢাকা একটা ছোট বালতি টেনে বের করতে। শেষে এমন অবস্থা হল যে কালিনা ইভানভিচ তার ওই ছোট বালতি না-নিয়ে শহরে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারত না। যদিও বেশির ভাগ সময়েই আ-ঢাকা শূন্য মুখ নিয়ে ফিরে আসত বালতিটা, আর কালিনা ইভানভিচ এক্কার পা-দানিতে খড়ের ওপর হেলাফেলায় ওটাকে ছুড়ে দিয়ে বলত:

'আচ্ছা মূর্খদের পাল্লায় পড়া গেছে যা-হোক! আরে, লোকে যাতে দু-দণ্ড তাকাইয়া দ্যাখতে পারে তেমন জিনিস দিতে পারস না? এ-বস্তুটা কিসের লেগ্যে শুনি, যত্তো সব পরগাছার দল? এ কি খাওনের বস্তু, না নাকে শোঁকনের লেগ্যে?'

কিন্তু দেরিউচেঙ্কোর আর সহ্য হচ্ছিল না, সে আবার তাড়াতাড়ি সর্বসাধারণের রান্না-করা খাবারে ফিরে এল। অথচ, ও ছিল এমন একজন লোক দৈনন্দিন জীবনের গতিশীলতা বোঝার সাধ্য যার কোনোদিনই ছিল না। কলোনিতে চর্বি-জাতীয় বস্তুপ্রাপ্তির অবিচল উন্নয়নশীল বক্ররেখার তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম হল সে, এবং নেহাতই যৎসামান্য রাজনৈতিক বোধের অধিকারী ছিল বলে ওর মস্তিষ্কে এই ব্যাপারটাই ঢুকছিল না যে একটা বিশেষ পর্যায়ে পরিমাণগত উৎকর্ষ গুণগত উৎকর্ষে উত্তীর্ণ হতে বাধ্য। আর এই অবশ্যম্ভাবী রূপান্তরের শুভফল হঠাৎ একদিন ওর পরিবারের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। আচমকা আমরা এত বেশি পরিমাণে মাখন পেতে শুরু করলুম যে পনেরো দিনের মাখনের সরবরাহ আ-রাঁধা খাবারের র‍্যাশন-তুলিয়েদের মধ্যে বিলি করা সম্ভব হল আমার পক্ষে। আর যত সব পরিবারের স্ত্রী, ঠাকুরমা, মেয়ে, শাশুড়ি আর অন্যান্য নানা গৌণ স্থানাধিকারী লোকজন কালিনা ইভানভিচের ভাঁড়ার থেকে নিজেদের ঘরে-ঘরে সোনালি-হলুদ জমাট মাখনের পিণ্ড, তাদের অতদিনের ধৈর্যের পুরস্কার, বয়ে নিতে যেতে লাগল। ওদিকে দেরিউচেঙ্কো তখন কলোনির রান্নাঘরে সর্বসাধারণের জন্যে রাঁধা খাবারের অংশীদার হয়ে থাকায় রান্নায়-মেশানো চর্বির বরাদ্দ খাদ্যের অলক্ষণীয় ও

অনাকর্ষণীয় অংশ হিসেবে ইতিপূর্বেই অসতর্কভাবে নিজের অজান্তে হজম করে বসে ছিল, ফলে তার ভাগ্যে এ-সময়ে আর কিছুই জুটল না। মনোকষ্টে আর অনবরত মন্দ বরাতের শিকার হয়ে-হয়ে দোরিউচেঙ্কো সত্যিই কেমন ফ্যাকাশে মেরে গেল। পুরো বেসামাল হয়ে গিয়ে সে ফের এই মর্মে একখানা দরখাস্ত দিলে যে তার আবার আ-রাঁধা খাদ্যের বরাদ্দ নেয়ার ইচ্ছে। তার দুঃখ তখন সত্যিই অবর্ণনীয় হয়ে উঠেছিল, তার প্রতি সকলের সহানুভূতিরও অভাব ছিল না, তবু তখনও সে সবকিছু পুরুষমানুষের মতো আর খাঁটি কসাকের মতো সহ্য করে যাচ্ছিল, মাতৃভাষা ইউক্রেনীয় তখনও পর্যন্ত সে ত্যাগ করে নি।

আগেই বলেছি, চর্বি-সম্পর্কিত এই ব্যাপারটা সময়ের দিক থেকে দোরিউচেঙ্কোর বংশবৃদ্ধির ব্যর্থচেষ্টার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল।

দোরিউচেঙ্কো ও তার স্ত্রী যখন তারাসের শোকস্মৃতির জাবর কাটছে বসে-বসে তখনই ভাগ্য হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে ভারসাম্য পুনরুদ্ধারে কৃতসংকল্প হল আর দোরিউচেঙ্কোর মনে বহুদিন-প্রতীক্ষিত আনন্দের আশীর্বাদ বর্ষণ করল। কলোনির এক দিনের নির্দেশনামায় এই মর্মে আদেশ দেয়া হল যে আ-রাঁধা খাদ্যের র‍্যাশন-তুলিয়েদের 'আগের এক পক্ষকালের' র‍্যাশন দেয়া হোক। এই র‍্যাশনের মধ্যে মাখনও জায়গা পেল। ফলে, খুশিমনে বাজারের থলি-হাতে দোরিউচেঙ্কো ছুটল কালিনা ইভানভিচের কাছে। দিনটাও তখন চমৎকার — সূর্য অকৃপণ হাতে রোদ্দুর ছড়াচ্ছে, সব জীবন্ত প্রাণীর মনে সুখ উথলে উঠেছে। কিন্তু এই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। আধ-ঘণ্টা পরেই বিষম বিচলিত আর যার-পর-নাই মর্মাহত হয়ে দোরিউচেঙ্কো ছুটে আমার কাছে এল। ওর কঠিন করোটিতে ভাগ্যের নিদারুণ আঘাত সেদিন এমনই অসহনীয় হয়েছিল যে সম্পূর্ণ লাইনচ্যুত হয়ে ওর মনের গাড়ির চাকাগুলো শ্লিপারের ওপর একেবারে খাঁটি রুশভাষায় ঝন্‌ঝন করে বাজতে লাগল:

'আমার ছেলের জন্যে র‍্যাশনে চর্বি দেয়া হল না কেন?'

অবাক হয়ে শুধোলুম, 'কোন্ ছেলে?'

'কোন্ ছেলে আবার কী? তারাস! কমরেড ডিরেক্টর, এ তো সম্পূর্ণ খামখেয়ালি আচরণ দেখছি! পরিবারের প্রতিটি লোকের জন্যে র‍্যাশন দেয়ার কথা — কাজেই দয়া করে তার ব্যবস্থা করুন।'

'কিন্তু আপনার ছেলে তারাস তো নেই।'

'সে আছে কি নেই তা তো আপনার দেখার কথা না। আমি আপনাদের সার্টিফিকেট দিয়েছি, আর তাতে লেখা আছে যে আমার ছেলে তারাস দোসরা জুন জন্মেছে আর দশুই জুন মারা গেছে — কাজেই তার নামে আট দিনের র‍্যাশন দিতে আপনারা বাধ্য...

ব্যাপারটা কী দেখার জন্যে কালিনা ইভানভিচ ইতিমধ্যে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে এখন খুব সাবধানে দেরিউচেঙ্কোর কনুই চেপে ধরে বলল:

'কমরেড দেরিউচেঙ্কো — অতটুক কোলের বাচ্চারে মাখন খাওয়ায় এমন বুদ্ধু কে আছে? নিজেই ভাইব্যা দ্যাখেন-না, বাচ্চার প্যাটে কি অমন খাবার সহ্য হইব?'

শুনে আমি তো থ' হয়ে একবার এর আর একবার ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলুম।

শেষে না-বলে পারলুম না, 'আজ তোমার কী হয়েছে বলো তো, কালিনা ইভানভিচ?.. বাচ্চাটা তো সপ্তা-তিনেক আগেই মারা গেছে...'

'অ, মারা গ্যাছে নাকি? তাইলে আপনে চান কী? ধুপধুনা দিয়া যেমন মড়া বাঁচান যায় না, তেমনই মাখন দিয়াও মরা বাচ্চা বাঁচান যাইব না। কইতে পারি, ওয়া তো মড়াই বইন্যা গ্যাছে।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে! রাগে ঘরের মধ্যে দাপাদাপি করতে-করতে আর দুটো হাত ছুড়তে-ছুড়তে দেরিউচেঙ্কো বলে চলল:

'পুরো আট-আটটা দিন ধরে একজন পুরো দাবিদার সদস্য আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ছিল। তার জন্যেও আপনারা দিতে বাধ্য।'

অনেক কষ্টে হাসি চেপে কালিনা ইভানভিচ যুক্তি দেখাল:

'পুরা দাবিদার? তা, তত্ত্বের দিক থেইক্যা সে-কথা কইতে পারেন বটে — কিন্তু বাস্তবে তার তো অস্তিত্বই নাই। ও ছিল কি ছিল না তাতে এখন কিছু যায়-আসে না।'

কিন্তু, আগেই বলেছি, দেরিউচেঙ্কো সম্পূর্ণ লাইনচ্যুত হয়ে পড়েছিল। এর পরের আচরণ ওর একেবারে উন্মত্ত আর বিশৃঙ্খল হয়ে উঠল। কায়দাদুরস্ত ভাবভঙ্গির সবটুকু গেল নষ্ট হয়ে, এমন কি ওর অস্তিত্বের বিশিষ্ট লক্ষণগুলো পর্যন্ত মনে হল সোজা হয়ে নেতিয়ে ঝুলে পড়েছে যেন — যেমন, গোঁফজোড়া, চুল, নেকটাই, সবকিছু। এই অবস্থায় ও অবশেষে গিয়ে হাজির হল জেলা

জনশিক্ষা-দপ্তর-প্রধানের অফিসে, আর সেখানেও নিজের সম্পর্কে অত্যন্ত খারাপ ধারণার সৃষ্টি করে এল। জেলা জনশিক্ষা-দপ্তর-প্রধান এরপর আমায় ডাকিয়ে বললেন:

'আপনের এক কর্মচারি কী এট্টা নালিশ নিয়ি আমার কাছে এস্যোছিল। দ্যাখেন — এই ধরনের লোকরে ছাঁটাই করতি লাগবে! কী কর‍্যো কলোনিতি এমনধারা অসহ্যি ভিক্ষুকরে পোষতিছেন আপনে? এমন আবোলতাবোল কথা বলতি লাগল লোকডা যে সে ভাষায় বর্ণনা দিতি পারব্য না — কী-সব তারাস, মাখন, আর ঈশ্বর জানেন আরও কী-কী যেন!'

'কিন্তু আপনিই তো ওকে আমাদের ওখানে কাজে লাগিয়েছিলেন।'

'অসম্ভব... হতিই পারে না... যাই হোক, অরে এই মুহূর্তে খেদায়্যো দ্যান!'

তাহলে, তারাস আর মাখনের মতো দুটো বিষয়ের পারস্পরিক সংলগ্নতার দরুনই শেষপর্যন্ত এমন প্রীতিকর ফলাফল দেখা দিল। ওদের আগে যে-রাস্তায় চলে গিয়েছিল রাদিমচিক, দেরিউচেঙ্কো আর তার স্ত্রী সেই রাস্তা ধরেই চলে গেল একদিন। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম, কলোনির সদস্যরা বাঁচল, এবং ইউক্রেনীয় ভূ-প্রকৃতির যে-ছোট্ট অংশটা উপরোক্ত ঘটনাবলীর দৃশ্যপট হয়ে ছিল তাও যেন বেঁচে গেল বলে মনে হল। তবে আমার এ-আনন্দের সঙ্গে মিশে রইল দুশ্চিন্তাও। সত্যিকার একজন মানুষ পাওয়া যায় কোথায় — সে-ই এক পুরনো সমস্যা এখন আগের চেয়ে আরও তীব্র হয়ে দাঁড়াল, কারণ নতুন কলোনিতে এরপর আর একজনও শিক্ষক রইলেন না। কিন্তু, দেখা গেল, গোর্কি কলোনির কপাল নিঃসন্দেহে ভালো। কারণ, নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই এমন একজন সত্যিকার মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল যেমন মানুষের জন্যে বহুকাল উন্মুখ হয়ে ছিলুম আমরা। সত্যিই, জীবনে কতই-না ঘটনা ঘটে! একেবারে রাস্তার মধ্যে মানুষটির সঙ্গে দেখা আমার। উনি দাঁড়িয়ে ছিলেন ফুটপাথের ওপর, জনশিক্ষা-দপ্তরের সরবরাহ-বিভাগের জানলার দিকে পেছন করে, ধুলো, গোবর আর খড়কুটোর জঞ্জাল-ছড়ানো রাস্তার সব মামুলি জিনিসের দিকে অলস চোখে তাকিয়ে। আন্তন আর আমি তখন গুদাম থেকে ফসলের বস্তা গাড়িতে তুলছি। হঠাৎ মাটিতে একটা গর্তে পা আটকে পড়ে গেল আন্তন। আর সেই সত্যিকার মানুষটি তাই দেখে তাড়াতাড়ি দুর্ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলেন। তারপর তাঁতে-আমাতে মিলে

ফসলের বস্তাটা আমাদের গাড়িতে তুলল্ম। অপরিচিত লোকটিকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে এবার আমি ভালো করে তাঁর দৃঢ়বদ্ধ শরীর, বুদ্ধির ছাপ-মাখানো তরুণ মুখখানা, আর আমার ধন্যবাদের উত্তরে যে-মর্যাদাবোধের পরিচয় দিয়ে তিনি হাসলেন তা লক্ষ্য করলুম। শাদা একটা কসাক-টুপি যে-সহজ প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর মাথায় চড়ানো ছিল তা সামরিক বাহিনীর লোকের বৈশিষ্ট্য বলে চেনা যাচ্ছিল।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি সামরিক বাহিনীর লোক, তাই না?'

'ঠিক বলেছেন', হেসে জবাব দিলেন অপরিচিত ব্যক্তিটি।

'ঘোড়সওয়ার বাহিনীর?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে, এখানে, জনশিক্ষা-দপ্তরে আপনার কী কাজ?'

'দপ্তরের কর্তার কাছে এসেছি। সবাই বলল, উনি নাকি শিগ্‌গিরই আসবেন, তাই ওঁর জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'কী? কাজ খুঁজছেন?'

'হ্যাঁ। ব্যায়াম-শিক্ষক হিসেবে আমায় কাজ দেয়া হবে, ওঁরা কথা দিয়েছেন।'

'তাহলে আগে আমার সঙ্গেই কথাটা হয়ে যাক-না।'

'বেশ তো।'

কথাবার্তা হল। উনি অবশেষে আমাদের গাড়িতে উঠে বসলেন। আর গাড়ি হাঁকিয়ে ঘরে ফিরলুম আমরা। তারপর পিয়ত্‌র ইভানভিচকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কলোনি দেখালুম। আর সন্ধের মধ্যেই ওঁকে কাজে বহাল করার ব্যাপারটা স্থির হয়ে গেল।

পিয়ত্‌র ইভানভিচ সঙ্গে করে কলোনিতে নিয়ে এলেন অত্যন্ত অনুকূল গুণাবলীর রীতিমতো একটা ঐশ্বর্যভাণ্ডার। আমরা যা চাইছিলুম ঠিক সেই সব বস্তুর সংযোগ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে — অর্থাৎ, তারুণ্য, প্রাণশক্তি, প্রায়-অমানুষিক সহনশীলতা, প্রশান্তি আর হাসিখুশি ভাব। আমরা যা চাইছিলুম না তার ছিটেফোঁটাও আবার ওঁর মধ্যে ছিল না — যথা, শিক্ষাদানের ব্যাপারে কোনোরকম গোঁড়ামির লেশমাত্র, ছেলেদের সামনে চালিয়াতি করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা, তুচ্ছ স্বার্থপরতা, ইত্যাদি। এছাড়া পিয়ত্‌র ইভানভিচের মধ্যে অন্যান্য গুণেরও অভাব ছিল না — যেমন, তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ পছন্দ করতেন, পিয়ানো বাজাতে পারতেন, কবিতা রচনার ক্ষমতাও কিছুটা ছিল

তাঁর মধ্যে, আর তিনি ছিলেন অসম্ভব শক্তিমান পুরুষ। তাঁর তত্ত্বাবধানে পরের দিন থেকেই নতুন কলোনি নতুনতর সুরে বাঁধা হয়ে গেল। রসিকতা, নির্দেশদান, ইয়ার্কি-মস্করা, আর নিজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার মধ্যে দিয়ে পিয়ত্র ইভানভিচ ছেলেদের দিয়ে যৌথ-জীবনগঠন শুরু করিয়ে দিলেন। শিক্ষাদানগত আমার সকল নীতিকেই সহজ বিশ্বাসের সঙ্গে সেই-যে গ্রহণ করলেন তিনি শেষপর্যন্ত তা বহাল ছিল, কোনো ব্যাপারে কোনোদিন সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। ফলে শিক্ষাদানের ব্যাপারে তুচ্ছ তর্কবিতর্ক আর বকবকানির হাত থেকে রেহাই পেয়ে বেঁচে গেলুম আমি।

অতঃপর আমাদের দুই কলোনির জীবন সুনিয়ন্ত্রিত রেলগাড়ির কামরাগুলোর মতোই সমন্বয় বজায় রেখে এগিয়ে যেতে লাগল। অধীনস্থ কর্মীদের ওপর নির্ভর করতে পারা আর তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারার একটা ভাব জাগতে লাগল আমার মনে। এটা ছিল আমার পক্ষে এক নতুন অভিজ্ঞতা। আমাদের অভিজ্ঞ পুরনো কর্মীদের মতোই তিখন নেস্তরভিচ, শেরে আর পিয়ত্র ইভানভিচ সাগ্রহে, আন্তরিকভাবে আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণে এগিয়ে এলেন।

এই সময়ে কলোনিতে সদস্য ছিল প্রায় আশিজন। ১৯২০ আর ১৯২১ সাল থেকে যারা ছিল সেই আদি সদস্যরা একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। কলোনির প্রতিটি ব্যাপারে খোলাখুলিভাবে তারাই নেতৃত্ব নিত। প্রতিটি নতুন সদস্যের প্রতি পদক্ষেপকে তাদের ইস্পাত-দৃঢ় ইচ্ছার একটা অনমনীয় কাঠামোর মধ্যে এমনভাবে ধরিয়ে নিত তারা যে কারো পক্ষেই তাকে রোধ করা কার্যত হয়ে পড়ত অসম্ভব। অবশ্য, প্রায়ই না-হলেও কখনও-সখনও, এটাকে প্রতিরোধ করার একটা চেষ্টাও-যে আমার নজরে পড়ত না তা নয়। নতুন আগন্তুকদের চোখে যা-কিছু কলোনির বাহ্য পরিবেশের সৌন্দর্য, সেখানকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যথাযথতা ও সরলতা, তার নানা বিচিত্র ঐতিহ্য ও রীতিনীতি (যদিও এ-সবের উৎপত্তির ইতিহাস এমন কি সবচেয়ে পুরনো সদস্যদের কাছেও সব সময়ে পরিষ্কার ছিল না, তবু) বলে গণ্য হোত, তাতে এতখানি প্রভাবিত হয়ে পড়ত তারা যে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ফেলত হারিয়ে। কলোনির প্রতিটি সদস্যের করণীয় কাজের তালিকা এমন কাটখোট্টা আর অনমনীয় শব্দের নাগপাশে বেঁধে প্রকাশ করা হোত যে কলোনির মধ্যে সামান্যতম খামখেয়াল দেখানো বা একগুঁয়ের মতো স্বেচ্ছাচার

করা প্রায় অসম্ভব করে তোলা হোত। তবে আমাদের সংবিধানেও ওই সমস্ত কাজের প্রকৃতি ইত্যাদি একেবারে কড়াকড়িভাবে ব্যাখ্যা করে দেয়া হোত। ওই একই সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে সমস্ত কলোনি এমন একটা কর্তব্যপালনে দায়িত্ববদ্ধ থাকত যার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না — তা হল, নতুন কলোনিতে মেরামতির কাজ শেষ করা, এক জায়গায় বসবাসের উদ্দেশ্যে সমস্ত সদস্যকে জমায়েত করা, এবং আমাদের অর্থনৈতিক নানা প্রচেষ্টার বিস্তারসাধন ঘটানো। এই দায়িত্ব-যে আমাদের সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল এবং এই কর্তব্যের সমাধান সম্পর্কে আমরা-যে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলুম, এ-বিষয়ে কেউ কোনো প্রশ্নই তুলত না। বলা বাহুল্য, অসংখ্য ব্যাপারে বঞ্চিত থেকেও আমরা সকলে যে তা মেনে নিচ্ছিলুম, ব্যক্তিগতভাবে আমোদপ্রমোদ করা ও আরও ভালো কাপড়জামা, খাবারদাবার ইত্যাদি পাওয়ার ব্যাপারে সবরকমের ত্যাগস্বীকার করে যাচ্ছিলুম এবং শুয়োরের চাষের উদ্দেশ্যে আর বীজ আর নতুন ফসলকাটাই যন্ত্র কেনার জন্যে প্রতিটি বাড়তি কোপেক বাঁচিয়ে চলছিলুম সে-সমস্তই কেবল উপরোক্ত আদর্শে অবিচল থাকার জন্যেই সম্ভব হচ্ছিল। আর এই সব ত্যাগস্বীকারকে এমন শান্তভাবে, ভালোমানুষের মতো, এমন হাসিখুশি আর দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে আমরা মেনে নিয়েছিলুম যে কলোনির একটা সাধারণ সভায় যখন বয়ঃকনিষ্ঠ ছেলেদের মধ্যে কেউ-একজন নতুন ট্রাউজার্স বানানোর কথাটা উত্থাপন করেছিল তখন আমি হাসির ছলে বলেছিলুম:

'নতুন কলোনি গড়ার কাজ শেষ করে যখন ধনী বনে যাব আমরা, তখন আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই নতুন পোশাক বানানো হবে — ছেলেদের জন্যে হবে রুপোর কোমরবন্ধসহ মখমলের কামিজ, মেয়েদের জন্যে তৈরি হবে রেশমের পোশাক আর পেটেন্ট লেদারের জুতো, প্রতিটি বাহিনীর থাকবে নিজস্ব একখানা করে মোটরগাড়ি আর সেই সঙ্গে কলোনির প্রতিটি সদস্যের জন্যে একখানা করে বাইসাইক্লও থাকবে। আর সারা কলোনি জুড়ে হাজার-হাজার গোলাপচারা পুঁতব আমরা। বুঝেছ ব্যাপারটা? তবে ইতিমধ্যে এই তিন শো রুব্ল দিয়ে একটা ভালো সিয়েমেন্থাল গোরু কেনা যাক, কী বল?'

শুনে প্রাণভরে হাসল ছেলেরা। আর এরপর ওদের ট্রাউজার্সে সুতী কাপড়ের তাপ্পি আর তেলকালি-মাখা ছাইরঙের কামিজগুলো আগের মতো অতটা জীর্ণ ঠেকল না।

কঠোরভাবে নির্দিষ্ট নৈতিক উৎকর্ষের পথ থেকে কলোনির যৌথ-জীবনের প্রধানরা বিচ্যুত হওয়ার জন্যে তখনও পর্যন্ত মাঝেসাঝে সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছিল। কিন্তু সারা দুনিয়ায় এমন কে আছে যে এই ধরনের সমালোচনার ঊর্ধ্বে থাকতে পারে? আমাদের কঠিন দায়িত্বপালনের কাজে এই 'প্রধানরা' কিন্তু নিজেদের অত্যন্ত মসৃণ ও নিখুঁত যন্ত্রাংশ হিসেবে প্রতিপন্ন করেছিল। ওদের মধ্যে যে-ব্যাপারটা বিশেষ করে আমার ভালো লেগেছিল তা হল এই যে ওদের কাজের প্রধান ঝোঁকটাই কেমন করে যেন সবার অলক্ষ্যে 'প্রধান' হিসেবে ওদের নিজেদের বিলুপ্তির এবং সমস্ত কলোনিকে কাজের মধ্যে টেনে নেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই 'প্রধান'দের মধ্যে আমাদের পুরনো বন্ধুদের প্রায় সকলেই ছিল। ছিল কারাবানভ, জাদোরভ, ভের্‌শ্‌নেভ, ব্রাত্‌চেঙ্কো, ভোলখভ, ভেত্‌কোভ্‌স্কি, তারানেত্‌স, বুরুন, গুত্‌, অসাদ্‌চি এবং নাস্তিয়া নচেভ্‌নায়া। তবে পরে আরও কিছু নতুন নাম যুক্ত হয়েছিল ওই তালিকায় — যেমন, অপ্রিশ্‌কো, গেওর্গিয়েভ্‌স্কি, জোর্‌কা ভোল্‌কভ ও আলিওশ্‌কা ভোল্‌কভ, স্তুপিত্‌সিন এবং কুদ্‌লাতি।

আন্তন ব্রাত্‌চেঙ্কোর অনেকগুলো গুণ আত্মস্থ করেছিল অপ্রিশ্‌কো। যেমন, ব্রাত্‌চেঙ্কোর উৎসাহ-উদ্দীপনা, ঘোড়াগুলোর প্রতি মমতা আর তার কাজ করার অতি-মানবিক ক্ষমতা। অবশ্য সৃষ্টিশীল কাজে ব্রাত্‌চেঙ্কোর মতো অতখানি প্রতিভা বা অতখানি প্রাণবন্ত ভাব ওর ছিল না, কিন্তু অপ্রিশ্‌কোর এমন কিছু গুণ ছিল যা একান্তভাবে ওরই নিজস্ব প্রকৃতিগত — যেমন, চলাফেরায়-কাজকর্মে একধরনের সৌষ্ঠব ও উদ্দেশ্যপূর্ণতাসহ প্রায়-জান্তব শক্তির একটা চমৎকার ধারাবাহিক প্রকাশ।

কলোনির সমাজের চোখে গেওর্গিয়েভ্‌স্কি ছিল এক দ্বৈত চরিত্রের ছেলে। একদিকে ওর চেহারা আর হাবভাবের বাইরের দিকটা এমন ছিল যে ওকে বেদে বলে ডাকতে ইচ্ছে হোত। ওর ঈষৎ-শ্যামবর্ণ মুখ, বড়-বড় কালো চোখ, কাটখোট্টা ঢিলেঢালা রসিকতার বোধ, পরের ব্যক্তিগত-জিনিসপত্রের প্রতি একটু দুষ্টুমিভরা আত্মবৎ ভাব — এই সবকিছুর মধ্যেই ছিল কেমন একটা বেদে-বেদে ভাব। অপরদিকে এটা স্পষ্ট বোঝা যেত যে গেওর্গিয়েভ্‌স্কি শিক্ষিত ঘরের ছেলে — ভালো পড়াশুনো ছিল ওর, ও ছিল দিব্যি ছিমছাম,

ফিটফাট, শহুরে কায়দায় কেতাদুরস্ত, আর ওর কথা বলার ও 'আর'-বর্ণটা উচ্চারণের ধরনে কেমন-একটা প্রায়-আভিজাত্যের ভাব ছিল বলা চলে। ছেলেরা বলত গেওর্গিয়েভ্স্কি নাকি ইর্কুত্স্কের এক প্রাক্তন শাসন-কর্তার ছেলে। কিন্তু এমন একটা লজ্জাজনক বংশ-পরিচয় যে থাকা সম্ভব সেটাই ও নিজে অস্বীকার করত, এবং ওর সম্পর্কিত কাগজপত্রেও এ-ধরনের নিন্দার্হ অতীতের বিন্দুমাত্র উল্লেখ ছিল না, তবু কেন জানি না এই সমস্ত ক্ষেত্রে ছেলেদের কথাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে যেত আমার। একটা বাহিনীর দলপতি হিসেবে নতুন কলোনিতে গিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ও নাম করে ফেলল — দেখা গেল ষষ্ঠ বাহিনীতে স্বয়ং দলপতি যতখানি কাজ করে এমন আর কেউ করে না। দলের ছেলেদের বইপত্র পড়ে শোনানো, তাদের পোশাক পরতে সাহায্য করা, ঠিকমতো স্নান, ইত্যাদি করছে কিনা তারা তা দেখা — এ-সবই ছিল গেওর্গিয়েভ্স্কির কাজ। ছেলেদের বারে-বারে বোঝাতে, রাজি করতে, উপরোধ-অনুরোধ করতে কখনও ক্লান্তি ছিল না ওর। দলপতি-পরিষদের সভায় ও সব সময়েই ছোট বাচ্চাদের প্রতি স্নেহযত্ন দেখানোর পক্ষে মতপ্রকাশ করত। আর রীতিমতো গর্ব করার মতোও বহু কীর্তিকলাপ ছিল গেওর্গিয়েভ্স্কির। সবচেয়ে নোংরা আর সবচেয়ে বেখাপ্পা ছেলেদের ওর হাতে তুলে দেয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে দেখা যেত চক্চকে, পরিপাটি চুল নিয়ে তারা রীতিমতো বাবু বনে গেছে আর কলোনির শ্রম-জীবনের নানা পথে একেবারে নিখুঁতভাবে এগিয়ে চলেছে।

কলোনিতে ছিল দু-জন ভোল্কভ · জোর্কা আর আলিওশ্কা। যদিও ওরা ছিল দুই ভাই, তবু কোনো একটা ব্যাপারেও ওদের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যেত না। জোর্কার কলোনি-জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিল খারাপভাবে — ওকে পেয়ে বসেছিল অদম্য কুঁড়েমি আর প্রায়-প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ার বিশ্রী একটা প্রবণতা, তাছাড়া ওর স্বভাবটাও ছিল কুঁদুলে আর হিংসুটে-গোছের। ছেলেটা কখনও হাসত না, কথাও বলত খুব কম; আমার ভয় ছিল কোনোদিন ও আমাদের একজন হতে পারবে না, ঠিক পালিয়ে যাবে একদিন। এমন যে-ছেলে তারও একদিন রূপান্তর ঘটে গেল, আর তাও কোনোরকম হৈ-হল্লা না-করেই, শিক্ষা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোনোরকম প্রয়াস ছাড়াই। দলপতি-পরিষদের সভায় হঠাৎ একদিন দেখা গেল একটা মাটির নিচের ঠাণ্ডা-ঘরের ভিত খোঁড়ার কাজের জন্যে একটামাত্রই জুটি তৈরি করা

সম্ভব হচ্ছে, আর তা গালাতেঙ্কো আর জোর্‌কাকে নিয়ে। সম্ভাবনাটার কথা শুনে সবাই একচোট হাসল:

'অদের মতন এমন দুডা ফাঁকিবাজরে জুটি বাঁধ্যে একই কাজে লাগায়ে দেয়া তো কল্পনা করা যায় না।'

আরও হাসির ধুম পড়ে গেল যখন কে-যেন প্রস্তাব করল যে ওদের দু-জনকে নিয়ে একটা মিশ্র বাহিনী গঠন করে দেয়া হোক। এটা বেশ একটা মজার পরীক্ষাও হবে, তাছাড়া দেখাই যাক না শেষপর্যন্ত এতে কী ফল দাঁড়ায় আর ওরা দু-জনে কতটাই-বা খুঁড়তে পারে। কিছুক্ষণ আলোচনার পর ঠিক হল জোর্‌কাকেই মিশ্র বাহিনীটার দলপতি করা হবে, কারণ গালাতেঙ্কো ছিল আরও অপদার্থ। অতঃপর জোর্‌কাকে পরিষদের সামনে ডাকিয়ে আনা হলে আমি বললুম:

'শোনো, ভোল্‌কভ, একটা ঠাণ্ডা-ঘরের ভিত খোঁড়ার জন্যে তোমাকে মিশ্র বাহিনীর দলপতি করা হয়েছে। এ কাজে গালাতেঙ্কো তোমাকে সাহায্য করবে। কেবল আমাদের একটু ভয় হচ্ছে তুমি ওকে দিয়ে কাজ করাতে পারবে কিনা।'

এক মুহূর্ত কী ভেবে জোর্‌কা বিড়বিড় করে বলল:

'পারব্য।'

পরদিন ভারপ্রাপ্ত একজন কলোনি-বাসিন্দাকে উত্তেজিত অবস্থায় আমার কাছে ছুটে আসতে দেখা গেল।

'আপনে শুধু আসেন একবার! জোর্‌কা ক্যামনে গালাতেঙ্কোরে দিয়ি কাজ করাত্যেছে দেখলি যা মজা লাগব্যে-না কী বলি! ক্যাবল এটু সাবধানে আসেন, অরা যদি আমাদেরে দেখতি পায় কি কথা শুনতি পায় তাইলে সব মজা নষ্ট হয়্যে যাবেনে।'

ঝোপের আড়ালে-আড়ালে গুড়ি মেরে ওদের কাজের জায়গাটার কাছে গেলুম। জায়গাটায় একসময়ে বাগান ছিল, পরে নষ্ট হয়ে-যাওয়া সেই বাগানের একটা অংশ পরিষ্কার করে নিয়ে সেখানেই ভবিষ্যৎ ঠাণ্ডা-ঘরের ভিতের চারকোনা আয়তক্ষেত্রের মাপটা দাগ দিয়ে রাখা হয়েছিল। সেই আয়তক্ষেত্রের একটা প্রান্ত খোঁড়ার ভার পড়েছিল গালাতেঙ্কোর ওপর, অপর প্রান্ত খুঁড়ছিল জোর্‌কা। কোন্‌টা-যে কার দিক তা অবশ্য এক-নজরেই ঠাহর করা গেল কে কোন্‌দিকে আছে তা দেখে এবং দুয়ের কাজের পরিমাণের মধ্যে স্পষ্ট ফারাক

লক্ষ্য করে। ওরই মধ্যে জোর্‌কা বেশ কয়েক বর্গমিটার জমি খুঁড়ে ফেলেছিল, অপরদিকে গালাতেঙ্কো কেটেছিল সরু একটা ফালি জায়গামাত্র। কিন্তু তা বলে গালাতেঙ্কো মোটেই ঘুমিয়ে ছিল না — অবাধ্য কোদালটার উলটো পিঠে ভারি পা-টা রেখে আনাড়ির মতো ঠেলে-ঠেলে কোদালটাকে মাটিতে বসানোর চেষ্টা করছিল, আর বেশ বোঝা যাচ্ছিল রীতিমতো কষ্ট করেই ভারি গর্দানটা বারে-বারে ঘুরিয়ে ওকে জোর্‌কার দিকে ফিরে-ফিরে তাকাতে হচ্ছিল। আর যেই দেখছিল জোর্‌কা ওর দিকে তাকাচ্ছে না অমনি গালাতেঙ্কো কাজ বন্ধ করে কোদালটার ওপর আলগাভাবে পা-খানাকে রেখে দাঁড়িয়ে থাকছিল, যাতে দরকার পড়লেই মুহূর্তে পা চালিয়ে কোদালখানাকে ঠেলে মাটিতে বসাতে পারে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল ওর এই চালাকিতে ভোল্‌কভ রীতিমতো বিরক্ত হয়ে উঠেছে। শোনা গেল গালাতেঙ্কোকে সে বলছে:

'তুই ভাব্যেছিসডা কী? আমি কি সারাক্ষণ তর পিছু-পিছু ঘোরব আর কাম করার জন্যি টিকটিক করতি থাকব? তরে নিয়ি অত সোহাগ করার সময় নাই আমার, বোঝ্যেছিস?'

'তা, অত বেশি কাম করার দরকারডা কী?' গালাতেঙ্কো গজগজ করতে লাগল।

এ-কথার জবাব না-দিয়ে জোর্‌কা গালাতেঙ্কোর কাছে গেল।

বলল, 'আমি শুধাশুধি তর সাথে বকবক করত্যে চাই না, বোঝ্যেছিস! কিন্তু তুই যদি এখান থ্যেকে ওইখান অব্দি না-খুঁড়্যেছিস আজ, তাইলে তর দুপরের খাবার আমি যদি জঞ্জালের মধ্যি না-ফেল্যে থুই তো কী কয়্যেছি।'

'কে তরে খাবার ফেলতি দিত্যেছে, শুনি? আন্তন জানতি পারল্যে কী কইবেন খেয়াল আছে?'

'তাঁর যা ইচ্ছা তাই কইতি পারেন, কিন্তু আমি তর খাবার ফ্যালবই ফ্যালব। এখন যা ভালো বুঝিস তাই কর্‌।'

জোর্‌কার চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে এক লহমা তাকিয়ে গালাতেঙ্কো বুঝতে পারল যে মুখে যা বলছে জোর্‌কা কাজে তা করে ছাড়বেই। এবার সে বিড়বিড় করে বলল:

'আমি তো কাজ করত্যেছি, করত্যেছি না? তুই এট্টুখানি রেহাই দে দিকি আমারে!'

এতক্ষণে ওর কোদাল আগের চেয়ে জল্‌দি চলতে শুরু করল। ভারপ্রাপ্ত কলোনি-বাসিন্দাটি এইবার আমার কনুইয়ে হাত ঠেকাল।

ফিস্‌ফিস করে বললুম, 'তোমার রিপোর্টে এই ব্যাপারটাও ঢুকিয়ে দিও।'

ওই দিন সন্ধেয় ভারপ্রাপ্ত কলোনি-বাসিন্দা তার রিপোর্ট পড়া শেষ করল এই কথাগুলো দিয়ে:

'বড় ভোল্‌কভের নেতৃত্বে পরিচালিত তৃতীয় 'পি' মিশ্র বাহিনীর ভালো কাজের ব্যাপারে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।'

কারাবানভ তার প্রকাণ্ড হাতখানা দিয়ে ভোল্‌কভের গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল:

'হুঁ-হুঁ বাবা! সব দলপতির বরাতে কিন্তু এমন সম্মান জোটে না।'

সগর্বে হাসল জোর্‌কা। অফিস-ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গালাতেঙ্কোও তার হাসি থেকে আমাদের বঞ্চিত করল না। তারপর ঘড়্‌ঘড়ে গলায় বলল:

'হ্যাঁ, আজ আমরা কাজ করেছি বটে — পাগলার মতন কাজ করেছি!'

সেই দিনটি থেকে একেবারে বদলে গেল জোর্‌কা। নিখুঁত, সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার পথে দ্রুতপদক্ষেপে এগিয়ে চলল সে। এতখানি উন্নতি হল তার যে এ-ঘটনার মাস দুয়েক বাদেই দলপতি-পরিষদ থেকে নতুন কলোনির পশ্চাৎপদ সপ্তম বাহিনীকে উস্কে তোলার বিশেষ উদ্দেশ্যে তাকে নতুন কলোনিতে স্থানান্তরিত করা হল।

জোর্‌কার ভাই আলিওশ্‌কা ভোল্‌কভকে প্রথম দিনটি থেকেই সকলে ভারি পছন্দ করেছিল। সে কিন্তু দেখতে মোটেই সুন্দর ছিল না। যত রকমের রঙ হতে পারে সব রঙের ছিটে-দাগে ভরতি ছিল ওর মুখখানা, আর কপালটা এত ছোট ছিল যে মনে হোত চুলগুলো ওপর দিকে না-উঠে শজারুর মতো সামনের দিকে এগিয়ে আছে। কিন্তু আলিওশ্‌কা বোকা তো ছিলই না, বরং ছিল দারুণ চালাক, আর অল্পদিনের মধ্যেই সকলে তা বুঝে ফেলেছিল। আলিওশ্‌কার চেয়ে মিশ্র বাহিনীর ভালো দলপতি আর ছিল না - ও যেমন দক্ষতার সঙ্গে কাজের পরিকল্পনা করতে পারত, তেমনি ওর চেয়ে অল্পবয়সী প্রতিটি ছেলের জন্যে উপযুক্ত কাজ খুঁজে বের করতে ছিল ওস্তাদ। কাজ করার নিত্যি নতুন উপায় আর পদ্ধতি আবিষ্কারেও ওর জুড়ি মেলা শক্ত ছিল।

চ্যাটালো মঙ্গোলীয় মুখ, শক্তসমর্থ গাঁট্টাগোট্টা চেহারার কুদ্‌লাতিও ছিল ভারি চালাক ছেলে। আমাদের কাছে আসার আগে ও ছিল নেহাতই খামারের

জনমজুর, কিন্তু কলোনিতে ওর ডাকনাম চালু হয়ে গিয়েছিল 'কুলাক' বলে। বাস্তবিক ও যদি কলোনিতে না-আসত (যার ফলে যথাসময়ে ও পার্টি-সদস্যপদ পেয়েছিল) তাহলে, বলা যায় না হয়তো ও কুলাকই বনে যেত। কারণ, একধরনের জান্তব ও একই সঙ্গে বদ্ধমূল সহজাত মালিকানার প্রবৃত্তি, এবং ভূ-সম্পত্তি, গাড়িঘোড়া, জমিতে চালানোর মই, সার, চষা জমি আর নানা চালার নিচে আর গোলাঘরে খামার-সংক্রান্ত নানা ধরনের কাজের প্রতি অদম্য আকর্ষণ ছিল ওর কাছে মস্ত বড় একটা নেশাবিশেষ। তর্কে কুদ্‌লাতি পরাস্ত হবার পাত্র ছিল না, কথা বলত আস্তে-আস্তে থেমে-থেমে, আর ওর মধ্যে হিসেবী আর সঞ্চয়ী সম্পত্তি-সংগ্রাহকের বনিয়াদটা ছিল পাকাপোক্ত। প্রথম জীবনে জনমজুরের কাজ করায় অবশ্য কুলাকদের ও বিবেকের তাড়নাবশতই ঘৃণা করত, আর নীতিগতভাবে যেমন সকল যৌথ-জীবনের তেমনি আমাদের যৌথ-জীবনেরও মূল্য বুঝত সর্বান্তঃকরণে। বহুদিন ধরেই কুদ্‌লাতি ছিল কলোনিতে কালিনা ইভানভিচের ডান হাত, ফলে ১৯২৩ সালের শেষাশেষি কলোনির অর্থনৈতিক পরিচালনার অনেকখানি দায়িত্ব ওর স্কন্ধেই ন্যস্ত হয়েছিল।

আমাদের স্তুপিত্‌সিনও ছিল বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মনের অধিকারী, তবে সে ছিল কুদ্‌লাতির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানুষ। সত্যিকার প্রলেতারীয় ছিল সে। স্তুপিত্‌সিন জানত তার পূর্বপুরুষরা খার্‌কভের কারখানাগুলোয় কাজ করতেন, এবং তার বাবা, ঠাকুর্দা, এমন কি ঠাকুর্দারও বাবা ঠিক কোন্‌-কোন্‌ জায়গায় কাজ করেছিলেন তার খোঁজও রাখত সে। তার পরিবারের লোকজন বহুদিন ধরে খার্‌কভের ফ্যাক্টরিগুলোয় সংগ্রামী শ্রমিকদের দলভুক্ত ছিলেন। ১৯০৫ সালের বিপ্লবে যোগ দেয়ার জন্যে তার বড় ভাই নির্বাসিতও হয়েছিলেন... তদুপরি স্তুপিত্‌সিন দেখতে ছিল সু-পুরুষ। চমৎকার সরু যেন পেন্সিলে-আঁকা ছিল ওর ভুরুদুটো, আর তাদের নিচে জ্বলজ্বল করত ছোট-ছোট, তীক্ষ্ন, কালো দুটো চোখ। ওর হাঁ-মুখের দু-পাশের গালে ছিল সূক্ষ্ম, সচল পেশীর পাতলা বন্ধনী, মুখখানা ছিল আশ্চর্যরকম ভাব-প্রকাশক, আর তার আচমকা পরিবর্তনগুলোও ছিল আগ্রহ-উদ্দীপক। আমাদের কৃষি-বিষয়ক শাখাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটার প্রতিনিধিত্ব করত স্তুপিত্‌সিন, সেই শাখাটা হচ্ছে নতুন কলোনির শুয়োরের খোঁয়াড়। ওই খোঁয়াড়ের জীবগুলো তখন অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে

বংশবৃদ্ধি করে খোঁয়াড় ভরিয়ে ফেলতে শুরু করেছিল। এ-কারণে একটা বিশেষ বাহিনী — যার সূচক-সংখ্যা ছিল দশ — তা শুয়োরের খোঁয়াড়ে কাজ করছিল, আর এই বাহিনীর দলপতি ছিল স্তুপিত্‌সিন। নিজের বাহিনীকে রীতিমতো কর্ম-তৎপর একটা দলে পরিণত করে তুলতে পেরেছিল ও। এই দলের সদস্যদের সঙ্গে অবশ্য মামুলি শুয়োর-পালকদের যৎসামান্যই মিল ছিল। দলের কর্মীরা বই ছাড়া এক পাও নড়ত না, নানারকম অঙ্কের হিসেবে গিজ্‌গিজ করত তাদের মাথা, আর হাতে-হাতে ঘুরত তাদের পেন্সিল আর লেখার প্যাড। তাছাড়া, খোঁয়াড়ের খাঁচাগুলোর দরজায়-দরজায় লট্‌কানো থাকত বরাহবংশ-পরিচয়সূচক নানারকম লেখাজোখা, আর সারা খোঁয়াড়-জুড়ে ছড়ানো থাকত হরেক রকমের নক্‌শা আর নিয়মকানুনের তালিকা। তদুপরি, প্রতিটি-শুয়োরের নামে-নামে ছিল একখানা করে দলিল। শুয়োরের খোঁয়াড়ে কী-যে না-ছিল তার ঠিক নেই!

আমাদের নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীটির পাশাপাশি ছিল ওরই সদৃশ আরও দুটো বড় গোষ্ঠী — এরা ছিল ভবিষ্যতে নেতৃত্ব নেয়ার জন্যে প্রতীক্ষমান দুটো সংরক্ষিত দল। এদের একটা দলে ছিল অপেক্ষাকৃত বয়স্ক সক্রিয় ছেলেরা। এরা ছিল চমৎকার কাজের ছেলে, ভালো কমরেড, শক্তসমর্থ, ধীরস্থির। তবে অসামান্য কোনো সাংগঠনিক দক্ষতা অবশ্য এদের ছিল না। এই ছেলেরা হল প্রিখোদ্‌কো, চোবত, সরোকা, লেশি, গ্লিইজের, শ্‌নাইদের, অভ্‌চারেঙ্কো, করিতো, ফেদরেঙ্কো ও এই রকম আরও অনেকে। অপর দলটিতে ছিল অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী ছেলেরা, সত্যিকার সংরক্ষিত দল বলতে যা বোঝায় সেই সব ছেলে। ওই সময়ের মধ্যেই তাদের ভেতর ভবিষ্যৎ সংগঠকের সকল লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল। বয়সে নিতান্ত ছোট ছিল বলে তারা তখনও পর্যন্ত কলোনির নানা বিভাগের পরিচালন-ব্যবস্থা নিজেদের হাতে তুলে নিতে পারে নি; তাছাড়া তাদের বড় দাদারা ছিল বিভিন্ন উঁচু পদে, আর ওই দাদাদের তারা আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি করত, ভালোবাসত। তবে বড়দের চেয়ে অনেকগুলো ব্যাপারে এই ছোটদের সুবিধে ঘটেছিল বেশি, কারণ দাদাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তারা কলোনি-জীবনে প্রবেশ করেছিল এবং সেই যৌথ-জীবনের সকল ঐতিহ্য ও তার মর্মবাণী আরও সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করতে সমর্থ হয়েছিল। ফলে, তারা কলোনি জীবনের তর্কাতীত মূল্যে আস্থাশীল ছিল আরও বেশি গভীরভাবে। সবচেয়ে বড়

কথা, এই বয়ঃকনিষ্ঠরা আরও উপযুক্তভাবে শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল, আর যে-জ্ঞান তারা আহরণ করেছিল তাকে বড়দের চেয়ে ভালোভাবে কাজে লাগাতে সমর্থ হচ্ছিল। এই সব ছেলে হল আমাদের পুরনো বন্ধু তোস্কা, শেলাপুতিন, জেভেলি, বগইয়াভ্লেন্স্কি; আর এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরও কিছু নতুন নাম — যেমন, লাপত, শারোভ্স্কি, রমান্চেঙ্কো, নাজারেঙ্কো, ভেক্স্লের, ইত্যাদি। এরা সবাই হল পরবর্তী কুরিয়াজবিজয়ের যুগের দলপতি আর সক্রিয় কর্মী। আমি যখনকার কথা বলছি তখনই ওরা মিশ্র বাহিনীগুলোর দলপতি মনোনীত হতে শুরু করেছিল।

কলোনির উপরোক্ত গোষ্ঠীগুলিই ছিল আমাদের যৌথ-সমাজের জনসংখ্যার অধিকাংশ। কি আশাবাদী মনোভাব, কি কর্মশক্তি, কি পড়াশুনো, আর কি অভিজ্ঞতা — সর্ব বিষয়েই ওরা ছিল সবল, প্রবল। বাকি ছেলেদের ওরাই দুর্নিবার গতিতে পিছু-পিছু টেনে নিয়ে চলেছিল। কলোনির ছেলেরা এই বাদবাকি ছেলেদের নিজেরাই তিনটে ভাগে ভাগ করে ফেলেছিল — যথা, 'জলা', কাচ্চাবাচ্চা আর 'উচ্ছৃঙখল জনতা'। 'জলা'-র দলে ছিল সেই সব ছেলে যারা কোনো দিক থেকেই নিজেদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারে নি, তারা-যে কলোনিরই অংশ সে-বিষয়ে নিজেরাই যেন যথেষ্ট নিশ্চিত নয় এমন ভাব করে স্পষ্টভাবে কোনো ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করতে পারত না।

তবে, সেই সঙ্গে এ-কথাও অবশ্য বলতে হবে যে কখনও-কখনও এই দলের মধ্যে থেকেও অসামান্য ছেলেপিলে বেরিয়ে আসত। আসলে এটাকে দল না-বলে একটা মধ্যবর্তী পর্যায় বলাই বোধহয় ঠিক হবে। কিছুদিন ধরে নতুন কলোনির ছেলেপিলেরাই ছিল এই পর্যায়ের একটা বেশ বড় অংশ। কাচ্চাবাচ্চা আমাদের কলোনিতে ছিল ডজন-খানেকেরও বেশি। অন্যেরা এদের কাঁচা মাল হিসেবেই গণ্য করত। এদের প্রধান কাজ ছিল কী করে ঠিকমতো নাক মুছতে হয় তা শেখা। এই শিশুরা নিজেরাও তাক-লাগানো কাজকর্ম করার কথা চিন্তা করত না, কেবল খেলাধুলো, বরফের ওপর স্কেটিং, নৌকো-বাওয়া, মাছধরা, বরফে শ্লেজগাড়ি চড়া আর টানা, ইত্যাদি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকত। আর আমারও মনে হোত ওরা ঠিক কাজই করছে।

'উচ্ছৃঙখল জনতা'-র দলে ছিল মাত্র জনা-পাঁচেকের মতো ছেলে — গালাতেঙ্কো, পেরেপেলিয়াত্চেঙ্কো, এভ্গেনিয়েভ, গুস্তইভান, এবং আরও এক-আধ জন। বিভিন্ন সময়ে এদের মধ্যে মারাত্মক কোনো-না-কোনো ত্রুটি

লক্ষ্য করেই সকলে একবাক্যে এদের এই ‘উচ্ছৃঙ্খল জনতা’-র দলে ফেলেছিল। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, গালাতেঙ্কো ছিল পেটুক আর কাজে ফাঁকিবাজ; মুখে-ফেনা-তুলে চিৎকারমাত করে মিথ্যে কথা বলা আর অনবরত বকরবকর করার জন্যে পরিচিত ছিল এভ্‌গেনিয়েভ; পেরেপেলিয়াত্‌চেঙ্কো ছিল রুগ্‌ণ, নাকী কান্না কেঁদে সহানুভূতি কুড়নোর ফিকির খুঁজত সে; আর গুস্তইভান ছিল ‘মানসিক বিকারগ্রস্ত’, ঈশ্বরে-আত্মনিবেদিত একধরনের জড়বুদ্ধি-বিশেষ। সব সময়েই সে পবিত্র কুমারীমাতার কাছে প্রার্থনা জানাত আর স্বপ্ন দেখত কোনো সন্ন্যাসীর মঠে ঢোকার। পরে, কালক্রমে, ‘উচ্ছৃঙ্খল জনতা’-গোষ্ঠীও তাদের এই সব দুর্ভাগ্যজনক চালচলন কিছু-কিছু বর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল, তবে এ-জন্যে যেতে হয়েছিল এক দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে।

১৯২৩ সালের শেষে আমাদের কলোনিতে যৌথ-জীবন ছিল এই রকম। অল্প কিছু ছেলেকে বাদ দিলে এই যৌথের সব সদস্যই চেহারায় আর চালচলনে ছিল একইরকম ফিটফাট আর চট্‌পটে, আর সকলেই হাবভাবে ফৌজী কায়দাকানুন জাহির করতে ভালোবাসত। ওই সময়ের মধ্যে আমাদের চমৎকার কুচকাওয়াজের দল তৈরি হয়ে গিয়েছিল, সারি-সারি ছেলের দলের সামনে থাকত চারজন বিউগ্‌ল আর আটজন ড্রাম-বাদক। আমাদের একটা অভিজ্ঞান-পতাকাও ছিল, রেশমী-সুতো-দিয়ে এমব্রয়ডারি-করা ভারি চমৎকার একটা সিল্‌কের পতাকা। এটা ছিল আমাদের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে শিক্ষা-সংক্রান্ত ইউক্রেনীয় জনগণের কমিশারিয়েতের কাছ থেকে পাওয়া উপহার।

প্রলেতারীয় ছুটির দিনগুলিতে আমাদের কলোনি ড্রাম বাজিয়ে কুচকাওকাজ করে শহরে যেত। আর আমাদের ছেলেদের আঁটোসাটো মাপা ছন্দে পা ফেলা, লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা আর বিশিষ্ট, ভদ্র চালচলনে শহরের লোকেদের আর সংবেদনশীল শিক্ষা-বিজ্ঞানীদের যেত তাক লেগে। কারো জন্যে যাতে অপেক্ষা করতে না-হয় সেজন্যে ওই সব দিনে শহর-স্কোয়ারের জমায়েতে আমরা এসে পেঁছতুম সবার শেষে, তারপর যতক্ষণ-না বিউগ্‌ল-বাদকরা শহরের সকল শ্রমিকের উদ্দেশে স্যালুটের বাজনা বাজানো শেষ করত আর তার সঙ্গে সঙ্গে কলোনির ছেলেদের হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকার পালা চুকত ততক্ষণ সবাই অ্যাটেন্‌শনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতুম। তারপর

আমাদের ছেলেরা সারি ভেঙে ছুটির দিনের মজা উপভোগ করতে কিছুক্ষণের জন্যে এদিক-সেদিক যেত, তবে আমাদের নির্দিষ্ট স্থানটুকুর সামনের আর পেছনদিকের সীমানা চিহ্নিত করে রাখার জন্যে সেখানে গোটাদুই ছোট পতাকা পুঁতে রেখে যাওয়া হোত। আর এই সমস্ত ব্যাপারটা এমনই গুরুগম্ভীর আর চিত্তাকর্ষক ছিল যে আমরা যে-জায়গাটা আমাদের জন্যে চিহ্নিত করে যেতুম আর কেউ এসে সেখানে দখল নিতে ভরসা পেত না। পোশাকের ঘাটতি আমরা উদ্ভাবনী কৌশল আর দুঃসাহস দিয়ে পূরণ করে নিতুম। ছেলেমেয়েদের যে-সুতীর পোশাক পরানো শিশু-সদনগুলোর জঘন্য প্রথা, আমরা ছিলুম তার ঘোর বিরোধী। কিন্তু আমাদের ওর চেয়ে ভালোদরের পোশাকও ছিল না। নতুন বা সুন্দর-দেখতে জুতোও ছিল না আমাদের। এ-কারণে আমরা কুচকাওয়াজে যেতুম খালি পায়ে, কিন্তু এমন ভাব দেখাতুম যেন এটা পুরোপুরি ইচ্ছাকৃত ব্যাপার। ছেলেরা পরত ধবধবে শাদা শার্ট। তাদের কালো ট্রাউজার্সগুলো ছিল ভালো কাপড়ের। সেই ট্রাউজার্স তলা থেকে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত পাটে-পাটে গুটিয়ে নিত ছেলেরা, আর ট্রাউজার্সের নিচের দুধ-শাদা অন্তর্বাসও একইভাবে তলা থেকে গুটিয়ে এনে ওই ট্রাউজার্সের পটির ওপর দিত তুলে। ছেলেদের শার্টের হাতাও কনুইয়ের ওপর পর্যন্ত গুটিয়ে তুলে দেয়া হোত। এর ফলটা দাঁড়াত এই যে সাজপোশাকে সামান্য একটু গ্রাম্য ছোঁয়াচ লাগা সত্ত্বেও এতে ছেলেদের বেশ ফিটফাট আর ঝলমলে দেখাত।

১৯২৩ সালের ৩রা অক্টোবর এমনই একসারি ছেলে কুচকাওয়াজ করে কলোনির ড্রিলের মাঠ ছাড়িয়ে বেরিয়ে এল। ইতিপূর্বে অবশ্য একটা অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ার অবসান ঘটেছিল, যেটা সম্পাদন করতে সময় লেগেছিল তিন সপ্তাহ। এরও আগে শিক্ষক-পরিষদ ও দলপতি-পরিষদের এক মিলিত সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী গোর্কি কলোনিকে একটা জায়গায় — অর্থাৎ, প্রাক্তন ত্রেপ্‌কে তালুকে — সংহত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, আর আমাদের দখলীকৃত রাকিত্‌নয়ে হ্রদের তীরবর্তী পুরনো তালুক জেলা জনশিক্ষা-দপ্তরের হাতে ছেড়ে দেয়ার কথা হয়। আর উপরোক্ত ওই ৩রা অক্টোবরের মধ্যে পুরনো কলোনির যাবতীয় জিনিসপত্র নতুন কলোনিতে স্থানান্তরণের কাজ শেষ হয়। কারখানা-ঘর, গুদামঘর, আস্তাবল, ভাঁড়ার, খাবার আর রান্নার ঘর, ইশ্‌কুল, ইত্যাদি সবকিছু আগেই একটু-একটু করে নতুন কলোনিতে

সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এই সময়ে শিক্ষক আর কর্মীদের জিনিসপত্রও স্থানান্তরিত হল। ৩রা অক্টোবরের সকাল লাগাদ কেবল পঞ্চাশটি ছেলে, আমাদের পতাকা আর আমি স্বয়ং থেকে গিয়েছিলুম পুরনো কলোনিতে।

ওই দিন ঠিক বেলা বারোটার সময় জেলা জনশিক্ষা-দপ্তরের জনেক প্রতিনিধি গোর্কি কলোনির তালুক হস্তান্তর-সম্পর্কিত দলিলে সই দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি নির্দেশ দিলুম:

'পতাকার নিচে — অ্যাটেন্‌শন!'

স্যালুট দেয়ার উদ্দেশ্যে ছেলেরা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল, ড্রামগুলো উঠল গর্জে, পতাকা-অভিবাদনসূচক কুচকাওয়াজের বাজনা বাজাতে লাগল বিউগ্‌লগুলো। পতাকা-রক্ষীবাহিনী অফিস-ঘর থেকে বের করে আনল নিশানখানা। আমাদের সারির ডানদিকে নিশানখানা বয়ে নিয়ে যাত্রা শুরু করলুম। যদিও পুরনো আস্তানাটার প্রতি বিন্দুমাত্র বিরূপ মনোভাব ছিল না, তবু তাকে বিদায় জানালুম না। আর কিছুই নয়, আমরা খালি পেছন ফিরে তাকাতে রাজি ছিলুম না, এই আর-কি। যখন আমাদের কলোনি-বাসিন্দাদের সারি তালে-তালে ড্রামের বাজনার আওয়াজে মাঠের নৈঃশব্দ্য চূর্ণ করে রাকিত্‌নয়ে হ্রদ আর আন্দ্রেই কার্‌পভিচের সুরক্ষিত আশ্রয় পাশে ফেলে গাঁয়ের রাস্তা পেরিয়ে গেল তখনও একবারের জন্যে পেছন ফিরে দেখলুম না কেউ। গাঁয়ের রাস্তা ছাড়িয়ে আমরা নামলুম গিয়ে কলমাকের ঘাসে-ছাওয়া তীরভূমিতে, তারপর কলোনি-সদস্যদের হাতে-গড়া নতুন পুলটার দিকে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে গেলুম।

আমাদের শিক্ষক আর কর্মী-সদস্যবৃন্দ এবং গন্‌চারোভ্‌কা গ্রামের বেশ কিছু মানুষ ত্রেপ্‌কের উঠোনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর নতুন কলোনির সমস্ত বালক আর কিশোর বাসিন্দা পুরো সাজসজ্জা করে সারি বেঁধে গোর্কি পতাকাকে অভিবাদন জানানোর উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ছিল অ্যাটেন্‌শনের ভঙ্গিতে।

আমরা প্রবেশ করলুম এক নতুন যুগে।

**প্রথম খণ্ড সমাপ্ত**

# পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union